রক্তাক্ত ভারত

নসীম হিজাযী

রক্তাক্ত ভারত

নসীম হিজাযী

অনুবাদ

ফজলুদ্দীন শিবলী

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

www.amarboi.org

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৩

ঐতিহাসিক উপন্যাস

রক্তাক্ত ভারত : মূল : নসীম হিজাযী
অনুবাদ : ফজলুদ্দীন শিবলী

প্রকাশক : তারিক আজাদ চৌধুরী
আল-এছহাক প্রকাশনী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স
(দোকান নং-৪৫) ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ইসলামী টাওয়ার দোকান নং-৩
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০১৯১৬৭৪৩৫৭৭, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯

স্বত্ব : সংরক্ষিত

বর্ণ বিন্যাস : আল-এছহাক বর্ণসাজ

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

মূল্য : ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

984-837-001-3

www.amarboi.org

পূর্বাভাষ

ভারত কখনও দেশ বিভাগ ও তৎকালীন পাকিস্তানকে মেনে নেয়নি। স্বাধীন ভারতীয় প্রশাসনের একটাই লক্ষ্য ছিল, কি করে পাকিস্তানের রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে রাখা যায়, যাতে আতুর ঘরেই এর অপমৃত্যু ঘটে। সুযোগমত যেন এই শিশু রাষ্ট্রটির টুটি টিপে দমরুদ্ধ করা যায়। চাই সেটা সন্ত্রাসের মাধ্যমে হোক কিংবা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, আভ্যন্তরীণ কোন্দল বা সৈন্য মার্চ করেই।

১৯৪৭-এর আগস্টেই সশস্ত্র হিন্দু ও শিখ জাতি প্রশাসনের ছত্রছায়ায় জিঘাংসা পূর্ণ মনোবৃত্তি নিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবে নামল। পরে দিল্লী,আজমীর, ইউপি, উত্তর ভারত ও ভরতপুর থেকে জম্মু-কাশ্মীরের পার্বত্যাঞ্চলেও ওই রক্তবন্যা বয়ে চলল। স্বপ্নেও যারা কিয়ামতের কথা ভাবেনি, শতাব্দীকাল ধরে যারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল–পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তারা। সামাজিক বন্ধন টুটে গেল। লাখো ইনসান পৌঁছে গেল মৃত্যুর দুয়ারে। হাজারো নিঃস্ব পরিবার তৎকালীন পাকিস্তানের পথ ধরল। এদের খুন ও আঁসু দিয়েই পাকিস্তানের ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

এ সেই ভুলে যাওয়া ইতিহাস নসীম হিজাযীর দুঃসাহসিক কলম যা 'রক্তাক্ত ভারত' শীর্ষক উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এই উপন্যাস কেবল ৪৭-এর রক্তস্নাত কাহিনী শুনিয়ে পাঠকের চোখের পানি ফেলতে নয় বরং এটা লেখার উদ্দেশ্য, নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে শিখানো।

দেশ বিভাগের আগে ও পরে থেকে নিয়ে অদ্যাবধি আমাদের স্বাধীনতা ও শান্তি-স্থিতিশীলতা বানচালকারীর একটাই অভীষ্ট লক্ষ্য–অখণ্ড ভারত। যার ছত্রছায়ায় উপমহাদেশে হিন্দু কৃষ্টি-কালচার ও পৌত্তলিক প্রজন্মের উন্মেষ ঘটানো যায়। এই কাপালিক লক্ষ্যে ওরা এক মুহূর্তও নষ্ট করতে নারাজ।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় একটি ইনসাফী রাষ্ট্র কায়েম করার স্বপ্ন দেখেছিল উপমহাদেশীয় মুসলিম মনীষীবৃন্দ। তাদের সেই চেতনাকে পুঁজি করে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে আমরা সাফল্যভরে উতরে ৪৭-এর রক্তলাল শোক ভুলতে চেষ্টা করব। রক্ত আখরে লেখা ৪৭-এর ইতিহাস আমাদের সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয়দৃপ্ত অঙ্গীকার।

শেষকথা, নসীম হিজাযীর আবেদন সারা বিশ্বে ব্যাপক পতন যুগের ইতিহাস বর্ণনা করায় তার ক্ষুরধার লেখনি তৃষিত মনের পিয়াস মেটায়। এজন্য আমরা তার এ বইসহ সপ্রকাশিত বই ছাপার আপ্রান চেষ্ট করছি। যা চেতনা যোগাবে। বইটি অনুবাদ করেছেন প্রথিতযশা নবীন অনুবাদক জনাব ফজলুদ্দীন শিবলী। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আগাম মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

–প্রকাশক

www.amarboi.org

ভূমিকা

প্রাচীন সেই বৃক্ষটি

যা প্রায় এক শতাব্দী ধরে আমার জনপদের প্রাণকেন্দ্র ছিল। গাঁয়ের শিশু-কিশোররা এর শাখা-প্রশাখায় ঝুল খেত। জোয়ান-বৃদ্ধরা এর শীতল ছায়ায় বসে আদিকালের ইতিকথার আসর জমাত। গ্রাম্য মহিলারা এর নিচে দাঁড়িয়ে বধূবরণ করত। এ সেই বৃক্ষ যা বহু শিশুকে জোয়ান আর জোয়ানকে দেখেছে বৃদ্ধ হতে।

আমার জীবনের হাসি-কোলাহল এ বৃক্ষের নীচে দাঁড়ালে অতীতের আবছা স্মৃতিতে ম্লান হয়ে যায়। উপনীত হই এমন এক সমুদ্রতীরে যেখানে আছড়ে পড়ে না উত্তাল তরঙ্গ। যদিও জীবন সমুদ্রের মহাসোপান থেকে হালকা, মিষ্টি ও নিবিড় সুর মূর্ছনা ভেসে আসছে। এমন এক মহাশূন্যে হারিয়ে যাই আমি, যার অন্তর রুকমারী রঙে রঙিন।

প্রাণোচ্ছল সংগীতের সুরলহরী ও নয়নাভিরাম রসের খেলা প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সুড়সুড়ি দেয় আমার। শুনতে পাই সেখানে পত্র-পল্লবের শনশনানি। ভেসে ওঠে সে সব বাল্যসাথীদের ক্রীড়া-কৌতুকের চিত্র, শৈশবে যারা ওই বৃক্ষতলে খেলত। জীবন পর্দার মৃদুহাসি যেখানে অট্টহাসিতে রূপ নিত সহসাই। ওখানে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের সোনালী অতীতকে কাছে থেকেই দেখি। আমার চেয়ে বয়সী ছেলেরা ওতে চড়ে হাসির মজলিস করে থাকত– হয়রান হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আমি। পরে একদিন আমি ওর শাখা-প্রশাখায় চড়তে থাকলাম–ছোট ছেলেরা কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

অতীতের বুক চিরে বর্তমানের জন্ম আর বর্তমানের বুক চিরে জন্ম ভবিষ্যতের। আমার জনপদে মুচকি হাসি-অট্টহাসিতে আর অট্টহাসি-শিহরণ পুলকে পরিণত হতো নৈমিত্তিকই।

বলতে গেলে হঠাৎই একদিন জীবন বীণার সূক্ষ্ম তারগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। যে বৃক্ষ থেকে মন্থর নৃত্যগীত ও হাসি-কোলাহলের সৃষ্টি, সে বৃক্ষের পাশে ঐ সব লোকের জিগরফাটা আর্তনাদ শোনা গেল–যারা এর স্রষ্টা।

আগস্ট, ১৯৪৭-এ পূর্ব পাঞ্জাবের হাজারো জনপদ যখন আগুন ও খুনের তুফান দেখছিল তখন এ বৃক্ষের শিকড় ওদেরই রক্তে লাল হয়েছিল যারা এক সময় এতে পানি সিঞ্চন করত। এর নীচে এসব লোকেরই লাশ তড়পাতে থাকে, বাল্যকালে যারা এতে নাগরদোলা করত। ওরা আমার সাথী, দোস্ত কিংবা প্রিয়জন। প্রিয় স্মৃতির ওই বৃক্ষটির নীচে শায়িত আছে ওদের লাশগুলো চিরদিনের তরে।

কল্পনার রঙিন পেখমে ভর করে ঐ মাহফিলের উদ্ভূত বাহারী রঙ দেখি, চিরদিনের তরে বিরান হয়ে গেছে যা। ওই মুচকি হাসিকে কখনই ভুলতে পারব না, জিন্দেগীর মাসুম চেহারা থেকে চিরতরে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে যা। ওই অট্টহাসি এখনও আমার কানে গুঞ্জরিত হয়, জনমের তরে যা খামোশ হয়ে গেছে। কিন্তু শত ঝড়-ঝাপটার মাঝেও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই বৃক্ষ বহাল তবিয়তে।

এক সফল সঙ্গীত বিশারদ হয়ে যদি এই গাছের শাখা-প্রশাখাকে হারমোনিয়াম বানাতে পারতাম তাহলে ওদের অশরীরী আত্মার কানে এ গুঞ্জন দিতাম–দোয়া করো, তোমাদের রক্তঋণ শোধ করতে কোন সুলতান মাহমুদ গযনবী বা মোহাম্মদ বিন কাসিম এগিয়ে আসে যেন।

নসীম হিজাযী
১২ মে, ১৯৪৭ ইং

www.amarboi.org

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ!! সুহৃদ পাঠক সমাজের হাতে শিকড়সন্ধানী উপন্যাসিক নসীম হিজাযীর আরেকটি উপন্যাস তুলে দিতে পারায় নিজকে ধন্য মনে করছি। পাঠক সমাজে আমার অনূদিত 'চূড়ান্ত লড়াই', 'স্পেনের আর্তনাদ', 'ইউসুফ বিন তাশফীন', 'রক্ত নদী পেরিয়ে'–শীর্ষক লেখকের চারটি বইয়ের অভাবনীয় সাড়া বক্ষ্যমান বইটির অনুবাদে হাত দিতে যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে।

'রক্তাক্ত ভারত' নসীম হিজাযীর অপর একটি দুনিয়া কাঁপানো উপন্যাসের ভাষান্তর। পাঠক বইটিতে লেখককে অন্য মূর্তিতে আবিষ্কার করতে পারেন। পতন যুগের ইতিহাসকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি যৎকিঞ্চিত নারী-পুরুষ চরিত্রের অবতারণা করে তিনি নাম কুড়িয়েছেন। বুঝিয়েছেন, এতটুকুনকে উপন্যাস বলে নাক সিটকানোর জো নেই।

প্রাচীন আরব, স্পেন, মরক্কো ও পৃথিবীর হাজারো জনপদে নির্যাতিত মুসলিম জাতির গাদ্দার ও শাসক চক্রের জন্য তার প্রতিটি বই-ই শেলের আঘাত। অধিকাংশ বই-ই প্রাচীন কাহিনী নিয়ে গড়া। ব্যতিক্রম শুধু চলতি বইয়ের বেলায়। এ বইটির মূল কাহিনী তথা ইতিহাস এমন লোকেও পড়বেন যারা নিখিল ভারত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে স্বচক্ষে দেখেছেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, প্যাটেল-জিন্নাহ, মাউন্টব্যাটেন ও র‍্যাডক্লিফকে জীবদ্দশায় অবলোকন করেছেন। পাঞ্জাব ও কাশ্মীর ট্র্যাজেডি দেখেছেন, দেখছেন, দেখবেন।

অত্যন্ত আফসোসের খবর হলেও সত্য যে, আমাদের এই প্রিয় লেখক সম্প্রতি তাঁর জাগতিক সফর শেষ করেছেন। কষ্টসহিষ্ণু পোড় খাওয়া এই মহা মনীষী রেখে গেছেন তাঁর অনবদ্য স্বাক্ষর ২২ খানা বইয়ে। ইসরাফিলের ফুৎকার ধ্বনির পূর্ব পর্যন্ত যা জাতিকে জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে। শেষকথা,

কারো হৃদয়ে আঘাত করলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। প্রেরণা দিয়ে দোয়া করবেন।

বিনীত—
ফজলুদ্দীন শিবলী
১৯/৪/৯৮

www.amarboi.org

রূহের খোরাকের জন্য আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই পড়ুন-

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কিছু বই-

❖ আনোয়ারুল বয়ান (কুরআনের তাফসীর) ৯ খণ্ডে
❖ বিষয়ভিত্তিক আল কুরআন
❖ বিষয়ভিত্তিক হাদীস (বাংলা ফয়যুল কালাম)
❖ হাদীস কাহিনী
❖ আল-কোরআন শ্রেষ্ঠ মোজেযা
❖ ওয়াজে বে-নজীর বা চমৎকার ওয়াজ
❖ হার পেরেশানী কা এলাজ "দুশ্চিন্তা মুক্তির উপায়"
❖ কুদরতের কারিশমা
❖ আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
❖ প্রিয় নবীর (সা) অশ্রু
❖ নারীর অলঙ্কার
❖ মরা লাশ যুদ্ধ করে
❖ নারী পর্দায় থাকবে কেন ? ও নারী মুক্তির পথ
❖ রাসূল (সা) এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন
❖ মরনের পূর্বে ও পরে
❖ কবর আযাব কী ও কেন? বাস্তব ঘটনাবলি
❖ স্বামী-স্ত্রীর মিলন তত্ত্ব ও দাম্পত্য জীবনের জরুরী কথা
❖ ছোট বেলায় প্রিয় নবী (সা)
❖ দাকায়েকুল হাকায়েক "মৃত্যু রহস্য"
❖ খ্রীস্ট ধর্মের বিকৃতির ইতিহাস
❖ রূহে তাসাউউফ
❖ দাড়ি রাখব কেন?
❖ বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আল্লাহকে দেখেছি
❖ নবী-ওলী ও মুসলিম মনীষীদের অবিস্মরণীয় বাণী
❖ সুন্নত ও বিদ'আত
❖ মুসলিম শিশুদের নামের ভাণ্ডার
❖ ফাঁসির মঞ্চে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা
❖ বীর দীপ্ত নারী (উপন্যাস)
❖ আমলের পুরস্কার ও বিস্ময়কর ঘটনাবলি
❖ প্রিয় নবীর (সা) হাস্য-রসিকতা
❖ বিশ্ব নবীর (সা) ১০০ অনন্য বৈশিষ্ট্য
❖ সমকালীন জরুরী মাসায়েল
❖ কালীলা-দিমনা (শিক্ষণীয় গল্পের ঝুলি)
❖ আল্লাহর জিকিরের মাহাত্ম্য
❖ ইসলামের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক
❖ বিশ্বনবীর (সঃ) জীবনী
❖ হালাল রুযী রোযগার
❖ মহিলাদের ওয়াজ (১ম-৩য় খণ্ড)
❖ থানবী (রঃ)-এর অমীয় বাণী
❖ আল্লাহর মুহব্বত লাভের উপায় (১-৩য় খণ্ড)
❖ গল্প শুধু গল্প নয়
❖ সাহাবায়ে কেরামের (রা) কান্না
❖ প্রিয় নবীর (সঃ) প্রিয় সুন্নত
❖ দারিদ্র মুক্তির আমল
❖ মেসওয়াকের গুরুত্ব ও ফজীলত
❖ মহিলাদের তা'লীম বা আদর্শ নারী শিক্ষা
❖ বেহেশ্তী নারী (তারিক জামিলের অমূল্য বয়ান)
❖ আল্লাহ ওয়ালাদের মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা
❖ সহীহ আমালে যিন্দেগী
❖ গীবত ভয়াবহ
❖ শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয়
❖ ছোটদের প্রিয় নবী (সা)
❖ বুখারী শরীফ (তাজরীদুস সহীহ)
❖ দ্বীনদার স্বামী ও দ্বীনদার স্ত্রী
❖ বেহেশ্তী খুশবু
❖ মহিলাদের মাসআলা মাসায়িল
❖ টি, ভি, দেখার ভয়াবহ পরিণতি
❖ বিষয়ভিত্তিক মাসয়ালা মাসায়িল
❖ শেখ সাদীর ১০০ গল্প
❖ কবীরা গুনাহ (৪৬৭ টি বড় গুনাহ)
❖ মছনবীর গল্প (আদর্শ গল্পগুচ্ছ)
❖ আখেরাতের সম্বল
❖ অসুস্থতা ও বিপদাপদের প্রতিদান
❖ তওবার ফযীলত ও গুরুত্ব
❖ নামাযের দার্শনিক তত্ত্ব
❖ বেহেশ্তী জেওর
❖ ঋণের ভয়াবহ পরিণতি
❖ মুসলিম মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
❖ আল-কুরআনের জ্ঞান কোষ
❖ আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে

❑ বিশ্বখ্যাত ইসলামী ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীর লিখিত বই-

১. চূড়ান্ত লড়াই, ২. রক্তাক্ত ভারত, ৩. রক্ত নদী পেরিয়ে, ৪. শত বর্ষ পরে, ৫. লৌহ মানব, ৬. মরু সাইমুম, ৭. সাংস্কৃতির সন্ধানে, (লেখকের অন্যান্য বই ধারাবাহিকভাবে বের হবে)

❑ বিশ্বনন্দিত ইসলামী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ এর বই-

১.দামেস্কের কারাগারে, ২.শেষ আঘাত (১ম+২য়+৩য় খণ্ড) ৩.সিংহ শাবক (লেখকের অন্যান্য বই বের হবে)

❑ খুচরা, পাইকারী ও ভি. পি. যোগে কিতাব পাইবার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা-

আল-এছহাক প্রকাশনী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং-৪৫
৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২৩৫২৬

আল-আবরার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৩
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯

www.amarboi.org

প্রথম খণ্ড

মুচকি হাসি

www.amarboi.org

৪র্থ খণ্ড

[illegible]

www.amarboi.org

১

বিলের কিনারায় আম ঝাড়ের নীচে বসে হুক্কার কল্কেতে আগুন ধরাচ্ছিল ইসমাঈল। তার বড় ভাই গোলাম হায়দারও বাগানের কোণ থেকে এসে হাযির। কোদাল রেখে পাশে বসতে বসতে বলল— ইসমাঈল! হাল বন্ধ করো না। অর্ধেকটা ক্ষেত চাষের বাকী রয়েছে এখনো। এরপর বাগানে দিতে হবে পানি।

হুক্কার নল গোলাম হায়দারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন ইসমাঈল। তিনি হাত বাড়িয়ে নিয়ে হুক্কার নলে টান দিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। গড়গড়ার আওয়ায ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

গোলাম হায়দার কয়েকটান দিয়ে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল— খানিকপর ক্ষেতটার চাষ কেমন হয়েছে দেখে নিও।

ঃ কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায় ?' বললেন ইসমাঈল।

ঃ মজিদের খবর নিয়ে আসি। গতকাল মাস্টারজী পাটোয়ারীর মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছেন— ও দু'দিন ধরে গরহাজির। আজ ওকে আচ্ছামত পিটিয়েছি।

ইসমাঈল মুচকি হেসে বলল— মেরে কোন ফায়দা হবে না। আমার মতে, তুমিও ওর সাথে স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও। আজ ভাইজান এলে বলব, মজিদকে পড়াতে হলে তার বাপকে তার রাখালী করতে হবে। বাপকে তার বেটার সাথে সর্বক্ষণ থাকতে হবে।

ঃ ভাইজান আজ আসছেন— একথা তোমায় বলল কে?

ঃ তাঁর নওকর এসেছিল। সন্ধ্যা নাগাদ আসছেন— এমনই বলেছে সে। দশ দিনের ছুটিতে আসছেন তিনি।

ঃ তাহলে এবার তিনি সলীমকে স্কুলে ভর্তি করেই তবে যাবেন। এটাই ভালো। এতে মজিদের পড়ার উৎসাহ বাড়বে বলে আমার বিশ্বাস।

ঃ কিন্তু সলীম যে ছোট এখনও। শুনেছি মাস্টারজী ওকে খুব মারপিট করেন।' গোলাম হায়দার আরো কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন, হঠাৎ ক্ষেতের কিষাণ বলে উঠল— হায়দার। বোধহয় তোমার পুত্রধন আসছে।'

গোলাম হায়দার উঠে দাঁড়াল। ইসমাঈলও তার অনুসরণ করল। সবুজ ক্ষেতের মাঝ দিয়ে যাওয়া সরু পথের দিকে তাকাতে লাগলেন তারা উভয়েই। পাঁচটি বালক গাধা হাঁকিয়ে এগিয়ে আসছে। মজিদ তাদের রাহবর। ওর হাতে একটা কাঠ, যা দিয়ে চাবুকের কাজ চলছে। ক্ষেতের কিষাণেরা উঁকি-ঝুকি মেরে দেখছিল ওদের। গাধার মালিক অসম্ভব রাগান্বিত সে আজ। বকছলন যাচ্ছে তাই। যমীন থেকে বারকয়েক ঢেলা উঠিয়ে মারছিল সাধ্যমত।

গোলাম হায়দারের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠেছে ; কিন্তু ইসমাঈলের হাসি দেখে সেও হেসে উঠলেন।

www.amarboi.org

আম ঝাড়ের কাছে এসে গাধার পিঠ থেকে নেমে পড়ল মজিদ। অন্যান্য বালকরাও তাই করল। গাধার পিঠ থেকে নেমে সকলেই যার যার বাড়ীর পথ ধরল। কিন্তু বাপ-চাচাকে দেখে মজিদ বাড়ী যাওয়ার সাহস করল না।

গাধার মালিক খায়রুদ্দীনের খায়েশ ছিল দুষ্ট বালকদের বাপ-দাদাদেরও গালি শোনানো। বদ্ কিসমত তার, চিৎকার দিতে দিতে কণ্ঠতালু শুকিয়ে যাওয়ায় তার সেই খায়েশ রয়েই গেল। রাগের তোড়ে মাথার পাগড়ী তার গলায় পেঁচিয়ে কণ্ঠহারে পরিণত হয়েছিল। আম ঝাড়ের একটু দূরে কাঁটা গাছের সাথে হোঁচট খেয়ে সে গিয়ে পড়ে পানির নালায়। ভদ্রসমাজ যাকে আত্মহত্যা বলে বিবেচনা করে তার সবগুলোই বয়ে গেছে খায়রুদ্দীনের ওপর দিয়ে। গাধাগুলো আসমানের দিকে তাকিয়ে জাতবুলি বকছিল। বেচারা খায়রুদ্দীন রাগান্বিত হয়ে অবোধ প্রাণীগুলোকে লাঠি দ্বারা আচ্ছামতো পেটাতে শুরু করল। লাঠি গেল ভেঙ্গে। এতে তার রাগ অবশ্য খানিক কমে এল।

হাসি সংযত করে সামনে এগিয়ে এল ইসমাঈল। বলল, খায়ের! যারা তোমাকে বিব্রত করেছে–তাদের কারো রক্ষা নেই।

গোলাম হায়দার লাঠি হাতে তেড়ে গেল মজিদের প্রতি। ইসমাঈল লাঠি কেড়ে নিয়ে বলল— কান ধর মজিদ!' মজিদ চাচার কথার অনুসরণ করল।

গোলাম হায়দার ও ইসমাঈলের সামনে খায়রুদ্দীনের রাগ কমে এলো। গলা থেকে পেঁচানো পাগড়ী মাথায় মুড়ে বলল— চৌধুরী সাহেব! আমি ওদের গাধায় চড়তে কখনও নিষেধ করেছি কি? আমার কাজ না থাকলে বাচ্চারা গাধায় চড়বে এতে অসুবিধে কিসে? কিন্তু আজ পুরান মাসীর মেলায় থালা-বাটি নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। বেশ ক'হপ্তা ধরে কাজের চাপ থাকায় মেলায় যেতে পারিনি। ওদের ছুটির আগেই প্রতিদিন গাধাগুলো বাড়ী তুলে নেই। কিন্তু আজ ওদের ছুটি হয়ে যায় নির্ধারিত সময়ের আগেই। আমি থালা-বাটি গাধায় তুলতে যাব এমনি সময় এসে দেখি ওরা গাধা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। পুরো গ্রাম বিচরণ করে নদীর তীরে যায় ওরা। এক চক্কর দিয়ে ফিরে এলে ভাবলাম আমার অসহায়ত্বের প্রতি ওদের রহম আসবে। এই আশায় ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকি। আমাকে দেখামাত্রই ওরা ক্ষেতের পথ ধরে এদিকে অগ্রসর হয়।'

ইসমাঈল বলল— আচ্ছা খায়ের ভাই! আগামীতে ওরা আর এমন ধৃষ্টতা দেখাবে না। দেখালে সোজা আমার কাছে নিয়ে এসো। যাও কাস্তে ওঠাও। গাধাগুলোর ঘাস কাটো এই ক্ষেত থেকে।

গোস্বার পরিবর্তে খায়রুদ্দীনের এক্ষণে কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে ওঠেছে। কাস্তে ওঠানোর পূর্বে অগ্রসর হয়ে সে মজিদের বাযু ধরে বলল— দেখ ভাই! আজ বড্ড পেরেশান করেছ আমায়। তোমার সওয়ার হবার খায়েশ জাগলে একাকী চলে এসো আমার কাছে। কিন্তু খোদার দিকে চেয়ে স্কুলের সকল ছেলেদের নিয়ে নয়।'

দ্বিধাগ্রস্তভাবে মজিদ একবার বাপ আর একবার চাচার দিকে তাকাতে লাগল। ইত্যবসরে আমবাগানের পাশ থেকে কে যেন উচ্চকণ্ঠে হেঁকে উঠল— মজিদ! মজিদ!! ও মজিদ!! অনুমতির কাতর নয়নে বাপ-চাচার দিকে তাকায় মজিদ। চাচা বললেন— যাও নালায়েক।

www.amarboi.org

স্কুলব্যাগ ও শ্লেট নিয়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে জনৈক বালক টমটমে চড়ে বাগানের কোণ থেকে বেরিয়ে এল। মজিদ ওর কাছে গিয়ে থামল।

ইসমাঈল বলল— 'সলীম! নেমে দাঁড়াও! তোমাকে না কতবার নিষেধ করেছি।' সলীম এই আদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ঘোড়া পিটিয়ে চলতে লাগল। প্রভুর আদেশে ঘোড়া ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে।

ইসমাঈল চিৎকার দিয়ে বললেন— 'ওকে রুখ! বেকুফ পড়ে যাবে তো।' কিন্তু সলীম গতি কমানোর স্থলে আরো বাড়িয়ে দিল। ডোবার নীচু জমিতে এসে ঘোড়া লাফ দিলে সলীম পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে তাকিয়ে গোলাম হায়দার ও ইসমাঈল। দু'ফার্লং যাওয়ার পর ঘোড়া থামল। মজিদ দৌড়ে সরুপথের সামনে এসে দাঁড়াল। ফেরার পথে টমটমের গতি পূর্বের মত দ্রুত হল।

মজিদকে পথিমধ্যে দেখে সলীম টমটম থামাল। বলল, মজিদ! জলদি আমার পেছনে উঠে পড়। আজ তোমাকে অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

পাদানিতে পা রাখল মজিদ। দূর থেকে গোলাম হায়দার হেঁকে বললেন— সলীম। টমটম চালিও না! তোমরা দু'জনেই মাটিতে আছড়ে পড়বে নির্ঘাত।

ঃ না, চাচা। জবাব দেয় সলীম।

✪ ✪ ✪

গাঁয়ের শেষ প্রান্তরে উলুবনের কাছে এসে সলীম ও মজিদ টমটম থেকে নামল। গাছের ডালে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল মজিদ। বলল— কি দেখাবে এখানে আমায় ?

সলীম বলল— আগে বলো, তুমি ওদের মারবে না।

ঃ কাদের ?

ঃ সেটা না হয় নাইবা শুনলে। আগে ওয়াদা করো!

ঃ আচ্ছা, আমি ওদের মারব না।

ঃ এ ওয়াদাও করো ওদের ঘরে উঠিয়ে নিয়ে যাবে না!

ঃ বেশ তাই হবে।

সলীম খানিক ভেবে বলল— 'না। আমি তোমায় দেখাব না। তুমি অপর ছেলেদের বলে দেবে।'

ঃ না না, আমি কাউকেই বলব না।'

ঃ আচ্ছা এসো।'

মজিদ সলীমের পিছু নিল। একটি ঝোপের আড়ালে এসে থামল ও। একটি পাখির বাসার দিকে লক্ষ্য করে সলীম বলল— দেখ! একটা শালিক বসে আছে।

মজিদ বলল— এটা কোন অদ্ভুত কথা হল। হাজারো শালিক আমাদের বাগানে ঠাসা।

ঃ তুমি কিছু দেখনি এখনও। ওটি বাচ্চা দিয়েছে। ছোট দু'টি ছানা।

www.amarboi.org

সলীম অগ্রসর হল। পাখি গেল উড়ে। আস্তে একটা বাচ্চা তুলে নেয় ও। তালুতে সেটি রেখে মজিদকে লক্ষ্য করে বলে— গত পরশুও এ দু'টি ডিমের মধ্যে ছিল। দু'দিনের মধ্যে ডিমের খোসা ফুটে বের হয়েছে। দু'দিন পরই মায়ের সাথে ফুড়ুত করে উড়াল দেবে।

ঃ ভাবছিলে শালিক ছানা দেখিয়ে আমায় হতভম্ব করবে— এই তো। নাও হয়েছে। যা বুঝেছ তা না— তিন কুড়ি আঠাশ না। এবার ঘরে চলো!

মজিদের বেপরোয়া জবাবে সলীম কেমন যেন বিব্রত। শেষ পর্যন্ত সলিম ছানা বাসায় রেখে দেয়।

✪ ✪ ✪

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সূর্য বিরহে পৃথিবীর বুক কালো হয়ে আসছে। বাড়ীর পথ ধরেছে ওরা দু'জন। বাইরের হাবেলীতে এসে চক্রযান নওকরের হাতে তুলে দেয় সলীম। ঘোড়ার চুলে আদর করে নওকর বলল— সলীম! তোমার চাচা আমার ওপর বেশ চটে গেছেন। টমটম থেকে তুমি পড়ে গেলে কথার গরল চাপত আমার ভাগ্যেই। আগামীতে তোমার চাচার অনুমতি ছাড়া তোমাকে আর টমটম দেব না।

সলীম কিছু বলতে যাবে এসময় হাবেলীতে খুবসূরত একটি ঘোড়া দেখা গেল। খুশীতে উছলে উঠে ও বলল— কি মজা, আব্বা এসেছেন। দেখ দেখ ঐ যে তার ঘোড়া, বলে হাবেলীতে প্রবেশ করে ও। ওকে দেখেই ঘোড়ার কান সচকিত হয়ে উঠল। অবলা প্রাণীর মূক যবান যেন বলছে, আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। সলীম কাছে এলে তাই ঘোড়া গর্দান নীচু করে দাঁড়াল। সলীম ওর গর্দানে বুলিয়ে দিল স্নেহপরশ। মজিদ ক'কদম দূরে দণ্ডায়মান।

সলীম বলল— মজিদ! ওকে তোমার ভয় লাগে?

ঃ 'ও আমাকে দেখলে তেড়ে আসে যে।' বলল মজীদ।

শালিক সম্পর্কিত মজিদের ভ্রুক্ষেপহীনতায় সলীমের যে পেরেশানি ছিল দূর হল তা। মজিদ বাড়ী গিয়ে ভাই-বোনের সামনে এ ঘটনা বলে ওকে হাসির পাত্র করবে না, এ বিশ্বাস আছে ওর। তাই ও গর্বভরে বলল— গাঁয়ের সব ছেলে-কিশোর ওকে ভয় করে। আমার কোন ভয়-ডর নেই।

ঃ তুমি এজন্য ভয় পেয়ো না যে, তোমায় দেখলে তেড়ে না আসে ও।

ঃ কেন তেড়ে আসে না— তা জানো কি?

মজিদ খানিক চিন্তা করে বলল— আচ্ছা, কেন তেড়ে আসে না— বলো না?

ঃ কেননা আমি ওকে গুড়-চিনি খাওয়াই।

ঃ আমিও ওকে গুড়-চিনি খাওয়াব। সলীম! তুমি না বলেছিলে, তোমার আব্বা ফুটবল কিনে দেবেন?

ঃ 'হ্যাঁ! সম্ভবত বল কিনেই এসেছেন তিনি!'

www.amarboi.org

✪ ✪ ✪

হাবেলীতে পশু ও খড়কুটো রাখার পৃথক মালখানা ছিল। এ ছাড়া কৃষিকাজের লাঙ্গল-জোয়ালসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদিও এখানে রাখা হত। মালখানার এক কোণে ছাপ্পর খাটের নীচে চারাকাটার মেশিনও ছিল। উঠানের মাঝে আখভাঙ্গা কল পোঁতা। উভয় দেয়ালের পাশে পশু বাঁধার অসংখ্য খুঁটি। আরেক পার্শ্বে আখের রস জ্বাল দেয়ার জ্বাল্য।

বাইরের ফটকের ঠিক উল্টোপার্শ্বে পাকা কাচারী ঘর। দেউড়ীর ডানে-বামে কাচা বারান্দা। দেউড়ীর একটু আগে বেড়ে দ্বিতীয় হাবেলী। ওটি পাকা, ছিমছাম। বৈঠকখানার একটা দরজা কাচারীর দিকে, আরেকটা অন্দরের দিকে। দেউড়ী পেরিয়ে বৈঠকখানায় পাশ দিয়ে অতিবাহিত হতে গিয়ে ওরা কারো আওয়াজ শুনতে পেল। মজিদ বলল— তুমি যাও। আমি বাড়ী যাই।

দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল সলীম। কাচারী ঘরে জ্বলছে টিমটিমে কুপি। বেঞ্চে ওর দাদা ছাড়াও আরো দশ-বার জন লোক উপবিষ্ট। কেউ ওকে ঠাহর করতে পারেনি দেখে ও চুপিসারে টেবিলের নিচে ঘাপটি করে বসল। ঐ টেবিলে ঝুঁকে কি যেন দেখছেন ওর বাবা ও দাদা। সলীম টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে নাড়াচাড়া করল, পরক্ষণে মাটিতে গেল শুয়ে। সলীম টেবিল টলাতে না পারলেও ওর আশা সফল হল।

দাদা বললেন— আলী আকবর! টেবিলের নিচে কি দেখত। মনে হচ্ছে, কুত্তা ঢুকেছে। সলীম বড় কষ্ট করে হাসি সংযত করল। আলী আকবর নিচে তাকিয়ে হেসে লুটোপুটি খেয়ে বললেন— কুত্তা নয়, প্রকাণ্ড বিচ্ছু একটা।

সলীম একবার সজোরে টেবিলে মাথা দ্বারা ধাক্কা মারল।

দাদা বললেন— আরে এ বিচ্ছু নয়— বাঘ হবে হয়ত, ভালো করে দেখত আলী আকবর। সলীম খিলখিল করে হেসে বেরিয়ে এল। আলী আকবর ওকে কোলে বসালেন।

দাদা বললেন— তোমার পুত্রকে সাথে নিয়ে যাও। ও আমাকে বেশ জ্বালাতন করে।

আলী আকবর বললেন— এক্ষণে পাঁচের কোঠা ছাড়িয়ে ছ'তে ওর বয়স। গতবার আপনাকে বলেও রাজী করাতে পারিনি। এবার কিন্তু ওকে স্কুলে দেয়া দরকার। নয়ত আওয়ারা হয়ে যাবে। আগামীকালই ওকে স্কুলে ভর্তি করে আসব।

স্কুলের কথা শুনে সলীমের হাসি কণ্ঠনালীতে আটকে গেল। বিশেষ করে দাদা যখন বললেন, গেল বার ও যোগ্য ছিল না, এবার অবশ্য নিষেধ করব না। সলীমের ধারণা স্কুলে দেয়ার সিদ্ধান্তের ওপর এবারে আখেরী মোহর লেগে গেছে।

✪ ✪ ✪

স্কুল সম্পর্কে সলীম যতটুকু জানে, ওখানে ছাত্রদের খুব পিটুনি দেয়া হয়। ওর চাচা আলী হায়দার ও ইসমাঈল বাল্যকালে টানা চার বছর পিটুনি খেয়েছে। দাবদাহ গ্রীষ্মে বৃক্ষের ছায়াতলে কিংবা শীতকালে আগুন জ্বেলে গ্রামের মানুষেরা পুরানো দিনের কথা

www.amarboi.org

বলে তাদের ছাত্র জীবনের স্মৃতিচারণ করত। তারা অনেকবারই স্বীকার করেছে, মাস্টার কান ধরে উপুড় করে তাদের পিঠে ইট রেখে দিতেন। শাস্তিভয়ে ইক্ষুক্ষেতে আত্মগোপন করলেও গ্রামের লোকজন ধরে তাদেরকে মাস্টারজীর কাছে নিয়ে যেত। ওর চাচাত ভাই মজিদ ও অপরাপর বালকরাও স্কুল থেকে ফিরে স্কুল সম্পর্কে নানা কথা বলত।

বছর দুয়েক আগে থেকেই মজিদ ক্লাসে উঠেছিল। সলীমের বড় চাচা গোলাম হায়দারেরই বড় সন্তান মজিদ। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা ও খেলাধুলায় চৌকস ছিল ওর এ চাচাত ভাইটি। হাজারও গুণের আধার ওই মজিদ। এরপরও মাস্টারজীর নির্মম ব্যবহার সলীমের কচিমনে অজস্র প্রশ্নের জন্ম দিত। মজিদের মত মেধাবী ছাত্র কেন নির্মমতার শিকার ? নিজ চোখেই মজিদের পিঠে মাস্টারজীর দেয়া বেতের চিহ্ন দেখেছে সলিম। চাচা গোলাম হায়দারের সাধ্যে কুলালে তার মর্জির বিরুদ্ধে ওকে স্কুলে যেতে দিতেন না; কিন্তু সলিমের বাবা ভাইদের মাঝে বড়। এ খান্দানের ছেলেদের পড়াশোনায় তিনি কোন ছাড় দিতে রাজী নন। দাদার পরে খান্দানের সকলেই তার নির্দেশের সামনে কেবল মাথাই নত করে থাকত। এর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে, উচ্চশিক্ষার বদৌলতেই তিনি সহকারী তহশিলদার হয়েছিলেন।

সলীম জ্বিন, ভূত ও প্রেতাত্মার কাহিনী শুনেছে, কিন্তু স্কুলের মাস্টারজীকে দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বিরল প্রজাতির চিজ মনে করত। ও শুনেছে, বাদশাহর বাহুশক্তি সর্বাপেক্ষা বড়। যাকে ইচ্ছে তিনি মারতে পারেন। তাই ও এক ক্ষুদে রাজা হওয়ার খায়েশ মনে মনে আঁটল।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাস্টারের নির্মমতা থেকে রেহাই পেতে এর বিকল্প কিছু জানে না ও। কিন্তু এখন যে ও-ই ওই স্কুলের ছাত্র হতে যাচ্ছে। সমস্যা যা এখানেই। বাবার কথা মুহূর্তে হাবেলীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মা ওর জন্য ইউনিফর্ম ও নতুন কেড্স খরিদ করেছিলেন। চাচী, ফুফু ও বোনেরা ওর স্কুলে যাওয়ার ফরমায়েশে খোশ। খান্দানের ওর সহমর্মীও ছিলেন একজন। তিনি ওর দাদী। একমাত্র তিনিই সলীমের পক্ষে মাস্টারজীর নির্মমতার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। বলেছিলেন— দাদু! চিন্তা করো না। মাস্টার তোমাকে কিছুই বলবেন না।

গ্রামের শিশু-কিশোররা বাইরে খেলা করছিল। ওরা ওকে ডাকতে এল। সলীম বেঁকে বসলে ওরা টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে চলল। দেউড়ীর বাইরে যেতেই পেছন থেকে মায়ের স্নেহময়ী কণ্ঠ ভেসে এল— 'বেটা! জলদি এসো। সকালে তোমাকে স্কুলে যেতে হবে।' নিরুত্তর সলীম।

সাথীরা বাইরে এসে শোরগোল করে বলল— সলীম কাল স্কুলে যাচ্ছে। একথা শুনে অন্যান্য ছেলেরা খেলা ছেড়ে ওর চারপাশে জড় হল।

'কি সলীম! সত্যি নাকি, যা শুনলাম সত্যি না মিথ্যা ? সত্যি সত্যিই তুমি স্কুলে যাচ্ছ?'

ছেলেরা যখন নিশ্চিত জানল, সলীম স্কুলে ভর্তি হচ্ছে, তখন মজিদের প্রস্তাবে সকলে বউচি, দাড়িয়াবাঁধা, কাবাডি, বুদ্ধি-ঠিলা ও চোর-চোর খেলার স্থলে 'মাস্টার-ছাত্র' খেলায় লিপ্ত হল। মজিদ মাস্টার হল। ছেলেদের এক কাতারে দাঁড় করে কান মলার

www.amarboi.org

নির্দেশ দেয় ও। স্কুলের এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র নির্দেশ পালন করল। অন্যান্যদের মজিদ ঘুরে ঘুরে প্রশিক্ষণ দিল। বলছিল— তাকাও আমার দিকে। এভাবে ঝুঁকে গর্দান নামাও। হাত ওইভাবে পেছন থেকে উঁচিয়ে কান ধর। পিঠ যেন না নামে। বিলকুল 'মুরগী' হও। পিঠ উঁচিয়ে না রাখলে ডাণ্ডা মারব। কথা বন্ধ কর। আর ধোপার ছেলে! এটি স্কুল, তোমার বাপের ঘর নয়। হাসবে না। হাসলে দাঁত ভেঙ্গে ফেলব।

সকল ছেলেরা কান ধরল। কিন্তু সলীমই কেবল ব্যতিক্রম। মজিদ বলল— আরে! তুমি কান ধরোনি যে ?

সলীম গোস্বায় কেঁপে বলল— আমি কান ধরব না। কিছুতেই না।

মজিদকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ও বাড়ির পথ ধরল।

✪ ✪ ✪

বাড়ি এসে কারো সাথে কথা না বলে সলীম বিছানায় শুয়ে যায়। আমেনা ওর সমবয়সী চাচাত বোন কাছটিতে এসে বসল। বলল— 'সলীম চলো! দাদীজানের থেকে গল্প শুনব।'

ঃ 'না।' রুক্ষ যবানে বলল ও।

সলীমের বাযু ধরে টানতে লাগল আমেনা। সলীম ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে বলল— যাও! শয়তানী। নয়তো চুল ছিঁড়ে ফেলব তোমার।

আমেনা নিরাশ হয়ে চলে গেল। খানিক পর মা এসে বললেন— সলীম! তুমি এখানে ? আমার ধারণা তুমি বাচ্চাদের সাথে বাইরে খেলছ। আজ তুমি দুধ খাওনি। এসো খাবে।

মা দুধের গ্লাস নিয়ে এলেন। কিন্তু দুধ খেতে নারাজী যাহির করে সলীম। মায়ের পীড়াপীড়ি দেখে শয্যাত্যাগ করে সলীম হাবেলীর ছাদে উঠল। ওখানে বসে রইল স্থাণুর মত। খানিক পরে আরেকদিকে চলে গেল।

হাবেলীর ছাদ একটা আরেকটার সাথে পুঁতির দানার মত গাঁথা। সলীম নিজেদের ছাদ থেকে আরেকটা ছাদের দিকে এগুলো। হাবেলীর কোণে আম ও পাইন গাছের সারি। সান্ধ্যকালীন মৃদুমন্দ সমীরণ ওই বৃক্ষরাজিতে আছড়ে পড়ায় শন্ শন্ আওয়াজ ভেসে আসছে। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদের অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছে ছাদের ওপর। দূরের ক্ষেত থেকে ভেসে আসছে শেয়ালের ডাক। খানিক এখানে দাঁড়ানোর পর বেশ ক'টা ছাদ অতিক্রম করে ও। শেষ পর্যন্ত পশুশালার চালা সংলগ্ন ছাদে এল ও। দেউড়ীর থেকে চাঁদের আলোয় ছাদ দেখা যাচ্ছে। সলীম ওখানেও দাঁড়ায় খানিক। আচমকা ওর কানে ভেসে এল বাবার আওয়াজ।

'সলীম! সলীম।'

হতচকিত এদিক সেদিক তাকায় সলীম। ওর বাবা ছাদের এক কোণে দাঁড়ানো।

'আসছি আব্বাজান!' দৌড়ে বাবার কাছটিতে এসে দাঁড়াল ও। বাবা বললেন— সলীম বেটা! একা একা এখানে করছ কি ?

www.amarboi.org

ঃ কিছু না।

ঃ তোমার মা বলছেন, তুমি নাকি স্কুল মাস্টারকে খুব ডরাও।

সলীম খামোশ দাঁড়িয়ে।

আলী আকবর সান্ত্বনা দিয়ে বলেন— বেটা! এমনিতেই কেউ তোমায় ভড়কে দিয়েছে। মাস্টার ভালো ছেলেদের মারেন না। গর্দভ ছেলেদের তিনি পেটান। আমিও এ স্কুলে পড়েছি, কিন্তু নখের আঁচড় গায়ে লাগেনি আমার কোনদিনও। ওস্তাদ ভালো ছাত্রদের পেয়ার করেন। এখন তুমি ছোট্টটি নও। দিলমন লাগিয়ে পড়। সারা জীবন তো আর খেলাঘরে কাটিয়ে দেয়া যায় না। আমি চাই, তুমি বড় হও। এখন থেকে গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেদের সাথে তোমার আড্ডাবাজি চলবে না। জগতে তোমার নামোজ্জ্বল করতে হবে। ওই স্কুল শেষে তোমাকে শহরের নামকরা স্কুলে যেতে হবে। অতঃপর যাবে কলেজে। সবশেষে সুদূর বিলেতে।

সলীম নীচে নামলে মা এসে ওর বিছানায় বসলেন। বললেন— বেটা! মাস্টার তোমাকে পেটাবেন না। রোজকার পাঠ তোমায় ইয়াদ করিয়ে দেব আমি। সময়মত স্কুলে পাঠাব। পরিষ্কার কাপড় পরিধান করাব। এতদসত্ত্বেও তুমি পিটান খেলে তোমার বাবাকে দিয়ে পণ্ডিতজীকে শাসাব।

এ শিশু বয়সেই ভবিষ্যত নিয়ে সলীম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। দু'চোখে ঘুম নেই। বারবার ভেসে আসছে বাবার কথা, তুমি এখন ছোট্টটি নও। এখন তুমি পাড়ার ছেলেদের সাথে আড্ডাবাজি করতে পারবে না। আব্বা বলছেন— আমাকে বড় হতে হবে। কিন্তু 'বড়' জিনিষটা কি— এক্ষণে ওর কচি মনে তা কেবল একরাশ প্রশ্নেরই জন্ম দিল। কি সেই তাগিদ— যা প্রথমে পাঠশালা, পরে হাইস্কুলে, সবশেষে বিলেতে নিয়ে যাবে। ওর সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু এ গ্রাম। এ গাঁয়ের সবুজ গাছপালার সাথে ওর কত প্রেম। এ তো সেই স্বর্গপুরী যেখানে গাছ-গাছালির কানাকানি, অবারিত পুষ্পোদ্যানের সুবাস, মৃদমন্দ সমীরণের দোলা, বন-বনানীর সুনিবিড় ছায়া, পক্ষীকুলের কূজন আর চড়ুইয়ের কিচির মিচির আওয়াজ বিরাজমান। এখানে আম, কমলা, আমরুদ, নাশপাতি ও আনারের বাগান আছে। এ গাঁয়ের বুক দিয়ে কাল-কালান্তর ধরে বেয়ে চলছে অসংখ্য নদী-খাল। এখানে বসে ও ওই পাহাড়ের চূড়া দেখতে পায়, যার শীর্ষদেশে প্রকৃতি বরফের শ্বেত চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। আসমানে রয়েছে জ্বলজ্বলে সূর্য। ওই আসমানের গায়ে নারীর অলংকারের মত সেজে আছে চাঁদ ও তারকারাজি। সুতরাং সুখের এ স্বর্ণপুরীতে কেউ ওকে বলুক— তুমি এখন ছোট্টটি নও, আড্ডাবাজি করতে পারবে না— এটা কাম্য নয়। ও পেছনের জীবনে শিশুর চোখেই পৃথিবীকে দেখেছে। জীবনের ওই সময়টা কত সুন্দরই না কেটেছে, যখন হাবেলীর ছাদে দাঁড়িয়ে দিগন্তের নীলিমা ও সবুজ বনানী অবলোকন করত ও। দিগন্তের নেমে যাওয়া আসমান ওর দু'চোখে লেগে থাকত। কি মোহনীয় সে অনুভূতি যখন ও কল্পনা করত— সূর্য এত বড়, চাঁদ এতটুকু আর তারকা এমনটি। ওর শিশু অভিজ্ঞতার কাঁচের স্বর্গ এক্ষণে যেন খানখান হয়ে গেছে। যখন ও সাথীদের বলত— চাঁদ, সূর্য ও সেতারা আমাদের মত

www.amarboi.org

চোখ খুলে ঘুম ভাঙ্গে। সন্ধ্যার দিকে সূর্য আসমান থেকে নেমে জঙ্গলে আত্মগোপন করে। চাঁদ ও তারকারাজি সারারাত ধরে তাকে তালাশ করতে থাকে ; কিন্তু গাছকে আড়াল করে সূর্য পাহাড়ের অপর পার্শ্বে চলে যায়। সুবৃহে সাদেকের আগমনে বিশেষ একটি তারকা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তারপর আচমকা তারকাটি অদৃশ্য হয়ে গেলে সূর্য তাকে দিনভর খুঁজে ফেরে।

কতই চিত্তাকর্ষক ছিল সেই ভাবনা, যে ভাবনার সোনালী স্পর্শে ফেরেশতাদেরকেও দেখত হাতী, ঘোড়া ও উটের পিঠে। কিন্তু 'বড়' হবার খবর আচমকা তার কল্পনার রঙিনপুরীতে তীব্র গতিতে আঘাত হানে। ওর জীবনে মায়ের কোলে বসে 'আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা, শীর্ষক সান্ত্বনা বচন বুঝি আর আসবে না। ফেরেশতারা বুঝি আর উট-ঘোড়াতে চড়বে না। জীবন খাতার এক একটা পাতা অতীত হতে না হতেই ওর জীবন থেকে যেন কল্পনার এক একটা পর্ব বিদায় নিতে বসেছিল।

✪ ✪ ✪

মাস্টারজী হুক্কা সেবন করতেন আর খুল্লুড় খুল্লুড় কাশতেন। বাচ্চাদের পেটাতেন। তিনি যে কোন তিক্ততা হজম করতে রাজি, কিন্তু বাচ্চাদের পরস্পর আলাপ, হাসি-টিপ্পনি এদিক-সেদিক তাকানোকে সহ্য করতে পারতেন না কিছুতেই। শিক্ষকতার আসনে বিগত বিশ বছর ধরে অধিষ্ঠিত থাকলেও হাস্যমুখ ও কোলাহলমুখর মানুষগুলোকে তিনি কেবল বাঁকা চোখেই দেখে আসছেন। মাত্র ১৫/২০ টাকা বেতনে তাঁর চাকরি জীবন শুরু। প্রতি বছর ১ টাকা হারে বেতন বেড়েছে ; কিন্তু বেতন বৃদ্ধির অনুপাতে তার দৈহিক ও মানসিক ক্ষয় হয়েছে প্রচুর। চাকরী জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। পরে করেছেন বিয়ে। দু'টি ছেলের বাবা তিনি। জীবনে কমবেশী শান্তি পেয়েছেন তিনি। বিশেষ করে কিছু ভুল এমন করেছেন, যার শাস্তি মৃদু হলেও অভিজাত লোকদের জন্য তা জুতাপেটার চেয়ে কম নয়। একবার জনৈক ইন্সপেক্টর সাহেব ভিজিট করতে এলে মেহমানদারীতে তাকে মুরগীর রোস্ট না দিয়ে পাতলা ডাল পরিবেশন করেন। এ ধৃষ্টতায় দু'বছর ধরে তাঁর চাকরীতে কোন প্রকার উন্নতি ঘটেনি। পরবর্তীতে অপর এক ইন্সপেক্টর তাঁর ওপর নাখোশ হয়ে প্রমোশন আরো এক বছরের জন্য মুলতবী করে দেন। মোটকথা সুদীর্ঘ বিশ বছরের তিনটা বছর তাঁর প্রমোশন স্থগিত থাকে।

মাস্টারজীর আরেকটি বিশেষ কসুর ছিল তা হচ্ছে— তিনি অবসর যাপনের জন্য গ্রামে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ইন্সপেক্টর এ খবর শুনে ঝট করে তাকে বদলী করে দেন। গ্রামে বাড়ী কেনার কোন খরিদ্দার নেই। মাস্টারজী কত কাকুতি-মিনতিই না করলেন। কিন্তু ইন্সপেক্টর তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তিনি চোখের আঁসু বেকার দেখে ডিম, মুরগী ও ঘি-এর আশ্রয় নিলেন।

এ ইন্সপেক্টর বদলী হবার প্রাক্কালে মাস্টারজীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে যান। মাস্টারজীর জানতে বাকী নেই— তাঁর বয়স ৬০/৭০ হয়ে গেলেও মুরগী খাওয়াতে খাওয়াতে বাড়ী-ঘর শেষ করতে হবে। বুভুক্ষু ইন্সপেক্টর আর ক্লার্কদের খাই খাই উদর

www.amarboi.org

কি আর সহজে ভরে ? তাঁর চাকরী জীবনে এমনও জনা তিনেক ভিজিটর এসেছেন, যারা তাঁর বাড়ীতে দুধ খাওয়াকেও গোনাহর কাজ মনে করতেন।

সলীমের বাবা ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে মাস্টারের হাতে দশ টাকার একটা কড়কড়ে নোট গুঁজে দেন।

মাস্টারজী বললেন— না, না চৌধুরী সাহেব। আপনার বড় মেহেরবানী কিন্তু...'

আলী আকবর তার কথা কেটে বললেন— মাস্টারজী! ওস্তাদের প্রাপ্য অপরিশোধ্য, দোয়া করুন। খোদা সলীমকে আপনার যোগ্য খাদেম বানান।

✪ ✪ ✪

এ প্রাইমারী স্কুলটি সলীমদের গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে। পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা এ স্কুলে পড়ে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ষাটের কোঠায়। মজীদ ক্লাস টু তে পড়লেও ভর্তি হয়েছে বছর তিনেক আগে। বয়সের দিক দিয়ে পাঁচ-ছ'টি ছেলে ওর বড় ; কিন্তু দাউদ ছাড়া আর সকলেই ওকে ভয় করে চলত। দাউদ পার্শ্ববর্তী গ্রামের তেলীর পুত্র। ওর বয়স দশের কোঠায় পেরুলে বাবা ওকে পড়াশোনা করানোর খেয়াল করেন। এখন ও ক্লাস ফোর-এ। মাস্টারজীর অনুপস্থিতিতে পুরো স্কুলের মোড়ল এই তেলী-পুত্র দাউদ। বয়সী ছাড়াও সুঠাম ও তাগড়া হওয়াতে ও সবার সেরা। অবয়ব যা, সে অপেক্ষা মাথাটা ওর কিছুটা ছোট। টেকো মাথায় খাঁটি সরিষার তেল মাখত। এ জন্য পাগড়ী মাথায় লেপ্টে থাকত। ওর মত কেউ মাথা টাক করলে অসংখ্য অসহ্য টোকা পড়ত মাথায়, কিন্তু দাউদের মাথায় আঙ্গুলের টোকা দেবে— এ সাধ্যি কার। মোটকথা ও এমন অবস্থানে ছিল— মাস্টারজীই কেবল সে অবস্থান অতিক্রম করতে পারেন।

দাউদ যতটা স্বাস্থ্যবান, ততটা মেধাহীন ভোম্বল দাস। ক্লাস ফোর-এ দু'দুবার ফেল করেছে। কিন্তু মাস্টারজীর মনোরঞ্জনে গ্রাম থেকে পিঠা-পায়েস আনত, তাঁর বাড়িতে পানি তুলত, হুক্কার কল্কেতে তামাক সাজাত, সর্বোপরি হালের গরুর দানা-পানিরও আঞ্জাম দিত। স্কুলটিকে ছোটখাটো একটা পোস্ট অফিস বললেও অত্যুক্তি হবে না। প্রতি বাড়ীর চিঠি সংশ্লিষ্ট গ্রামের ছাত্রদের কাছে দেয়া হত। মাস্টারজী চিঠিতে সীলমোহর, ডাক থলে বন্ধ-খোলার দায়িত্ব দাউদকে দিয়েছিলেন। দাউদ সর্ববিষয়ে তার নায়েব। অবশ্য স্কুলের দু'টি ছেলের ব্যাপারে ও তেমন মাথা ঘামাত না। মজীদ ও মোহন সিং। মজীদই একমাত্র ছেলে যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছিল। একদিন দুপুর বেলা মাস্টারজী বাসায় যান। এদিকে হাইবেঞ্চে বসে ছেলেদের শাসাতে শাসাতে ঝিমুনি কাটছিল দাউদ। ওর পাগড়ী মাথা থেকে খুলে কোলে পড়েছিল। ছেলেরা পাগড়ী নিয়ে ফুটবল বানিয়ে খেলা শুরু করল। মজীদ ওদিন এসেছিল টুপি পরে। চট্‌ করে মজীদ ওর পাগড়ী তুলে নেয়।

চোখ খুলে ছেলেদের জড়ো হতে দেখে দাউদের চোখ ছানাবড়া। মজীদ তখন সবেমাত্র সপ্তাহখানেক হয় স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তাই ও দাউদের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিল না। পাগড়ীকে কোড়া বানিয়ে দাউদের দিকে নিক্ষেপ করে মজীদ বলল— এই নাও তোমার পাগড়ী।

www.amarboi.org

ঃ 'আমার পাগড়ী ?' বলে দাউদ কোড়া দ্বারা মজীদকে পেটানো শুরু করে। কোড়ার ক'ঘা খেয়ে মজীদ অগ্রভাগ ধরে ফেলল। দাউদ দু'একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে প্রতিপক্ষের শক্তি অনুধাবন করতে পারল। কাজেই সে সজোরে টান মারল। মজীদ সহসাই কোড়া ছেড়ে দিল! দাউদ আপনার টান সামলাতে না পেরে পেছনের এক ছাত্রের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। পরবর্তীতে চিৎপটাং। লজ্জা ও রাগ নিয়ে পূর্ণশক্তিতে গর্জে ওঠে দাঁড়ায় ও। ঝাঁপিয়ে পড়ে মজীদের ওপর। লেগে যায় ধস্তাধস্তি। মজীদ ওর কোমর পেঁচিয়ে পিঠের ওপর কিল চালান দিচ্ছিল। পরে এক লাথিতে ধরাশায়ী করল দাউদকে।

এবার মজীদ চড়ে বসে দাউদের বুকে ; কিন্তু খানিকবাদে দাউদ পূর্ণোদ্যমে ওকে আক্রমণ করে। মজীদের জামা যায় ছিঁড়ে। গালে-মুখে খামচা আর চড়-থাপ্পড়ের লাল আশীর্বাদ সুস্পষ্ট। হাঁপাচ্ছিল সিংহ-শার্দুল ; কিন্তু হার মানার মত চিজ নয় এ মজীদ। মার খেল, লাথি খেল, তারপরও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মানসে নবউদ্যমে উঠে দাঁড়ায় মজীদ। দাউদের গোস্বা এবার পেরেশানিতে রূপ নিল। কেননা এতক্ষণে তার মোড়লী স্থির রাখা কিংবা প্রতিপক্ষকে দৈহিক আক্রমণ করে দুর্বল করা মূল সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে, এ লড়াই থামানো যায় কি করে।

এক্ষণে সে মজীদকে মারা কিংবা ধরাশায়ী করার স্থলে ওর থেকে দূরে সরার ফন্দি আঁটছিল। বলল— দেখো। ক্ষান্ত হও। নইলে আলু বানিয়ে দেব। আমি তোমার বীরত্বের প্রশংসা করি। তুমি আমার পাগড়ীকে কোড়া বানাতে গেলে কেন ? কেন থামছ না ? এখনি মাস্টারজী এসে পড়বেন— দাউদ বারবার এ বাক্য দোহরাচ্ছিল ; কিন্তু মজীদ এ কথা মানতে প্রস্তুত নয়।

শেষ পর্যন্ত দাউদ ওকে সজোরে ধাক্কা মেরে ভূতলে ফেলে দিল। মজীদ এবার বেশ চোট পেল পিঠ ও ঘাড়ে। দ্রুত উঠে দাঁড়ায় ও। দাউদ বলে চলছে, এখন আরামে বসে থাক। তোমার আক্রমণের স্বাদ মিটেছে তো? মজীদ এদিক সেদিক তাকিয়ে নিল। আচমকা একটা শ্লেট উঠিয়ে বলল— এবার কোথায় যাবে বাছাধন ?

দাউদ হাত দিয়ে ওই নিক্ষিপ্ত শ্লেট ঠেকাতে গিয়ে কব্জীতে ব্যথা পেল। আরেকটি শ্লেট উঠিয়ে পিটুনী দেয় মজীদ। হাঁটু ও গোড়ালিতে বেশ ক'টা লাগায়। দাউদ এক পায়ে আঘাত পেয়ে ব্যথায় পা ওঠালে আরেক পায়ে তখন আঘাত করে। দাউদ উপায় না দেখে আরেকটা শ্লেট ওঠাতে গেলে সুযোগ পেয়ে মজীদ ওর কোমরে সজোরে আঘাত করে। দাউদ প্রাণ নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল ; কিন্তু তাকে ছেড়ে দেয়ার বান্দা নয় মজীদ।

স্কুলের সমস্ত ছেলেরা মজীদের সহযোগী হয়ে যায়। দাউদের অবস্থা শোচনীয়। স্কুল ছেড়ে পরাজিত শেয়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছিল দাউদ।

এদিকে ছেলেরা আনন্দে আকাশ মাথায় উঠাচ্ছিল। অকস্মাৎ কেউ দেয়ালের বাইরে থেকে জোরে বলে উঠল— মাস্টারজী আসছেন!'

ছাত্ররা স্ব-স্ব স্থানে এসে বসল। মাস্টারজীকে দেখে মজীদ তার শেষ আঘাতটি করতে গিয়েও করল না।

www.amarboi.org

স্কুলের চৌহদ্দীতে পা রেখেই মাস্টারজী গর্জে উঠলেন— বাসায় বসে তোমাদের হৈ-হুল্লোড় কানে এসেছে আমার। দাউদ! তুমি ওদের চুপ করাওনি কেন ? তোমাকে মনিটর বানানোর হেতুটা কি ছিল শুনি ?

দাউদকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললেও মাস্টারের দৃষ্টি মজীদের ওপর নিবদ্ধ। তিনি আবারো প্রশ্ন করলেন— এর জামা ছিঁড়েছে কে ?

এ প্রশ্নের জবাবে মজীদ খামোশ হয়ে গেল।

মাস্টারজী চিৎকার করে বললেন— বলছি কি শুনছ না, কে ছিঁড়েছে ওর জামা ? আর ওর মুখমণ্ডলে লাল দাগই বা করেছে কে ? বলছ না কেন তোমরা ? এক ছাত্র কতকটা সাহস করে বলল— মাস্টারজী, মজীদ ও দাউদ লড়াই করেছে।

মাস্টার সাহেব আর কোন প্রশ্ন না করে জোড়া বেত দিয়ে দাউদকে ক'টা লাগান। বলেন— তেলীর বাচ্চা তেলী। আমার ছেলেদের সাথে লড়তে তোর শরম লাগে না ? মাস্টারজীর ভুল ধারণা দাউদকে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মযলুম বানিয়ে দেয়। সে বলে— মাস্টারজী! ছেলেদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমি ওকে যথেষ্ট ছাড় দিয়েছি তার পরও ও আমাকে শ্লেট দিয়ে পিটিয়েছে।

ঃ মজীদ তোমায় মেরেছে ?

সম্মতিসূচক মাথা হেলায় দাউদ। পাজামার রাবার টেনে টাখনা উঠিয়ে পায়ের যখম দেখায়।

মাস্টারজী জিজ্ঞেস করলেন— তাই বলে কি তুমি তেলীর মত কাজ করবে ?

মজীদ বলল— মাস্টারজী! আমি ওকে অনেক ছাড় দিয়েছি।

দাউদের আঘাত মজীদের ছেঁড়া জামা দ্বারাই শোধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অনেক ধমকি-দাপট দেখিয়ে ওদের ছেড়ে দেয়া হয়। পরে মজীদ-দাউদ বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়।

স্কুলের অপর এক বালক দাউদ যার প্রভাবে প্রভাবিত, সে মোহন সিং। মোহনের বাবা কেবল জমিদারই নন ; বরং আশপাশের বেশ কিছু জনপদে তার জায়গা-জমিও ছিল। গ্রামে তার প্রাসাদোপম মহল ছিল। মোহন সিং ৮ বছর বয়সেও নওকরদের কাঁধে চড়ে স্কুলে আসত। পাড়াগাঁয়ের প্রতিটি বালককে গালি দেয়া যেন তার জন্মগত অধিকার। সুতরাং একদিন সে খোদ দাউদকেই গালি দিয়ে বসে। দাউদ এ উপহারের বদলে একটি চপেটাঘাত দিয়েছিল। মাস্টারজী সেদিন হাজির ছিলেন না। মোহন সিং ক্রন্দনরত অবস্থায় বাড়ী এল। নিয়ে এল বাবার নির্দেশে দু'নওকরকে। ওরা দাউদকে পাকড়াও করে স্কুলের বাইরে নিয়ে গেল। বেশ ধোলাই দিল। দাউদের বাবা সর্দারজীর কাছে পুত্রের নালিশ নিয়ে গেল। বলল— আপনার দু'নওকর আমার ছেলেকে মেরেছে। সর্দার তখন নেশায় বুঁদ। তার জানার এতটুকু বাকী ছিল যে, এ দাউদের বাপ, যে কিনা তার গুণধর ছেলের গালির জবাবে থাপ্পড় দিয়েছে। সুতরাং সে নওকরদের হুকুম দিল— জুতিয়ে ওকে বিদায় করে দাও। ঐ দিন থেকে দাউদ উপলব্ধি করতে সক্ষম হল, প্রত্যেকের গালির জবাবে থাপ্পড় দেয়া যায় না। ক'দিনের মধ্যেই স্কুল ও এর

www.amarboi.org

পারিপার্শ্বিকতা সলীমের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল। মাস্টারজী খামোখাই কাউকে পেটান না— এ ধারণা হয়েছে ওর ইতোমধ্যে। চিল্লাচিল্লি, হৈ-হুল্লোড়, পাঠে অমনোযোগী ও অনুপস্থিত ছাত্রদের বেলায়ই কেবলই তাঁর শাস্তি কার্যকর।

স্কুলের বাইরে হাজারো চিত্তাকর্ষক বস্তু ছিল যা মাস্টারজীর হাজারো মারপিট সত্ত্বেও ছেলেদেরকে অনুপস্থিত থাকতে মদদ যোগাত। ছিল অসংখ্য বাগান ও ক্ষেত-খামার। খোলা আকাশের নীচে পাখির কূজন, ঝিলের ফুটন্ত শাপলা-শালুক ও নদ-নদীর কলকল, ছলছল নাদে বয়ে যাওয়া পানির স্রোত সবই মনোমুগ্ধকর ও প্রাণবন্ত। গগনচুমো পাহাড় ও দামাল ছেলেদের স্বাধীন ক্রীড়া-কৌতুক তো ছিলই। পক্ষান্তরে এ স্কুল একটি সাক্ষাত হাজতখানা। দুটো মাত্র কক্ষ। সামনে প্রশস্ত বারান্দা তাও আবার ঐ দু'কক্ষের একটির কোণে ছিল প্রকাণ্ড গর্ত। যেখান থেকে নাপাক পানি বেরুত। ও পানিতে ছেলেরা শ্লেট ধুত। স্কুলে লেখার জন্য দোয়াত-কলম ও শ্লেট ছিল, ছিল পর্যাপ্ত বইও। সলীম ছাদের আড়া থেকে কক্ষের মেঝ পর্যন্ত যাবতীয় বস্তু পর্যবেক্ষণ করে ফেলেছিল। কক্ষের দেয়ালে পুরানো নক্‌শা ও ভগ্নপ্রায় ছবি ছিল। এগুলো সলীমের মনে গেঁথেছিল। চাটাইয়ের কালো দাগ ও ছাদের মাকড়সার জাল সবই ছিল ওর নখদর্পণে। দু'তিন দিনের মধ্যেই ওর এমন অবস্থা হল, যেন কতদিনের পরিচিত ওর এ শিক্ষা নিকেতন। এতো স্কুল নয়— সাক্ষাত এক জেলখানা।

যে কক্ষে ওর ক্লাস বসত— উত্তরমুখো তার দরোজা। দরোজার পাশেই বসত ও। এখানে বসে ক্ষেত-খামার সবই দেখতে পেত। দূরের ঐ বিশাল আকাশ, তাও দেখতে পেত। ওই আকাশের পানে কতবার তাকিয়েছে ও। দু'হাতের করে কতবার গুণেছে তারকাপুঞ্জ। কক্ষের সরু দরোজা ওর কোলাহলমুখর জিন্দেগীর সব সুখ-আহ্লাদ কেড়ে নিয়েছে। কল্পনায় ও পাহাড়ের কোলে ঘুমানো মেঘপুঞ্জের ঘুম ভাঙ্গাত এবং এর ওপর সওয়ার হয়ে সুবিশাল নীল আসমানে চড়ে বেড়াত। ও যখন কল্পনার রঙীন জাল বুনছিল যখন ঠিক তখন মাস্টারজীর আচমকা ডাকে সে স্বপ্নজাল ছিন্ন হল— সলীম! কি দেখছো তুমি ?

ঃ 'জ্বি– কিছু না স্যার!' অস্ফুট কণ্ঠের লাজুক জবাব সলীমের।

ঃ পড়া মুখস্থ করেছ ?

ঃ জ্বি হ্যাঁ!

ঃ শ্লেটে লেখ তো।

পাঠ মুখস্থ ও শ্লেটে লিখন ওর জন্য কোন ব্যাপারই নয়, কিন্তু টানা সাত ঘণ্টা মূর্তির মত বসে থাকা সহ্যের বাইরে।

✪ ✪ ✪

সাধারণ ছেলেদের চেয়ে সলীমের মেধা অধিক। ছ'মাসের মধ্যেই মাস্টারজী ওকে টুতে প্রমোশন দেন, গোড়ার দিকে মজীদের কু-মন্ত্রণায় ও গরহাজির হতে কোশেশ করেছিল, কিন্তু উপর ক্লাসের বড় ছেলেদের বাড়ী বাড়ী পাঠানোর দরুন গার্জেনরা স্ব স্ব

www.amarboi.org

. প্রতিপাল্যকে স্কুলে দিয়ে যাওয়ায় তা আর হয়ে ওঠেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক তালাশের পর সলীমকে পাওয়া গেলেও বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট বলে মাস্টারজী মৃদু ধমকি দিয়ে ছেড়ে দেন সলীমকে। কিন্তু ঝড়-ঝাপটা যা, তা বয়ে যেত মজীদের ওপর দিয়েই। মজীদের বাবা ওকে স্কুলে দিতে এসে বলেছিলেন— মাস্টারজী! সলীম এখনো কচি কিন্তু সব দোষ মজীদের।

গরহাজির থাকার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মজীদের সব পরামর্শই এড়িয়ে চলত সলীম। মজীদের যেদিন মাথায় দুষ্টামির পোকা কিলবিল করত, সেদিন সে সলীমকে এড়িয়ে পাড়ার অন্য ছেলেদের সঙ্গে নিত। সলীম ভর্তি হবার পূর্বে অন্যান্য ছেলেদের ওপর মজীদের মাতব্বরি ছিল। তার নিয়ত খারাপ হলে সকলকে ফুসলাতে সক্ষম হত। অতি সহজেই সে ঝিল-পুকুরে ডুব খেলার কুমন্ত্রণা দিতে সক্ষম হত। কেউ এ পদ্ধতির সামান্য বিরোধিতা করলে নেতৃত্বের লালচোখে তাদের কুপোকাত করে ফেলত। কিন্তু সলীম গরহাজির হতে বেঁকে বসায় নয়া পরিস্থিতির সম্মুখীন হল মজীদ। সলীমকে ফুসলানোর কোন পন্থাই অবশিষ্ট রাখল না মজীদ। প্রথম দিন সলীম ওকে বলল— আচ্ছা, স্কুলে তুমি না গেলেও আমি যাব।' মজীদ ওকে এ সময় পাগলা কুকুর লেলিয়ে দেয়ার ভয় দেখাল। এতেও টলল না সলীমের মন। শালিক পাখির বাসার প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও সলীম আগের মতই ইস্পাত কঠিন।

মজীদ বুঝল, সলীম গলার পাত্র নয়। এবার সে অন্যান্য বালকদের পথ আগলাতে লাগল। আরো উপলব্ধি করল— প্রকারান্তরে সলীমকে সে নেতা মেনেছে। গোস্বাবশে সে এক বালকের গালে চড় দিতে উঠলে সলীম ওর হাত খামচে ধরে। বলে— দেখো মজীদ! তুমি কারো গায়ে হাত দিলে আমি তোমার বিরুদ্ধে লড়ব কিন্তু। দাদাজানের কাছে ওয়াদা করেছ, আর কোনদিন স্কুল কামাই দেবে না।

ঃ তুমি আমার সাথে লড়বে ? বলে মজীদ ওর গালে হালকা থাপ্পড় দিল।

সকলেই বাকরুদ্ধ লোচনে পরবর্তী পরিস্থিতি দেখার আশায় তাকিয়ে রইল। এ প্রথম মজীদের পক্ষ থেকে সলীমের প্রতি আঘাত ; কিন্তু সলীমের কাছে এর কোন জবাব নেই। কাঁপছিল ওর ঠোঁট। চেহারা মজীদের মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ। আচমকা কাউকে কিছু না বলে সলীম স্কুলের পথ ধরল। গাঁয়ের অপরাপর সহপাঠী জালাল, বশীর, রামলাল ও গোপাল সিং-ও ওর অনুসরণ করল।

নির্বাক দাঁড়িয়ে মজীদ, ওর গোস্বা অনুতাপে রূপ নিল। সলীম আর ওর মাঝে এ প্রথম সংঘাত। সলীমকে পাড়া গাঁয়ের অপরাপর ছেলেদের সাথে লড়তে দেখেছে। হার মানার পাত্র নয় ওর এ চাচাত ভাইটি। জালাল একবার ওকে গালি দিয়েছিল— শ্লেট দিয়ে ওর মাথা ফাটিয়ে রক্ত ছুটিয়েছিল ; কিন্তু আজকের ওর নির্বিকার ভাব ওকে ভাবিয়ে তোলে। সলীমের যে হাত ওর টুঁটি চেপে ধরতে উত্থিত হয়নি ওই হাত সম্পর্কে ওর অভিযোগ। ওই চোখ সম্পর্কে ওর প্রশ্ন— যাতে ও গোস্বা ও ঘৃণার লেশমাত্র দেখেনি। সলীম ও তার সহপাঠীরা চার পাঁচটা ক্ষেত অতিক্রম করেছিল। মজীদ 'সলীম' 'সলীম' বলে ওদের পিছু নেয়। সলীমের সাথীরা পিছে তাকায়। সলীমের কোন আকর্ষণ

www.amarboi.org

নেই এ ডাকের প্রতি। মজীদের ধারণা, এ ডাক সলীমের মনে দাগ কাটবে। স্কুলে পৌছার পূর্বে ওর সাথে মিলে যাবে। দু'জনের হাত ধরাধরি করে একসাথে স্কুলে প্রবেশ করবে ; কিন্তু সলীম চলছে তো চলছে।

একেবারে কাছটিতে এসে বলল— সলীম! দাঁড়াও! আমি তোমার সাথে যাব।

সলীম ঘাড় কাত করে ওর দিকে তাকায়। বলে— আমার ভয়ে স্কুলের পথ ধরতে যেও না। দাদাজান ও চাচা মিয়ার কাছে তোমার কথা বলব না। সলীম চলতে লাগল। মজীদ হতাশ ও পেরেশান হয়ে মাথা নীচু করে চলতে লাগল। সারা পথ ওকে বশ করার কল্পনা করতে লাগল। স্কুলের নিকটে এসে বলল— সলীম। তুমি আমার সাথে সন্ধি করবে কি-না বল।

সলীম জবাব না দিয়ে দ্রুত চলতে লাগল। মজীদ বলল— বেশ তাই হোক। ছুটির দিনেও আমি তোমার সাথে নদীর তীরে যাব না। এ কথারও কোন জবাব এল না সলীমের পক্ষ থেকে। মজীদ বলল— তোমার শালিকের বাসা ও ডিম ভেঙ্গে দেব। বুড়ো শালিকের গলায় দড়ি লাগিয়ে গাছের ডালে বেঁধে দেব।

সলীমের গতি শ্লথ হল। মজীদের দিকে একবার তাকিয়ে চলতে লাগল। ওর চোখ বলছে, মজীদের কথাকে ও ঠাট্টা হিসেবে নেয়নি। সে বলল— তোমার বিড়ালের বাচ্চাকে মগডালে রেখে আসব, কুয়োতলার সর্বাপেক্ষা বড় পাইন গাছটিতে। হ্যাঁ, তুমি যা নামাতে পারবে না।

সলীমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আচমকা বইয়ের ব্যাগ ও শ্লেট ছুঁড়ে ফেলে মাটিতে বসে পড়ল। মুখ কালো ওর।

মজীদ ও অন্যান্য ছাত্ররা ওকে ঘিরে ধরল। কেউ বলল— চলো সলীম! দেরী হয়ে যাচ্ছে।

একটা ঘাস দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে ও বলল— না। আমি যাব না। মজীদ হেসে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। ওর গালে মৃদু টোকা মারল। আচমকা ও মজীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এলোপাতাড়ি ঘুষি চালাল। চুল টেনে ছেঁড়ার উপক্রম করল। মজীদ এগুলো কেবল হজম করে যেতে লাগল। এবার ওর দু'কব্জি সজোরে চেপে ধরল। সলীম ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত হাঁপাতে লাগল। মজীদকে ও ওই অবস্থাই মুষ্টাঘাত করতে লাগল। মজীদ হাসছে আর ওর পাগলামো দেখছে। জালাল এসে ওদের লড়াই থামাতে ব্যাপৃত হল। মজীদ ওকে ধাক্কা দিয়ে বলল— তুমি যাও। সলীমকে ওর রাগ প্রকাশের সুযোগ দাও।

এ সুযোগে সলীম ক্ষেতের ঢেলা উঠিয়ে মজীদকে মারতে লাগল। এদিক ওদিক ঝুঁকে মজীদ আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। একটা ঢেলা এতদ্‌সত্ত্বেও ওর মাথায় আঘাত হানল, সলীম আরেকটা ঢেলা উঠিয়ে ওর দিকে তাকাল। মজীদ উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে অগ্রসর হতে থাকল। হাত উঁচিয়ে ধরল সলীম ; কিন্তু মজীদ এদিক সেদিক না হেঁটে ঠিক ওর দিকেই এগুতে লাগল। বলল— মারছ না কেন ? মারো!'

সলীম ঢেলা মাটিতেই নিক্ষেপ করল।

www.amarboi.org

মাটিতে পড়া টুপী উঠিয়ে সলীমের মাথায় পরিয়ে দেয় মজীদ। অতঃপর বইয়ের ব্যাগ উঠিয়ে একে অপরের দিকে তাকাল।

মজীদ হাসছে মিটিমিটি। সলীম চেষ্টা করছে হাসি লুকোতে। মজীদ বলল— 'নাও। আমি তোমার কাপড় ঝেড়ে দিচ্ছি।' খিলখিল করে হেসে পড়ে সলীম। এবার হাসির রোল পড়ে যায়। মনে হয় অভিমান নাটকের শেষ অংক মঞ্চায়িত হচ্ছে।

জালাল বলল— সলীম! মজীদ তোমার বিড়াল ও খরগোশের বাচ্চা মারবে না। এমনিতেই তোমাকে খেপাতে চাচ্ছে।

ঃ 'সে কথা আমি জানি।' বেপরোয়া জবাব দেয় সলীম।

ঃ কিন্তু জালালের বাচ্চা। তোমার মুরগীর ছা' ফুটেছে, ওগুলোকে ছাড়ছি না। ওগুলো আমি সলীমের ক্ষুধার্ত বিড়ালের সামনে ছেড়ে দেব। মজাটা টের পাবে তখন।' দাঁতে দাঁত পিষে বলল মজীদ।

জালালের চিন্তা এখন স্কুলকেন্দ্রিক না হয়ে মুরগীকেন্দ্রিক হল। ভাবছিল ও, হায়! ও কথা যদি মিথ্যে হত।

সলীম ওর গোমরা মুখের দিকে তাকিয়ে কানে কানে বলল— জালাল! মজীদ তোমায় এমনিতেই রাগাচ্ছে।

ওরা সবে স্কুলের চৌহদ্দিতে যখন পা রেখেছে, দাউদ তখন বাজাচ্ছে ঘণ্টা, মজীদকে দেখা মাত্রই সে বলল— মজীদ! আমি আজ একটি গাছে তোতাপাখি দেখেছি। ছুটির পরে মজা করে সকলে ওখানে যাব।

সলীম বলল— তোমাদের সাথে যাব আমিও।

দাউদ বলল— ওখানে আরো বেশ কিছু বাচ্চা আছে। তোমাকে একটা দেব।

ঃ 'আর আমাকে ?' প্রশ্ন জালালের।

দাউদ বলল— তোমাকেও বঞ্চিত করব না। কিন্তু বড় তোতাটি আমার।

ঃ বড় তোতা মানে? বলল সলীম।

ঃ 'যেটার গলায় উঁচু পর আছে।' উত্তর দাউদের।

✪ ✪ ✪

শেষ বিকেলে স্কুল ছুটি হল। ছেলেরা, দাউদের নেতৃত্বে তোতা-শাবকের খোঁজে বেরোল। সলীম ওকে এক আনা আর জালাল দিল এক পয়সা। গোলাপ সিং ও বশীর ওয়াদা করল, ওকে গুড় দেবে। দাউদ এ নামমাত্র মূল্যে সকলকে এক একটা তোতা-শাবক দেয়ার অঙ্গীকার করল। কিন্তু কোন মূল্যেই বড় তোতাটি দিতে নারাজ। অবশ্য দাউদের পর উত্তম শাবকটি হাসিল করার জন্য ও ময়ূরের একটা ডিম দিতে চাইল।

পথিমধ্যে দাউদকে প্রশ্ন করে মজীদ— যদি তোতা-শাবক কম হয়, তাহলে কি হবে? দাউদ জবাব দেয়— না, না। তা হবে কেন। গাছে বেশ কটা বাসা আছে।

সমস্যা যা, তা শুধু গাছে চড়া।

www.amarboi.org

ঃ তুমি বলেছিলে কথক তোতা কাউকেই দেবে না ?' প্রশ্ন করে মজীদ।

ঃ দু'টা হলে তোমাকে একটা দেব।

সলীম বলল— আর আমাকে ?

ঃ বেশী পেলে তোমাকেও বঞ্চিত করব না।

সলীম বলল— দাউদ! গাছে উঠে পাখির বাসাগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো।

দাউদ বলে— তা করব বৈকি। কিন্তু উঁচু পর-বিশিষ্ট তোতা সংখ্যায় খুবই কম।

সলীম বলে— দেখো দাউদ। ওই তোতা কিন্তু আমার চাই-ই। প্রয়োজনে তোমাকে আরো এক আনা দেব।

মজীদের কাছে এ কথা বেখাপ্পা লাগল যে, ওর উপস্থিতিতে অন্য কেউ দাউদের কাছে পীড়াপীড়ি করুক।

ও বলল— সলীম! দাউদ তোমার পছন্দ মাফিক তোতা না দিলে খোদ্ আমিই গাছে উঠে তোমায় তা দেব।

দাউদ বলল— ওই গাছে আমি ছাড়া কেউ চড়তে পারবে না— এটা আমার শর্ত। কেননা ওই গাছের ডাল খুবই মোটা। কেবল একটিমাত্র শাখা আছে, যা অতিক্রম করে তোমার বাসার কাছে পৌছা যায়। তোমাদের কারোরই সে ডাল ধরতে শক্তি নয়। এমন কি ওখানে ওঠতে আমার তোমাদের সাহায্যও লাগতে পারে। মজীদ বলল— সলীম! সলীম!! তোমার পছন্দ মাফিক তোতা না মিললে আমারটাই না হয় তোমায় দেব। নিজের জন্য নেব অন্যটা।

তেঁতুল গাছের নীচে এসে বাচ্চারা যার যার স্কুলব্যাগ মাটিতে রাখল। দাউদের জন্য মইস্বরূপ মজীদ ও জালাল সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওদের নিকটেই একজন উপুড় দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। দাউদ ওই বালকের পিঠে পা দিয়ে জালাল ও মজীদের ঘাড়ে পা দিল। অতঃপর পা কেঁচকি মেরে বাদুড়ের মত গাছের ডালে পেঁচাল। এদিকে জালালের অবস্থা তখন কেরোসিন। মজীদ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

জালাল বলছিল— দাউদ! জলদি করো।

দাউদ গাছের শাখা ধরে রাখতে ব্যর্থ হল। জালাল স্ব-স্থান থেকে সরে দাঁড়াল।

ঃ জালালের বাচ্চা...। দাউদ কথা শেষ করতে না করতেই বালকেরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। দাউদের পাগড়ী ঢিল হয়ে গেল। রাগে-গোস্বায় তা মাটিতে ফেলে দিল। দৌড়ে দু'হাতে জালালের কান মলা শুরু করল।

মজীদ দৌড়ে জালালকে বাঁচাতে গিয়ে বলল— দাউদ! এ ব্যর্থতা তোমার। খামোকাই দেরী করেছ তুমি। এসো আবার আমরা মই হই। আর তুমি চড়ো। এবার তোমার শরীরের চাপটা আমার ভাগেই বেশী রেখো।

দাউদ আবারও হারানো শক্তি ফিরে পেতে উঠে দাঁড়াল। তবে আগেভাগে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে বলল— জালালের বাচ্চা! এবার আমাকে ফেলে দিলে

www.amarboi.org

তোমার কপালে তোতার বদলে ফুটবলের কিক্ জুটবে। এবার মজীদ অপেক্ষা জালালের যিম্মাদারী বেড়ে গেল। তাই দাউদ অতি সহজেই গাছে চড়তে পারল।

গাছের মধ্যভাগে দাউদের আশানুরূপ পাখির বাসা মিলে গেল। গাছের মূল ডাল অত্যন্ত মোটা, কিন্তু চারপাশের ডালগুলো ক্ষুদ্রই বলা চলে। ওই ক্ষুদ্র শাখা বেয়ে বেয়ে দাউদ মোক্ষম স্থানে যেতে লাগল।

গাছের একটা গর্ত থেকে দু'টি তোতা উড়ে গেল। দাউদ আনন্দাতিশয্যে গর্তে হাত ঢোকাল। খানিক পর বলল— এতেও নেই। আমার ধারণা, বাচ্চারা বড় হওয়ায় উড়ে গেছে।

এদিকে নীচের বালকদের মুখ শুকিয়ে গেল। সলীম বলল— উপরে আরো গর্ত আছে। ওগুলোর মধ্যে বাচ্চা অনেক পাবে। ভালো করে দেখো।

মজীদ ওকে বারণ করে বলল— তুমি চিন্তা করো না।

আরেকটি গর্ত থেকে একটা তোতা উড়াল মারলে তাতে হাত ঢুকিয়ে দাউদ চিৎকার দিয়ে উঠল— মিলে গেছে। পেয়ে গেছি। দু'টি নয়, তিনটি।

পরপর তিনটি বাচ্চা বের করে ও গাছের ডালে রাখল। ভ্রু-কুঁচকে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল— এগুলোর কোনটারই দেহে পাখনা নেই। নেহাৎ ছোট।

বেশ কিছু ছাত্র ওগুলোকেই তাদের জন্য যথেষ্ট মনে করছিল। কিন্তু সলীম বলে উঠল— দেখো, দাউদ। ওগুলো বাসায় রেখে দাও। নেহাৎ ছোট। মরে যাবে তো।

দাউদ বাচ্চা তিনটি বাসায় রেখে বলল— আমি আরো ওপরে দেখছি। এছাড়াও আরো দু'টো বাচ্চার সন্ধান পেল দাউদ, কিন্তু ওর একটাও কথা বলতে পারে না। অবশ্য পূর্বের তুলনায় এ দুটো অপেক্ষাকৃত বড়। বালকেরা ঝুলি পেতে ধরল। কিন্তু দাউদ বলল— না! এখন নয়, নামার সময় ঝুলিতে পুরে তবেই নামব। উপরের গর্তগুলো খুঁজে দেখব এক্ষণে।

মজীদ তীর্যক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল। বলল— দোস্ত! বড় একটা বাসা দেখতে পাচ্ছি। ওটি চিলের বাসা নয় তো ?

জালাল বলল— দাউদ! আমার মা বলতেন, চিলের বাসায় স্বর্ণ থাকে।

ঃ 'বকাবকি রাখো তো! চিল স্বর্ণ সংগ্রহ করবে কোত্থেকে ?' বলল দাউদ।

ঃ সত্যি বলছি। মজীদের মাও একথা বলতেন। বলল জালাল।

মজীদ বলল— যদি সত্যি না হয় তা হলে ?

জালালের কাছে এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই, কিন্তু সলীম বলল— হ্যাঁ মজীদ! জালাল মিথ্যো বলেনি। চিলের নীড়ে সত্যিসত্যিই সোনা থাকে। কেন, ওই কেচ্ছাটি তোমার মনে নেই, এক রাণী গোসল করছিলেন। গোসলের সময় তার কণ্ঠহারটি ঘাটে রেখেছিলেন। চিল ওটা ছোঁ মেরে নিয়ে এসেছিল। এক বাওয়ালী কাঠ কাটতে গিয়ে চিলের বাসায় ওই হার খুঁজে পেয়ে রাজদরবারে জমা দিলে রাজা তাকে পুরস্কার দেন।

জালাল বলল— দেখো! চিলের বাসায় স্বর্ণ পাওয়া যাবে— সেকথা আমি কিন্তু বলিনি।

www.amarboi.org

কিন্তু দাউদ সলীমের গল্প শুনে ফেলেছে ততক্ষণে। কারো পরামর্শের দরকার পড়ছে না ওর এক্ষণে। দ্রুত ওপরের দিকে উঠতে লাগল। কথক তোতার প্রতি ওর কোনই আকর্ষণ নেই। দাউদের স্বর্ণলোভের সামনে তোতা এখন কিছুই নয়। ওই বিশাল বাসার নিকট পৌছতেই বাসা কেমন যেন খচখচ এবং পরক্ষণে কেঁপে উঠল। একটা চিল ওর টেকো মাথায় ঠোকর মেরে উড়ে গেল। জীবনে এ প্রথম মাথায় চুলের অস্তিত্ব অনুধাবন করে দাউদ। ঠোকরমারা স্থানে হাত ফেরাতে না ফেরাতে আরেকবার মাথায় নেমে এল চিলের চুম্বন। পাশাপাশি সূচালো নখের এক আঁচড় দিতেও ভুলল না চিলটি। দাউদ যথাসাধ্য চিলকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত সরু ডাল মাড়িয়ে বৃহৎ ডাল-এ উপনীত হয় দাউদ। কিন্তু ততক্ষণে মাদী-চিলের শোরগোলে মাদা-চিলগুলোও এসে জড়ো হয়। ওরা একযোগে দাউদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদের সকলেরই টার্গেট দাউদের জ্বলজ্বলে টেকো খুপড়ি। ওর সাথীরা গাছের নিচে হেসে খায় লুটোপুটি। দাউদ চিৎকার দিচ্ছে 'জালালের বাচ্চা- তোমার মায়ের সোনা বুঝি চিলের...?'

চিলের অনবরত ঠোকর ওর কথা শেষ করতে বাধ সাধে।

মজীদ বলে চলছে— এলো! এলো!! চিল এলো!!!

গাছের একটি ডাল ও হাতকে চোখের জন্য দ্রুত ঢাল বানিয়ে নেয় দাউদ। তার চেয়েও দ্রুত নামতে থাকে গাছের মগডাল থেকে। মজীদ দেয় চিৎকার— ওই যে চিলও নামছে তোমার সাথে।

দাউদ ঝুলে, বেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে কোনক্রমে লাফ দিয়ে ভূতলে পড়ে। ওর টেকো মাথায় চিলের অসংখ্য আশীর্বাদ ফুলে লাল। কোন কোনটা থেকে রক্ত পড়ছে অবিরাম। ছেলেদের উল্লাসে ভাটা। যমীনে শুয়ে অসহায়ের মত ওদের মুখ দর্শন করছে দাউদ।

শেষ পর্যন্ত ও দাঁত কটমট করে বলে— জালালের বাচ্চা! তুইও হাসছিস ?

জওয়াব না পেয়ে চারদিক তাকায় দাউদ। জালাল ওখানে নেই। রামনাথ একদিকে হাত উঠিয়ে বলে- আরে জালাল দেখছি পলায়ন করছে।

ঃ কোথায় ?

ঃ ওই দেখো না।

ঃ দাঁড়াও জালাল! জালালের বাচ্চা!' চিৎকার দাউদের।

কিন্তু বইয়ের ব্যাগ বগলদাবা করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে জালাল। ওর দ্রুতগতি দেখে মনে হয়— নিজ গ্রামে না পৌছা পর্যন্ত গতি মন্থর হবে না ওর।

✪ ✪ ✪

বর্ষা মওসুম শুরু হয়েছে। স্কুলের ছেলেরা খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে মেঘ-বাদল দেখছে। আলো-আঁধারী দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। তবুও ছাত্রদের শঙ্কা, মাস্টারজী আসার পূর্বে বৃষ্টি নামলেও তাদের ছুটি নেই। কালো মেঘ তখনও সূর্য থেকে দূরে কিছুটা। বিগত রাতে আকাশটা কেঁদে নিয়েছে বেশ। দিনের বেলায়ও দেখা যাচ্ছে সেই কাঁদার পদধ্বনি। কাজেই দূর গ্রামের অনেক ছেলেই অনুপস্থিত আজ।

www.amarboi.org

সলীম, মজীদ ও ওদের গাঁয়ের অনেক ছেলেই এখন কালেভদ্রে অনুপস্থিত থাকে। অথচ বর্ষাঘন এ মেঘলা দিনে আম, পাইন ও বর্ষাপ্লাবিত নদীর তীরে আনন্দ-খুশীর হাজারো উপাদান বিদ্যমান। রাতের বেলা বৃষ্টি হওয়ায় ওদের এ বিশ্বাস জন্মে যে, কাল ওদের স্কুলে যেতে হবে না। সারাটা দিন ছুটি উপভোগ করা যাবে— খেলাধূলা, তীর চালনা ও ডোবাডুবির মধ্য দিয়েই। কিন্তু হায় কপাল! সকালে বৃষ্টি থামল। পূর্ব আকাশের মেঘগুলো ওদিক সেদিক সরে সূর্যের শ্বাস ফেলার জায়গা করে দিল। মনে জমাট ব্যথা নিয়ে ওরা স্কুলের পথ ধরল। উত্তর গগণ অবশ্য তখন কালো মেঘে ঢাকা। ওদের আশা, স্কুলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আকাশ আবারো কাঁদবে। আবারো ক্রীড়া-কৌতুকের সুযোগ মিলে যাবে ওদের। স্বল্প সময়ের পথ ওরা দেরীতেই অতিক্রম করতে লাগল। কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। স্কুলের চৌহদ্দিতে পৌঁছে মজীদ বলল— আজ হয়তো ছাত্ররা কমই আসবে। ঘণ্টা বাজেনি এখনও। অর্ধেকটা ছাত্র গরহাজির হলেও মাস্টারজী ছুটি দিয়ে দেবেন। খানিক বাদে ঘণ্টা বাজানোর পরও বৃষ্টি এলে মাস্টারজী ছুটি দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

স্কুলের বারান্দায় পা রেখে অন্যান্য ছেলেদের মত ওরাও বারে বারে আসমানের দিকে তাকায়। মেঘপুঞ্জ তখন পূর্ব অন্তরীক্ষে পুঞ্জীভূত। সূর্য ঢেকে গেছে। কালো-সাদা মেঘের লুকোচুরিতে পুরো আকাশটা কেমন শ্বেতবর্ণে রূপান্তরিত। স্কুল কোণের জলাশয় থেকে ব্যাঙেরা বিচিত্র ডাকে পরিবেশকে বর্ষা-সঙ্গীত উপহার দিচ্ছিল। পাপিয়ার কুজন ধ্বনি আম্রকাননে নিয়ে এসেছিল নবান্ন উৎসবের আমেজ।

দাউদ মাস্টারজীর হুক্কা তুলে অন্দরে প্রবেশ করল। ছেলেদের চেহারায় তা এক চপেটাঘাত হয়ে দেখা দিল। হুক্কাটি টেবিলে রাখা হল। বেল উঠিয়ে বাজানো হল ঘণ্টা। ছাত্ররা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে দাঁড়াল সারিবদ্ধ হয়ে।

ওদের জাতীয় সঙ্গীতে জীবন উজ্জ্বল হওয়ার কথা বিদ্যমান। কিন্তু সেই ঔজ্জ্বল্যের মর্ম অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে অজানা। ওরা কেবল জীবনের আলো খুঁজে পেতে আকাশ পানে তাকায়। ওদের আশা, মেঘের আনাগোনা, মুষলধারে বৃষ্টি। সর্বোপরি মাস্টারজীর হুক্কার অনুপস্থিতি।

মাস্টারজী এলেন। পাটোয়ারীর সাথে কথা বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলেন। উভয়ে ফটকে দাঁড়ালেন। তাঁরা হয়তো কোন গুরুত্বপূর্ণ আলাপ করছেন। অন্য সময় এ আলাপচারিতা দীর্ঘ সময় চলত।

কথা বলার ফাঁকে পাটোয়ারী আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন— মাস্টারজী। এ মেঘ না নেমে ক্ষ্যান্ত হবে না। রাতেও বেশ বর্ষা হয়েছে।

মাস্টারজী আঙ্গিনা ও আকাশে দিকে তাকিয়ে বললেন— আজ ছাত্র উপস্থিতি খুবই কম।

সঙ্গীত শেষ। মাস্টারজী দাউদকে হাজিরা খাতা আনতে বললেন। অন্য সময় তিনি টেবিলে বসে হুক্কা সেবন করতেন, অতঃপর হাজিরা খাতায় চোখ বুলাতেন। কিন্তু আজ হাজিরা টানলেন আঙ্গিনায় দাঁড়িয়েই। পাটোয়ারী তার নিকটে দাঁড়িয়ে। হাজিরা নিতে

www.amarboi.org

নিতে তিনি আসমানের দিকে তাকালেন আবারও। বৃষ্টির ক'ফোঁটা তার হাজিরা খাতায় নাম লেখাল। দ্রুত হাজিরা শেষ করে তা দাউদের হাতে দেন তিনি।

পাটোয়ারী বললেন— মাস্টারজী আজ ছুটি দিয়ে দেন।

মাস্টারজী জবাব না দিয়ে আসমানের দিকে তাকান। মজীদ সলীমের বাহুতে চিমটি কাটে। জনৈক ছাত্র মুখ লুকিয়ে বলে— ছু'টি! ছুটি!!

স্কুলের অপর কোণ থেকে আরো অনেক ছাত্র এ কথা পুনরুচ্চারণ করল। গোটা স্কুলেই কেবল এক রব— ছুটি! ছুটি!!

মাস্টারজীর মন মৌসুমী বৃষ্টিতে তরতাজা না থাকলে হয়ত এতক্ষণে বেত এনে আচ্ছামত পেটাতেন। কিন্তু আজ তিনি চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে কেবল মুচকি হাসলেন। এতে ছাত্ররা তাদের দাবী মানার সদুত্তর খুঁজে পেল। মাস্টারজী পাটোয়ারীর দিকে তাকালেন।

পাটোয়ারী বললেন— মাস্টারজী। আজ আম খাওয়ার দিন। মাস্টারজী ছাত্রদের দিকে আবারও তাকালেন। স্মিতহাসি দিয়ে বললেন— বড্ড নালায়েক দেখছি তোমরা। কাল যেন কেউ গরহাজির না থাক।

✪ ✪ ✪

ছাত্ররা স্কুল থেকে বেরিয়ে একটি জলাশয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। কাদা পানির এ জলাশয় বর্ষাস্নাত খালে রূপ নিয়েছে। খানিক ওই জলাশয়ে সাঁতার ও ডোবাডুবির পর ছেলেরা কাবাডি খেলায় মেতে উঠল। স্কুলের পাশাপাশি বসবাসকারী ছাত্ররা সংখ্যায় ঢের। বাইরের ছাত্র কম। এজন্যে ওরা পরস্পরে ভাগ করে কাবাডি খেলায় সমতা আনল। মজীদ ও দাউদকে একই দলে অন্তর্ভুক্ত করাতে অন্যান্য ছেলেরা ভয় পাচ্ছিল। কাজেই ওরা দু'জনকে দু'দলে ফেলল। মজীদ বিপক্ষ দল থেকে কাবাডি দিলে একমাত্র দাউদ পারত তাকে রুখতে। এবারে দাউদও কাবাডি দিলে মজীদই পারে তাকে প্রতিহত করতে। ক্ষেতের মাঝে লাঠি দ্বারা কোট বানানো হল। কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার আগেই বিলের কোণে খায়রুদ্দীনের গাধা দেখা গেল। মজীদ দাউদকে নিয়ে ওদিকেই ছুটল।

সলীম বলল— কোথায় চললে মজীদ ?

ঃ তুমি খেলতে থাক সলীম! আমরা এই এলাম বলে।

মজীদের অনুপস্থিতিতে কাবাডি খেলার এক দলের নেতৃত্ব সলীমের কাঁধে চাপল। বিপক্ষে দলের নেতৃত্ব চাপল মোহন সিং-এর ওপর।

মোহন সিং প্রথমে কাবাডি দিল। স্বাভাবিকভাবে বিপক্ষের একজনের গা ছুঁয়ে নিরাপদে কোর্টে ফিরে এল। সলীমের দল থেকে গোলাপ সিং কাবাডি দেয়। বিপক্ষের একজনকে জমিনে আছড়ে ফেলে। মোহন সিং আবারও একজনের গা ছুঁয়ে গেল। এবার এল সলীমের পালা। ও একজনকে আছাড় মেরে প্রতিশোধ নিল। খানিক বাদে সলীম

www.amarboi.org

অনুধাবন করল, মোহন সিং কাবাডি দিতে এলে তার পক্ষের কেউই ওকে আটকাতে সমর্থ হচ্ছে না। গোলাপ সিং সলীমকে কানে কানে বলল— সলীম! ছেলেরা মোহন সিং-এর সাথে লড়তে পছন্দ করছে না। কেননা, ওরা জানে, মোহন সিংকে সহজেই ওর বাবা গিয়ে তাকে পেটাবেন। সে আমাদের দলের অর্ধেককে তাই সহজেই ছুঁয়ে গেছে। জালাল, রামলাল এবং বশীরও ওকে ডরায়।

সলীম বলল— কি হে জালাল! মোহন সিংকে ডরাও তুমিও ?

ঃ কাবাডি দিতে গেলে ও আমাকে গাল দেয়।' বলল জালাল।

ঃ আচ্ছা! এবার আমি ওর খবর নিচ্ছি।

সলীম এমনিতেই ওকে ঘৃণা করত। বিশেষ করে দাউদের অপরাধে ওর বাবাকে নওকর দিয়ে পেটানোয় সেই ঘৃণা বহুলাংশেই বৃদ্ধি পায়।

মোহন সিং কাবাডি দিলে সলীম ওর সামনে এসে দাঁড়াল। মোহন সিং পূর্ণ শক্তিতে ওর বুকে হাত মারল। এর জবাবে সলীম ওর গর্দানে হাত লাগাল। মোহন সিং উল্টা দিকে ঘুরতে লাগল। সলীম কেঁচকি মেরে ওকে ভূতলশায়ী করল। মোহন সিং ভূতলশায়ী হয়ে 'কাবাডি কাবাডি' বুলি না কপচে 'গালি' কপচাতে লাগল। এ পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতা ওদের জীবনে প্রথম। মোহন সিং-এর সাথে খেলাধূলায় দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করার দুঃসাহস দেখাতে পারল সলীম। আবার সলীমকেও কেউ তখনও গালি দেয়ার সাহস দেখায়নি। দু'জনেই লেগে গেল ধস্তাধস্তিতে। মোহন সিং নিচে পড়ে গাল দিচ্ছিল। সলীম প্রতিটা গালির জবাবে এক একটা ঘুষি চালান দিচ্ছিল। জমিদার পুত্রের এহেন পরিস্থিতিতে গাঁয়ের গরীব ছেলেদের সাহায্যে এগিয়ে আসা অপরিহার্য। পাঁচ-ছ'জন এসে সলীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ; কিন্তু গোলাপ সিং ও বশীর শ্লেট উঠিয়ে নিল। সংখ্যায় ওরা বিশ। দূর গ্রামের আরো তিনজন ছাত্র ওদের দলে ভিড়ল। অবশ্য কিছু ছেলে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকল। জালাল চিরাচরিত নিয়মমাফিক বইয়ের ব্যাগ উঠিয়ে দ্রুত বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটল।

ক্ষেতের একটা ঢেলা উঠিয়ে সলীম মোহন সিং-এর মুখে মারল। শেষ পর্যন্ত ওকে ছেড়ে সাথীদের কাতারে এসে শামিল হল।

মোহন সিং সলীমের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে সাথীদের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল— দেখো! ওরা যেন কেউ ভেগে যেতে না পারে। ওদেরকে ঘিরে নাও।'

একথা বলে আস্তে আস্তে অগ্রসর হল। ইতোমধ্যে রামলাল জলাশয়ের কিনারায় গিয়ে চিৎকার দিয়ে বলল— দাউদ! মজীদ! লড়াই হয়ে গেছে। পালাও! পালাও!

ওরা গাধা হাঁকিয়ে আসছিল। খাইরুদ্দীন সেই পূর্বেকার মত ওদের পেছনে দৌড়াচ্ছেন।

মোহন সিং-এর সাথীরা পুরো ক্ষেতটা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। সলীম ও ওর সাথীরা পরামর্শ করে অকস্মাৎ অবরোধকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মোহন সিং

www.amarboi.org

যেদিকটায় দাঁড়াল সেদিকটায় ওদের আক্রমণটা তীব্র হল। গোলাপ সিং-এর শ্লেট এক ছাত্রের বাহুতে আঘাত হানল। সে অস্ফুট আর্তনাদ করে দে-ছুট। বশির আরেক জনের হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত হানল। সে এতে চিৎকার জুড়ে দেয়। অন্যান্যরা ছুটে পালায় যেদিক পারল সেদিকে। সলীমের দৃষ্টি এবার পুরোপুরি মোহন সিং-এর প্রতি। কেননা সে সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। সলীম ওর পথ আগলে ধরল। বাধ্য হল সে বাড়ীর পথ ধরতে। সলীম ওর পিঠে শ্লেটের এক ঘা লাগিয়ে দিল। ধোপাবাড়ী পর্যন্ত ওর পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু ধোপাবাড়ীর কুকুর ঘেউ ঘেউ করে মোহন সিং-এর পিছু নিলে সলীম হেসে ফিরে আসে।

ইতোমধ্যে দাউদ ও মজীদ ফিরে এল এবং মোহন সিং-এর অবশিষ্ট সাথীদের কানমলার হুকুম দিল। সলীম বলল— দাউদ! ওদের কোন দোষ নেই। ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করেনি। একমাত্র মোহন সিং-এর প্রভাবে ওরা আমাদের বিপক্ষে লড়তে চেয়েছিল। অন্যথায় মোহন সিং-এর নওকররা ওদের পেটাত।

দাউদ বলল— আচ্ছা! কান ছেড়ে দাও।

জনৈক বালক বলল— সলীম! তোমরা কেটে পড়। মোহন সিং তোমাদের মার খেয়ে ভেগেছে। ওর বাপু ও নওকররা প্রতিশোধ নিতে এল বলে।

ঃ পলায়নকারীরা চিরকালই ভীরু। গোস্বায় লাল হয়ে বলল দাউদ। মজীদ এসে ওর পিঠ চাপড়ে বলল— দেখলে দাউদ, দেখতে হবে না ভাইটা কার।

দাউদ বলল— দেখো মজীদ। ওর বাপু ও নওকররা এলে আমি তোমাদের সঙ্গ দেব। তোমরা জান! ওরা একবার আমাকে মেরেছিল। আমার বাবাকে হেস্তনেস্ত করেছিল।

মজীদ দাঁতে দাঁত পিষে বলল— আজ এলে বেটাদের বোঝাব, কত ধানে কত চাল।

ঃ কিন্তু শাস্তিটা অবশ্যই পেতে হবে আমাকে। ওরা মনে করবে— এটা নিশ্চয় আমার কারসাজি' বলল দাউদ।

ঃ দাউদ! তুমি কেটে পড়। আমরা থেকে যাই।' বলল সলীম। দাউদ বলল— কেটে পড়ব! তোমাকে ও মজিদকে ছেড়ে ? না না, তা হয় না— হতে পারে না— তোমাদের সাথে আছি, থাকব। বেশীর বেশী ভয় ওরা আমার বাবার বেইয্যতী করবে। কিন্তু এর বদলে আমি মোহন সিং-এর মাথার একটা একটা চুল গুণে গুণে ছিঁড়ব।

স্কুলের নিকটবর্তী ছাত্ররা ধারণা করেছিল যে, মোহন সিং অবশ্যই তার বাবা ও নওকরদের নিয়ে আসবে। পক্ষান্তরে অন্যরা দেখছিল, সলীম, মজিদ ও দাউদ তাদের মোকাবেলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই সকলে উপস্থিত বিপদ দেখে চম্পট দেয়। আবার অনেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে তামাশা দেখার আশা পুরল মনে। কেউবা চাপল গাছে। দাউদ ও মজীদের আগমনের পর দূর গ্রামের ছেলেরাও ওদের সঙ্গ দিল।

মজীদের পরামর্শক্রমে ছেলেরা স্কুলব্যাগ উঠিয়ে পাশের আখক্ষেতে আত্মগোপন করল।

মজীদ বলল— দেখো! আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা কেউই স্থান ত্যাগ করবে না। কেউ এলে আমিই দেখব।

www.amarboi.org

মজীদ পাগড়ী খুলে দু'ভাঁজ করল। এর কোণে শক্ত ঢেলা বাধল। অতঃপর দাঁড়িয়ে বলল— দাউদ! জানো এগুলো কি ?

দাউদের নিশ্চুপ ভাব আঁচ করতে পেরে মজীদ বলল— একটি হাতিয়ার। শিখেছি চাচা আফজাল থেকে। তিনি এই অস্ত্র দিয়ে একবার জনৈক ডাকাতকে কুপোকাত করছিলেন।

ঃ কিভাবে ? দাউদের চোখেমুখে আগ্রহ।

মজীদ পাগড়ীর এক কোণ মুঠে চেপে ঢেলা বাধা কোণ মাথার উপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরাতে লাগল। বলল— দেখো ? এটা লাঠির চেয়ে খতরনাক। এর আওতায় এলে যে কেউ শির নত করতে বাধ্য। মজীদ ওর দাবীকে আরো প্রমাণপুষ্ট করতে ঢেলাবাধা প্রান্ত যমীনে পূর্ণশক্তিতে আঘাত করল। এতে বেশ খানিকটা স্থান দেবে গেল। মজীদ ছেলেদের কাছে এসে বসল। তাকাতে লাগল বীরের দৃষ্টিতে।

দাউদ নিজের পাগড়ী খুলল দ্রুত। উভয় হাতে ঢেলা ঢুকিয়ে বলল— সত্যিই তো, এ এক অনন্য হাতিয়ার! কিন্তু এ মাটিতো নরম। এর স্থলে যদি ..... কথা শেষ না করে কূপের কাছে এগিয়ে গেল। ঝামা ইটের দু'টুকরো ওঠাল। একটা বাধল পাগড়ীর কোণে অপরটা মজীদকে দিয়ে বলল— মাটির বদলে এটাই যুৎসই মজীদ!

অন্যরাও ওদের দেখাদেখি ইট ওঠাল। খানিক পরে সকলেই ওই নতুন অস্ত্রে সজ্জিত হল। কিন্তু আফসোস সলীমের। পাগড়ীর মত যুৎসই হাতিয়ারের স্থলে ও যে টুপি পরিহিত।

আচানক ওরা ঝিলের কিনারার দিকে তাকাল। খায়রুদ্দীন গাধাগুলোকে ঘাস খেতে দিয়ে ঝিলে গোসল করছেন। পাগড়ী তার কূলে। সলীম অন্য সময় হলে এ দুষ্টুমি করত না ; কিন্তু অবস্থা এখন নাযুক। তাই ও-ই পাগড়ী উঠিয়ে নিল। খায়রুদ্দীন ডুবাচ্ছেন বিধায় সলীমের এ কাণ্ড তার চোখে পড়ল না।

সলীম যখন খায়রুদ্দীনের পাগড়ী পরিধান করে সাথীদের কাছে আসছিল তখন মোহন সিং তার জনতিনেক নওকর নিয়ে গাঁও থেকে বেরুচ্ছিল। এক্ষণে ইট যোগাড় করা রীতিমত মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। মোহন সিং-এর হাতে ত্রিফলা। নওকরদের হাতে ল্যাঠি। দাউদ বলল— ওই কালো পাগড়ীধারী আমার বাবাকে জুতো মেরেছিল। ওর সাথে আমিই বুঝব।

মজীদ বলল— কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া তোমরা কেউই এক কদমও নড়বে না।

ওরা কাছে এসে গেলে মজীদ উঠে দাঁড়ায়। নওকররা তাদের লাঠির জবাবে ছেলেদের কাছে প্রতিরোধমূলক কিছু না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অগ্রসর হয়।

ওদেরই একজন বলে ওঠে— মোহন সিংকে কে মেরেছে ?

মোহন সিং সলীমের দিকে তাকিয়ে চিৎকার দেয়— ও ই যে, ও।

মজীদ বলল— তোমরা কেন ? ওর বাপকে আনলেই পারতে।

মোহন সিং নওকরদের দিকে তাকিয়ে আবারো চিৎকার দেয়— ও সলীমের ভাই। এরা ওদের চেনা। সকলকে ধোলাই দাও।

www.amarboi.org

নওকর বলল— তোমরা সবে আমাদের সাথে সর্দারজীর কাছে চলো।

মজীদ বেপরোয়া জবাব দেয়— আরে রাখো তোমাদের সর্দারজী। যাব না আমরা। এ জবাব নওকরের জীবনে এ প্রথম। ফ্যালফ্যাল করে সে সাথীদের দিকে তাকায়। কালো পাগড়ীধারী আড়চোখে দাউদের চেহারা নিরীক্ষণ করে। আচমকা চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে— আরে, এতো দেখছি নুরুদ্দীন তেলীর ছেলে। তেলীর বাচ্চা তেলী। তুমি সেদিনের মার এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে ?

সলীম দাঁড়িয়ে বলল— দাউদের ওপর তোমাদের গোস্বার কারণ, ও গরীবের পুত্র। মোহন সিংকে মেরেছি তার অশ্রাব্য গালাগালের কারণে। ও গালি দিলে এমনই মার খেয়ে যেতে থাকবে।

নওকর সলীমকে ভয় দেখানোর আশায় লাঠি ঘোরাল ; কিন্তু এর পূর্বেই মজীদের হাত বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল। পাগড়ীতে পেঁচানো ইটের আচমকা আঘাত নওকরের পার্শ্বদেশে আঘাত হানল। ভয়ে সে কদম পাঁচেক দূরে সরল। ব্যথায় কুঁকড়ে যমীনে বসল। উভয় হাত দিয়ে পাঁজর কুঁচকে 'রাম রাম' বলে উঠল। ওর সাথীরা হতবাক। মজীদ আচানক তার লাঠি কেড়ে নিল। নওকরদের একজন ওকে আঘাত করার কোশেশ করল। মাথাটা একদিকে বাঁকিয়ে নিল মজীদ। ততক্ষণে ওর সাথীরা ময়দানে চলে এসেছে।

মজীদের বিপক্ষের লোক ওর মাথায় লাঠির আঘাত করতে যাবে এই মুহূর্তে গোলাপ সিং তার পাগড়ী লাঠিওয়ালার ওপর ঘোরাল। গর্দানে ওর নিশানা আঘাত হানল। এ সুযোগে মজীদ তার গোড়ালীতে লাঠির আঘাত হানল।

দ্বিতীয়বার লাঠির আঘাত করার উদ্যোগ নিলে সে 'মারে বাবারে' বলে রণে ভঙ্গ দিল। মজীদ যাকে পয়লা আঘাত করেছিল সে উঠে দাঁড়ানোর কোশেশ করল। ইতোমধ্যে জনাচারেক বালক তাকে ঘিরে নিল। একটা ইটের প্রচণ্ড আঘাত তার মাথায় লাগলে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

পরাজয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে মোহন সিং ক' কদম দূরে সরে দাঁড়াল। চোখ বন্ধ করে এক চক্কর খেয়ে সলীম তার নিকটে এসে পৌঁছল। মোহন সিং আঘাত করার প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বেই সলীমের ইটের আঘাত তাকে ভূতলশায়ী করল। বেশ কয়েকটা ঘুষি খেয়ে জামা রেখেই/মোহন সিং পালাল।

সলীম দৌড়ে সাথীদের কাছে এল। একটু আগের থমথমে রণাঙ্গন এখন বিজয়োল্লাসে মাতোয়ারা। কালো পাগড়ীধারীকে দাউদ পেয়ে বসেছিল। দাউদের ইটের আঘাত তার গর্দানে লেগেছিল। দাউদ পাগড়ী তার গলায় পেঁচিয়ে হ্যাঁচকা টান মারলে বেচারা চিৎপটাং। দাউদ ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। ও ওই অবস্থায়ই যমীনে তাকে টানছিল। ওর এ মজাদার খেল দর্শকদের চিত্তে হাসির খোরাক যোগাচ্ছিল রীতিমত। ভূতলশায়ী অন্যান্য নওকররা আজব এ ইটের কারিশমায় হতভম্ব। পাহারাদারদের মন অন্যদিকে দেখে ওরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। ওদের পিঠে আরেক দফা আঘাত করে সলীম তার শেষ ঝাল মেটাল।

www.amarboi.org

যুদ্ধ শেষ। দুশমন ময়দান ছেড়ে ভেগেছে। বিজেতাদের যুদ্ধলব্ধ মালের ফিরিস্তিতে দেখা গেল দু'টি লাঠি, দু'জোড়া জুতো, একটা পাগড়ী ও ছেঁড়া-ফাটা একটা জামা। এছাড়া একজন কয়েদীও। কালো পাগড়ী জীবনে এ প্রথম অনুমান করল, পাগড়ীর মত মহত্তম বস্তু অপাত্রে ব্যবহার করলে কি বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া আরেকটা অভিজ্ঞতা তার যা হল তা হচ্ছে— স্কুলের ছেলেরা হাসি-আনন্দের চেয়েও গোস্বা করলে তা মারাত্মক হতে পারে। জীবন বাঁচানোর জন্য নাকে খত দিয়ে এসেছে সে। এতদসত্ত্বেও কাউকে সে বলতে শুনেছে লোকটার পাগড়ী কালো, কাজেই তার মুখও কালো করে দাও। সুতরাং আট-দশ দোয়াতের কালি তার মুখে ঢেলে দেয়া হয়েছে। সকলে জোরে হেসে ওঠল। এতে তার ধুকধুকানি বেড়ে গেল। হয়ত কোন নয়া মুসীবত আসছে। কেউ বলল— বেটাকে জুতাপেটা কর। মাথায় জুতোবৃষ্টি বর্ষণ কর।

এরপর যেন কেউ বলল— ওকে গ্রামে নিয়ে যাই। বাচ্চারা ওকে দেখে বেশ মজা পাবে। এতে তার আত্মা উড়ে গেল। ঘুষি, চড়, থাপ্পড় ও লাথির পর আরেকদল বাচ্চাদের সামনে উপহাসের পাত্র হতে হবে শুনে আত্মা উড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। দাউদ বলল— আচ্ছা! দোহাই দাও। স্কুলের কোন ছাত্রের সাথে লড়াই করবে না!

ঃ দোহাই দিলাম।'

ঃ আচ্ছা বলতো— তুমি একটা আস্ত বানর।

ঃ আমি একটা আস্ত বানর।

ঃ এবং আমি বানর নাচ নাচতে পারি।

ঃ আমি বানর নাচ নাচতে পারি।

মজীদ তার গলে পাগড়ী বেঁধে বলল— শাবাশ! আমার বানর। এবার নাচ দেখাও। অসহায় নওকর উঠে দাঁড়াল। ছাত্ররা শোরগোল করে উঠল। তার নাচ আসছিল না। মিথ্যো বলেছে সে। মাস্টারজী মিথ্যাবাদীর কান মলা দিতে বলেছেন।

দাউদ বলল— আচ্ছা। কান মলো!

সে উভয় হাতে কান মলল। ছাত্ররা হাসিতে লুটিয়ে পড়ল।

মজীদ বলল— আরে বানর! এতেই শায়েস্তা হবে না তুমি। গোলাপ সিং! তুমি ওর কান মলে দাও।

গোলাপ সিং-কে সে নতুন আরেক বিপদ মনে করল। তার ধারণা, মোহন সিং হয়ত এতক্ষণে সর্দারজীর কানে তাদের দুরবস্থার কথা জানিয়েছে। একটু পরেই হয়ত বেটাদের রামধোলাই দেয়া যাবে। হয়ত কষ্ট সীমা ছাড়ালে সে ওদের লক্ষ্য করে বলবে— আমাকে ছেড়ে দাও। সর্দারজী তার লোকজন নিয়ে তোমাদের এলাকা নাস্তানাবুদ করে দেবেন। তোমরা ভাগো।

ওদের ধারণাও কতকটা এমনটা হল। শেষ পর্যন্ত দাউদ বলল— চলো মজীদ! গ্রামের সকল লোকের সাথে আমরা পেরে উঠব না। তোমরা লড়াই করতে চাইলে তোমাদের এলাকার কাউকে পাঠাও।

www.amarboi.org

কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল— এখানে হচ্ছেটা কি ?

ছেলেরা নওকরের মদদদাতা ভেবে কেঁপে উঠল। ইনি সলীমের চাচা। সাথে তার গোলাপ সিং-এর বাবা শের সিং। হাতে লাঠি। ছেলেদের ধারণা, জালালের কাজ এটা। আফজাল ও শের সিং জঙ্গী কয়েদীর চেহারার কালির দাগ দেখে হেসে উঠল।

তারা বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বললেন— কে এ লোক ?

এ প্রশ্নের জবাবে ছেলেরা পুরো কাহিনী শুনিয়ে গেল।

আফজাল ও শের সিং কেবল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। শের সিং বললেন— চরণ সিং বড্ড কমিনা। সম্ভবত ওই এ কাজের নাটের গুরু।

আফজাল বললেন— দাঁড়াও এখানে। ওরা এখন অনেক লোক নিয়ে আসবে।

সলীম বলল— চাচাজী! ইতোপূর্বে এ বেটা দাউদ ও তার বাপকে জুতাপেটা করেছিল।

আজ দাউদ আমাদের সঙ্গ দিয়েছিল। আপনি না থামালে তো ও তার বাবাকে পুনরায় বেইয্যতী করত।

ঃ 'আমরা ওকে সিধা করব।' বলে আফজাল নওকরের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

ঃ কি বদমাশ। ছেলেদের বিরুদ্ধে লাঠি নিয়ে লড়াই করতে লজ্জাবোধ হয় না ?

ঃ 'চৌধুরীজী! জানতাম না এরা আপনাদের খান্দান।' ভাঙ্গা গলায় বলল নওকর।

ঃ দেখো বদমাশ! বাচ্চারা সবাই সমমনা। আগামীতে ওদের গায়ে হাত দিলে তোমার ভাল হবে না।

ঃ জ্বি ,আচ্ছা চৌধুরী সাব!

ঃ যাও! চেহারার যা অবস্থা। ওগুলো ধুয়ে মুছে ফেল।

নওকর জলাশয়ের কিনারায় গিয়ে বসে পড়ল। মনে মনে বলল— যাক বাবা! এ যাত্রা তো বাঁচলাম।

✪ ✪ ✪

হালকা বৃষ্টি পড়ছিল রিমঝিম। এলাকার মানুষের শোরগোল শুনে আফজাল ও শের সিং ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। বাচ্চারা নিশ্চিতে কাবাডি খেলায় মেতে উঠল। মোহন সিং-এর বাবা চরণ সিং জনাদশেক লোক নিয়ে আবির্ভূত হলেন।

চিৎকার দিয়ে গালাগাল করতে করতে তারা এগিয়ে আসছিলেন। চরণ সিং বলছিলেন— 'দেখিস! বেটারা যেন পালাতে না পারে, সবগুলোকে এক দড়িতে বাঁধবি।' এদিকে তার সাথীরা ওদেরকে মারার স্থলে তাড়াতেই পছন্দ করছিল বেশী। এলাকা থেকে বেরুনোর সময় তাদের জোশ ছিল অপরিসীম। তাদের ধারণা, হতচ্ছাড়াগুলো আগেভাগে না ভাগলে তাদের দেখামাত্রই ভেগে যাবে ; কিন্তু হায়! ওরা নির্বিঘ্নে কাবাডি খেলে যাচ্ছে। সকলের জোশ পেরেশানিতে রূপ নিল।

www.amarboi.org

চরণ সিং অনুমান করলেন, এরা তার কাটা ঘায়ে যেন লবণ নিক্ষেপ করছে। এরাই তো তার ছেলেকে মেরেছে। মেরেছে তার পোষ্য নওকরদের। তিনি কমবেশী এক হাজার একর জমির মালিক। তার সাথে রয়েছে এলাকার দশজন যুদ্ধংদেহী মানুষ। বিকট আওয়াজে ওই এলাকাটা তারা কাঁপিয়ে তুলছিল। কিন্তু ওরা কি পাথরের মূর্তি। ওই তো নিশ্চিন্তে কাবাডি খেলছে। তাও শুধু তার এলাকায় নয়, খোদ্ তারই জমিতে। ওদের নিরুদ্বিগ্ন ভাব যেন নেপথ্যে বলছে— জমির মালিক ওরাই। সিং নিজকে বড় অসহায় মনে করলেন। যে নওকর খানিক পূর্বে এদের হাতে মার খেয়েছিল সে বলছিল, ওদের লাঠির চেয়ে পাগড়ীই হচ্ছে মারাত্মক অস্ত্র। অবশ্য এখন ওরা খালি হাতে। হামলাবাজরা যত নিকটে আসছিল তাদের কথা ও কর্মে উদ্দীপ্ত ভাবখানা প্রকট হয়ে উঠছিল।

ওরা পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতেই আফজাল ও শের সিং ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। খানিক হেঁটে গেলেন দাঁড়িয়ে।

হামলাবাজরা ভূত দেখার মত চমকে উঠল। এক্ষণে ছেলেরা উঠল চিৎকার দিয়ে। আফজাল ধমক দিয়ে ছেলেদের থামালেন। চরণ সিং এ ধমককে তার স্বপক্ষীয় মনে করে কতকটা সাহস করে সামনে এলেন। বললেন— চৌধুরী আফজাল! ওরা আমার পুত্র ও নওকরদের মেরেছে।

আফজালের জবাব— তোমার ছেলে আর নওকররা ছেলেদের যদি ওই গাল দিয়ে থাকে, যা এক্ষণে তোমরা দিলে, তা হলে ওরা ভালো কাজই করেছে।

শের সিং বললেন— চরণ সিং! আমরা মনে করেছিলাম তুমি এলাকার সকল লোককে নিয়ে আসবে। তোমার চুল পেকে সাদা হলেও আক্কেলটা নেহাৎ কাঁচা। যদি মনে করে থাক তোমার ছেলে ছাড়া আর সবে বে-ওয়ারিশ ; তো তাদের গায়ে হাত রেখে দেখো!

চরণ সিং থতমত খেয়ে বললেন— শের সিং! তোমার সাথে আমার কোন বিবাদ নেই ; কিন্তু ওরা আমার বেটাকে চরম মার দিয়েছে।

শের সিং বললেন— তোমার লোককে স্রেফ দু'জনে মেরেছে। তন্মধ্যে আমার ছেলে একজন। অন্যজন আফজালের ভাতিজা। আমাদের ছেলেদেরকে আমরা গালিগালাজ শেখাই না— শেখাই কেবল গালির সাজা দেয়া। তোমার গুণধর পুত্র ওদের গালমন্দ করেছে। বিনিময়ে ওরা শাস্তি দিয়েছে। এতে তোমার প্রতিশোধমনা না হয়ে অনুতপ্তমনা হওয়া দরকার ছিল। এতে তোমার আপত্তি থাকলে এসো না! তোমরা দশজন আমরা দু'জন। তোমরা বললে আমরা লাঠি নিক্ষেপ করি ? তোমার ফৌজদের তো লড়াকু মনে হচ্ছে না।

আফজাল বললেন— চরণ সিং-এর গোস্বা বাচ্চাদের গিলে খেতে চাচ্ছে। কৈ! সলীম! মজীদ! গোলাপ! এসো না, চরণ বাবু তার রাগটা মেটাক।

ওরা তিনজন সামনে এল। চরণ সিং পেরেশানির দৃষ্টি নিয়ে কেবল তাকাল। তার সামনে এক্ষণে অন্য কেউ এলে এতক্ষণ ব্যাপার দাঁড়াত ভিন্ন ধাঁচের ; কিন্তু আফজাল ও

www.amarboi.org

শের সিং তো চরণের বাবা। শক্তি যেখানে খতম, বুদ্ধি সেখানে উদ্যত। চরণ বেচারা মুখরক্ষা করতে গিয়ে ওই প্রবাদের আশ্রয় নেন এই বলে— মোহন সিং ওদের গালমন্দ করেছে জানলে ওকে আচ্ছামত পেটাতাম।

আফজাল হাসতে হাসতে বললেন— বাচ্চারা তাদের বাবা ও নওকরদের থেকেই গালাগাল শেখে। যাও সর্দারজী! আমরা তোমার সাথে লড়তে আসিনি। এটা নিছক বাচ্চাদের ব্যাপার। কাল ওরা আবার এক হয়ে যাবে। ওদের ছেলেমীতে বড়দের শরীক হতে নেই। ছেলের কথায় লড়াই করতে এলে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করবে।

অতঃপর পরস্পর সন্ধিসুলভ কথা হল। সর্দারজী নিজ বাগানের আম খাওয়ানোর আমন্ত্রণ জানালে আফজাল ও শের সিং ওজর জানাল।

হালকা বৃষ্টি পড়ছে। ঝিলের এক প্রান্তে কে যেন চিৎকার দিয়ে গোটা জনপদ কাঁপিয়ে তুলছে। পণ্ডিত রামপ্রসাদ চিৎকার দিয়ে বলছেন— খায়েরের বাচ্চা! ওরা মূক। আরে পাপী! অবলাগুলোকে ওভাবে মারতে নেই। খায়রুদ্দীন নির্দয়ের মত তার গাধীটিকে পেটাচ্ছিল। গাধী এদিক সেদিক ছুটছিল। আর সে মনের ঝাল মেটাচ্ছিল।

জনপদবাসী অসংখ্যবার গাধার প্রতি তার এ নির্মমতা অবলোকন করেছে। কিন্তু গৃহপালিত গাধীর সাথে তার এ নিষ্ঠুরতা সকলের মনে একরাশ প্রশ্নের জন্ম দিল।

সকলেই তাই ইতর প্রাণীর প্রতি এ ইতরামির বিরুদ্ধাচরণ করল। খায়রুদ্দীন সাফাই গেয়ে বলল— সর্দারজী। চৌধুরীজী! আমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে। এ গাধীটা আমার পাগড়ী গিলে ফেলেছে। আমার সাত হাত পাগড়ী। খোদার গযবই বলতে হয়। বিলকুল নয়া পাগড়ী। বিহারী লালকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। গত মাসেই তার থেকে খরীদ করেছিলাম। পাগড়ী গেছে তাতে ক্ষোভ নেই ; কিন্তু কোণে তাবিজ বাঁধা ছিল। সেটাতো দুষ্প্রাপ্য। ওটি সংগ্রহ করতে পীর বেলায়েত শাহকে পাঁচটি টাকা দিতে হয়েছে নযরানা।

আফজাল বললেন— আরে! দেমাগ খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার। গাধী কি করে পাগড়ী গলাধঃকরণ করে ?

সে বলল— চৌধুরী সাহেব! কসম খোদার! গাধীটা অতি অবশ্যই আমার পাগড়ী খেয়ে ফেলেছে। কাপড় ছেড়ে গোসল করছিলাম। গাধী ছাড়া এখানে অন্য কেউই আসেনি।

চরণ সিং বললেন— আরে! পানিতে ডুবে গেছে কিনা দেখ না।

ঃ সর্দারজী! আমি খোঁজ না নিয়েই কি পেটাচ্ছি ?

আফজাল বললেন— তবে হয়তো অন্য কোথাও রয়ে গেছে। যাও বাড়ী গিয়ে দেখো।

ঃ জি, আমি তাও দেখেছি। আশ-পাশের ক্ষেতখামারেও দেখেছি। তখন অবশ্য মন বলছিল, এটা পানিতেই ডুবেছে। তাই পুনরায় পানিতে তালাশ করতে নামলে দেখি ওই গাধীটা আমার চাদর চিবুচ্ছে। বলে সে 'কামড়ানো' চাদরের এক কোণ উঠিয়ে দেখাল। বলল— আমি তৎক্ষণাৎ এসে ওটা উদ্ধার না করলে এতক্ষণে হয়ত ওটাও ওর পেটে চলে যেত।

www.amarboi.org

খায়রুদ্দীনের পাগড়ী বগলদাবা করে সলীম এক পাশে দাঁড়ানো। সে মজীদের কানে কি যেন বলল। মজীদ দাউদের সাথে কানাকানি করল। সলীম পাগড়ীটা তাড়াতাড়ি আস্তিনে লুকাল এবং অতি সন্তর্পণে জলাশয়ের এক কোণে রেখে দিল।

স্কুলের ছাত্ররা কানাকানি করে হাসি লুকাতে চেষ্টা করছিল। আচানক খায়রুদ্দীনের গ্রামের একজন বলে উঠল— আরে ওটা কি দেখতো!

ঃ 'আরে খায়েরের বাচ্চা চোখে ঠুলি দাওনি তো।' অন্য একজন পাগড়ী তুলে নিয়ে একথা বলল।

কাদামাটি খায়েরের পাগড়ীকে অন্য রঙ বানিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য তাতে তার তাবিয বাঁধা দেখে সান্ত্বনা মিলল। বলল— হ্যাঁ! এটাই আমার। এতদ্‌সত্ত্বেও সে কসম খেল— 'ইতোপূর্বে এ পাগড়ী এখানে ছিল না।' পণ্ডিত রাম প্রসাদ যিনি ঘটনা আগাগোড়া দেখেছেন হেসে চলে গেলেন।

বৃষ্টির প্রবল ঝাপটা কৌতূহলী মানুষকে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দিতে বাধ সাধল। যখন সকলে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলছে তখন সলীম ওর বাবার কানে কানে বলল— বাবা! ইনি দাউদের ওপর নাখোশ মনে হচ্ছে।

ঃ 'বেটা! তুমি সে চিন্তা করো না।' বলে চরণ সিং-এর হাত ধরে নিরিবিলি স্থানে দীর্ঘ আলাপে কাটানোর পর ফিরে এলেন।

আফজাল ও শের সিং বাচ্চাদের নিয়ে এলাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে দাউদও তাদের পিছু নেয় কতদূর যাওয়ার পর আফজাল বলেন— দাউদ! নিশ্চিত মনে বাড়ী যাও। তোমার কথা তার কানে দিয়েছি। এতদসত্ত্বেও কিছু বললে আমাকে বলো কেমন।

পরদিন। মোহন সিং -এর ব্যবহার সকলের কাছে কেমন অপ্রত্যাশিত মনে হল। গতকালের ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে খোঁচা মারা হয়— কিন্তু নিশ্চুপ সে। ওর প্রতিবেশী বাল্যসাথীরা বলেছে— বাড়ী গিয়ে বাবা ওকে বকাঝকা দিয়েছেন।

আফজাল ও শের সিং-এর সামনে চরণ সিং-এর দুর্বলতা খামাখাই নয়। এলাকায় কেউই তাদের সামনে উচ্চবাচ্য করার সাহস পেত না। তাদের দোস্তি ও বাহাদুরীর কথা দূর-সুদূরের গঞ্জ ও জনপদে প্রচারিত। উভয়েই ছ'ফুটের মত উঁচু এবং সুন্দর সুঠাম সুপুরুষ। কুস্তি, পোলো ও ঘোড়দৌড়ে ছিল তাদের অকৃত্রিম শখ।

ভাইদের মধ্যে আফজাল কনিষ্ঠ। বড় ভাই আলী আকবর তহশিলদার হলে ছোট ভাইটির খাতিরে দু'নওকর রেখে দেন। জমি-জোত দেখভালের চাপ অনেকাংশেই তার ওপর থেকে লাঘব হয়েছিল।

শের সিং ভাইদের মধ্যে বড়। ছোট ভাইয়েরা তাকে কোন কাজে হাত দিতে দিত না।

আফজালের শিক্ষাদীক্ষা প্রাইমারী পর্যন্ত। হাই স্কুলের বারান্দা মাড়ানোর সুযোগ হয়নি। শের সিং অবশ্য ক্লাস টু পাশ। সে 'অ-তে অজগর' 'ব-তে বকরী' আর 'ত-তে তাল' ছাড়া সবই ভুলে বসেছিল। তারা উভয়েই হিরু ওয়ারিছের বিখ্যাত পুঁথির শ্লোক মুখস্থ করেছিল। শের সিং কথায় কথায় ওই পুঁথির শ্লোক গাইত।

www.amarboi.org

এতদঞ্চলের গ্রামীণ মেলা আফজাল ও শের সিং ছাড়া জমত না। ওরা মেলায় যেত। কুস্তি লড়ত, কাবাডি খেলত, প্রয়োজনে তাদের আসরও জমাত। গ্রামীণ মেলা কখনও বা ঝগড়া-বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। খ্যাতনামা কুস্তিগীর ও মল্লযোদ্ধারা শক্তি প্রদর্শনের জন্য এখানে আসত। একজন মদ গিলে লাঠি উঁচিয়ে বলত— অমুক কোঠায় ? অপর পক্ষ থেকে এ চ্যালেঞ্জের জবাব মিলত। অতঃপর উভয় গ্রুপ অগ্রসর হত। লাঠির ঠন্ঠন্ শব্দ শোনা যেত। মাথা ফাটত। ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছুটত। দোকানীর শাটার ভাংত। দুর্বল মানুষ পদতলে পিষ্ট হত। একদল নেতাসহ পলায়ন করত। অপর দল এদের পশ্চাদ্ধাবন করত। পরিস্থিতি শান্ত হলেই তবে পুলিশ আসত। খামাখাই ক'জনকে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে বাহাদুরি ফলাত। কিন্তু আফজালের মেলায় আসা অবধি এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বেশ ভাটা লক্ষ্য করা যায়। লড়াকুদের মাঝে ওরা দু'বন্ধু ঝাঁপিয়ে পড়ত। ওদের এ প্রতিরোধ কাজে না আসলে লাঠি ওঠাত। কাবাডি খেলার দর্শক ও খেলোয়াড়রা ওদের সঙ্গ দিত।

শের সিং ও আফজালের বন্ধুত্ব ওদের প্রাচীন হিংসা-বিদ্বেষের যবনিকাপাত করেছিল। তবে ওদের হৃদ্যতার গোড়ার দিকটা যেমন ছিল অপূর্ব তেমনি ছিল কৌতূহলপূর্ণ।

✪ ✪ ✪

এলাকায় একটা জনশ্রুতি ছিল যে, আফজালের ঘোড়া খুবই দ্রুত ছুটতে পারে। শের সিং-এর কাছে একটি ঘোড়া ছিল। একদিন শের সিং ভাইদের সাথে ক্ষেতে ঘাস কাটছিল সে সময় আফজাল ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। শের সিং কাস্তে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন এক নিমিষে। তার ভাইও তাকে করল অনুসরণ। শের সিং -এর বাবা অন্দর সিং বললেন— কি দেখছ শের সিং! কেন, তুমি ঘোড়া দেখনি কোনদিনও ?

শের সিং বললেন— বাপু! ঘোড়াটি সত্যিই অনন্য।

ঃ আফজাল কিন্তু ওটার ওপর বিরক্ত। নিছক তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই ওকে তেয করেছে। বললেন অন্দর সিং।

ঃ বাপু একদিন আমি ঘোড়াপৃষ্ঠে শহরাভিমুখী হচ্ছিলাম। আফজাল তার ঘোড়া নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়। সে আমার দিকে তাকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসছিল।'

অন্দর সিং কাস্তে যমীনে ছুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। চাদর কাঁধে উঠিয়ে বললেন— শের সিং! আফজালের ভাই তহশিলদার হয়েছে তাতে কি! আমি তোমাকে অমন দশটি ঘোড়া কিনে দেব। আজই আমি টাকা যোগাড় করছি হ্যাঁ!'

এর চারদিন পর।

অন্দর সিং পুত্রের জন্য এক নয়া ঘোড়া খরিদ করে আনেন।

এলাকায় পূর্বেই ছড়িয়ে পড়ছিল, অন্দর সিং পুত্রের জন্য ঘোড়া কিনতে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য ওই ঘোড়া আফজালের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে। জনপদের বাইরে খোলা

www.amarboi.org

মাঠে এ ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা স্থির হল। শের সিং ও তার বাবা-ভায়েরা বড় আশা নিয়ে ময়দানে এলেন। জনপদের অভিজ্ঞ লোকজন বিশেষত চৌধুরীর রমযান আলী শের সিং-এর পিঠ চাপড়ে বললেন, তোমার ঘোড়া আরবী বংশোদ্ভূত। কাজেই প্রতিযোগিতায় তুমি আফজালের ঘোড়াকে পেছনে ফেলতে পারবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরু হলে দর্শকদের শোরগোলের কারণে শের সিংয়ের ঘোড়া সামনে না দৌড়ে পশ্চাৎ দিকে দৌড়াতে শুরু করে। শের সিং ছড়ি মারলে ওটি লম্ফন-কূর্দন করে। দর্শক এতে কেবল হাসল। শের সিং পরপর তিনটি ছড়ি পিটিয়ে ভাংল। ঘোড়া শুরু করল তার মজ্জাগত দাম্ভিকতা।

কিন্তু ততক্ষণে আফজাল একাকী আধা মাইল দৌড়ে ফিরে এসে বলল— প্রকৃত কথা হল দর্শকদের শোরগোলে ঘোড়াটি তোমার ঘাবড়ে গেছে।

চৌধুরী রমযান আলী হুক্কার নলিচা উঠিয়ে বললেন— আফজাল ঠিকই বলেছে। নয়ত তার ঘোড়াটি আরবী। শের বাবাজি! ওকে গোটাদুয়েক থাপ্পড় দিয়ে ঠাণ্ডা কর। আফজাল, তুমিও তোমার ঘোড়াটিকে ততক্ষণে তাজা দম করে নাও। পরে হবে প্রতিযোগিতা। ঘোড়ার থেকে এক লাফে নেমে ওর চুলে হাত বুলায় আফজাল। চৌধুরী রমযান আলী হুক্কা টানতে টানতে শের সিংকে নির্দেশনা দেন। বলেন— দেখো শের সিং! ছুটন্ত অবস্থায় ওর লাগামটা ঢিল দিও। না ছোটা পর্যন্ত ছড়ি মারবে না। এক্ষণে ওর গর্দানে হাত বুলাও। আরবী ঘোড়ার গোস্বা অন্য ঘোড়া অপেক্ষা তুলনামূলক বেশি।

চৌধুরী রমযান আলী অগ্রসর হয়ে ঘোড়াটির পিঠে স্নেহ পরশ বুলাতে উদ্যত হতেই ওটি পিছনের দু'পা দিয়ে এমন জোরে চাটি মারল যাতে তার হুক্কা ১০/১৫ গজ দূরে ছিটকে পড়ল। অসহায় রমযানের দর্শকদের তিক্ত হাসি হজম করা ছাড়া সে সময় আর কি-ইবা করার থাকল।

আফজালের বড় ভাই ইসমাঈল হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। বললেন— কি চৌধুরী সাব! ঘোড়াটা না আরবী বংশোদ্ভূত?

শের সিং-এর বাবার সহ্যশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। ক্ষোভে-দুঃখে তিনি একটা লাঠি দ্বারা ঘোড়ার গোড়ালিতে আঘাত করেন। ঘোড়াটি আচমকা আঘাতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে লম্ফন-কূর্দন ও চিৎকার করতে করতে এলোপাতাড়ি ছুটতে লাগল। আফজাল চোখের পলকে দ্রুত নিজ ঘোড়ার পিঠে চাপলেন। প্রায় তিন শো' গজ দৌড়ানোর পর আফজাল ওটির কাছে এসে পৌঁছল। ঘোড়াটি ঊর্ধ্বে পেছনের দু'পা উঠিয়ে চাটি হানল। আফজাল বিপদ দেখে নিজ ঘোড়ার গতিপথ ঘোরালেন; কিন্তু দাম্ভিক ঘোড়া চাটি দিয়ে চলছে। কার সাধ্যি থামায় তাকে।

অন্দর সিং গোস্বাভরে ওর দিকে অগ্রসর হলে ইসমাঈল তাকে নিবৃত্ত করে বলেন— জ্যাঠামশাই। যেতে দিন ওকে। আপনার ঘোড়াটি বড় দাম্ভিক। আফজাল ওকে ঠিক করবে। অন্দর সিং বায়ু ছাড়িয়ে বললেন— আফজাল ঘোড়া চালনা জানলে শের সিং জানবে না কেন?

www.amarboi.org

আমার পুত্রকে তো কেবল গাধা চালনা শেখাইনি! আমি ওকে নতুন পোষমানা আরেকটা ঘোড়া কিনে দেব। দেখি কে ওর সাথে প্রতিযোগিতায় টেকে। ইসমাঈল বললেন— কিন্তু আরবী ঘোড়া খরিদ করেন না যেন!

অন্দর সিং পরদিন ঘোড়াটি বিক্রি করে জমি বন্ধক দিয়ে আরেকটি ঘোড়া খরিদ করার মানসে রওয়ানা হলেন।

পনের দিন পর।

একটি খুবছুরত বাদামী রঙের ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলেন। এজন্যে তাকে আরো তিনশোটি টাকা গুনতে হয়েছে। এলাকার পৌছেই চৌধুরী রমযান আলীর মাধ্যমে চৌধুরী রহমত আলীর কাছে বার্তা পাঠান— চারদিন পর আবার দৌড় হবে। হিম্মত থাকলে ওকে রেসকোর্সে হাজির হতে বল।

চতুর্থ দিন। আসমানে মেঘ-বাদলের আনাগোনা। ঘোড়দৌড় দেখার জন্য দূর-সুদূরের জনপদ থেকে অসংখ্য মানুষ হাজির। প্রতিযোগিতার পূর্বক্ষণে অন্দর সিং বললেন— চৌধুরী রহমত! খালি ঘোড়দৌড়ে লাভ কি। বাজি বাধ না একটা!

রহমত আলী জবাব দেন— আমাদের দু'জনার চুলই পেকে সাদা। অন্দর সিং! বাজী ধরা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি ?

ঃ ব্যাস! পুঁটি পরানে চৌধুরী এতটুকুতে ঘাবড়ে গেলেন ?

ইসমাঈল বললেন— বাজি ধরার শখ থাকলে শেরসিংকেই বল না, আফজালের সাথে যা ইচ্ছে ধরুক তাই।

অন্দর বললেন— শের সিং! আফজালের সাথে পাগড়ীর বাজি ধরো!

আফজাল বললেন— তোমরা এখানেই থাকো। আমি শের সিং-এর পাগড়ীর বদলে আমার ঘোড়ার বাজি রাখছি।

অন্দর সিং বললেন— হেরে গেলে ?

ঃ হেরে গেলে ঘোড়া তোমার।

ঃ বাবার কাছে জিজ্ঞেস করেছ তো।

ঃ আমার কাছে জিজ্ঞাসা করার কি দরকার ? ঘোড়া আফজালের। ওর ভাই ওকে কিনে দিয়েছে ওটা। হেরে গেলে আরেকটা না হয় কিনে দেবে।' বললেন রহমত আলী।

ঘোড়দৌড় শুরু হল। সওয়ারদের একমাইল দূরবর্তী তেঁতুল গাছ থেকে আবারো ফিরে আসার কথা। এলাকার বিজ্ঞ ক'জন ময়দানের অপর প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। ওই গাছ পর্যন্ত দৌড়ে শের সিং-এর পাল্লা ভারী ছিল। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পালায় আফজাল ওকে ধরে ফেললেন। চৌধুরী রমযান আলী বরাবরই বলে আসছেন, শের সিং জিতবে। কর্মকার হরি সিং ও কাকু খ্রিস্টানও তাদের স্ব-স্ব পাগড়ীর বাজী ধরেছিলেন। কাকুর কথা হচ্ছে, আফজাল জিতবে। হরিসিং-এর কথা শের সিং।

প্রথম দৌড়ে শের সিং অগ্রসর থাকলে হরি সিং চিৎকার দিয়ে বললেন— আরে কাকুর বাচ্চা! কৈ তোমার পাগড়ী ? কাকু তাড়াতাড়ি তার পাগড়ী দিয়ে দিলেন।

www.amarboi.org

কিন্তু ফেরার পথে আফজাল অগ্রসর হয়ে গেলে কাকু বললেন— কৈ হরি সিং! পাগড়ী মাথা থেকে খুলছ না যে ?

হরি বললেন— আরে এখনো পাঁচ-ছটা ক্ষেত বাকী। শের সিং কি আর দমে যাওয়ার পাত্র?

ঃ তুমি দৌড় খতম হবার আগেভাগেই আমার পাগড়ী নিয়েছিলে। কাজেই এখন পাগড়ী দাও। অন্যথায় আমিই খুলে নেব।

কাকু হরি সিং-এর জবাবের তোয়াক্কা না করে নিজের পাগড়ী ছিনিয়ে অতঃপর তারটা খুলে নিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে হরি সিং সর্বদাই কাকুর দৈহিক শক্তির সামনে পরাভূত হয়ে আসছেন।

দৌড় খতম হবার পূর্বে শের সিং-এর চেয়ে অগ্রগামী থাকল আফজাল। অন্দর সিং গোস্বা ও লজ্জায় উঠে বাড়ীর পথ ধরলেন। শের সিং-এর মাথা নিম্নমুখী। আফজালের কাছে এসে ঘোড়ার জিন কষে মাথার পাগড়ী খুলে ওর দিকে ছুঁড়ে মারলেন শের সিং। কিন্তু আফজাল বললেন— শের সিং! ওটা তোমার মাথায়ই থাক। কারো মাথায় পাগড়ী খুলে নেয়া বীরত্বের পরিচয় নয়।

চৌধুরী রহমত আলী বললেন— ঠিক আছে বেটা। তোমার পাগড়ী খুলো না। তোমার বাবাইতো বাজী ধরতে বাধ্য করলেন। যদিও এতে তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেননি।

এ কথার পরও শের সিং পাগড়ী খুলে ওর দিক ছুঁড়ে ঘোড়ার পদাঘাত করেন।

ইসমাঈল চৌধুরী রমজান আলীর কাছে এসে তার হুক্কার চিলম ধরে মাটিতে রাখলেন। বললেন— চৌধুরী রমযান! মনে মনে আমিও একটা বাজি ধরেছিলাম। শের সিং জিতলে তোমার হুক্কাটাই ভেঙ্গে ফেলব। আর আফজাল জিতলে কেবল তোমার চিলমটাই।

শোকর খোদার! তুমি বিপুল ক্ষতি থেকে বেঁচে গেছ।

রমযান চিৎকার দেন— আরে! অমনটা করো না। ওটি কালই কিনেছি। তিনি অগ্রসর হয়ে চিলম ছিনিয়ে নিতে চাইলেন, কিন্তু ইসমাঈলের লাঠি তার কাজ সেরেছে। হরি সিং কর্মকার এ প্রতিযোগিতায় বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। কাকু বিজয়োল্লাসে সবাইকে পাগড়ী দেখাতে লাগলেন। ব্যাপারটা কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হত, এক সময় সেটা নারী সমাজেও ছড়িয়ে পড়ল। হরি সিং এও জানতেন— কাকু ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও লেলিয়ে দেবেন। এ কাকু বড় খতরনাক চিজ্। হরি সিং তার পাম্প-ভাটার কাছ থেকে কাকুকে অতিবাহিত হতে দেখলে কুকুর লেলিয়ে দিতেন। বলতেন— কাকু! কাকু। কাকু! আতুত!

হরি সিং-এর বাবার নাম সন্তু। কাকু একটা মেষ পালতেন। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি ওই মেষের নাম রাখেন সন্তু। হরি সিং তার সামনে থেকে অতিবাহিত হলে বলতেন— সন্তু! সন্তু! সন্তু! তুমি মরো।' আর তিনি সন্তুকে এমন গাল দিতেন যা হরি সিং সহ্য করতে পারত না।

www.amarboi.org

হরি সিং কাকুর বাড়ীর ছায়া মাড়ানও ছেড়ে দেন ; কিন্তু কাকু তার পিছ ছাড়তে নারাজ। তিনি কোন না কোন অজুহাতে কামারের ভাটার কাছ থেকে মেষের দড়ি ধরে অতিবাহিত হতেন এবং নিত্যনতুন অশ্রাব্য গাল দিতেন।

এলাকার ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরে বলত— কাকু! সন্তুকে আজ কোথা নিয়ে যাচ্ছ ?

জবাবে তিনি বলতেন— কামার পাড়ায়।' দূর থেকে হরি সিং দাঁত কামড়াতেন।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হরি সিং ঘর থেকে কুত্তা বের করে দেন। কাকুও তার মেষের নাম পরিবর্তন করেন।

✪ ✪ ✪

ঘোড়দৌড়ের কিছুদিন পর হরি সিং লাঙ্গলের ফাল তৈরী করছিলেন। শের সিং তার নিকটে বসা। আফজাল এসে তাকে বললেন— হরি সিং! গতকাল আমার ঘোড়ার শেকলের চাবি তালার মধ্যেই থেকে গিয়েছিল। হয়তো কোন দুষ্ট ছেলে তা তুলে নিয়েছে। আমি তোমায় শেকল দিয়ে যাচ্ছি। নতুন চাবি বানিয়ে দিতে হবে একটা।

ঃ তা বানিয়ে দেব বৈকি। কিন্তু চাবিটা সযত্নে রেখ। অসৎ লোকের পাল্লায় পড়ে ঘোড়াটা না আবার খুইয়ে বস। গত পরশু দিন সর্দার চরন সিং-এর ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে। পায়ে শেকল ছিল, তারপরও চোরে চাবি দিয়ে তা খুলে নিয়েছে।

ঃ ওই শেকলের তালা বোধহয় খুব একটা ভালো ছিল না। আমার মতে, শহরে গিয়ে মজবুত একটা তালা নিয়ে এস। সে যা হোক তালার চাবি বানাও এক্ষণে দ্রুত। আফজাল চলে গেলেন। খানিক বাদে কাকু ওখানে এলেন। হরি সিং থেকে বাজিতে জেতা পাগড়ী তার মাথায়।

হরি সিং শের সিংকে বললেন— শুনেছি আফজাল তোমার পাগড়ী ফেরত পাঠিয়েছে। কিন্তু এ কাকু বজ্জাতের শিরোমণি। আমার পাগড়ী মানুষকে দেখাতে তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন।

শের সিং খানিক ভাবার পর বললেন— হরি সিং! তুমি বিশ টাকা কামাতে চাইলে আমার সাথে একটা সওদা করো।'

বিশ টাকা কামানোর কথা শুনে হরি সিং-এর হাতুড়ি থমকে গেল। তিনি বললেন— তুমি আমার গাভী খরিদ করতে চাইলে ত্রিশ টাকার একখানা কড়িরও কমে পাবে না।

ঃ না, না। বিশ টাকা এমন এক জিনিষের বিনিময়ে দেব যার মূল্য তোমার কাছে দু'পয়সাও নয়।

ঃ ঠাট্টা করছ বুঝি ?

ঃ তা করব কেন!

ঃ বলো না, কি সে কাজ ?

ঃ আগে দোহাই দাও, কাউকে তা বলবে না!

www.amarboi.org

ঃ আমি বাবার দোহাই পড়ছি।

ঃ না, ওতে হবে না। গৌরের নামে দোহাই দাও।

হরি সিং দু'পয়সার জিনিষ বিশ টাকায় বিক্রির সুবাদে দোহাই দিলেন। শের সিং বললেন— আফজালের শেকলের আরেকটা চাবি আমাকে বানিয়ে দিতে হবে।

হরি সিং-এর মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন— তুমি ----?'

ঃ হ্যাঁ! আমি ওর ঘোড়া সাগর পার করে দিতে চাই।

ঃ কিন্তু তুমি ধরা খেলে ফেঁসে যাব যে আমিও!

ঃ দোহাই গিরিথরের। ধরা খেলে তোমার নাম প্রকাশ করব না কারো কাছেই।

হরি সিং মনকে কোনক্রমে শক্ত করে নিলেন। অবশ্য বললেন— তুমি ঘোড়া নিয়ে কোথাও গেলে জনপদে না গেলে অবশ্যই আফজালের সন্দেহে পড়বে।

ঃ সে চিন্তা তুমি নাইবা করলে। আমার কাজ তার ঘোড়া হাবেলীর বাইরে বের করা। ওটা নিয়ে যাওয়ার আলাদা লোক থাকবে।

ঃ আচ্ছা। এখন তাহলে যেতে পার। আমার কাছে তোমাকে দেখলে ওরা সন্দেহ করবে। লাঙ্গলের ফালির সাথে চাবিও বানিয়ে রাখব।

ঃ কিন্তু চাবি স্রেফ আমাকেই দেবে। বাবা যেন ওকথা ঘূর্ণাক্ষরেও না জানেন।

ঃ টাকা ?

ঃ 'যেদিন ঘোড়া হাবেলীর বাইরে বের হবে সেদিন।' বলে শের সিং উঠে দাঁড়ালেন।

✪ ✪ ✪

গভীর রাত।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দেউড়ী টপকে হাবেলীর মধ্যে প্রবেশ করল শের সিং। অতি সন্তর্পণে চাবির গোছা পকেট থেকে বের করলেন। শেকলের কড়া টুং টাং করে উঠল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিজলীর চমকে দেখলেন ছিটকানিতে তালাই নেই।

দিনদুয়েক পূর্বে আরও একবার এসেছিল সে। তখন অবশ্য তালা লাগানো ছিল। আজ তালা না দেখে কার্যোদ্ধার হবে ভেবে সে মহাখুশী। হরি সিং কামার ও অমর সিং ডাকু তাকে পনের-বিশটা ডুপ্লিকেট চাবির ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু কড়ায় তালা নাই। তার ধারণা, বাড়ীর লোকজন হয়তো তালা লাগাতে ভুলে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে ছিটকানি খুলে দেয়। দরজা ওভাবে বন্ধ রাখল। চলার গতি শিকারী বিড়ালের মত ধীর। উদ্দেশ্য পশুশালা। বিদ্যুৎ চমকে হাবেলীর অপর প্রান্তে নাকডাকা লোক তার দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। ভাগ্যিস, বৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম ধারায়। এ বৃষ্টিতে এ পাশের সব কিছু নিয়ে যাওয়া হলেও সে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও শুরু হল মনে ধুকধুকানি। খানিক ইতস্তত অবস্থায় পশুশালায় দাঁড়িয়ে রইল। লাঠি রাখল দরোজায়। পকেট হাতড়ে শেকলের চাবি বের করল। চাবির বড় গোছা থেকে একটা তাতে ঢোকাল।

www.amarboi.org

আচানক বিদ্যুতের চমকে সে এদিক সেদিক তাকিয়ে কাজে লেগে গেল। ঘোড়ার গলার ঘন্টা খুলে এবার পায়ের শেকল খুলতে লেগে যায়। অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল তালা। তার মনের ধুকধুকানি বাড়ছে দ্রুত। কাঁপছে হাত। বৃষ্টির দরুন পরিবেশ বেশ থমথমে। অবশ্য সে ঘামছে বেশ। কম্পিত হাত তার এক সময় তালায় লাগল। খুলে গেল তালা। ঘোড়ার পা থেকে শেকল খোলার স্বার্থে ঘন্টা একপাশে রাখলেন। ঘুমন্ত ঘোড়া সজাগ হয়ে ঘাড় কাত করল। গলার শেকল 'খুর খুর' করে উঠল।

শের সিং ঘোড়ার গলদেশের শেকল বগলে চাপাল ; পিঠ চাপড়ে পায়ের শেকল খুলতে ব্যাপৃত হয়। তালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাতে থাকে। আচানক পাশে কোথায় হাল্কা পদধ্বনি শোনা যায়। দ্রুত সে উঠে দাঁড়াতে কোশেশ করে। তার চাদরের এক কোণ ততক্ষণে ঘোড়ার পায়ের তলে চলে গিয়েছে। ঝুঁকে চাদর সরাতে গেলে অদৃশ্য একখানা হাত তার গর্দান স্পর্শ করে। অপর একখানা হাত পেঁচিয়ে ধরে বাযু। শের সিংয়ের রক্ত জমে বরফ। হতাশা চাপা দেয়ার কোন প্রচেষ্টাই সে বাকী রাখল না। তার ধারণা, লৌহমুষ্টির এ থাবা থেকে তার বেঁচে যাওয়া অসম্ভব। আরো ধারণা হয়, লৌহমুষ্টিধারী আফজাল-ই হবে হয়ত বা। ওই দু'হাত এক সময় গর্দান ছেড়ে কব্জি পেঁচিয়ে ধরে।

শের সিং-এর অবস্থা তখন খুবই করুণ। অদৃশ্য থাবা এক সময় তার কোমর পেঁচিয়ে ধরে উপরে পুরো শরীরটাই উঁচিয়ে ধরে এবং ঘাসের গাদায় ছুঁড়ে মারে। শের সিং প্রতিঘাত করার পূর্বেই অদৃশ্য লোকটা তার বুকে চেপে বসে। অন্ধকারে ভেসে এলো গম্ভীর কণ্ঠ—

'দু'রাত ধরে তোমার অপেক্ষা করছি। মুক্তি নেই তোমার'— কণ্ঠটা আফজালের। গোস্বা ও প্রতিশোধের চেয়ে ওই কণ্ঠে আস্থার রেশ ছিল তুলনামূলক বেশি।

শের সিং জীবনে প্রথম বড়দের একটি প্রবাদের সত্যতা উপলব্ধি করল যে, চোরেরা চিরকালই ভীরু। আফজালের কাছে তার পজিশন এক চোর না হলে এ পরিস্থিতি আর কিইবা হতে পারে। তার প্রতিরোধ শক্তি যেন দেয়ালের ওপাশে রেখে এসেছে। আফজাল দু'রাত ধরে অপেক্ষা করে থাকলে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সে পুরো করে ফেলেছে। সুতরাং তার কর্মকাণ্ড সবই বৃথা। আফজাল বলল— পলায়নের চেষ্টা করলে দেখবে আমার হাত কতটা বে-রহম। তার আগে তোমাকে আমার আবিষ্কার করতে হবে। বলো, কে তুমি ?

শের সিং খামোশ। পাগড়ী খুলে আফজাল শের সিংয়ের পা আর দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বাঁধল। কাজ শেষ করে ঘোড়ার দিকে মনোনিবেশ করল। ঝুঁকে ঘোড়ার পায়ের বন্ধন দেখে বলল— ওহ্ হো! তোমার কাজ তাহলে শেষ করে ফেলেছ ইতোমধ্যে। যাক বাবা! এ শেকল এক্ষণে তোমার কাজে আসবে।

ঘোড়ার শেকল খুলে তা দিয়ে শের সিংয়ের পা বাঁধা হল। শুইয়ে দেয়া হল খোড়লির মধ্যে। আফজাল বলল— দেখো! চেঁচিয়ে ঘরের সকলকে জাগিয়ে তোলার মত কষ্টদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাই না। চুপচাপ বসে থাক্। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। কোন গ্রাম তোমাদের ? আর কে কে তোমার সাথে এসেছে ?

www.amarboi.org

শের সিং নিশ্চুপ।

আফজাল ফের বলল— আমার যদ্দুর বিশ্বাস, এ পর্যন্ত একাকী পৌছনি তুমি। আমাদের এলাকার কেউ পথ দেখিয়েছে তোমায় নিশ্চয়ই। তোমাকে রেহাই দিতে পারি, কিন্তু ওই বদমাশকে ছাড়ব না কিছুতেই। সে বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকলে আমায় বল!

নিশ্চুপ এ প্রশ্নের জবাবেও শের সিং।

বাইরে বিজলী চমকাল। খিড়কি পথে আসা সে চমকে হালকাভাবে চোরের মুখে দৃষ্টি পড়ল আফজালের। চিৎকার দিল সে— শের সিং, তুমি!

চোর এবারেও খামোশ। আফজাল বাইরে এল, এবার তার হাতে লণ্ঠন। খামোশ সে শের সিং-এর মুখে তাকিয়ে। নিকৃষ্ট সাজার উপযুক্ত করে রেখেছিল ; কিন্তু আফজালের নির্লিপ্ততা তাকে ভাবিয়ে তুলল। শেষ পর্যন্ত আফজাল বলল— তাহলে গত পরশুও তুমি দেয়াল টপকে আমাদের অন্দরে ঢুকেছিলে। মাটিতে তোমার পায়ের ছাপ আমার চোখ না এড়ালে হয়ত তোমার মিশন কামিয়াব হত। ওদিন সম্ভবত দেউড়ীর ছিটকিনিতে তালা ঝোলা না থাকলে তুমি কার্যসিদ্ধি করে ফেলতে। গত রাতে আমি ইচ্ছে করেই তালা খুলে রেখেছিলাম ; কিন্তু কাল আসনি তুমি। আমার ধারণা হয়েছিল, সম্ভবত চোর আজ রাতে আচ্ছা করে ঘুমিয়ে কাল আসবে আবারও।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, আজ তুমি আসবে অবশ্যই। আফসোস। ময়দানে তোমার ঘোড়া দম ফেল করেছিল ; কিন্তু সে প্রতিশোধ আমার ঘোড়ার ওপর দিয়ে নেয়ায় তো কোন বাহাদুরি দেখছি না। তোমার চেহারা চোরের চেহারা নয়। আজ তুমি কামিয়াব হলে কাল অন্যের দরোজায় হানা দিতে। পরে ডাকাতি, সবশেষে করতে কাউকে খুন। হয়ত পরবর্তীতে দুনিয়াবাসী তোমার গলে ফাঁসির দড়ি দেখত। শের সিং! তোমার বাবা আমাদের দুশমন। যদিও তিনি বাহাদুর। আর কোন বাহাদুর একথা শোনতে পছন্দ করবেন না যে, তার গুণধর পুত্রটি চোর।

কথাগুলো মধুশ্রাবী হলেও বিষাক্ত খঞ্জর হয়ে তা শের সিংয়ের বুকে বিধল। সে বলল— আফজাল! যত খুশী বলে নাও। দরোজার পাশে আমার লাঠি পড়ে আছে। উঠিয়ে নাও ওটা। পিটিয়ে আমায় মেরে ফেললেও পুলিশ তোমায় গ্রেফতার করবে না। আমি চোর। লাঠি ওঠানোর শক্তি তোমার না থাকলে আমার লোকজনকে ডেকে দেই। তোমার আওয়াজ শুনলে এলাকাবাসী জেগে উঠবে। বাবা, আমাকে এ অবস্থায় দেখলে মনে করবেন তাঁর মুখে চুনকালি দিয়েছি আমি। কাজেই আমাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেবেন তিনি।

ঃ আস্তে কথা বল। কাচারীতে আমার ভাই ঘুমুচ্ছে। নওকরও ওখানে।

ঃ ওহ্। তাই বুঝি আমায় ভয়ে ভয়ে মারবে। ওদের না ডাকলে আমি না হয় ডেকে দেব।

ঃ শের সিং! তুমি আমার হাতের শক্তি অনুধাবন করেছ নিশ্চয়ই। আস্তে তোমার টুঁটি চিপে মেরে ফেলতে পারি। আমার মর্জির বিরুদ্ধে তোমার ঠোঁট থেকে একটা আওয়াজও বেরুতে পারে না।

www.amarboi.org

আফজালের এ জলদগম্ভীর সুরে শের সিং-এর গোটা শরীর ঝটকা মেরে উঠল।

দু'জনেই নির্বাক। একে অপরের মুখ পানে তাকিয়ে। আফজাল নিরবতা ভঙ্গ করে সহসাই বের হয়ে গেল। পরে আবার ফিরে এল। হাতে ঘোড়ার লাগাম ও জিন। ঘোড়ার লাগাম ও জিন কষে বলল— শের সিং! তুমি কাউকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে দেখনি। দেখিনি আমিও। কিন্তু ভাইয়ার সাথে গিয়ে দেলাওয়ার ডাকাতের লাশ দেখেছি। ফাঁসির পর তার মুখ থেকে বিঘত খানেক জিহ্বা বেরিয়ে এসেছিল। চোখও বেরিয়ে পড়েছিল। আর তাঁর গর্দান। সে কথা আর কি বলব। জীবনে আমি প্রথম ভয়ে আঁতকে উঠি। কথিত আছে, চুরির অপরাধে এক বছর জেল হয়েছিল তার। ছাড়া পেয়ে তার সাহস বেড়ে যায়। পরপর দু'জনকে হত্যা করে বসে। পরিণতিতে ফাঁসির মঞ্চে চড়তে হয়।' জিন কষে ঘোড়ার রশি খুলতে গিয়ে বললেন আফজাল।

শের সিং বলল— তুমি থানায় যাচ্ছ বুঝি ?

ঃ না। আমি চাই না দেলাওয়ার ডাকুর মত তুমিও একদিন ফাঁসিতে যাও। আমি তার মা ও বিবিকে কাঁদতে দেখেছি। তোমার মা-বাবাকে অমন কাঁদতে দেখতে চাই না। তার চেয়ে তোমার বাযু ভেঙ্গে দেই যাতে অন্য কারো ঘরে চুরি করতে না পার। শের সিং! শুনলাম, আগামী মাসে তোমার গায়ে হলুদ আজ তোমাকে ছেড়ে দিলে তার কোনদিন চুরি করবে না তো ?

শের সিং-কে খামোশ দেখে আফজাল মুচকি হেসে বলল— 'আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না এইতো। দাঁড়াও!' বলে আফজাল তার পায়ের শেকল খুলতে লাগল। শের সিং বিস্ময়ে থ।

ঃ 'ওঠো!' নির্দেশ আফজালের।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল শের সিং।

আফজাল বলল— তুমি এ ঘোড়া নিতে এসেছিলে। এখন থেকে এটি তোমার। ওটিতে সওয়ার হয়ে যেতে পার। ওটি আজীবন তোমার থাকবে— চড়বে, কেবল এ শর্তে, কোন ডাকুর কাছে সোপর্দ করবে না।

শের সিং ভাবছিল আফজাল সহসাই অট্টহাসি দিয়ে তার বক্ষে চেপে বসবে। আফজাল বলল— তুমি বাইরে বেরুলে আমার লোকজন তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে মনে করছ কি! তোমার মনে হয়ত এ ধারণাও হতে পারে যে, আব্বার এজাযত ছাড়া তোমার ঘোড়া দিতে পারি না। তুমি বড্ড বেকুফ শের সিং। এ ঘোড়া আমার। আর তোমার মত নওজোয়ানকে ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে বাঁচাতে ওটা তোমায় দিতে সক্ষম। বলব, এটা তোমায় বিক্রি করেছি। পাগড়ী বাঁধো। এসো আমার সাথে। সকাল হয়ে আসছে! জলদি।

মাথায় পাগড়ী মুড়ে শের সিং উঠে দাঁড়াল। আফজাল নিল এক হাতে ঘোড়ার বাগডোর অপর হাতে ধরল শের সিং-এর বাযু। বৃষ্টি পড়ছে আগের মতই। আঙ্গিনা পানিতে টইটুম্বর। ফটকের কাছে এসে আফজাল তার বাযু ছাড়ল। বলল— দরোজা খোল।

www.amarboi.org

শের সিং খানিকটা ইতস্তত করে দরোজা খুললেন।

ফটকের বাইরে এসে লাগাম এগিয়ে দিয়ে বলল— নাও! চড়ে বসো।

বিজলী চমকাল। শের সিং আফজালের চেহারায় তাকাল। হাসি তাতে ঢেউ খেলানো। সে সংশয়-সন্দেহ নিরসনকল্পে বলল— সত্যিই কি আফজাল ?

শের সিং-এর অনুচ্চ আওয়াজ এ পর্যন্ত হয়ে মাঝ গলায় আটকে গেল। সে আছড়ে পড়ল আফজালের পায়ে। ফোঁপানো কাঁদার সুর শোনা যায়। ঠিক যেন অবুঝ শিশু কাঁদছে অঝোরে।

ঃ আফজাল! আফজাল! আমায় ক্ষমা করো। না না! তা হয় কি করে ? আমাকে মেরে ফেলো। মেরে ফেলো!

আফজাল তার বাযু ধরে ওঠাল। বলল— তোমাকে মাফ করেছি সেই কখন! এমন কি তার প্রমাণে এ ঘোড়া।

ঃ ভগবানের দিকে তাকিয়ে ও ঘোড়ার নাম নিও না। ইতোপূর্বে আমি মানুষ ছিলাম না। ছিলাম আস্ত একটা পশু। বদমাশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। যদ্দরুন সেদিন এখানে ঢোকার পরিকল্পনা এঁটেছিলাম। ও প্রতিদিন আমার কাছে আসত।

ঃ কে ?

ঃ অমর সিং ডাকাত।

ঃ কোথায় সে ?

ঃ আমাদের হাবেলীস্থ দরোজায় আমার অপেক্ষা করছে।

ঃ আমি যাব তোমার সাথে।

ঃ 'না, না। এটা আমার ও তার মধ্যকার ব্যাপার।' বলে আফজালের জবাবের তোয়াক্কা না করে শের সিং বেরিয়ে পড়ল। আফজাল ঘোড়াটি ফের আস্তাবলে বাঁধল। বর্ষাসিক্ত কাপড় পাল্টে খাটে শুয়ে পড়ল। ভোরের স্নিগ্ধ আলো শার্সি দিয়ে তার মুখে পড়ছে। তন্দ্রার ঘোর কাটেনি পুরোপুরি। এমন সময় গাঁয়ের অদূরে চিৎকার ও শোরগোল শোনা গেল। সমস্বর কোলাহল। শের সিং-দের হাবেলীর কাছে পৌছলে আফজাল রমযান আলীকে আসতে দেখল।

ঃ কি হল চৌধুরী সাব ? প্রশ্ন আফজালের।

ঃ কি আর হবে ?

ঃ চৌধুরী আফজাল! অন্দর সিং-এর ছেলে লংকাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

ঃ খুলে বলুন তো শুনি।

ঃ ওপারের অমর সিং ডাকুকে চেন ?

ঃ তা চিনি বৈ কি! কিন্তু কি হয়েছে তার ?

ঃ শের সিং তার দু'হাত ভেঙ্গে ফেলেছে!

www.amarboi.org

ঃ বলেন কি ?

ঃ কসম খোদার। শের সিং হালকা, পাতলা গড়নের। কিন্তু কিভাবে যে সে এ কাজ করল ?

ঃ সত্যিই তো! কিভাবে করল ? কি করে ভাংল ?

ঃ মুচড়ে ভেঙেছে।

ঃ মুচড়ে ভেঙেছে ?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। লোকেরা বহু কষ্টে তাকে উদ্ধার করেছে। বেটা ভালোই করেছে। শয়তানটা বেশ ক'দিন ওদের ওখানে আনাগোনা একটু বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তখনই বুঝেছিলাম, বেটার মতলব ভালো নয়। এখন আর সে এ গাঁওমুখো হবে না।

আফজাল ও চৌধুরী রমজান যখন কথা বলছিলেন তখন হাবেলীর মধ্যে শের সিংহের গলা শোনা গেল।

আফজাল বলল— এখন আবার হল কি ?

ঃ খামাখাই চেঁচাচ্ছে। অমর সিং তো ভাঙ্গা-মচকা হাত নিয়ে সেই কখন ভেগেছে!

ঃ না, না! কাকে যেন পেটানো হচ্ছে।

ঃ আরে হাসছে যেন কে। মারপিট শোন কোত্থেকে! চলো, ঠাওয় গলাটা কেমন করছে। উভয় প্রস্থানোদ্যত হলে খ্রিস্টান কাকু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছেন তিনি।

ঃ কি হল কাকু ? প্রশ্ন আফজালের।

ঃ চৌধুরীজী! আজ বড্ড আরাম লাগছে। শালা হরি সিং-ও পেয়েছে কিছু।

ঃ কি ?

ঃ শের সিং তার টেকো মাথায় ২০ টা জুতোর পিটুনি দিয়েছে।

ঃ কিন্তু কি অপরাধে ?

ঃ জানো না! লোকজন হাবেলীতে জমায়েত হচ্ছিল। আর সে কিনা দেখাচ্ছিল মাতব্বরী। ওর চেহারা দেখেই শের সিং-এর মাথা চড়কগাছ। হরি রে! এসো! তোমাকে গোটাবিশেক রূপিয়া দেই...' বলে জুতা উঠিয়ে মাটিতে বসাল। উপস্থিত লোকজন তাকে ছাড়াতে কোশেশ করল। কিন্তু বিশ জুতো লাগানোর পরই সে মুক্তি পেল। খোদার কসম! কাদা-পানিতে ওর জুতার ওজন দু'কেজির কম হবে না।

✪ ✪ ✪

আফজালের হাবেলীতে যা ঘটেছে, তা কেবল দু'জনেরই জানা থাকল। কিন্তু শের সিং-এর হাতে এলাকার ত্রাস ও কুখ্যাত ডাকাতের প্রহার ও হরি সিং-এর জুতাপেটা বিদ্যুতবেগে ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের ঘটনায় এলাকাবাসী ভগৎরামের দোকান কিংবা চৌধুরী রহমত আলীর হাবেলীর সম্মুখস্থ বড় গাছের নিচে বসে আলোচনা-পর্যালোচনায়

www.amarboi.org

ঝড় তুলত। কেউ বা ওখানে চাদর বিছিয়ে তর্ক-বিতর্কে লেগে যেত। শীতকালে ছায়ানীড়ে সমবেত হত। জনপদের যে কোন মাহফিলই ইসমাঈল বিনে অসম্পূর্ণ মনে হত। তিনি খামোশ হলে সকলে মনে করত— হয়ত নয়া কোন ফন্দি আঁটছেন তিনি। মাথা তুলে সামান্য হাসি দিলে বোঝা যেত— এ বুঝি কোন নয়া পন্থা শোনা যাবে।

এদিকে তার যবান সঞ্চালিত হত, ওদিকে তখন লোকজন হাসিতে লুটোপুটিরত। লছমন সিং-এর দেহ ও কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত বড় হওয়ায় সে ইসমাঈলের কাছে বসত। এতদসত্ত্বেও ইসমাঈলের আওয়াজ তার কানে না পৌঁছলেও অন্যের দেখাদেখি সে হাসতে ভুল করত না।

উপস্থিত জনতা খামোশ হয়ে গেলে সে কানে কানে বলত— কি বলল ইসমাঈল ? লোকেরা তাকে উচ্চস্বরে ওই কথার পুনরাবৃত্তি করলে সে আবারও হাসত।

ইসমাঈল হল এ এলাকার জন্য মুচকি হাসি আর লাগাতার অট্টহাসির ভাঁড়। কিন্তু চৌধুরী রহমত আলী এতে সীমাহীন রাগ করতেন। ইসমাঈল কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হলে তিনি চৌধুরী সাহেবের অপেক্ষায় থাকত। এসব ক্ষেত্রে তিনি বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। কিন্তু তাঁর মুখনিঃসৃত কথাকে ইসমাঈল অট্টহাসির খোরাকরূপে ভর মাহফিলে পেশ করত।

চৌধুরী রহমত আলী অনেক চেষ্টা করেছেন যেন এ হাসির এটম বোমের কাছে বসতে না হয় ; কিন্তু মনের বিরুদ্ধে মানুষের উল্লাসধ্বনি হজম করতেই তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে মজমায় আসতে হল।

কখনও বা তিনি ঘরে বসে হুক্কায় টান মেরে মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করতেন ; কিন্তু উৎসুক জনতা মজমায় তার অনুপস্থিতির পীড়া অনুভব করে তাকে ডেকে পাঠাত।

আজ বৃষ্টি না হলে এলাকার বয়োবৃদ্ধরাও বড় গাছটির নীচে জমায়েত হত আর ইসমাঈল অতি অবশ্যই শের সিং কর্তৃক হরি সিং-এর বিশটা জুতোর পিটুনিও আবিষ্কার করে ফেলত। রমজান কিংবা অন্য কেউ মজমা থেকে উঠে গিয়ে অবশ্যই শের সিংকে নিয়ে আসত। কিন্তু প্রবল বৃষ্টি যা সকালে একটু কমে এসেছিল তখন তা আবার পূর্বমূর্তি ধারণ করল। জনপদের খাল-বিল উপচে বৃষ্টির পানি বড় গাছটির গোড়ায় পৌঁছল। ঈসায়ীদের বস্তি গেল ডুবে। তাদের হাবেলীর একটা দেয়াল পড়ে গেল। একটি মেষ তাতে চাপা পড়ল। লছমন সিং ও তার সাথীরা সেটাকে অনেক টানাটানি করে উদ্ধার করল।

জনমনে সৃষ্টি হল তাদের ক্ষেত ও গবাদিপশুর জন্য ধুকধুকানি। এজন্য তারা সকলে এক স্থানে জড় হয়ে ইসমাঈলের মুখ থেকে তাজা ঘটনা শোনায় তেমন একটা আগ্রহ দেখাল না।

স্রেফ জনাআষ্টেক লোক ভগ্ন দেয়ালের কাছে জমায়েত হয়ে আড্ডা জমাল। বৃষ্টি বর্ষণের সাথে সাথে জনমনে প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিল। ইসমাঈল কিন্তু হাসছেন তথৈবচ। আফজালও আজ হাসছেন তার সাথে। অবশ্য তার হাসির কারণ ছিল অন্য একটা।

www.amarboi.org

চৌধুরী রহমত আলী মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে অন্দর থেকে বেরিয়ে আঙ্গিনায় এলেন। বললেন— তোমরা এখানে করছ কি ? প্লাবনের পানি ক্ষেতে ঢুকলে আরো ক'মাসের ফসল বরবাদ হয়ে যাবে। যাও, দেখ না গিয়ে খালের বাঁধ চুয়ে কিংবা টপকে পানি আসছে কি-না!

চৌধুরী রমজান শোরগোল করে হাবেলীতে প্রবেশ করলেন। আঙ্গিনায় তার পা পিছলে গোটা শরীর কাদা পানিতে একাকার হয়ে গেল। ইসমাঈল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। অন্যরা করল তার অনুসরণ।

রহমত চৌধুরী তাদের ধমকি দিয়ে বললেন— বড় বে-শরম তোমরা। বড়দের আদব-লেহাজ গিলতে বসেছ পুরোপুরি। চৌধুরী রমজান আলী অগ্রসর হয়ে বললেন— চৌধুরীজী। এখানে বসে দাঁত বের করছেন যে। আর ওদিকে অন্দর সিং তার লোকজন নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভাংতে যাচ্ছে। আমি তার কথা শুনেছি। সে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাথে তার গাঁওগ্রামের কমপক্ষে পাঁচ-ছ'জন বদমাশ রয়েছে। চৌধুরীজী। তাকে প্রতিহত করা না গেলে আমার ফসলও যে নষ্ট হয়ে যাবে!

রহমত আলী বললেন— ওহে! অন্দর সিং তাহলে দমেনি। গত বছর সে নিজ ক্ষেতকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বাঁধ দেয়নি। এখন পানি এসেছে। সে চাচ্ছে তার ফসলের পাশাপাশি অন্যের ফসলও বরবাদ হয়ে যাক।

রমজান আলী বললেন— তার ধারণা কি এমন যে, বাঁধভাঙ্গা পানির তোড় তার ক্ষেতের দিকে বুঝি কম হবে। জনপদের গোটা শিখ সম্প্রদায় তার সাথে। সকলে মদ গিলে বুঁদ হয়ে আছে। লাঠি, বর্শা ও পিস্তল আছে সকলের কাছে।

ঃ আমরা বেশ ক'বার তার বাহাদুরি দেখেছি। গোলাম হায়দার! যাও নূর মোহাম্মদ ও আলী মোহাম্মদকে খবর দাও ; আর ইসমাঈল তুমি বাকী লোক নিয়ে তৈরি হও।

নূর মোহাম্মদ ও আলী মোহাম্মদ চৌধুরী রহমত আলীর ছোট ভাই। তাদের বাসগৃহ মহল্লার সেই কোণে। নূর মোহাম্মদের পাঁচ আর আলীর তিন পুত্র রয়েছে।

মুহূর্তেই রমজান হাবেলীতে পঁচিশ জন লোক জমায়েত হল।

চৌধুরী রমজান আলী এ ধরনের পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতেন। অন্দর সিং-এর মহল্লার বেশ ক'জন লোক এসে বলল, তার মতিগতি আজ ভালো নয়।

মহল্লার বাইরে বৃষ্টিস্নাত খালের তীরে দু'গ্রুপ বর্শা, লাঠি ও সড়কি নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান। আপোষমূলক কথা ভেস্তে গেছে। অন্দর সিং বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মহল্লার পাঁচ-ছ'জন শিখ ছাড়া সকল শিখই চৌধুরী রহমত আলীর দলে ভিড়ল। পাশের জনপদেরও জনাছয়েক তার দলে এল। কিন্তু শের সিং যাকে অন্দর সিং দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করেছিলেন সে গায়েব। তার দলেরই একজন ওকে অনুপস্থিত দেখে বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আফজালের বিরুদ্ধে সে একাই যথেষ্ট। এই তো সে এল বলে।

www.amarboi.org

চৌধুরী রমজান আলী আপোষমূলক কথায় নেতৃত্ব দিলেন। কিন্তু দৈহিক শক্তি প্রদর্শনকালে খালের কিনারাস্থ ঝোপঝাড়ে গিয়ে লুকোলেন।

দু'দলের ব্যবধান ক্রমশই কমে এসেছিল। এ বুঝি বিপুল বিক্রমে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আচমকা শের সিং ঝোপের আড়াল থেকে আবির্ভূত হলেন। উভয় গ্রুপের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন— দাঁড়াও! দাঁড়াও!! এ লড়াই থামাও! এ লড়াই হতে পারে না। উভয় গ্রুপ নীরব নিস্তব্ধ। পিনপতন নীরবতা।

শের সিং বাবার দিকে তাকিয়ে বলল— বাপু! হাবেলীতে বসে আপনাকে নিষেধ করেছিলাম। আমার কথায় আপনি কান না দেয়ায় আমার লোকজন নিয়ে আপনাদের পূর্বেই বাঁধ হেফাযতের জন্য চলে এসেছি।

অন্দর সিং-এর আরেক পুত্র চিৎকার দিয়ে বলল— বাপু! শের সিং-এর দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে।

শের সিং বললেন— গতকাল পর্যন্ত আমার দেমাগ খারাপ ছিল— আজ নয়। তুমি আমার দুধভাই কিন্তু আফজাল আমার ধর্মভাই। আফজালের দিকে উত্থিত লাঠি সর্বাগ্রে আমার মাথায় পড়বে।

এ অঞ্চলের কেউই শের সিংকে বছরাধিককাল ধরে ওঠাবসা করতে দেখেনি। সকলেই হতবাক। অন্দর সিং গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে অগ্রসর হলেন। লাঠির এক প্রচণ্ড আঘাত করলেন শের সিংকে লক্ষ্য করে। লাঠি লাগল গিয়ে রানে। কিন্তু লৌহ ধাতুতে গড়া এ শের সিং। একটুও টলল না। অন্দর সিং আবারও লাঠি মারতে উদ্যোগ নিলেন, কিন্তু ততক্ষণে আফজাল এসে তার মুঠি ধরলেন চেপে। লৌহমুষ্টির চাপে অন্দর সিংয়ের হাত অবশ।

শের সিং বললেন— আফজাল! ইনি আমার বাবা! তাঁর হাত ধরো না। তাঁর গোস্বা খতম করতে দাও। ছেড়ে দাও আফজাল! বাপের লাঠির আঘাতে পুত্ররা মরে না।

আফজাল খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অন্দর সিংয়ের হাত ছেড়ে দেন। অন্দর সিং আবারও লাঠি ওঠালেন। কিন্তু গোটা দেহে তার কাঁপুনি। পুত্র নিজ পাগড়ী খুলে তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়াল। বাবার হাতের লাঠি মাটিতে পড়ল ছিটকে। অসহায়ের মত এদিক-সেদিক তাকিয়ে অন্দর চললেন হাবেলীর দিকে। তার গতি ক্রমশ বাড়ছিল, অন্দর সিংয়ের দু'পুত্রই আঁচলে আঁসু মুছে বাবার অনুসরণ করল।

আফজাল বললেন— শের সিং! যাও বাবাকে নিয়ে সান্ত্বনা দাও গিয়ে।

শের সিং মাথায় পাগড়ী পরল। নিঃশব্দে চললেন হাবেলীর উদ্দেশ্যে। যারা অন্দরের হয়ে লাঠি ধরতে এসেছিল— কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে তারা।

চৌধুরী রহমত আলী অগ্রসর হয়ে বললেন— দেখো ভাই! খোদার মর্জি ছিল না— আমাদের মাঝে লড়াই হোক। এতে কল্যাণ সকলেরই। গত বছর আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করেছিলাম। আরামে ঘরে বসেছিলে তোমরা। এখন তোমাদের ক্ষেতে পানির সয়লাব হলে আমাদের কসুর আছে বলে অভিযোগ করতে পারবে না। বাঁধ

www.amarboi.org

ভেঙ্গে পানি এলে ক্ষতি আমাদেরও। তোমরা চাও, তোমাদের ক্ষতি না হোক আর তোমরাও বেঁচে যাও। এখানে জনাষাটেক লোক আছ। তোমরা চাইলে এ বাঁধকে দুরস্ত করে ফেলা খুব একটা কঠিন নয়। আমরা সবে তোমাদের মদদ করব। এ মুহূর্তে বাঁধ দিলে সকলেরই ক্ষেত বন্যা থেকে বেঁচে যাবে এবং ফসলও ভাল থাকবে। তোমরা কাজ শুরু করে দাও। আমি এলাকার অন্য লোকদের ডেকে আনছি।

লোকেরা হয়রান। এ কথাতো পূর্বে কেউ বলেনি? কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মাটির প্রাচীর গড়তে লেগে গেল। পাশের এলাকার যে দু'জন অন্দর সিয়ের দলভারী করতে এসেছিল তারা দৌড়ে গিয়ে আরো জনাত্রিশেক লোক নিয়ে এল। সন্ধ্যার পূর্বেই বাঁধ তৈরী হল। বৃষ্টির চোখ রাঙানী কমে এসেছে তখন। অবশ্য চৌধুরী রমজানের হদিস মেলেনি এ যাবত। বাঁধ তৈরীর পর লোকেরা একটা মশালের আলো আবিষ্কার করল, পানি ভর্তি ক্ষেতে প্রকাণ্ড একটা মাছ সাঁতরাতে দেখা গেল। লোকেরা শোরগোল করে উঠল। কেউ কেউ লাঠি নিয়ে নেমে পড়ল। মাছটা প্রকাণ্ড, পানির গভীরতা সামান্য। শোরগোল শোনা গেল— মারো! ধরো! ঘিরে নাও! গভীর পানিতে যেতে দিও না।

লোকজন মাছটিকে শিকার করল।

কিন্তু বণ্টন নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। কে পাবে এ মাছ। লোকেরা ইসমাঈলের ওপর দায়িত্ব সোপর্দ করল।

ইসমাঈল বললেন— দেখো ভাই! রমজান আলীর সন্ধান যে দিতে পারবে মাছ তার।

চৌধুরী রমজান আলীর খবর কেউই জানত না। সকলেই কানাঘুষা করতে লাগল, কিন্তু ইসমাঈল সকলের ধারণা রদ করে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত লছমন বলল— দেখো ইসমাঈল! জানি, মাছটা তুমি আত্মসাৎ করবে। তা বলো না, চৌধুরী রমজান কোথায়?

ইসমাঈল হেসে পড়লেন— আমরা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিলে সে ঝোপের আড়ালে পালায়। অন্দর সিং শের সিংয়ের মাথায় লাঠি মারলে সে মনে করে, লড়াই হল শুরু। তখন ঝোপ-ঝাড় ছেড়ে নিজের ইক্ষু ক্ষেতে লুকোয়। পরে আমাদের সর্ষে ক্ষেত দিয়ে লাল সিংয়ের ইক্ষুক্ষেত হয়ে বাড়ী যায়। অবশ্য ততক্ষণে আব্বাজান বাঁধ দেয়ার জন্য বাকী লোকজন নিয়ে হাজির হন। তাদের গতি দেখে ওনার ধারণা, সকলেই বুঝি তার তালাশে আসছে। উল্টো তিনি ইক্ষু ক্ষেত দিয়ে এ সময় চাচা আলী মোহাম্মদের ক্ষেতের পাশে পালাল। ততক্ষণে গ্রামের অন্যান্য লোকজন এসে জড়ো হয়। চৌধুরী রমজান ওই স্থানকেও নিরাপদ মনে না করে অপর একটা বিশাল আখক্ষেতে আত্মগোপন করেন। এরপর তার গন্তব্য জানা নেই। পানির ক্ষেত মাড়িয়ে তিনি তোমার বাঁধের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ; কিন্তু তখন তার ধারণা, তোমরা লড়াই এ নিহত লোকজনের লাশ দাফন করছ। পরে সে পালিয়ে আমাদের ইক্ষুক্ষেতেই উপবিষ্ট।

লছমন প্রশ্ন করে— সে তোমাদের ক্ষেতে, একথা জানলে কি করে ?

ঃ ভাই! আমিই তো তাকে ওখানে বসিয়ে রেখে এসেছি !

www.amarboi.org

ঃ কখন ?

ঃ এই তো! সবেমাত্র।

গোলাম হায়দার বললেন— কিন্তু তার পুরো কাহিনী তুমি জানলে কি করে?

ঃ গোটা দিন আমি তার পিছু নিয়েছি। ঝোপের আড়ালে তার আত্মগোপন সর্বপ্রথম আমার নজরে পড়ে। পরে তাকে অনুসরণ করি। তোমাদের বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখ। ঝোপের আড়ালে তার লাঠি পড়ে আছে। তার কাছটিতেই পড়ে আছে পাগড়ী। আর আমাদের ক্ষেত মাড়াতে গিয়ে তার কান ও পায়ে ফোস্কা পড়েছে।

লছমন বলল— কিন্তু সে যে এখনও আখ ভিটেয় লুকানো ?

ঃ আমি তাকে ডাকতে না গেলে সে আরো দু'দিন ওখানে পড়ে থাকবে। তার ধারণা, লড়াইয়ে বহু প্রাণ খোয়া গেছে, পুলিশ এসেছে, সকলের তল্লাশি চলছে।

লোকেরা এসে লুটোপুটি খেয়ে রমজান আলীর তালাশে গেলে ইসমাঈল মাছ নিয়ে দে-ছুট।

রাতের আকাশ পরিষ্কার, চৌধুরী রহমত আলী এশার নামায পড়ে মসজিদ থেকে বেরুলেন। অন্দর সিং তার দরোজায় খাড়া। তিনি বললেন— চৌধুরীজী! আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।

ঃ কে ? অন্দর সিং ?

ঃ হ্যাঁ, চৌধুরী আমি। এইমাত্র শের সিং আমাকে একটা কথা বলেছে। জীবনে এ প্রথম তাই তোমার সকাশে এসেছি অবনত মস্তকে।

ঃ কি এমন কথা অন্দর সিং! একখানে দু'বরতন থাকলে বেজে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। আর আমরা তো মানুষ। ও হ্যাঁ! শের সিংয়ের কথা বলেছিলে না ?

ঃ চৌধুরী! সত্যিই তুমি কিছু জান না ?

ঃ কি কথা ?

ঃ কাল রাতের ঘটনা সম্পর্কে আফজাল কি কিছুই জানায়নি তোমায় ?

ঃ কৈ নাতো! কি হয়েছিল কাল ?

অন্দর সিং কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আফজাল মসজিদ থেকে বেরোলেন। বললেন— আব্বাজী! গতরাতে শের সিং আমার সাথে মিলিত হয়েছিল। কথা হয় আমাদের দু'খান্দানের মাঝে মৈত্রী নিয়ে। আপনাকে রাজি করার কথা দেই তাকে।

এবারও কিছু বলার ছিল অন্দর সিংয়ের, কিন্তু মসজিদের মুসল্লীরা সকলেই তাদের কাছে জড় হওয়ায় তা আর হয়ে ওঠেনি। তিনি কেবল হা করে আফজালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রহমত আলী অন্দর সিংয়ের কাঁধে হাত রেখে বলেন— চলো বসবে! অন্দর সিং কোনরূপ বাক্যব্যয় না করে তাকে অনুসরণ করলেন।

www.amarboi.org

বহির্বাড়ীর হাবেলীস্থ ফটক অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি বললেন— ভগবানের খেল নয়া রূপধারণ করেছে। গতকাল পর্যন্ত আমি কিংবা আমার কওমের কেউ ভুলেও মনে করেনি যে, এই বাড়ীর আশে পাশে পা রাখব ; কিন্তু আজ তোমাদের কোনরূপ আহ্বান ছাড়াই অনাহুতভাবে উপস্থিত হয়েছি।

রহমত আলী বললেন— আফসোস! এ ধরনের নেক কাজে আগে ভাগে আমি কেন উদ্যোগ নিলাম না ? আমাদের উভয়ের চুল পেকে সাদা। জীবন সেতো এই আছে এই নেই। মানুষ মাত্রই মৃত্যুপথযাত্রী। কিন্তু থেকে যায় তার কালজয়ী কর্ম।

উঠানে বেঞ্চ পাতা। অন্দর সিংকে বসতে অনুরোধ জানানো হল। আফজাল বসলেন সামনের একটায়। অন্দর সিং গতরাতের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছেন। তার ধারণা আফজাল বাপ-ভাইকে আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে রহমত আলীর অজ্ঞতা ও আফজালের সাফাই তার কানে এ কথার গুঞ্জরণ দিয়েছে যে, ও তাদের কওমকে লজ্জা দিতে চায় না, বাবাকে যখন একথা বলেনি, তখন হয়ত অন্য কেউও একথা জানতে পারেনি।

শের সিং-এর শাদী আসন্ন। তার মনে শংকা, ওই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে শ্বশুর খান্দান তাকে ধিক্কার দেবে। অবশ্য তার শংকার মেঘ কেটেছে। শোকর ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তিনি আফজালের মুখের দিকে তাকান। চাঁদনী আলোয় আফজালের খামোশ দৃষ্টি যেন তাকে বলছে— জানি তুমি কি বলতে চাও, কিন্তু এর জরুরত নেই, এ কথা আমার কাছে আমানত।

কিছুক্ষণের মধ্যে উঠানের বেঞ্চগুলো লোকে ভরে গেল। ইসমাঈলও এল। উপস্থিত আওয়াম প্রাণখুলে হাসির অবকাশ দিতে রহমত আলী অন্যসময় উঠে অন্দরে চলে যেতেন। কিন্তু আজ ইসমাঈল এলে তিনি বললেন— ইসমাঈল! অন্দর সিংকে চৌধুরী রমজান আলীর কেচ্ছা শোনাও।

ইসমাঈল থতমত খেয়ে গেলেন। কিন্তু বাবার নির্দেশকে উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি পুরো কাহিনী শুনিয়ে যান। শ্রোতাদের অনবরত হাস্যধ্বনি পাশের বাড়ীর আওয়ামেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারাও ক্রমে এখানে জমায়েত হতে লাগল।

লছমন সিং রমজানকে তার ঘর থেকে নিয়ে এল। কাকু ঈসায়ী আর পুরান দত্ত চৌকিদার হরি সিংকে গ্রেফতার করে আনলেন।

রহমত আলী বললেন— আফজাল! যাও শের সিংকে ডেকে পাঠাও!

খানিক বাদে শের সিং এলেন।

বর্ষার দিনগুলো কৃষকদের অবকাশের দিন। এমনিতেই গ্রাম্য মুহূর্তগুলোর মিনিট ও সেকেন্ড হিসাব হয় না, কাজেই এই মজমা মধ্যরাত পর্যন্ত জারী থাকল। ইসমাঈল এ প্রথম চৌধুরী রমজানের জীবনের পর্যালোচনা করলেন। পরে এল হরি সিংয়ের পালা। নিদ্রাঘোরে কেউ উঠে দাঁড়ালে পাশের একজনে খোঁচা মেরে বলত— আরে দোস্ত! পালাচ্ছ যে! ঘুম না হয় কাল সারাদিন ধরে কাজা করো ; কিন্তু এই কথার কি আর কাজা আছে ?

www.amarboi.org

শেষ পর্যন্ত ইসমাঈল বললেন— আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমাদেরও ঘুম আসছে, এবার তোমরা চৌধুরীর মুখ থেকে মুরগীর কেচ্ছা শোনো।

চৌধুরী রমজান একথা শুনতেই হুক্কা সামলে ওঠার কোশেশ করলেন। কিন্তু লছমন তার হাত ধরে বললেন— না চৌধুরী! শোনাও না, শুনি খানিক।

রমজান গর্জে উঠলেন— এখানে এসে ভুলই করলাম। নির্বুদ্ধিতা কাকে বলে। আর কোনদিন আসব না তোমাদের শিবিরে; বারংবার তিনি অপারগতা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু লছমন সিং নাছোড়বান্দা। মধ্যবয়সী হওয়া সত্ত্বেও সে ৮ খানা রুটি খেত। তাই রমজান তার হাত ঝাড়া দিয়ে নিজকে ছাড়াতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বসে গেলেন। তিনি কেচ্ছা শোনাতে নারাজ।

রমজান আলী কেচ্ছা না শোনানোর বিনিময়ে যে কোন পণ আদায় করতে রাজী।

বললেন— আচ্ছা শোনাচ্ছি। আমাদের চাষ চলছিল। জালাল চারা লাগাচ্ছিল। আমি গুড় বানানোর কলঘরে বসেছিলাম। বিড়াল মুরগীর ভয়ে কেঁপে ওঠল। জালালের মা চিৎকার দিয়ে ওঠলেন।

থামলেন রমজান আলী। আওয়াম বললেন–পরে কি হলো চৌধুরীজী?

রমজান খানিক দম নিয়ে বলতে লাগলেন— মুরগীগুলো খোপে ডাকছিল। আমি বিড়ালকে ভড়কালাম কিন্তু কুকড়ে ভয়ে সে এক কোণে জড়োসড়ো হল। খোপের দরজা খুলে তাকালাম। কিন্তু সেখানে অন্ধকার। বললাম একথা জালালের মাকে। তিনি দিয়াশলাই আনলেন। বললাম— তোমার খোপের মধ্যে আলো ধরো। বিড়ালের গলা রুদ্ধ করে দেই। সে চেরাগ এগিয়ে দিল।

কালু হাসি সংযত করে বললেন— এরপর কি হল চৌধুরী?

: এরপর তাই হল যার জন্য তোমরা হাসছ— জালালের মাকে বললাম। চেরাগ আরো সামনে নাও। একটু উপরে ওঠাতে বললাম, চেরাগ ওপরে ওঠানো হল। একেবারে আমার পাগড়ীর কাছাকাছি। খোপের এক কোণে আমার মাথারও পাগড়ীর ছায়া পড়ল। জালালের মাকে বললাম, চেরাগ নীচু কর। নীচু করল। একেবারে আমার দাড়ির কাছাকাছি। দাড়িতে লাগা আগুন হাত দ্বারা নেভালাম, কিন্তু পাগড়ীতে লাগা আগুন সম্পর্কে আমার তখনও খেয়াল হয়নি। যখন গোটা খোপ ধোয়াচ্ছন্ন হয়েছিল, বিড়াল পাঞ্জা মেরে আমার মুখ খামচালো। দ্রুত মাথা বের করলাম। জালালের মার চিৎকার শুনলাম— তোমার মাথায় আগুন। পাগড়ী খুলে মাটিতে ছুঁড়লাম। পাগড়ীর আগুন পায়ের তলে পেষার দ্বারা নেভালাম। দ্বিতীয়বার মাথা ঢুকিয়ে দেখলাম, বিড়াল দু'টি মুরগীর গলা চিবিয়েছে। এটা অবশ্য হাসির খোরাক হতে পারে না, কেননা মানুষের সবদিন এক রকম যায় না। কোন কোন দিন খারাপও যায়।

গোটা মজমায় হাসির রোল পড়ে গেল। চৌধুরী রমজান আলী উঠে দাঁড়ালেন। হেলতে হেলতে বাড়ীর পথ ধরলেন।

www.amarboi.org

রমজান চলে গেলে ইসমাইল অন্দর সিংকে লক্ষ্য করে বললেন— চাচা আরেকটা কথা শুনুন। চৌধুরীর বাপের ঘোড়া একটা বাচ্চা প্রসব করল। চৌধুরীর শখ হল তার শাদী পর্যন্ত এটি সওয়ারের উপযুক্ত হবে। এজন্য সে সকলের অগোচরে ওটিকে মেষের দুধ পান করাত। যখন সে বরযাত্রী হল, তখনও বাছুরের ওপর চাপল। ওটি তখন মেষের চরিত্রে রূপ নিয়েছে। গরম সহ্য করতে পারে না একেবারেই। সুতরাং শ্বশুর বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে ওই ঘোড়া তাকে নিয়ে কাদা-পানিতে ডুব দেয়। অন্দর সিং হেসে লুটোপুটি খান। রাতের শেষ প্রহর। ইসমাঈলের চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু। তিনি উঠলেন। উঠল উপস্থিত জনতাও।

মজমা ভেঙ্গে গেলে অন্দর সিং উঠতে গিয়ে বললেন—

'চৌধুরী রহমত আলী! যে কাজের জন্য এসেছি তা বেমালুম ভুলে গেছি। কথা হল, আগামী চাঁদের দশ তারিখে শের সিংয়ের বিয়ে। তোমাদেরকে ওর বরযাত্রী হতে হবে। তহশীলদারকে লিখবেন, সেও যেন দু'দিনের ছুটি নিয়ে আসে। রহমত আলী বললেন— তা যাব না কেন। শের সিং-এর বিয়ে আর আমরা যাব না— তা কি হয়! ও হ্যাঁ! টাকা-পয়সার দরকার হলে সুদী কারবারীদের দ্বারস্থ হয়ো না যেন। সব ব্যবস্থা আমরাই করব। অন্দর সিং বলেন— চৌধুরীজী! আপনি বড় রহমদিল ; কিন্তু সব ব্যবস্থাদি করে ফেলেছি। শেঠরাম চাঁদ আমাকে হাজার খানেক দিয়ে গেছেন।

রহমত আলী খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললেন— ভাই! ছেলেদের ওপর ঋণের বোঝা চাপতে যেও না। আমি জানি, তুমি এর আগেও রামচন্দ্রের থেকে ঋণ নিয়েছ।

ঃ সামান্যই সে ঋণ। শোধ হয়ে যাবে। তবে বরের জন্য আপনাকে ঘোড়ার আঞ্জাম দিতে হবে।

ঃ সে চিন্তা তোমার না করলেও চলবে। এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনেও যোগাযোগ করো!

এ ছিল দু'খান্দানের মিলন মেলার পয়লা দিন।

✪ ✪ ✪

সলীম, মজীদ, রামলাল ও গোলাপ সিং এক সাথে পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। মহল্লার তিন মাইল দূরবর্তী এক হাই স্কুলে ওরা ভর্তি হল। প্রাইমারী স্কুলের সাথী মোহন সিং, মেরাজুদ্দীন ও মাস্টারপুত্র আলী আহমদও ওদের সাথে হাই স্কুলে ভর্তি হল। দাউদ বছর দুয়েক পূর্বে প্রাইমারীর পালা শেষ করে স্কুল ছেড়েছে। শহরের কারখানায় চাকরী নিয়েছে। জালাল ও বশীর স্কুল ছেড়ে রাখালী পেশা বেছে নিয়েছে। সলীমের মহল্লা ও হাই স্কুলের মাঝে আরো একটি মহল্লা ছিল। তখন থেকে বেশ কিছু ছাত্র ওই স্কুলে যেত। তন্মধ্যে মহিন্দর সিং ও বলনাথ সিং সলীমের অন্তরঙ্গ হয়ে গেল। বলনাথ সিং সলীম ও মজীদের সাথে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছে। বলনাথের ভাই মহিন্দর সিং তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ত। ওদের বাবা শহরের একটি ইন্ডাস্ট্রিজের হেডক্লার্ক।

ওই মহল্লায় সলীমের আরেক ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল। নাম কন্দন লাল। তার বাবা শেঠরাম চাঁদ সে এলাকার নামকরা সুদখোর। সে গ্রামের লোকদের বিয়ে-শাদীতে কর্জ

www.amarboi.org

দিত। দরিদ্র কৃষকরা আংটি লাগিয়ে টিপসই দিয়েই তবে কর্জ নিত এবং ধুম-ধামের সাথে শাদী দিত। শেঠরাম চাঁদ খোদ্ তার নাতি-পুতিদের থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদ নিতেন। যে বছর বিয়ে-শাদী কম হত সে বছর তিনি কৃষকদের মাঝে খুনাখুনি বাধিয়ে দিতেন। পুলিশ আসত। লড়াকুদের হাতে হাতকড়া লাগাত। শেঠরাম চাঁদ তাদেরকে অর্থকড়ি দিয়ে সাহায্য করতেন। সুযোগমত কৃষকদের থেকে চড়া সুদ লিখতেন। বলতেন দেখো ভাই। থানার দারোগা বড় কড়া। তোমাদের পক্ষ থেকে এ টাকা নিয়ে থানায় যাচ্ছি। কিন্তু ভয় হয়, সে না আবার আমাকে বেইয্যতী করে বসে। কৃষকরা তাকে ধন্যবাদ দিত। সে তার খাতায় দু'শ লেখালেও একশ' নিজের কাছে রেখে আর একশ' দারোগাকে দিত। বলত— দারোগা সাহেব! এ নিরীহ লোকদের কাছে আর কিছু নেই। নিছক আপনার খাতিরেই তাদেরকে এ একশ' টাকা কর্জ দিচ্ছি। ওরা আমার সাবেক কর্জগুলোও পরিশোধ করেনি। আমাকে কোনদিন আপনার সাহায্য নেয়া লাগতে পারে।

দারোগা তাদের হাতকড়া খুলে দিলে খালাস লোকদের বলত— দেখো ভাই, দারোগা মানতে চাচ্ছিল না। তার সামনে দু'শো টাকা রাখতেই সে তা আমার মুখে ছুঁড়ে মারে। বহু মিনতি করে তাকে গ্রহণ করাই। এক্ষণে তা পরিশোধ করতে কালক্ষেপণ করো না।

দারোগা বিশ্বস্ত হলে রামচাঁদের কিষাণদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা লড়তে উৎসাহ যোগাত আর ওই কর্জ দ্বারাই উকিলদের ফিস আদায় করতে বলত। এতদ্সত্ত্বেও রামচাঁদের দেবতা তার উপর খোশ ছিল এবং তাদেরকে খোশ রাখতে রোজকারমতো আহ্নিক পূজাপাট সেরে কাঁচা তরকারী পেশ করত।

মহল্লা থেকে স্কুলে যেতে সলীম সাথীদের একটা কাহিনী শোনাচ্ছিল। গোলাপ সিং ও রামলাল চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী ওর কাহিনী শুনছিল। মজীদের হাতে রাবারের গুলতি। চলতে চলতে সে বিভিন্ন নিশানায় টার্গেট করছিল। একটা গাছে চড়ুই বসা। মজীদ সাথীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলল— দেখো ওটাকে কজা করছি। কিন্তু গোলাপ সিং ও রামলাল কাহিনী শোনায় এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। মজীদ চড়ুইয়ের খেয়াল পরিত্যাগ করল। দ্রুত ওদের কাছে পৌছে বলল— সলীমের গল্প একেবারে ভুয়া। আমি ওকে চিনি। সব কথাই ঘরে বসে বানিয়েছে।

সলীম নিরুত্তর। কিন্তু গোলাপ সিং বলল— তোমার ভাল না লাগলে শুনো না।

আমরা শুনব— বলে যাও সলীম!

ঃ না। তাই হোক। আমি শুনব না।' বলল মজীদ।

ঃ 'না শুনলে রোববার তোমাদের সাথে মাছ শিকারে যাব না। খালে ডুবাডুবিও করব না। খেলব না। কি বল রামলাল?' বলল গোলাপ সিং।

রামলাল মাথা হেলিয়ে গোপাল সিং-এর কথায় সায় দিল। সাথীদের বিদ্রোহমনা দেখে মজীদ বলল— আচ্ছা সলীম! বল তোমার কাহিনী।

ঃ না, না! বলার শখ আমার শেষ।' বিরক্ত সলীম।

ঃ আরে! আমিতো নিছক ঠাট্টা করছিলাম। তোমার কাহিনী বিলকুল সত্য।

www.amarboi.org

ঃ সত্যাসত্য বুঝি না। আমি বলবই না।

রামলাল ও গোলাপ সিং ওকে বোঝাচ্ছিল এমন সময় একটা আওয়াজ এল— সলীম! সলীম! আমি কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে। জলদী এসো তো।

পাটোয়ারীর ছেলে মেরাজুদ্দীনের আওয়াজ এটি। রাস্তার মোড়ে রোজানা ও এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওরা কাছে এলে মেরাজ বলল— বল তোমার কাহিনী।

মেরাজের অনুরোধ সলীম ফেলতে পারল না। বলল— শাহজাদাকে যখন পিঞ্জিরায় ক্ষুধার্ত বাঘের মুখে ফেলানো হয় তখন...!

মেরাজ ওর কথা কেটে বলল— কিন্তু কি করে কেন ফেলা হল ?

ঃ সে কথা বলেছি ওদের।

ঃ কিন্তু আমি শুনিনি যে। শুরু থেকে শোনাও।

ঃ না না! তা হতে পারে না।

গোলাপ ও রামলাল ক্ষুধার্ত বাঘের মুখে শাহজাদাকে ফেলার পর কি হল— তা জানতে উদগ্রীব। কিন্তু মেরাজের জিজ্ঞাসা, কি করে শাহজাদার এই দুর্দশা হল ? এ গোলমেলে বিতর্কে মজীদ উৎসাহী হয়ে ওঠল। সে বলল— সলীম! শুরু থেকে শোনালে আমিও মন দিয়ে শোনব।

সলীমকে দ্বিতীয়বার গোড়ার থেকে গল্প বলতে হল ; কিন্তু ক্ষুধার্ত বাঘের মুখ পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে বলনাথের মহল্লা এসে গেল। বলনাথ সিং, মহিন্দর সিং ও কন্দন লাল পথিমধ্যে অপেক্ষমান। ওরাও কাহিনী গোড়া থেকে বলতে অনুরোধ জানাল। সলীমের সাথে ওদের সখ্যতা একেবারেই নয়া। সুতরাং ওদের অনুরোধ ফেলাও সম্ভব নয়। মজীদ বলল— কখনও সম্ভব নয়। যখন বলনাথ সিং পীড়াপীড়ি করল তখন গোলাপ সিং রেগে গিয়ে বলল— যাও সলীম! ভিন্ন জনপদের ছেলেদের গল্প শোনানোর দরকার নেই। বলনাথ সিং ও কন্দন লাল নারাজ হয়ে চলে গেল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট মহিন্দর সিংয়ের গল্পের প্রতি ঝোঁক ছিল। মুখ তুলে বারবার ও সলীমের দিকে তাকাচ্ছিল। সলীম ও অন্যান্য ছেলেরা ওর দিকে মনোনিবেশ না করে চলে গেলে সে গোস্বায় স্কুল ব্যাগ মাটিতে ছুঁড়ে মারল।

সলীম এক মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকাল, কিন্তু মজীদ ওর বাযু ধরে সামনে ঠেলে দিল। বলল— চলো সলীম! দেরী হয়ে যাচ্ছে!

একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সলীমকে ওর সাথে যেতে হল। বলনাথ সিং একটি ক্ষেতের সামনে গিয়ে পেছনে তাকিয়ে আওয়াজ দিল— মহিন্দরের বাচ্চা! দেরী হচ্ছে। কিন্তু মহিন্দর ওভাবেই পড়ে রইল।

বলনাথ সিং বারকয়েক এমন বলার পর চলা শুরু করল। ওর খেয়াল কদ্দুর যাওয়ার পর ও এমনিতেই চলা শুরু করবে। কিন্তু ওদের খেয়াল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ওরা আরো দু'টি ক্ষেত অতিক্রম করল। কিন্তু মহিন্দর ছিল খুব জেদী।

www.amarboi.org

কন্দর লাল বলনাথ সিংকে লক্ষ্য করে বলল— আরে দোস্ত! ওকে দু'চারটি থাপ্পড় দিচ্ছ না কেন?

বলনাথ সিং এমন নসিহতে সর্বদাই আমল করতে প্রস্তুত। দ্রুত সে যমীনে স্কুলব্যাগ রাখল ও মহিন্দরের কাছে এগিয়ে গেল। লাগাল সজোরে দু' থাপ্পড়। এতক্ষণ বসেছিল মহিন্দর, এবার সে শুয়ে চিৎকার দিতে লাগল। বলনাথ ওকে উঠিয়ে বসাচ্ছিল কিন্তু সে যমীনে শুইয়ে গড়াগড়ি লাগাচ্ছিল। সলীম ব্যাগ রেখে দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে এল। বলল— বলনাথ! তুমি বড় যালিম। ওকে মারছ?

বলনাথ সিং পরাভূত মনে বলল— ওকে জিজ্ঞেস করো, বসে আছে কেন? আমার যে দেরী হচ্ছে।

সলীম বলল— চলো মহিন্দর। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

মহিন্দর সিং ফুঁপিয়ে উঠে বলল— তোমরা যাও।

সলীম তার সামনে বসতে বসতে বলল— দেখ মহিন্দর। তুমি আমার ওপর নারাজ হয়েছ?

মহিন্দর ওর দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক মাথা হেলাল।

ঃ আচ্ছা ওঠো! আমি তোমাকে শুরুর থেকে গল্প শোনাব।

মহিন্দর ভাইয়ের চড়-থাপ্পড়ের কথা ভুলে গেল। বলল— পুরোটাই শোনাবে কি?

ঃ হ্যাঁ, পুরোটাই শোনাব।

ঃ আগামীকালও শোনাবে?

ঃ হ্যাঁ, কালও।

মহিন্দর দ্রুত স্কুলব্যাগ উঠিয়ে নিল কিন্তু খানিক চিন্তা করে বলল— আমি ছাড়া আর কাউকে শোনাবে নাতো?

ঃ না না। তুমি ছাড়া আর কাউকে নয়।

মজীদের চাচাত ভাই আর তহশীলদারের পুত্র হিসাবে সহপাঠীদের মাঝে সলীমের বিশেষ একটা মর্যাদা ছিল। তাছাড়া ছাত্ররা ওর মেধার প্রতিও কেমন একটা দুর্বলতা ছিল। ওই কেবল একমাত্র ছাত্র যাকে মাস্টারজীর পিটানোর প্রয়োজন হয়নি কোনদিনও। বিশেষ করেও গল্প বলায় বেশ পারদর্শী ছিল। ছুটির পর ছেলেরা নিছক ওর গল্প শোনার জন্য ওদের জনপদ পর্যন্ত যেত। গল্প শোনাতে শোনাতে মাঝপথে থেমে গেলে সকলে উৎসুক হয়ে বলত— এরপর কি হল সলীম?

ও বলত— বাকীটা কাল বলব।

ছাত্ররা নিরাশ হয়ে চলে যেত। সলীম রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে কেচ্ছার বাকী অংশ ঠিক করত। পরের দিন এমন এক স্থানে গল্প শেষ করত যার শেষটা শুনতে সকলেই অতৃপ্ত থাকত। সলীমের এ খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার কথা খান্দানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারও জানা ছিল। কিন্তু একটি ঘটনায় খান্দানের বয়োবৃদ্ধ লোকেরা বুঝতে পারল যে, বিরল রহস্যজনক ঘটনার জন্ম দিতেই বুঝি এ বালকের জন্ম। সেই কাহিনীটা হচ্ছে— পাটোয়ারীর ছেলে মেরাজুদ্দীনকে সলীম একটা কেচ্ছা শুনিয়েছিল।

www.amarboi.org

আকর্ষণীয় একটা স্থানে গল্পটা শেষ করে পরের দিনের জন্য বাকীটা রেখে দিল। গল্পের আকর্ষণে মেরাজ একেবারেই অভিভূত থাকায় ঈদের ছুটির কথা ভুলে গেল।

ঈদের দিন সলীম মহল্লার বাইরে ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করছিল। ওর চাচাত ভাই চিৎকার দিয়ে বলল— সলীম বাড়ী যাও! চাচীজান তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। বাড়ীতে এসে দেখল নারী শিবিরে ৬০ বছরের জনৈকা বৃদ্ধাও আছেন। তার ডানে-বায়ে দু'টি বাচ্চা। তন্মধ্যে ফুরফুরে চুল এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, সে মেরাজের বোন।

সলীমের মা ওকে দেখামাত্রই বলল— নাও মাইজী! সলীম এসে গেছে!'

বৃদ্ধা বললেন— এসো বেটা এসো! তোমাকে তালাশ করতে করতে হয়রান হয়ে গেছি।

সলীমের চাচাত বোন আমেনা হাসিতে লুটোপুটি খায়। অন্যান্য মহিলারা বড় কষ্ট করে হাসি সংযত করল। সলীমের দাদী আমেনাকে এক ধমকে মজমা থেকে উঠিয়ে দিল। কিন্তু আমেনার হাসি যেন থামতেই চায় না।

সলীম কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মা বললেন— সলীম। এ তোমার দোস্তের দাদী। এগিয়ে এসে সালাম করো।

সলীম লজ্জানম্র হয়ে সামনে এল। বৃদ্ধা রমণী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন— বসো বেটা! নিছক তোমার জন্যই আমি ঈদের আনন্দ ফেলে চলে এসেছি।

মহিলারা বড় কষ্ট করে হাসি থামালেন। সলীম তাকাল মায়ের দিকে। মা অঙ্গুলী ইশারা করলেন। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে বুড়ির পাশটিতে বসতে হল।

মেরাজের দাদী বললেন— বেটা! মেরাজ দু'রাত্রি ধরে বিড়বিড় করছে। ও আমার সাথে আড়ি পেতেছে। ঈদের দিন তোমাদের বাড়ী আসব— এ শর্তে নয়া জামা পরিধানে রাজী হয়। আর সাকীলাও দিনদুয়েক ধরে আমাকে ফুসলিয়েছে। চাচ্ছিলাম, ঈদের পর স্কুল খুললে মেরাজের আব্বার দ্বারা তোমাকে আমাদের বাড়ী ডেকে বাকী কেচ্ছা শুনব। কিন্তু বাচ্চাদের ঐকান্তিক পীড়াপীড়ি আমাকে আর স্থির রাখল না। হ্যাঁ বেটা! কি হল এরপর?

সলীম চিন্তায় পড়ল, মাঝপথে গল্পটা শেষ হয়েছিল কোথায়? মেরাজের দাদী বললেন— এক্ষণে না শুনে আমি যাব না। বলো, বাদশাহ অজগরের মুখ থেকে কি করে বের হল?

কপাটের পেছনে সলীমের চাচাত বোন ছোগরা আর ওর ছোট বোন যুবায়দাও আমেনার হাসির মিছিলে শরীক হয়েছিল। কিন্তু ওদের খিলখিল হাসির চেয়েও বয়স্ক মহিলাদের চাপা হাসি ওকে বিব্রত করছিল। বর্তমান পরিস্থিতির গোটা দায়ভার সলীম মেরাজের কাঁধে চাপাল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল— এ থেকে মুক্তি পেলে আর কোনদিনও মেরাজকে গল্প শোনাবে না। কিন্তু তখন যে পালানোরও যাবতীয় পথ রুদ্ধ। ওর মা, চাচী ও খান্দানের মহিলারা আঙ্গুলে আঙ্গুল ঢুকিয়ে আসন গেড়ে বসেছেন। দিন দুয়েক ধরে খেলাধুলায় মশগুল থাকার দরুন গল্প বানানোর ফুরসত হয়নি ওর। সমস্যাটা কেবল মেরাজকে নিয়ে হলে "বাদশাহর অজগরের পেট থেকে বেরোনোর" কোন একটা হক্কা-পাক্কা জবাব বের করা যেত। আর সেটা অমূলকও হত না।

www.amarboi.org

সলীমের পেরেশানি আরো এক ধাপ বাড়ানোর জন্য ওর মা বললেন— হ্যাঁ গো! সম্ভবত ও কেচ্ছার প্রথম অংশ ভুলে গেছে। স্মরণ করিয়ে দিন তা।

বৃদ্ধা রমণী আশাভরা মনে বললেন— হ্যাঁ বেটা! আমি তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বাদশাহ ভিনদেশী শাহযাদীকে শাদী করার অনেক শর্তই পুরা করেছিলেন। বাকী ছিল স্রেফ একটা শর্ত। সেটা হচ্ছে, গভীর অরণ্য থেকে একটা স্বর্ণের শিংওয়ালা হরিণ শিকার করে আনতে হবে। পাইক-পেয়াদা নিয়ে দুর্লভ ওই হরিণ শিকারে বেরোলেন তিনি। এক সময় ওই হরিণ পাহাড়ের গুহায় ঢুকল। বাদশাহ ও পাইক-পেয়াদা গুহায় ঢুকল। কিন্তু ওটি কোন পাহাড় নয়। প্রকাণ্ড একটা অজগর। আর গুহাটিও মূলত অজগরের মুখ। বাদশাহ ও তার পাইক-পেয়াদা ওই মুখে ঢুকলে অজগর মুখ বন্ধ করে ফেলে। এরপর কি হোল বেটা?

এবার সকল মহিলারা সলীমের দিকে কাতর নয়নে তাকাল। আমেনা এবং ছোগরাও ওর কাছটিতে এসে বসল।

মেরাজ বলল— দাদীজান! আপনি একথা বলেননি যে, বাদশাহর ফৌজ, ঘোড়া, হাতি এবং কুকুরও অজগরের পেটে ঢুকছিল।

মেরাজুদ্দীনের স্মৃতি রোমন্থন সলীমের পেরেশানি অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। মানুষকে উদ্ধার করতে যে পরিমাণ গর্তের দরকার, তা সাধারণত চাকু ও তলোয়ার দ্বারা করা সম্ভব।

কিন্তু হাতি-ঘোড়ার জন্য তো ওই অস্ত্র যথেষ্ট নয়।

ব্যাপারটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটা স্পর্শকাতর। গোটা নারী শিবির এবার অনুধাবন করল, বৃদ্ধা দাদী নাতি-পুঁতি নিয়ে খামাখাই আসেননি।

বৃদ্ধা রমণী বললেন— মেরাজ ও সাকীনা আমাকে বিব্রত করলে আমি তার বাপের কাছ থেকে বাকী কেচ্ছা শোনার জন্য চাপ দেই। এ ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে তো বাদশাহ ও হাতিঘোড়াসহ সৈন্য-সামন্ত দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার কথা। কিন্তু সলীম মেরাজকে বলেছিল, বাদশাহ অন্যান্য মুসিবতের মত এ মুসীবত থেকেও বেঁচে যান। আমি এ বাচ্চাদের নিয়ে গৃহশিক্ষকের কাছে গিয়েছিলাম, সে বলেছিল বাদশাহ মারা গেছে।

সলীমের মা! এতটুকুনতো আমিও জানি। বাদশাহ শাহজাদীর সাথে বিয়ের পূর্বে মারা যেতে পারেন না। যেভাবে তিনি অন্য ছ'টা শর্ত পূরণ করেন এভাবে তিনি এটাও পুরা করবেন, কিন্তু বেরোবেন কিভাবে?

বৃদ্ধা রমণী যখন কথা বলছিলেন সলীম তখন তার চেহারায় তাকিয়েছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। নীচু চোয়ালের দু'টি দাঁত তার পড়ে গেছে। কথা বলার সময় তার জিহ্বা হেলত। ও চিন্তা করছে, ভাঙ্গা দাতের ফাঁকে আংগুল রেখে জিহ্বা কাটলেও বৃদ্ধা তাকে রেহাই দেবে না। আচমকা কি চিন্তায় ওর মন-মেধা সতেজ হয়ে ওঠল। গর্দান উঠিয়ে সে চারদিক তাকাল। সমবেত শ্রোতাদের গাম্ভীর্য ও থমথমে ভাব এ কথার যেন সাক্ষ্য বহন করছিল, তুমি গল্প শেষ না করলে সে অপমান কেবল তোমার নয় অপমান গোটা খান্দানের।

www.amarboi.org

সলীম বলল— আচ্ছা শোনাচ্ছি।'

বৃদ্ধা দাদী বললেন— সাবাশ! বাঘের বাচ্চা।

সাবাশের প্রতি সলীমের তেমন একটা আগ্রহ নেই। ও কেবল এ পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে চাচ্ছিল। বলল—

বাদশাহ শিংওয়ালা স্বর্ণ হরিণকে জাপটে ধরলেন। পরে তিনি জানতে পারলেন, গুহার স্থলে তারা অজগরের পেটে ঢুকেছেন, আর অজগরের মুখ এখন বন্ধ।

অজগরের দাঁত আমাদের বদ্ধ ফটকের চেয়ে ইস্পাত কঠিন। ওটিও বেশ বুড়া। দাঁত একটা ভঙ্গুর প্রায়। বাদশাহ গোটা হাতি-ঘোড়ার রশি একত্রিত করে এই ভঙ্গুর দাঁতে বাধতে নির্দেশ দিলেন। রশির অপর প্রান্তে হাতি-ঘোড়া বেঁধে উল্টা দিকে হাঁকাতে নির্দেশ দিলেন।

দীর্ঘ দু'দিন ধরে দাঁত ভাঙ্গার প্রচেষ্টা চলল।

তৃতীয় দিন দাঁত ভেঙ্গে গেল। দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ায় বিশাল একটা দরোজার সৃষ্টি হল। বাদশাহ, ফৌজ ও হাতি-ঘোড়া অবলীলায় বেরিয়ে এল। অজগরটি এত বিশাল আকৃতির যে, সে ঠাহ্‌রই করতে পারল না।

থামল সলীম। দম নিয়ে বিজয় গর্বে মজমার চারদিকেই তাকাল। দাঁড়াল উঠে। কিন্তু বৃদ্ধার অতৃপ্তির ঘোর কাটেনি এখনও। তিনি কম্পিত হাতে সলীমের বাযু ধরে বললেন— এরপর কি হল বেটা! পুরো কাহিনীটাই শোনাও। দাঁড়িয়েই কথা শেষ করল সলীম— 'বাদশাহ স্বর্ণ শিংওয়ালা হরিণ শাহযাদীর কাছে পৌছে দিলেন। শাহযাদীর সাতটা শর্তই এক্ষণে পূর্ণ হওয়ায় তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

এরপর তাদের সুখের দিন কাটতে লাগল।

মেরাজের দাদী সলীমদের হাবেলী থেকে বের হবার সময় অনুধাবন করছিলেন, তার ধারণার বিপরীতই সলীম কাহিনী শেষ করেছে। মেরাজ বিজয়দর্পে বলছিল— দেখলেন দাদীজান! আপনি না বলছিলেন, বাদশাহ মারা যাবে ?

বৃদ্ধা দাদী গর্জে ওঠলেন— আমি কখন বললাম তা! তোমার বাবা ও মাস্টার বুঝে কি? সন্ধ্যার দিকে সলীমের মা ওকে বলছিল— সলীম! তুমি বড্ড বেয়াড়া হয়ে গেছ। বড়দের ঠাট্টা করতে নেই।

সলীম গোবেচারাভাবে বলল— আমি কারো সাথে ঠাট্টা করিনি আম্মিজান! সলীম মায়ের স্নেহ ক্রোড়ে ঠাঁই নিল। মুচকি হেসে মা বললেন— সত্যি করে বলো তো! বৃদ্ধা দাদীর ভাঙ্গা দাঁত দেখেই তুমি অজগরের ভাঙ্গা দাঁতের কাহিনী বানাওনি?

সলীম সম্মতিসূচক মাথা হেলিয়ে হাস্‌ল।

✪ ✪ ✪

পাড়াগাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলের চেয়ে শহরের এ হাই স্কুল সলীমের কাছে ভিন্ন পরিবেশ অনুমিত হল। এখানে অনুন্য পাঁচশ' ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। শিক্ষকদের

www.amarboi.org

সংখ্যাও ১২-এর উর্ধ্বে। কেউ ইংরেজী, কেউ অংক, উর্দু, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, আরবী, আবার কেউ ফার্সীর ক্লাস নিতেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের নিকট ওস্তাদবৃন্দ স্রেফ তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেন— ১. কম মারেন ২. বেশী মারেন ৩. অতিরিক্ত পেটান।

মনের সুতীব্র টান ছাড়া কোন কাজই সলীমকে আকর্ষণ করতে পারত না। উর্দু-ইংরেজী বইতে কেচ্ছা-কাহিনী ছিল। এজন্য ওগুলো শখ করে পড়ত। ইতিহাস ও ভূগোলের প্রতিও ওর বেশ টান ছিল। কিন্তু বিশেষ ভাষায় ওস্তাদবৃন্দের জবাব দান ওর ধৈর্যের বাইরে।

পাটিগণিত ও জ্যামিতির রেখার প্রতি ছিল ওর বীতশ্রদ্ধভাব। অবশ্য অংকের শিক্ষক খুব প্রভাবশালী ছিলেন। এদিকে ভাগ্যক্রমে তিনি ওর বাবার দোস্ত। তিনি সর্বাগ্রে সলীমকে জিজ্ঞাসা করতেন— কি সলীম! হোম ওয়ার্ক সেরেছ?

দু'তিনবার জিজ্ঞাসার পরে বেঞ্চে দাঁড়িয়ে ও বলত— আগামীতে সে আর স্যারকে অভিযোগ করার সুযোগ দেবে না। অপরাপর স্যারদেরও ইচ্ছা, ছেলেরা রোজকার পাঠ মুখস্থ করে আসুক। ইতিহাস ও ভূগোলের স্যাররা চাইতেন ছেলেরা ক্লাসের পাঠ তার নিজস্ব ও বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে দিক। কেননা বিগত দিনের পাঠ দ্বারা বইয়ের ভাষা তারা রপ্ত করেছেন পুরোপুরি। ছেলেদের থেকে পাঠ শোনার পূর্বে তারা ছড়ি ঘোরাতেন। কোন ছেলে পাঠ শোনানোর মাঝপথে একটা লাইন এদিক সেদিক হলে শপাং শপাং বেতের ঘা বর্ষিত হত। ইংরেজীর স্যার ছিলেন খুবই নরম। পড়ার সময় বাচ্চাদের দিকে চোখ মেলে তাকাতেন না। এজন্য যে সব ছেলেরা ইতিহাস ও ভূগোলের বাড়ীর কাজ করে আনত না— তারা এ ক্লাসের পেছনের বেঞ্চে বসে ওদু'টি কাজ করে নিত অবলীলায়।

এমনিভাবে অংকের স্যারের তুলনায় উর্দুর স্যার খানিকটা নম্রদিল ছিলেন। এজন্য উর্দু ক্লাসে ছেলেরা অংকের বাড়ীর কাজ অন্য ছেলেদের থেকে টুকে নিত। এজন্যই প্রতি বছর ইন্সপেক্টররা ইতিহাস ও অংক শিক্ষকদের প্রতি ছেলেদের অগ্রগতির কারণে নাখোশ হতে পারতেন না।

স্কুলের গদবাঁধা কাজ সত্ত্বেও গ্রাম্য পরিবেশ সলীমের মনকে বীতশ্রদ্ধ ভাব জন্ম দিতে পারেনি। বাড়ী এসে স্কুলব্যাগ খুলত। বাড়ীর কাজ সারত। মজীদ বড় খাতা নিয়ে হোমওয়ার্ক সমাধা করত। পরে দু'জনে ঘোড়ার পিঠে চাপত। শেষ বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরত। দাদার হুকুমে অতঃপর যেত মসজিদে। নামায শেষে খানা খেত। অতঃপর ছেলেদের সাথে কাবাডি খেলত। মাঝবয়সী লোকেরা ওদের খেলা দেখতে আসত। এ গ্রাম আফজাল ও শেরসিংয়ের কারণে বেশ নাম-যশ কুড়িয়েছিল। কখনওবা পার্শ্ববর্তী গ্রামের ছেলেরাও ওদের খেলায় শামিল হত। দর্শকরা এ সময় ইসমাঈলের উপস্থিতি কামনা করত। পাশাপাশি চৌধুরী রমজান আলীর হাজিরাকেও কম গুরুত্ব দিত না। খেলোয়াড়রা খেলত-দর্শকরা দেখত, ইসমাইল এল কি-না। কারো অট্টহাসি শোনা গেলে খেলোয়াড়রা খেলা বন্ধ করে সেদিকে মনোনিবেশ করত। এ সময় সাধারণত ছোট ছেলেরা আলাদা খেলত। সলীম ও মজীদ সাধারণত ভাল খেলোয়াড়

www.amarboi.org

হিসাবে বিবেচিত হত। কাবাডি খেলার প্রতি ছিল ওদের অকৃত্রিম শখ। কিন্তু ইসমাঈল এসে গেলে ওরা হাসির মিছিলে শরীক হত।

বেশ কিছুদিন ধরে সলীমের আকর্ষণ পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার প্রতি ছিল। চাচা আফজালের ঘোড়ার দ্বিতীয় বাচ্চা এখন বেশ বড়সড় হয়েছে। প্রাইমারীতে পড়াকালে চাচা ওকে লক্ষ্য করে ওয়াদা করেছিলেন— আমার ঘোড়ী দ্বিতীয় বাচ্চা দিলে সেটা তোমার।

বাড়ীতে আরোহণের আরো ঘোড়া ছিল কিন্তু ওই বাচ্চাটির শখ সলীমের মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের প্রতিটি সদস্যকে ও আস্তাবলে নিয়ে ওই বাচ্চাটির প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করত। বলত— দেখ! ওর রংটা কেমন। চুলটা কি অপরূপ। দেখ! আমার কথা শুনে কান খাড়া করেছে।

চৌধুরী রমজান আলী আরবী ঘোড়া সনাক্ত করতে পটু ছিলেন। সলীম বাচ্চাটির কান পাকড়ে তার ঘরে নিয়ে যেত। বলত— দেখেন চাচা! আমার ঘোড়াটি আরবী কি-না? চাচা রমজান বিজ্ঞতা জাহির করার জন্য সস্থান থেকে উঠে দাঁড়াতেন। বাচ্চাটির আশেপাশে ঘুরতেন। ঝুঁকে গভীর দৃষ্টিতে নাক পরীক্ষা করতেন, কান টানতেন। সোৎসাহে পিঠে দু'চারখানা থাপ্পড় বসিয়ে দিতেন। চুটে হাত রাখতেন। শেষ পর্যন্ত চুটে হাত রেখে বলতেন— হ্যাঁ ভাইপো! মনে হচ্ছে আরবী-ই।

সলীম খুশীতে আটখানা। ও চলে আসতে উদ্যোগ নিলে চাচা ওকে থামিয়ে বলতেন— শোন সবজান্তা! তোমার চিজখানি দ্রুত বড় হচ্ছে। খাওয়াও কি?

ঃ চনা-বুট খাওয়াই।

ঃ খুব ভালো। কিন্তু কখনও মেষের দুধ পান করাতে যেও না।

ঃ মেষের দুধে কি আছে চাচা?

ঃ বড় বেইমানতী বেটা। মেষের দুগ্ধপোষ্য ঘোড়া কখনও কখনও আরোহীসহ কাদাপানিতে নেমে পড়ে।

বাড়ীর মহিলারা বলত— সলীম! তোমার ঘোড়ায় এ দোষ আছে। ব্যাস ও ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে। একদিন ও স্কুল থেকে এল। কিছু মহিলা চরকায় সূতা কাটছিল। ওর চাচী বললেন—

সলীম! শুনলাম তোমার ঘোড়ার কান গাধার মত হয়ে যাচ্ছে। দেখো বড় হয়ে ওটি না আবার আস্ত গাধা বনে যায়।

সলীম স্কুলব্যাগ মাটিতে ফেলে আস্তাবলে দৌড় দেয়। বাচ্চাটির কান নিরীক্ষণ করার সময় আমেনা ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। রাগে ও বলে ফেলে— আমেনার বাচ্চা দাঁড়া!' ধেয়ে যায় ওর দিকে। আমেনা চিৎকার দিতে দিতে দাদীর কোলে আশ্রয় নেয়।

সলীমের চাচী হেসে বলেন— কি সলীম! দেখেছ কান? সলীম এর কোন জবাব না দিয়ে চাচীর চরকার তানা-বানা উল্টে দিয়ে হেসে বেরিয়ে যায়।

স্কুলে যাবার পূর্বে সলীম রোজানা আমেনাকে বলত— দেখ্ আমেনা! রাতে গল্প শোনার খায়েশ থাকলে আমার ঘোড়ার দেখভাল করিস। আর আমেনা গল্পের মজা

www.amarboi.org

পাবার আশায় ওর ঘোড়ার দানা-পানি সংগ্রহ করত। ঘোড়ার সামনে দানা-পানির কোন অভাব হয়নি এরপর।

এ ঘোড়াশাবকটি ঘরের লোকজনের কাছে পরিচিত। বাইরের লোকজন এটাকে ঘৃণা করত। কেননা অপরিচিত কেউ এলে শাবকটি তার দিকে তেড়ে যেত। অবশ্য আফজাল দেখছিলেন, ঘোড়াটির খাসলতে ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে।

একদা সলীম ও ওর সাথী স্কুল থেকে ফিরছিল। মহল্লার নিকট আসতেই ওর মন খুশীতে নেচে ওঠল। আফজাল ওর ঘোড়ায় চেপে সওয়ার। চৌধুরী রমজান ও এলাকার ক'জন তার পাশটিতে দণ্ডায়মান।

এ দৃশ্য দেখামাত্রই ওদিকে ছুটে গেল ও। মজীদও ওর পিছে ছুটছে। আফজালের নিকটে এসে সলীম চিৎকার দেয়— চাচাজান! চাচাজান!!

ঘোড়া থামিয়ে আফজাল ওর দিকে তাকান। মুচকি হেসে বলেন— আমরা তোমার ঘোড়ার উদ্বোধন করলাম। যাও ভাবীজানকে মিষ্টি বিলাতে বলো।

সলীম অগ্রসর হয়ে ঘোড়ার কাঁধে হাত রেখে স্নেহপ্রবণ চিত্তে বললেন— চাচাজান! আজ আমিও চাপব ওর পিঠে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে গিয়ে আফজাল বললেন— না, বেটা! এখনই না। ও এখনও দাম্ভিক। কিছুদিনের মধ্যে ওকে বশে আনব। আমাকেই আজ যমীনে আছড়ে ফেলতে চেয়েছিল।

ঃ আমাকে ফেলবে না— দেখে নেবেন!

চৌধুরী রমজান বলেন— দুষ্টু! আফজাল ঠিকই বলেছে। জিদ করো না। সলীম হতাশ হয়ে আফজালের দিকে তাকিয়ে বলল— চাচাজান! কবে নাগাদ ও বশে আসবে?

ঃ এই ১৫/২০ দিন। এরপর ওর পিঠে চাপতে পারবে তুমি। আচ্ছা বেটা! এখন বাড়ী যাও!

সলীম ঘোড়ার লাগাম ধরে মজীদের হাতে ব্যাগ দিল।

পথিমধ্যে মজীদ বললো-সলীম! তোমার ঘোড়ায় চাপার অনুমতি আমারও থাকবে তো?

ঃ আরে! চাচার থেকে দু'জনে চড়ার নিয়তেই তো নিলাম।

ঃ আমরা আর কাউকে চড়ার অনুমতি দেব না। চাচা আমার কাছে ওয়াদা করে বলেছেন, আগামী বছরের বাচ্চাটি আমার হবে।

ঃ কিন্তু মজীদ! সেটিকে মেষের দুধ পান করাতে যেও না।

ঃ ওহহো! তুমিও শেষ পর্যন্ত আমাকে চৌধুরী রমজান আলী মনে করলে?

ঃ মজীদ! আমি চাচা আফজালকে ভয় করি। নয়তো আজই ওর পিঠে চাপতাম।

ঃ না-না সলীম! তুমি আছড়ে পড়বে।

ঃ না! এ ঘোড়া আমার সাথে অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেই পারে না।

ঃ তোমাকে আজ চড়তে দেব না। চাচা আফজাল শুনলে তো রক্ষাই নেই।

www.amarboi.org

ঃ আমি নিজেই আজ চড়তে চাচ্ছি না। নইলে তুমি আমাকে বিরত রাখতে পারতে না।

ঃ কেন পারব না তোমাকে বিরত রাখতে? অতি অবশ্যই তোমাকে রুখব।

ঃ বেশ! তাহলে তোমার মত— ও আমাকে আছড়ে ফেলবে এই তো?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ তুমি চড়লে তোমাকেই আছড়ে ফেলবে।

ঃ কিন্তু কি করে?

সলীম খানিক ভেবে বলল— আমি দ্রুত না হাঁকালেও আমাকে ফেলে দেবে?

ঃ তুমি গতি দ্রুত না করলেও তোমাকে ফেলে দেবে। জানোয়ারের তো আর এ জ্ঞান নাই যে, তার পিঠে এক অবুঝ বাচ্চা সওয়ার।

ঃ আমি বাচ্চা নই।

ঃ এ জন্যই না চাচা তোমায় বারণ করলেন। এ বিশাল ঘোড়ার লাগামইতো তুমি আয়ত্তে আনতে পারবে না।

সলীম আর কোন জবাব দেয় না। কারণ কথা বাড়লে লড়াই শুরু হয়ে যেতে পারে। তাই ও খামোশ থাকল।

খালের কিনারে নতুন পানি আসায় সবুজ ঘাস গজিয়েছে। ঘোড়া ঘাসে মুখ রাখল। ঘোড়া খালে নামল। খালে নামতেই উঁচু কিনারা থেকে সলীম ঘোড়ার পিঠে চাপল। ঘোড়া নর্তন-কূর্দন করে ওঠল। সলীম চোখের পলকে লাগাম খিচল। থামল ঘোড়া। নিতম্বে লাথি মেরে মজীদের দিকে এগিয়ে সলীম বিজয় দর্পে বলল— দেখ মজীদ! আমি বাচ্চা নই, আমার হাত লাগাম ধরতে পেরেছে। আছড়েও পড়িনি আমি। মজীদের আরো কিছু বলার ছিল। কিন্তু ততক্ষণে সলীম ঘোড়ায় পদাঘাত করে সেরেছে। ঘোড়া চলছে উর্ধশ্বাসে। মুহূর্তে বেশ কটি ক্ষেত অতিক্রম করে ফেলেছে। আফজাল দূর থেকে ওকে দেখলেন। যমীনে যেন তার পা আটকে গেছে। বুলন্দ আওয়াজে তিনি বলেন— মজীদ! ওকে রুখো! বেকুফ পড়ে যাবে তো।

কিন্তু এ আওয়াজ সলীমের কান পর্যন্ত পৌছুয় না। ও চলছে দুলে দুলে। আধা মাইলের মত যাবার পর ও ঘোড়ার গতি ফেরালো। সলীমকে সুস্থ-সবল ফিরতে দেখে আফজালের গোস্বায় ভাটা পড়ল। কিন্তু ও তার দিকে না এসে ডানে মোড় নিলে তিনি আবারও চিৎকার দেন— ঘোড়া বাঁদিকে ঘোরাও। সামনে গভীর ঝিল।

ঝিলে জোয়ারের পানি আসায় তা টইটুম্বর। একটি পুকুর ওখানে। তা ছ'ফিট চওড়া ও দু'ফিট গভীর। কিন্তু এ খাদ এক লাফে পার হতে সলীমের তেমন একটা বেগ পেতে হল না। চাচা আফজাল এ প্রথম কোন ঘোড়াকে সওয়ারসহ বিশাল এ পুকুর টপকাতে দেখলেন। মজীদের খর্বকায় ঘোড়াও মাঝেমধ্যে ওটি টপকাত। সুতরাং সলীম সে সাহসে এটি টপকাতে তেমন একটা ভড়কাল না।

রমজান চৌধুরীর ছেলে জালাল পুকুরে গোসল করছিল। ঘোড়ার পদধ্বনি শুনে সে কূলে ওঠল। উভয় হাত তুলে শোরগোল করতে লাগল। ঘোড়া আচমকা গতিরোধ হওয়ায় লাফ দিয়ে ওঠল। সলীম সে লাফে টাল সামলাতে না পেরে যমীনে আছড়ে

www.amarboi.org

পড়ল। ঘোড়ার থেকে ওর পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সওয়ারীর তাড়নায় ও ইতোপূর্বেই বেশ কিছু চোট পেয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই ব্যথা-যাতনা পেয়েও চেপেছে ঘোড়ায়। চাচা আফজাল ওকে ওঠালেন। ও কাতরাতে লাগল। অন্য সময় হলে আফজাল ওকে পেটাতেন। কিন্তু ওর মায়াবী চোখের দিকে তাকিয়ে তা পারলেন না।

বললেন— ব্যথা পাওনি তো?

ঃ না, চাচাজান। ব্যথার চোটে কাতরানো আরোহণের সামনে কোন ছার। আফজালের রাগ হচ্ছিল। সুর পাল্টে বলল— বড্ড দুষ্টু বনে গেছ দেখছি!

ঘোড়া কদ্দুর গিয়ে থেমে গেল। চৌধুরী রমজান ওটিকে ধরতে এগুলেন। ঘোড়া তেড়ে এল। রমজান উল্টো পায়ে ফিরে এলেন। আফজাল ধীর কদমে ওটির লাগাম ধরে নিয়ে এল।

সলীমের পাশটিতে এসে বললেন–নাও! এখন সওয়ার হও।'

সলীম লজ্জায় মাথা নোয়াল। আফজাল বলল— এ কারণেই এতটা নেতিয়ে গেলে? ঘোড়াকে এ বুঝ দিতে যেও না— তার আরোহী একজন বুযদিল।

আফজাল সলীমের বাযু ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করার কোশেশ করলেন কিন্তু ব্যথায় ও কাতরাতে লাগল। বসে পড়ল যমীনে।

আফজাল পেরেশান হয়ে বলল— তুমি কোন ব্যথা পাওনি তো?

সলীম জওয়াব দিল— চাচা... আমার বাযু...!

চৌধুরী রমজান আলী সলীমের কাছে এসে বাযু ধরে ফতোয়া ঝেড়ে দিলেন— ওর বাযুর হাড্ডি বিলকুল ভেঙ্গে গেছে।

ততক্ষণে আরো কিছু লোকও জমায়েত হয়েছে। আফজাল একজনের কাছে ঘোড়া সোপর্দ করলেন। সলীমকে নিজের বাযুর ওপর টেনে তুলতে কোশেশ করলেন। রমজান আলীর নির্মম আনাড়ী কথাবর্তা শোনার পর সলীমের চোট পূর্বের চেয়ে বহুলাংশে বেড়ে গেলেও কতকটা সাহস করে চাচাকে বলল— চাচা। আমি যেতে পারব।

আফজাল নিজের ওপর ওকে ভর করিয়ে চালাতে লাগল।

বাড়ী এসেই বিছানাশায়ী হল সলীম। বিছানার চারপাশে পাশের বাড়ীর অনেক মহিলাকে দেখে ওঠতে কোশেশ করল ও। সলীমের দাদী গরম দুধের পেয়ালা নিয়ে কাকুতি-মিনতি করছিলেন— দাদু! দুধটুকুন পান করে নাও। আমার সোনামনি নাও!

গোস্বায় হাতঝাড়া দিয়ে দুধের পেয়ালা মাটিতে ফেলে দিল সলীম। তিনি আরেক পেয়ালা নিয়ে এলেন। সলীম এবার বাধ্য হল দু'এক ঢোক পান করতে।

চৌধুরী রহমত আলী বললেন— কি ব্যাপার! শোরগোল করছ কেন তোমরা। বাচ্চারা চোট পেলে অমন একটু আহ্-উহ্ করে থাকে। সলীম সামান্যই ব্যথা পেয়েছে। ইসমাঈলকে ফাজ্জু পালোয়ানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে এসে ওকে দেখবে।

কিন্তু দাদী তার নাতির দেহে একটু নখের আঁচড় পড়তেও দিতে চান না। তিনি বললেন— দেখছেন না। নাতীর আমার চেহারাটার রং কি হয়েছে। আমি ওই কুলক্ষণে দাম্ভিক ঘোড়াকে বাড়ীছাড়া করে তবেই ক্ষ্যান্ত হব।

www.amarboi.org

সলীম আচমকা ওঠে বসে বসল— না, দাদীজান! ঘোড়ার কোন কসুর নেই। ও ভড়কে গিয়েছিল।

রহমত আলী বললেন— আরে বেটা, তুমি মহিলাদের কথামত ঘোড়ায় না চড়তে পারলে ওটির গলায় রশি লাগিয়ে হালের গরু বানাও।

ইতোমধ্যে রমজানের বিবি এসে বললেন— হায় খোদা! একি হোল! জালালের বাপ বলেছেন, ওর বাযুর হাড় বিলকুল ভেঙ্গে গেছে।

একথা শোনা মাত্রই দাদীজান মাথায় হাত তুললেন। প্রতিবেশী অনেক মহিলাই ওদের মহলে গিজগিজ করছে।

ইসমাঈল ফাজ্জু পালোয়ানকে নিয়ে এলেন। সাথে চৌধুরী রমজানও। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করছেন, ওর বযুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। শহরের পঙ্গু হাসপাতালেই কেবল এর চিকিৎসা সম্ভব। সলীমের দাদীর কানে এসব কথা গরম সীসার মত মনে হচ্ছে। তিনি ওর প্রতি সর্বাপেক্ষা সহানুভুতিশীল।

ফাজ্জু পালোয়ান সর্বপ্রথম ওর আহত স্থান টিপে, নাড়িয়ে-চাড়িয়ে ব্যথায় কোকড়াতে বাধ্য করলেন। সলীম দেয় চিৎকার। অতঃপর গরম তেল দেয়া হয় মালিশ করে। বাধা হয় তুলোর পট্টি।

চৌধুরী রহমত আলী বলেন— কি ফাজ্জু! আশঙ্কার কিছু নেই তো?

ফাজ্জু সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল— না চৌধুরীজী! জোড়া মচকে গেছে। অল্প দিনেই ভালো হয়ে যাবে। সকাল নাগাদ আরেকবার আসব। কিছুদিন ওকে শয্যাশায়ী থাকতে হবে। নয়তো জোড়া আবার এদিক-ওদিক হয়ে যাবে।

রাতের বেলা সলীম জানল, দাদী হুকুম করেছেন ওর ঘোড়াকে যেন দানা-পানি না দেয়া হয়। মা খানা নিয়ে এলে ও তেতে ওঠে। মুচকি হেসে তিনি কানে কানে বলেন— আমি তোমার ঘোড়ার দানা-পানির ব্যবস্থাদি করে তবেই এসেছি।

সলীম বলল— আম্মী! দাদী বলেছেন, ঘোড়াকে হাবেলীর বাইরে বের হতে দেবেন না।

সান্ত্বনার প্রতীক মা বলেন— না, বেটা! তোমার বাযু চাঙ্গা হয়ে গেলে দেখবে তার গোস্বা পানি হয়ে গেছে।

✪ ✪ ✪

পীর বেলায়েত শাহের প্রভাব ওই এলাকায় ছিল রমরমা। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব তার খান্দানের একচ্ছত্র অধিকার। এটা চলে আসছিল আবহমান কাল ধরেই। ফসল ক্ষেত, ফলদার বাগান ও বিনোদনের উদ্যান— কোনটার অভাব তাঁর। জনগণ তাঁর ভয়ে থাকত ত্রস্ত। ছিল পারিবারিক কবরস্থান। মর্মর পাথরে বাঁধানো তা। তাঁর প্রপিতামহের মাজার পাঁচ মাইল দূর থেকে দেখা যেত।

পীর বেলায়েত শাহ চার চারবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছেন। এতদসত্ত্বেও বাবার অকাল মৃত্যুতে গদ্দীনশীন পীর হতে যাননি। কাজেই জ্ঞান চর্চার সমুদ্রে আরো

www.amarboi.org

ক'বছর ডুবে থাকলেন। এবার মুরীদদের পুলসিরাত পার করার যিম্মাদারী তাঁর স্কন্ধে। তিনি পূর্ণোদ্যমে পীরগিরি চালাতে লাগলেন। আদম সন্তানদের আসমানী ও পার্থিব গযব থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি তাবিজ দিতেন। অবসরের তিক্ত মুহূর্তগুলোকে দিলকাশ করতে দাবার ছকে ঘুটি চালতেন। তাংয়ের পেয়ালায়ও মাঝেমধ্যে লাগাতেন দু'এক চুমুক। ঘটকালিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিয়ে দিতেন, কাজী সাজতেন। আবার তালাকের বেলায়ও থাকতেন সর্বেসর্বা। এক কথায় নামীদামী এক অলরাউন্ডার।

তার কাছে ছিল গোটাআটেক ঘোড়া। পাঁচ-ছ'টা খচ্চর। পনের-বিশটা কুত্তা। বছরে একবার রাজকীয় বেশে দূরে কোথাও যেতেন। ত্রিশ-চল্লিশ জন পদব্রজী ও সওয়ার থাকত আশেপাশে— যারা একান্তই তার চেলা-চামুণ্ডা। মুরীদের ভিড়ে এতই ঠাসা থাকত যে, এক এক জনপদের মুরীদদের যিয়াফতে লেগে যেত দিনের পর দিন। ওই বার্ষিক কাফেলার প্রথম দলটি এক এক জনপদে গিয়ে ঘোষণা করত–আজ পীরবাবা তোমাদের এখানে তশরীফ ফরমাবেন।

পীর বাবার খাদ্য-খোরাকের খরচ তেমন একটা কুলসুমের মেজবানী না হলেও যে মুরীদদের অঞ্চলে ঠাঁই নিতেন, তাদের দেউলিয়া বানিয়ে ছাড়তেন। তাদের লকলকিয়ে ওঠা গম ক্ষেত পীর বাবার ঘোড়ার মুখে নজরানাস্বরূপ যেত। আর বাগ-বাগিচার ফল চেলাদের রাক্ষুসে উদরের ইন্ধন হত। বিদায় বেলায় তিনি নজরানা উসুল করতেন। চেলারা মুরীদদের বাড়তি পোষাক ও ক্রোকারিজ তুলে আনত।

পীর সাহেব অপর কোন জনপদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে এ মুরীদরা টিলায় উঠে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলত— খোদা! টর্নেডো আসে আসুক! ঝড়-বাদলেও ভয় নেই। ভূমিকম্প হলেও ক্ষতি নেই ; কিন্তু এ পীর যেন আবার না আসে।

বেশ কিছুদিন ধরে এলাকার বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজনকে পীর বেলায়েত সাহেব ব্যাপারটি ভাবিয়ে তুলছিল। এ ভাবাভাবির কারণ, পীর সাহেব জনৈকা যুবতীকে মাস্তানদের থেকে রক্ষা করে খোদ্ নিজেই তার ভক্ষক সেজে বসেন। এতদসত্ত্বেও জনপদের বিশাল একটা সমর্থক তার অন্ধভক্ত। ভাং ও তাড়ি পানকারীরা তাকে নেতা বলেই মনে করত। এলাকায় এদের ব্যাপারে একটা জনশ্রুতি ছিল যে, পীরের যবানে খোদা তা'আলা এমন অলৌকিক শক্তি দিয়েছেন যে, যাকে তিনি বদ্দোয়া করবেন তার গবাদিপশু মারা যাবে। মহিলারা হয়ে পড়বে বিধবা। বাচ্চারা আক্রান্ত হবে নানা মহামারীতে। এছাড়া লোকেরা বেলায়েত সাহেবকে জ্বিন-ভূত ও ডাইনীদের সাথে কথা বলতে দেখেছে। বিরল প্রজাতির এ পীর সাধারণত খোদার সৃষ্টিকূলে দেখা যায় না। মানুষ তার কথায় নাচে। একটা জ্বিন ফলমূল দিয়ে যায়। আরেক জনে বিছায় বিছানা। একজনে ম্যাসেজ করে শরীর।

যখন বেলায়েত শাহের জালালী তবিয়তে-জোশ মারে তখন তিনি জনৈক জ্বিনকে হুকুম করেন— অমুকের গলারুদ্ধ করে এসো। সে কোন ধরনের চিন্তা না করেই হুকুম পালন করে। তাঁর এ গাঁজাখোরী তেলেসমাতি অশিক্ষার আবর্তে নিমজ্জিত জনপদেই জমজমাট।

www.amarboi.org

পুরুষদের চেয়ে নারীরাই তাঁর ভক্ত বেশী। বেলায়েত সাহেবের কাছে তাবীয-কবজের জন্য নারীদের আনাগোনা বেশী। আর এটা স্বদেশের নারীদেরই দরকার অধিক। অসুস্থ বাচ্চাদের ঝাড়ফুঁক ও প্রেমাসক্ত যুবক-যুবতীদের সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর দরবারের জুড়ি নেই।

সলীমদের জনপদের বেশ কিছু লোক এই পীরের মুরীদ। চৌধুরী রমজান আলী এই পীরের জন্য উৎসর্গপ্রাণ। তার এ ভক্তি এমনিই হয়নি। তিনি জ্বিন, ভূত ও প্রেতাত্মাদের ভয় করতেন। এ ভয় দূর করার জন্য পীর বাবা তাকে তাবীয দেন। তাছাড়া পুলিশ দেখলেও তার হা-পিত্যেশ উঠত। তার ঘর থেকে পুলিশ দূরে রাখার জন্যও তাবীয দেয়া হয়। গলায় এ দু'তাবিয বেঁধে তিনি চলতেন। চৌধুরী সাহেবের পীড়াপীড়িতে পীরবাবা একবার এ জনপদে এলেন। অবশ্য কসম খেয়ে বলে গেলেন—আর কোনদিনও এখানে আসবেন না। কেননা সে সময় সলীমের বাবা চৌধুরী আলী আক্‌বর ছুটিতে বাড়ী এসেছিলেন। বেলায়েত শাহ জানতেন না, জনপদে আলী আকবরের সাথে তার সাক্ষাত ঘটবে। জানলে আসতেন না। আলী আকবর বিরল প্রজাতির এ.পীরকে শিক্ষা জীবন থেকে পালায় হাড়ে হাড়ে চিনতেন। তিনি একে দেখেই বললেন— আরে বেলায়েত যে! আমার তো ধারণা তুমি এখনও স্কুলে পড়। বল, এ বছর কতটা বিয়ে করেছ?

বাল্যসাথীর মুখ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এই প্রথম বিষোদগার। আলী আকবর এরপর স্কুলের নানা কথা বলেন। লোকেরা হাসতে থাকে। মুরীদরা তা দেখে রাগে অগ্নিশর্মা। রমজান আলীর জড়সড় ভাব দেখে ইসমাঈল বললেন— যারা পীর সাহেবকে ফলমূল ও মিঠাই খাইয়ে মোটা-তাগড়া করেছে তারা এবার তাদের ঘোড়ার কোমর বাঁকানোর চিন্তা করুক। খোদার ফজলে উনি এখনও জোয়ান কিন্তু খোদার দরবারে পৌছতে পৌছতে ওজন বোধ করি আরো দেড় দু'মণ বাড়বে। ভয় লাগে, উনি কি করে পুলসিরাত পার হবেন। তার বোঝা ওঠাতে তো বিশাল ক'টি মাল গাড়ীর দরকার হবে।

বেলায়েত শাহের দিমাগে ভাং-এর আছর না থাকলে হয়ত জালালী তবিয়তে জোশ মেরে উঠত। চৌধুরী রমজান কিন্তু ধৈর্যের পিরামিড। তিনি বললেন-ইসমাঈল! তহশীলদার না হয় পীরের বাল্যসাথী ও পরশ্রীকাতর, কিন্তু তোমার মুখে এসব কথা মানায় না। বুযুর্গদের মুখ থেকে বদ্‌দোয়া বেরোলে কবুল হতে দেরী হয় না।

ইতোমধ্যে চৌধুরী রহমত আলী রমজানের আঙ্গিনায় প্রবেশ করলেন। বললেন— ইসমাইল! তুমি বড্ড বে-শরম। যার তার শানে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দাও।

আলী আকবর বললেন— আব্বা হুজুর! ইসমাইল তো খারাপ কিছু বলছে না। পীরজী সত্যিই বিশাল মোটা। তাঁকে মেদ কমাতে হবে।

রহমত আলীর এ তথাকথিত পীরের প্রতি তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। অবশ্য বুযুর্গদের প্রতি তিনি সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল। তাই তিনি চাইতেন না পীর চাই সে যত নচ্ছারই হোক না কেন তাঁর খান্দানের ছেলেদের বদ্‌দোয়া করুক। ছেলেদের ধমকি দিয়ে বের করে দিলেন। পীরজীকে বললেন— শাহ সাহেব! রাগ করবেন না। আমার ন্তরে আপনার মত বুযুর্গদের প্রতি ভক্তি আছে।

www.amarboi.org

শাহ সাহেব গোস্বা প্রকাশ করলেন না। অবশ্য মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন— এমন জনপদের ছায়া ভুলেও আর কোনদিন মাড়াবেন না। কিছুদিনের মধ্যে রহমত আলীর দু'টি হালের বলদ চুরি হয়ে গেল। রমজান বললেন, এটা পীরের বদ্দোয়ার পরিণাম। ঠিক এর দিনদুয়েক পর বলদ দু'টি পাওয়া গেল। রমজান আলী জনপদে প্রচার করলেন, পীর সাহেব রহমত আলীর ছেলেদের মাফ করে দিয়েছেন।

বেলায়েত শাহের নিয়ম ছিল, একবার এক জনপদে এলে দ্বিতীয়বার ওখানে আসতেন না। কিন্তু ক'বছরের মধ্যে এমন এক বিরল ঘটনা ঘটল— যদ্দরুন তাঁকে তশরীফ নিতেই হল। যেদিন সলীম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ল এর ঠিক দিনতিনেক পর জনপদবাসী এক নয়া পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। চৌধুরী রমজান জীবনের এক নাযুক মুহূর্তে পতিত হলেন। অন্য সময় জনপদবাসী তার পেরেশানিতে হাসত।

কিন্তু এবার তারা চিন্তায় কপালে ভাঁজ ফেলল। ঘটনাটি হল, চৌধুরী রমজান তার কিছু গম কুঠির ছাদে রোদে দিয়েছিলেন। তাই কুঠি সংলগ্ন হচ্ছে, লছমন সিং-এর কুঠি। লছমন সিং-এর বাউন্ডারী সংলগ্ন সর্ষে ক্ষেত। সর্ষে ক্ষেত বর্ষা মওসুমে একটু দেবে যেত। সর্ষের ওপর বসে লছমন সিং নানা কাজ-কর্ম করত। বর্ষা মওসুমে ক্ষেতে পানি ওঠলে তিনি গবাদিপশুর ঘাস লাগাতেন। গ্রীষ্মকালের গরমে চৌধুরী রমজান তার ওখানটায় এসে গপ্-শপ্ মারতেন। গ্রামের কারো খাঁটি সর্ষে দরকার হলে তারা ওখান থেকে সংগ্রহ করতেন। তাই তিনি কখনও ভুলেও রমজান আলীর চেয়ে সর্ষের স্তূপ কম উঁচু করতেন না।

যেদিন রমজান আলীর কুঠিতে গম ওঠানো হয় ওদিন থেকেই লছমন সিং বকরীর গলে দড়ি লাগান। কিন্তু তার মহিষগুলো দড়ি ছিঁড়ে ফেলে; কিন্তু খোদার কি শান, মহিষগুলো ওই সর্ষস্তূপের ওপর ভর করে রমজানের কুঠির ছাদে ওঠে।

চৌধুরী কুঠিতে বসে রুটি চিবাচ্ছিলেন। আচমকা তার কানে 'খড় খড়' আওয়াজ আসে। ছাদের মাটি খুলে পড়ে। হঠাৎ ছাদ থেকে দু'টি লোমশ কালো পা বেরিয়ে আসে। পা দু'টি মহিষের।

মিয়া-বিবি বিস্ময়ে একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। বাইরে জালাল ও ওর বোন চিল্লিয়ে আকাশ মাথায় তোলে— মা! মা! লছমন সিং-এর মহিষ কুঠিতে চড়েছে।

রমজান আলী যিনি কোন ভয়াবহ পরিস্থিতির কল্পনা করছিলেন কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এলেন। মুহূর্তেই কাঠের সিঁড়ি টপকে ওপরে ওঠলেন। লছমনের মহিষের গলা ছাদে আটকে গেলে। সামনের দু'পা ছাদ ফুটো হয়ে ঢুকে গেছে। পেছনের দু'পা তখনও সর্ষেরস্তূপে। অসহায় বিস্ময়ের এ দৃশ্য ছাদের নাযুকতার সাক্ষ্য বহন করছিল।

চৌধুরী কিছু সময়ের মধ্যে গোটা জনপদের লোকজনকে হাবলীতে জমায়েত করলেন। বালক ও যুবকরা খিলখিলিয়ে হেসে পড়ে। কিন্তু বড়দের জন্য এটি ভাবনার বিষয়। মহিষকে এ অসম পরিস্থিতি থেকে রেহাই দেয়া হল। পরবর্তীতে একটি গুঞ্জন-ই শোনা গেল যে, আদম (আঃ)-এর জন্ম থেকে নিয়ে অদ্যাবধি মহিষের ছাদে ওঠার কথা শোনা যায়নি; কিন্তু আজ এমনটা কেন হল ?

www.amarboi.org

গ্রামের ঠুন্‌কো জ্যোতিষীই পারে এর জবাব দিতে। সে বলল— আজ মঙ্গলবার। মহিষ চড়েছে রমজানের ছাদে। মালিক লছমন। নক্ষত্রের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিপদ পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর না এলেও এ দু'ঘরের ওপর অতি অবশ্যই আসবে।

রমজান ও লছমনের দু'বউ সর্বপ্রথম এ কথায় আস্থা আনলেন। লছমনের বউ বললেন— মহিষটি কাউকে দান করে দেয়া হোক। কিন্তু রমজানের বউ বললেন— শীঘ্র বেলায়েত শাহ্'র কাছে যান।

রাতের বেলা জালালের পেটে ট্রাবল শুরু হোল। লছমনের ছাদে দু'টি কুকুর ডাকল। শেষ প্রহরে রমজান আলী ত্রিশ টাকা ও লছমন মহিষটি নিয়ে বেলায়েত শাহ্‌র উদ্দেশ্যে চললেন। পথিমধ্যে মহিষটা ত্রিশ টাকায় বিক্রী করে ফেললেন। দরবারে এসে রমজান ২০ টাকা নজরানা দিলেন। লছমনও এর চেয়ে বেশী দিতে নারাজ। সুতরাং তিনিও ২০ টাকা দিয়ে বাদবাকী দশ টাকা মদের জন্য রাখলেন।

উভয়েই হাত বেধে স্ব-স্ব মুসিবতের কাহিনী শোনান। বেলায়েত শাহ্ তখন ভাং-এর নেশায় ঢুলুঢুলু। বললেন— ভাই! আমার সংকল্প ছিল। ওই জনপদে আর যাব না। তোমরা যখন এসেই পড়েছ তখন না যেয়ে উপায় কি।

যিনি তোমার ছাদে মহিষ উঠিয়েছেন তিনি যেনতেন জ্বিন নন। ভালো কাজই করেছ ওটি বিক্রি করে। তখন ওটি যে বাড়ী যাবে তাদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

গোধূলি লগ্ন।

চৌধুরী রমজান ও লছমন সিং বেলায়েত শাহ্‌কে নিয়ে জনপদে আসছেন। আফজাল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। বেলায়েত শাহ্ ঘোড়া থামিয়ে তাকে দেখতে থাকেন। সাথে চার চেলা। তারাও ঘোড়ার লাগাম কষল।

বেলায়েত শাহ্ রমজানকে জিজ্ঞাসা করল— কে ওই ঘোড়ার মালিক?

ঃ আফজাল চৌধুরী, রহমত আলীর পুত্র।

ঃ কত দিয়ে কেনা হয়েছে ওটা?

ঃ পীরজী! এটা গৃহপালিত। নিখাদ আরবী বংশোদ্ভূত। দেখবেন এখনই লাফিয়ে খাল পার হবে।

যেখান থেকে আফজাল লাফ দেয় ওটা ছিল বেশ প্রশস্ত। ঘোড়ার লাফ দেখে বেলায়েত শাহ বললেন— কি চৌধুরী! উনি ঘোড়া বেচবেন কি-না?

ঃ পীরজী! আপনার খরিদ করার ইচ্ছা হলে উনি আরেকটা সওদা করতে পারেন। ওটির আরেকটা বোন আছে। খুবই দ্রুতগামী। ওটি পোষ মানেনি এখনও। তহশীলদারের ছেলের ওটি।

কিন্তু পীর বাবা তালগাছের মত পা'ধারী হলেও দাম্ভিক ঘোড়ার প্রতি অকৃত্রিম। তিনি বললেন— ঘোড়া আমার কাছেও কম নেই। তুমি ওই ঘোড়া খরিদ করার কোশেশ করো।

চৌধুরী রমজান অগ্রসর হয়ে বললেন— আফজাল! আফজাল! এদিকে এসো ভাই।

কিন্তু আফজালের কানে ওই আওয়াজ পৌঁছায় না। এক দৌড়ে ঘোড়া নিয়ে ক্ষেতের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

www.amarboi.org

পীর বেলায়েত যতক্ষণে রমজানের হাবেলীতে প্রবেশ করেন ততক্ষণে আস্তাবলে ঘোড়া রেখে আফজাল হাবেলীর বাইরে বের হন।

তিনি পীরজীকে দেখে বলেন— পীর সাহেব! আস্‌সালামু আলাইকুম।'

পীর সাহেব উষ্ণস্বরে সালামের জবাব দিয়ে বলেন— চৌধুরী! আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে তোমার ঘোড়া নিরীক্ষণ করেছি। কিন্তু তুমি আমাদের দিকে নযরই দাওনি। যেমন ঘোড়া তেমন তার সওয়ার।

ঃ চৌধুরী আলী আকবর বাড়ী আছেন কি?

ঃ না। আগামী মাসে আসবেন।

ঃ রহমত আলী কোথায়?

ঃ শহরে গেছেন। সন্ধ্যা নাগাদ এসে যাবেন।

রমজান আলী বললেন— পীরজী। বড় চৌধুরী ছেলেদের কথায় দখল দেন না। আফজাল যা বলবে তাই মঞ্জুর হবে।

আফজাল বললেন— কি হয়েছে রমজান সাহেব?

পীর সাহেব রমজানের দিকে ঘুরলেন। এসব পরিস্থিতিতে রমজান ভূমিকার আশ্রয় নেন না। সরাসরি বলেন— ভাই! কথা হল, পীর সাহেব তোমার ঘোড়াটা কিনতে চান। এখন বল, তা কি করে সম্ভব?

আফজালের গালে যেন একটা চপেটাঘাত হল। এতদসত্ত্বেও তিনি পীর সাহেবের শ্রদ্ধার্থে নম্র গলায় বললেন— এটা আমার ভাতিজার।

লছমন সিং বললেন— ভাই! পীরজী এক্ষণে বাচ্চাদের সাথে কথা বলবেন না।

ঃ পীরজী! এ ঘোড়া আপনার কাজে আসবে না। কাজেই আমরা তা বেচতেও চাইনে।

ঃ বাকীতে নয়। নগদ দিয়ে কিনব।' বললেন বেলায়েত শাহ্।

আফজাল প্রকৃতিগতভাবেই লজ্জাশীল। উনি পীর সাহেবের মত ঘোরাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পীর তার সিদ্ধান্তে অনড়। রমজান ও লছমন তার দালালি করে যাচ্ছে জোর গলায়ই। গোলাম হায়দার ও ইসমাঈল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গাঁয়ের দু'দশজনও জমায়েত হয়েছে। মজীদ সলীমকে এ খবর জানিয়েছে। ও গলার সঙ্গে লটকানো ব্যাণ্ডেজসহ ওই স্থানে এল।

বেলায়েত শাহ্ এমনই এক একরোখা প্রকৃতির যিনি অর্থের জোরে যে কারো প্রাপ্য নষ্ট করতে সিদ্ধহস্ত। তার খেয়ালে ঘোড়াটি খুবছুরত। ওটি কেবল তার আস্তাবলেই মানানসই। কাজেই তিনি এ আপত্তি কিছুতেই শুনতে চান না যে, ওটির প্রতি আফজালের ভাতিজার আকর্ষণ রয়েছে এবং ওটি বিক্রী করলে এক মাসুম বাচ্চার হৃদয়ে আঘাত করা হবে। আফজাল ও তার ভাইয়েরা পীরের জেদের ওপর গোস্বা করছিলেন, কিন্তু তিনি যে মেহমান, তাও আবার রমজানের বিপদে এসেছেন। পীর সাহেবকে দ্বিতীয়বারের মত এ জনপদ হতে তারা ফিরে যেতে দেবেন না। রমজান বলেছিলেন, খোদার দিকে চেয়ে পীর বাবাকে আবারও নারাজ করবেন না।

www.amarboi.org

নিজের ঘোড়া নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে দেখে সলীম পেরেশান। কিন্তু ওর দিকে তাকানোর মত কোথাও কেউ নেই।

বেলায়েত শাহ'র খায়েশ টলবার নয় দেখে ইসমাঈল বললেন— পীরজী! এমনিভাবে আপনার ঘোড়ার প্রতি কারো নজর পড়লে আপনি সহজেই তা বিক্রী করে দিতে পারবেন কি?

পীরজী বলেন— সঠিক মূল্যদাতা থাকলে আমার ঘোড়া এখনই বিক্রী করে দিতে রাজি। এটা নিছক খরিদ্দারের হিম্মতের ব্যাপার। আমার ঘোড়ার মূল্য চারশ' টাকা।

ইসমাঈল বললেন— আপনার ঘোড়ার দাম চারশ' হলে আমাদেরটার দাম পাঁচশ' টাকা। হিম্মত থাকলে কিনে নিন।

পীর সাহেবের জোশ-দাপট ক্ষণিকের তরে শিথিল হল। এদিক সেদিক তাকিয়ে বললেন— আচ্ছা! পাঁচশ টাকায় বিক্রির কথা পাকাপাকি হল তো। হিম্মতওয়ালা হলে আমিই খরিদ করব। নয়তো তোমাদের মাল তোমাদেরই থাকবে।

ঃ চলো চৌধুরী রমজান।'

রমজানের হাবেলীতে এসে এক মুঠ শুষ্ক মাটি মুঠে পুরলেন বেলায়েত শাহ্। কিছু পড়ে মারলেন ফুঁক। বললেন রমজানকে— এ মাটি কুঠির ছাদে ঢেলে মার। অতঃপর লছমন সিংকে তাবিজ লিখে দিয়ে বললেন— মাঝরাতে ঘরের মেঝে দু'বিঘতের মত গর্ত করে গেড়ে দিও। এ কাজ থেকে ফারেগ হয়ে তারা ভাং-এ চুমুক দেন। আফিম খান। অতঃপর হুক্কায় টান মারেন। হুক্কা সেবন শেষে বলেন— রমজান! আরবী বংশোদ্ভূত ঘোড়া চেন তো?

ঃ হ্যাঁ! পীরবাবা! এটি বাস্তবিকই আরবী ঘোড়া। এ জন্যই তো আকাশচুম্বী দাম হেঁকেছে।

ঃ কিন্তু তাতে কি। বিক্রি করতে রাজীতো হয়েছে।

ঃ না, বাবাজান! ওদের ধারণা আপনি মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম। এজন্যইতো ওদের এ সোনার দাম হাঁকানো।

পীরজী আচমকা উঠে বসে বললেন— পাঁচশ টাকাকে আমি আমার জুতোর দামও মনে করি না।

ঃ হ্যাঁ, জনাব! পাঁচশ সে আর ক'টি টাকা! বললেন রমজান আলী।

ঃ আচ্ছা যাও। ওদের কথা পাকাপাকি করো। সকালের দিকে ঘোড়াটা ভালোভাবে নিরীক্ষণ করব। কোন খুঁত না থাকলে কালই পাঁচশ' টাকায় কিনে নেব।

বটগাছের নিচে লোকজন আড্ডায় মেতেছে। 'রমজানের পীর' সকলের আলোচ্য বিষয়। তার বিশাল বপু, ইয়াবড় গোঁফ ও পাগড়ীর ১৬ প্যাঁচের প্রতি টিপ্পনি কাটছিল। চৌধুরী রমজান হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলেন— চৌধুরী রহমত আলী কোথায়?

রহমত আলী ফটক খুলে বেরিয়ে বলেন— কি হল চৌধুরী! কি চাও?

ঃ পীরজী আমায় পাঠিয়েছেন।

www.amarboi.org

ইসমাঈল বললেন— ভাই! আমরা পীর সাহেবকে তো মূল্য বলে দিয়েছি।

রহমত আলী বললেন— কিসের মূল্য?

ইসমাঈল বললেন— আব্বাজী! রমজানের পীর এসেছেন। সলীমের ঘোড়া কিনতে চান। আফজাল তাকে টলাতে চেয়েছে কিন্তু উনি তখন ভাং-এর নেশায় বুঁদ। আমি তখন বিরক্ত হয়ে বলেছি, ঘোড়ার দাম পাঁচশ' টাকা। পীর এ কথা শুনে নীরবে চলে গেছেন। এক্ষণে রমজানকে পাঠিয়েছেন। মনে হচ্ছে, তিনি ভাং মাত্রাতিরিক্ত পান করেছেন।

রমজান আলী ইসমাঈলের জবাব দেয়ার স্থলে চৌধুরী রহমত আলীর দিকে তাকান। বলেন— চৌধুরীজী! রাজার ঘরে মোতির অকাল পড়ে কি কখনো? পীরজী বলেছেন, সকালে ঘোড়া দেখবেন। কোন খুঁত না থাকলে টাকা দিয়েই নিয়ে নেবেন। খোদা তাঁকে অনেক দিয়েছেন। পাঁচশ' রুপিয়া তো তাঁর সকালের নাশতা।

যে যুগে টাকায় ১ মণ গম পাওয়া যেত সে যুগে পাঁচশ টাকা কি চাট্টিখানি কথা। সমবেত শ্রোতারা হতবাক। কিন্তু ইসমাঈল অট্টহাসি দিয়ে বলেন— চৌধুরী রমজান। সত্যি করে বলতো। তোমার পীর আজ কত ঠিলা মদ গিলেছেন?

রহমত আলী ইসমাঈলকে ধমক দিয়ে বলেন— ইসমাঈল! সকলকে উপহাসের পাত্র বানিও না। অতঃপর রমজানকে লক্ষ্য করে বলেন— যাও চৌধুরী রমজান! ইসমাঈল পাঁচশ টাকা দাম বলে থাকলে সকালের দিকে পীর সাহেবকে নিয়ে এসো।' বলে রহমত আলী মসজিদে চলে গেলেন।

দেয়ালে সলীম ঠেস দিয়ে দাঁড়ান। খানিক পূর্বেও ও সান্ত্বনা পেয়েছিল এই ভেবে যে, বালামুক্তি হওয়া গেছে। কিন্তু রমজানের কথা শুনে ওর চেহারা ফের মলিন হয়ে যায়।

আফজাল তাকালেন সলীমের চেহারায়। বলেন ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে— ইসমাঈল। বেলায়েত শাহ টাকার কুমীর। জেদ করলে অবস্থা খারাপ হবে। সলীম দু'তিন বার কেঁদেছে।

ইসমাঈল বললেন— আরে। এতো রমজানের কথা।

গোলাম হায়দার বললেন— না, ইসমাঈল। এ পীরের লালসা দৃষ্টি কিছুর ওপর পড়লে তার আর রক্ষা নেই। একটা কুকুর সে ৬০ টাকায় কিনেছিল।

সলীমের কাঁধে হাত রেখে ইসমাঈল বললেন— বেটা! চিন্তা করো না, বিমর্ষ হয়ো না। সকাল নাগাদ পীরের নেশা কেটে যাবে। একান্তই যদি সে কিনেই নেয়— তাহলে ওই টাকায়ই তোমার জন্য জগৎসেরা ঘোড়া কিনে আনব।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপানো কাঁদার সুরে সলীম বলল— আমার ঘোড়া দেব না। আমার ঘোড়া দেব না। এটা আমার। শুধুই আমার।

রাতের বেলা যেহেতু চাচা ও দাদা পীর সাহেবকে আস্তাবলে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন সেহেতু সলীম খানায় হাত ছোঁয়াল না।

ওর দাদী যিনি ওর ব্যথা পাওয়ার পর ঘোড়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন তিনি আফজাল ও রমজান আলীকে গালমন্দ করছিলেন।

www.amarboi.org

চৌধুরী রহমত আলী নিজ ওয়াদার প্রতি সর্বদাই কঠোর। তাঁর আখেরী ফায়সালা হল, পীর বেলায়েত শাহর ঘোড়া পছন্দ হলে তাকে কিনতে বাধ্য করা হবে।

মা, দাদী ও চাচীদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সলীম খানায় হাত লাগাল না। নিশ্চুপ বিছানার কোলে আশ্রয় নিল।

শেষ রাতে মহিলারা চরকা কাটতে উঠলে দুধ গরম করে নিয়ে গিয়ে সলীমের বিছানা শূন্য দেখলেন মা। লণ্ঠন হাতে নিয়ে তিনি এদিক ওদিক তালাশ করলেন। সলীমের চাচী ইসমাঈলকে জাগালেন। তিনি তালাশ করে ফিরে এসে হাসিমুখে বললেন— চলো, সলীমকে দেখিয়ে আনি।

মা বললেন— আফজালের কাছে বুঝি।

ঃ না।

ঃ তাহলে কোথায়?

ঃ আগে চলুন না তারপরে দেখা যাক। ভয় লাগে, রাতে ওর সর্দি না লাগে।

সলীমের মা-চাচী অতিরিক্ত প্রশ্ন না করে ইসমাঈলের অনুসরণ করলেন।

ইসমাঈল পশুশালায় ঢোকলেন। চেরাগের আলোয় দেখলেন খোরলীতে বসে আছে সলীম। মায়ের মনে পুত্রত্বের মমতা জেগে ওঠল কিন্তু ঘোড়ার মুড্ দেখে ওর সামনে যাওয়ার সাহস হল না।

ইসমাঈল বললেন— ভাবীজান। ওর সামনে যাবেন না। ঘোড়া তার মনিবকে পাহারা দিচ্ছে। ও আমাদেরকে সলীমের কাছে যেতে দিতে নারাজ।

'সলীম! সলীম!! মা ডাকলেন বাকরুদ্ধ কণ্ঠে। স্বপ্নের ঘোরে যেন সলীম বলছে— 'না না, ওটা আমার। শুধুই আমার।

সলীম! সলীম!! মায়ের আওয়াজ আবারো কণ্ঠনালীতে আটকে গেল। সাথে সাথে তার চোখে আঁসু উছলে ওঠে।

স্বপ্নঘোরে তখনও বিড়বিড় করছে সলীম। ইতোমধ্যে আফজাল এসে গেলেন। 'কি হচ্ছে এখানে?

ইসমাঈল বললেন— আফজাল" অগ্রসর হয়ে সলীমকে উদ্ধার করো। ঘোড়া তো কাউকে ওর কাছে যেতে দেবে বলে মনে হয় না।

ঃ আরে? সলীম এখানে ঘুমাচ্ছে?

ঃ সলীম সম্ভবত গোটা রাতই এখানে শুয়েছিল।

আফজাল অগ্রসর হলেন। ঘোড়ার চোয়াল থেকে চিঁ হিঁ শব্দ বেরুল। থুতনি ঘষল সলীমের মুখে। প্রাণের মনিবের সাথে ওর প্রেম যেন যুগ-যুগান্তরে। আফজাল ওকে জাগ্রত করলেন সুড়সুড়ি দিয়ে।

মা-চাচীরা পালাক্রমে ওকে বক্ষে চেপে অধর চুম্বন করেন।

সলীমকে নিয়ে সকলে যখন ঘরে এল তখন দাদীজান জুতো তালাশ করে ফিরছেন। সলীমকে দেখামাত্রই তিনি বললেন— হায় হায়! খোদা এমন পীরের নাক ধুলি-ধূসরিত করুন। আমার আদরের নাতি সারারাত আস্তাবলে কাটিয়েছে।

www.amarboi.org

এরপর সলীমের সান্ত্বনা মিলল, কওমের সিংহভাগ সদস্য তার পক্ষপাতি।

নামাযের ওয়াক্ত আসন্ন। মা বললেন— বেটা! ওযু করে নামায পড়ো। খোদার দরবারে দোয়া করো। বাদ নামায সলীম কায়মনোবাক্যে দোয়া করছে–আয় মাওলা। আমার ঘোড়া যেন না যায়। আয় আল্লাহ! রমজানের পীরের যেন নেশাভঙ্গ হয়। অতঃপর ও বিছানার কোলে আশ্রয় নেয়। সান্ত্বনাদায়ক মিষ্ট স্বপ্ন দেখে ও। যেন ওর ঘোড়ায় সওয়ার। লকলকিয়ে ওঠা গম ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ছুটছে ওর ঘোড়া, এক সময় জনপদের মরুপথে এগোয় তা। স্কুল ছাত্ররা ওর পাশে হচ্ছে জমায়েত। ও যেন তাদেরকে বলছে— দেখ। কি সুন্দর আমার এই ঘোড়া।

ঃ সলীম ওঠো! সলীম!! এ সলীম!' ঘাবড়ে চোখ খুলল সলীম। খিড়কি পথে সৌররশ্মি এসে পড়ছে ওর মুখে।

মজীদ বলল— সলীম! জলদি চলো! রমজানের পীর তোমার ঘোড়া দেখতে এসেছেন। আমি এইমাত্র তার হাবেলী থেকে এলাম।

সলীম ওর সাথে খালি পায়ে আস্তাবলে ছুটল। বেলায়েত শাহ ফটকে দাঁড়িয়ে দাদার সাথে কথা বলছেন।

–চৌধুরী!' আমার লোকদের টাকা আনতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ইসমাঈল বুঝে সলীমের কানে কানে বললেন— বেটা! চিন্তা করো না। ওষুধ ঠিক করেছি একটা। কাল রাতের মত ওভাবেই চোখ বন্ধ করে খোরলিতে শুয়ে পড়।

সলীম আপাদমস্তকে এ আদেশ শিরোধার্য করে বলল— এতে হবে কি তার চাচা?

ঃ কিছু না। ইনশাআল্লাহ পীর খালি হাতেই ফেরৎ যাবে। জলদি করো।

সলীম দ্রুত আস্তাবলে চলে গেল।

চৌধুরী রহমত আলী বললেন— চলুন। বৈঠকখানায় বসা যাক।

রমজান বললেন— পীরজী হুজুর ঘোড়া দেখতে চাচ্ছেন।

চৌধুরী রহমত আলী আফজালকে ডাকলেন। কিন্তু ইসমাঈল অগ্রসর হয়ে বললেন— আব্বাজী! আফজাল ঘাস কাটতে গেছে কোথাও। পীরজীকে ঘোড়া না হয় আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি। আসুন পীর বাবা!

পীর সাহেব রমজানের সাথে আস্তাবলে প্রবেশ করলেন। এদের দেখে ঘোড়ার চোখ-কান সচকিত হয়ে উঠল। আরবী ঘোড়া সনাক্তকরণে রমজান যতটা বিজ্ঞ ছিলেন তার চেয়ে বেশী সতর্ক ছিলেন ওর থেকে দূরে থাকতে। ঘোড়াটি যেন তার চক্ষুশূল। ইসমাঈলও দরোজার সামনে যান না। রমজান বললেন— পীরজী! ঘোড়াটি নেহাৎ দাম্ভিক।

পীরজী বললেন— আমি এর চেয়ে অধিক দাম্ভিক ঘোড়া দেখেছি এতো কোন ছার?

অকৃত্রিমভাবে তিনি এগিয়ে যান। সেই সাথে সলীমের প্রতি তার নযর পড়ে।

চাচার নির্দেশমত চোখ বন্ধ করে খোরলিতে উপবিষ্ট ও। 'আরে এ কে?' পীরজীর প্রশ্ন।

রমজান জবাব দেন— রহমত আলীর পৌত্র। ঘোড়ার প্রকৃত মালিক ও-ই।

www.amarboi.org

ঃ আরে ভাই। ঘোড়াটি দেখছি বাচ্চাদের সাথেও থাকতে পারে। সুতরাং দাম্ভিক বল কি করে?

পীরজী বেপরোয়াভাবে অগ্রসর হন। তিনি সলীমের বাযু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন— কি বল দুঃসাহসী বালক...।' পীরজীর কথা শেষ হতে না হতেই ঘোড়া তার বুকের উত্থিত গোশত কামড়ে ধরে।

বেলায়েত শাহর অবস্থা ওই হাতির চেয়ে কোন অংশে কম নয় যার শুঁড় হিংস্র বাঘের মুখে। তিনি পূর্ণশক্তিতে আর্তনাদ করছেন। ঘোড়ার এ কর্মকাণ্ড ইসমাঈলের ধারণাতীত। তার ধারণা ছিল, ওটি কেবল তাকে ধাওয়া করবে, বেশীর বেশী দু'চারখানা চাটি উপহার দেবে। সলীমের হাসি যেন থামতেই চায় না। রমজান এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে শোক-মাতম শুরু করে দেন।

ইসমাঈল পরিস্থিতি হাসি-ঠাট্টায় স্তর অতিক্রম করে যাচ্ছে দেখে ঘোড়ার মুখে ঘুষি মারলেন। দাঁত ঢিল হয়ে এল ওর। বেলায়েত শাহ ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা গেলেন। মুহূর্তে জনপদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাবেলীতে জড়ো হল। বহু কষ্ট করে লোকজন পীর সাহেবকে স্ট্রেচারে করে বাইরে আনলেন। আধঘণ্টা পর পীর সাহেবের হুঁশ এল। সকলেই দেখে ফেলল তার যখম।

উপস্থিত জনতার ঠাসা ভিড় আর বেদনার আধিক্যে পীরবাবা নিজকে মুমূর্ষু মনে করে একনিষ্ঠ মুরীদদের লক্ষ্য করে অছিয়তছলে বলেন— 'এ জনপদে আমার জানাযা শুভ হবে না। আমাকে ফওরান নিজ গ্রামে নিয়ে চলো।' হুকুম তামিল করা হল। তাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হল।

বেলায়েত শাহ মাস দেড়েকের মত বিছানাশায়ী রইলেন। মুরীদরা তাকে এক নযর দেখতে যেত। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা দূর-দূরান্ত থেকে সলীমের ঘোড়া দেখতে আসত। তারা উৎসাহভরে ইসমাঈলের মুখ থেকে চাক্ষুষ বর্ণনা শোনত।

এ ঘটনার সপ্তাহ অনেক পরে ফাজ্জু পালোয়ান সলীমের ফিটনেস পরীক্ষা করে বললেন— ওর মচকা ব্যথা চাঙ্গা হয়েছে। পরদিন সলীম ঘোড়ার পিঠে চড়ে ক্ষেত ও সরুপথে ঘোড়া হাঁকায়। কার সাধ্য থামায় ওকে।

✪ ✪ ✪

শবেবরাত আসন্ন। স্কুলের পাশেই এক পসারী ফুলছড়ি, পটকা ও আতশবাজির পসরা সাজিয়েছে। ছাত্ররা চকলেট, পাপড় ও চীনাবাদামের স্থলে তারাবাজিই কিনছে অধিক। সলীম টিফিনের কিছু পয়সা মজীদকে দিত। বাদবাকী দিয়ে আজও কিনল তারাবাজি ও স্বল্পমাত্রার ককটেল ও হাতবোমা। লেইজারের পরপরই ছিল ওদের উর্দু ঘণ্টা। স্যারের অনুপস্থিতিতে ছেলেরা শোরগোল করছিল। মজীদ তারাবাজির সরঞ্জামাদি ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল; কিন্তু ওগুলো দেখতে চায় ও। সলীম বারবার ওর হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে ডিস্কে ঢুকায়। কিন্তু সলীম আবারও বের করে নেয়।

সলীমের বাঁ পাশের ডিস্কে আরশাদের সিট। ও একটা ফুলছড়ি বের করে তাতে আগুন লাগিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

www.amarboi.org

সলীমও ওর দেখাদেখি মজীদের ব্যাগ থেকে একটা বের করে তাতে আগুন লাগায়। আরো কিছু ছেলে ওদের অনুসরণ করে। দেখাদেখি এক সময় গোটা কক্ষই আগুনের মশালে দপদপ করে ওঠে।

আরশাদ সলীমকে লক্ষ্য করে বলে— তোমার ভাই অনেক তারাবাজি ও ককটেল কিনেছে, কিন্তু তা কাজে আসছে না। গতকাল একটা ফুটাতে গিয়েছিল, কিন্তু তাতে কেবল কয়লা পাওয়া গেছে।

সলীমের আফসোস, এ কথা ওকে আগেভাগেই জানানো হয়নি কেন। এতদসত্ত্বেও ও একটা ককটেল বের করে বলল— এটির মধ্যে কিন্তু কয়লা নেই। আমি আরো ক'জনকে এটা ফোটাতে দেখেছি।

ঃ এসো। তোমাকে ফুটিয়ে দেখাই।

সলীম ককটেলটা আরশাদের হাতে তুলে দেয়। আরশাদ অবজ্ঞাভরে ওটি বারান্দায় ছুঁড়ে মারে। গোটা স্কুল কেঁপে ওঠে।

ওদিকে কামরার বাইরে হেড মাস্টার উর্দু স্যারকে বলেন, আপনার অনুপস্থিতিতে দেখলেন ছেলেরা কি লংকাকাণ্ডটাই ঘটিয়ে বসেছে।

ছাত্ররা আসলেই হৈ-হুল্লোড়ে গোটা স্কুল মাথায় তুলছিল। হেড মাস্টারের ধমক খেয়ে উর্দু স্যার গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে শ্রেণীকক্ষে এলেন; কিন্তু তিনি কক্ষে প্রশ্ন করতেই আরশাদ তারাবাজি ছেড়ে দেয়। প্রথমে তা মেঝে, পরে দরোজায় সবশেষে মাস্টারের পায়ে গিয়ে আঘাত হানে। মাস্টার সাহেব ক'টা উল্টি খেয়ে সালোয়ার ঝাড়েন। এ দৃশ্য দামাল ছেলেদের হাসির খোরাক যোগায়।

তারাবাজিতে আক্রান্ত হয়ে মাস্টারজী সরাসরি হেড মাস্টারকে নিয়ে আসেন। হেড স্যার বেত ঘুরিয়ে বলেন— এটি কার দুঃসাহস?

কেউ জবাব দেয় না।

গর্জে ওঠেন তিনি— বলো! অন্যথায় সকলকে শাস্তি দেব।

ছেলেরা কেবল একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

সামনের বেঞ্চের ছাত্রদের জানা নেই 'কে মেরেছে এই তারাবাজি।' আর পেছনের সারির ছেলেদের জানা আছে হেড মাস্টারের গোস্বার টার্গেট সামনের সারির ছেলেরা। ওদের ওপর ঝাল মেটানো হলে তা পেছনের সারিতে পৌঁছবে না। সুতরাং ওরা দেখল, খামোশ থাকলেই পগার পার।

আরশাদ মিনতিভরা চোখে সলীমের দিকে তাকায়। সলীমের মুচকি হাসি ওকে সান্ত্বনা যোগায়। মজিদ ব্যাগ উঠিয়ে কোলে রাখে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য ডেস্কে লুকোয়। হেড মাস্টার ক'বার বেত ঘোরান। ছেলেদের দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। এক কোণ থেকে গণপিটুনি শুরু করেন।

বলনাথ সিং সামনের সিটের একেবারে কোণে ছিল। সুতরাং সিরিয়ালে সে পড়ল সবার আগে। হেড মাস্টারের হুকুমে নির্দ্বিধায় সে হাত এগিয়ে দেয়। কষা পিটানের

www.amarboi.org

প্রথম ঘা লাগতেই সে চিৎকার দিয়ে বলে— না স্যার! ওই কাম আমি করিনি। কিন্তু স্যারে এ কথা শোনতে চান না। হাত ওঠাও! বলনাথ সিং অপর হাত বাড়াল। ভয়ে ও হাত সরিয়ে ফেলল। পিটুনি গিয়ে লাগল ডেস্কে।

ঃ স্যার, আমি তারাবাজি নিক্ষেপ করিনি। ছেলেদের জিজ্ঞেস করে দেখুন!

ঃ তাহলে বলো— কে করেছে এই কাজ? হেড মাস্টারের বেত সচকিত। 'হাত বাড়াও! নইলে...।

বলনাথ সিং কম্পিত হাত বাড়াল। কিন্তু পিটুনি পড়ার আগেই অটোমেটিক্যাল ওর হাত পেছনে সরে এল। বেত আবারও গিয়ে আঘাত হানল ডেস্কে। হেডমাস্টারের গোস্বা এখন তুঙ্গে।

একপাশ দিয়ে সলীম ক্ষীণকণ্ঠে বলল— স্যার! আমি! আমিই তারাবাজি...।

ঃ তুমি? প্রশ্ন হেড মাস্টারের।

ঃ জ্বী!

ঃ এদিকে এসো!

আরশাদ কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু ওর শুকনো আওয়াজ কণ্ঠনালীতে এসে আটকে যায়। সলীম অগ্রসর হয়ে হেড মাস্টারের কাছটিতে এগিয়ে যায়। হেড মাস্টার বেত উঁচিয়ে বলেন— 'আগে কেন বলোনি?

সলীম জবাব দেয়ার স্থলে হাত বাড়িয়ে দেয়। লাগাতার ছ'ঘা বেত লাগিয়ে মাস্টারের গোস্বা পেরেশানিতে রূপ নেয়। হাত বাড়িয়েই চলছে। এবার এক সাথে দু'হাত বাড়ায়। কাঁপছে ওর অধর। ঝুঁকে আসছে মাথা। মাস্টার ওকে নিরীক্ষণ করছেন গভীর নযরে। এটি নিঃসন্দেহে এক বিশাল গোস্তাখি বিশেষ করে উর্দু মাস্টারের কাছে। সলীম একবার ক্ষমা চাইলেই ক্ষমা হয়ে যেত এবং ওর এই হিম্মত ও দুঃসাহস হেড মাস্টারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।

মজীদ আড়চোখে আরশাদের দিকে তাকায়। ওর চোখে অগ্নিগোলা। সুযোগ থাকলে এতক্ষণে আরশাদের ওপর ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত। হেড মাস্টার সম্পর্কে শ্রুতি রয়েছে, প্রথমত তিনি কাউকে মারেন না! মারলে কমপক্ষে হাফ ডজন থেকে এক ডজন হিসাব করেই মারেন। আরশাদের ধারণা, সলীমের মত ছেলের জন্য হাফ ডজনই যথেষ্ট। কিন্তু হাফ ডজনের পরও মাস্টার বেত ওঠালে আরশাদের ধৈর্যশক্তি লোপ পায়। সে মজীদের দিকে তাকায়। মজীদ লঘু আওয়াজ ও চাপা ক্ষোভ নিয়ে বলে— তুমি আস্ত একটা বুযদিল, গোবর গণেশ। আরশাদের কৈশোরে আগুন ধরে গেল। সে চিৎকার দিয়ে ওঠে— মাস্টারজী। সলীম বে-কসুর। তারাবাজি আমিই মেরেছি।

হেড স্যারের বেত থামল। আরশাদ এগিয়ে এল সলীমের কাছটিতে। হেড স্যার ও উর্দু স্যার বিস্ময়ে হতবাক। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সে বিস্ময় কমাতে চায়।

ঃ মিথ্যা বলছ তুমি! হেড মাস্টার আরশাদের দিকে তাকিয়ে বলেন।

www.amarboi.org

ঃ সলীম জানত তারাবাজি আমিই মেরেছি। মজীদও জানে। জানে আরো অনেকেই। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন! সলীম আমাকে বাঁচানোর জন্যই...' আরশাদের আওয়াজ রুদ্ধ হয়ে এল, ওর চোখে অশ্রুর ঢল।

ঃ কি মজীদ? হেড মাস্টারের জিজ্ঞাসা মজীদকে।

ঃ 'জী' সলীম আচমকা মজীদের দিকে তাকায়। এ তাকানোই মজীদের কণ্ঠকে আর সামনে এগুতে দেয় না।

ঃ বলছ না কেন? প্রশ্ন হেড স্যারের।

মজীদের খামোশীর ওপর রামলাল বলে— মাস্টারজী। আরশাদই চালিয়েছিল।

ছাত্রদের এ অকৃত্রিম ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখে মাস্টারদ্বয় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা কেবল সলীম ও আরশাদের মুখপানে তাকান। বলেন— বড্ড নালায়েক তুমি হে আরশাদ! আর সলীম তুমি... তুমি আমার সাথে এসো।'

সলীম হেড স্যারের সাথে কামরা থেকে বের হয়ে গেল। উঠান পেরিয়ে দফতরে প্রবেশ করল। হেড মাস্টারের চিন্তার ললাটে বেশ ক'টা নীলাভ রেখা। দৃষ্টি কুঁচকানো। সলীম টেবিলের অপর প্রান্তে দাঁড়ানো। শেষতক তিনি বলেন— সলীম! তোমার পিটুনি খাওয়ার খুব শখ তাই না?

নিরুত্তর ও। তিনি ফের বলেন— তুমি মিথ্যা বলতে গেলে কেন?

ঃ স্যার! ওই তারাবাজিটা আমার, আরশাদ কেবল তাতে আগুন লাগিয়েছে। বলনাথ সিং বে-কসুর!

ঃ কিন্তু আরশাদকে বাঁচানোর কোশেশ করলে কেন?

ঃ আরশাদ জেনেশুনে দোষ করেনি। ওর ধারণা, তারাবাজিতে বিস্ফোরক দ্রব্যের স্থলে পোড়া কয়লা।

ঃ এদিকে এসো।' মাস্টার ইশারায় কাছে ডাকলেন।

টেবিলের পাশ ঘুরে স্যারের কাছে এগিয়ে যায় ও।

ঃ হাত দেখাও!

সলীম উভয় হাত মেলে ধরে। আফসোস ও আক্ষেপে ওর কচি হাতে বেতের নিশানা দেখে বলেন— তুমি সত্যিই অনন্য। মনে হচ্ছে খোদা তোমার দ্বারা জাতির কোন বড় খেদমত নেবেন। ভালো কাজ করতে গিয়ে মানুষের হাত অনেক সময় ক্ষত-বিক্ষত হয়। আজকের পিটুনিতে তুমি আক্ষেপ করবে না তো?

নিরুত্তর সলীম।

হেড স্যার খানিক খামোশ থেকে বললেন— দেখো বেটা! আজ তুমি হিম্মত না করলে আরশাদ এখন থেকে পরের ওপর নিজের দোষ চাপিয়ে দেয়ার মত ভুলটা আজীবনই করে যেত। তুমি ওকে বুযদিল বানানো থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছ। আমার আশা, এ শিক্ষা ও জীবনেও ভুলবে না— যা তুমি দিলে ওকে, কোনদিন তুমি এ কথার ওপর ফখর করবে যে, তোমার এক সাথীর পা এক সময় পিছলে যাবার মত হয়েছিল,

www.amarboi.org

বাঁচিয়েছ তাকে তুমি। এমনিভাবে ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে আমরাও তোমার ওপর গর্ব করব। আচ্ছা এখন যেতে পার।

গরমকালে কিছু ছাত্র ছুটির পর বাড়ী না গিয়ে খালের দিকে যেত। এ খাল স্কুল থেকে তিন ফার্লং দূরে। খালের দু'তীরে পাইন, জাম ও আম গাছের প্রলম্বিত সারি। গাছের ছায়ায় ছেলেরা কাবাডি খেলত। পানিতে করত ডুব খেলা।

কখনও ওরা সাঁতার প্রতিযোগিতায় নামত। সারি করে দাঁড়িয়ে এক সাথে লাফ দিত। অপর কিনারা ছুঁয়ে ফিরত।

পুলের কাছে গাছের একটি শাখা নীচু হয়ে পানিতে মিশেছিল। ছোট ছেলেরা ওখানে ভিড় জমিয়ে থাকত।

আম ও জাম পাকলে খালের শ্রীবৃদ্ধি হত। সস্তায়ই বিকাত আম। আর জাম ফ্রি। একদিন জাম গাছে চড়ে মজিদ ফল সংগ্রহ করছিল। নীচে কিছু ছেলে ঝুলি পেতেছিল।

সলীম খালে ডোবাডুবি করছিল। মহিন্দর সাঁতার জানত না। তাই ভাসমান ঘাস ধরে একটু আধটু পানিতে নামত। দু'একটা ডুব দেয়ার পর কূলে উঠে সাতারু ছেলেদের দৃশ্য উপভোগ করত।

কন্দনলাল খাল থেকে উঠে মহিন্দরের কাছে এসে কাপড় পাল্টাচ্ছিল— মোহন সিং এক দুষ্টুমির ফন্দি আঁটল। পিছে এসে সে ওকে ধাক্কা মারল। কন্দন লাল নিজকে সামলাতে মহিন্দরের গায়ে পড়ল। পরিণতিতে দু'জনই পানিতে গিয়ে পড়ল। কন্দর সাঁতার জানে।

তাই ও নির্দ্বিধায় সাঁতরে উঠে এল। মহিন্দরকে হাত-পা নেড়ে ডুব ও পানি হজম করতে দেখা গেল। কূলে ওঠার ওর সেকি প্রচেষ্টা। সলীম সাঁতার জানে। কিন্তু ডুবন্তকে বাঁচানোর শক্তি ও অভিজ্ঞতার দরকার ছিল ওর। সলীম সময় নষ্ট করতে নারাজ। এক লাফে মহিন্দরের কাছটিতে পৌঁছুল। ওর গর্দানে দু'হাত পেঁচিয়ে কোনক্রমে কূলের তীরবর্তী শাখা পর্যন্ত পৌঁছুল। ততক্ষণে বলনাথ সিং, মজিদ ও অন্যান্য ছেলেরা গাছ থেকে নেমে ছুটে এল। ভাইয়ের পানিতে পড়ার কথা শোনামাত্রই বলনাথ সিং ৮/১০ ফুট উঁচু থেকে পানিতে ঝাঁপ দিল। কিন্তু ওর কোন সুবিধে করার পূর্বেই সলীম মহিন্দরকে নিরাপদে কূলে তুলল। পানি থেকে মুক্তি পেয়ে হুঁশ আসার পর মহিন্দর সিং কন্দন লালের দিকে তাকাল। দিতে লাগে অশ্রাব্য গালি।

মজীদ ও বলনাথ সিং কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই কন্দন লালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আরেকজন ওদের অনুসরণ করল। প্রাথমিক হামলা এতই অকস্মাৎ ছিল যে, কন্দন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগই পেল না। ছেলেরা ওকে মেরে নেতিয়ে দিয়েছে। সলীম ওকে বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

চিৎকার দিয়ে বলছিল— আরে! ওকে মারছ কেন? ধাক্কা দিয়েছ মোহন সিং। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কন্দনের যা প্রাপ্তি, তা সে পেয়েছে। কিন্তু মোহন সিংয়ের যখন তালাশ পড়েছে তখন সে গা ঢাকা দিয়েছে।

www.amarboi.org

পরদিন। স্কুল থেকে ফিরে সলীম মহিন্দর সিংয়ের জনপদ থেকে আসছিল। মহিন্দর বললো–চলো সলীম। মা তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।

সলীম থতমত খেয়ে মজীদ ও অপরাপর সহপাঠীদের দিকে তাকাল। বললো–না মহিন্দর!

বলনাথ সিং ওর বাযু ধরে বললো–চলো না সলীম! আমাদের আম বড় মিষ্টি। সত্যি বলতে কি, মা তোমার জন্য বড় বড় পাকা আম পেড়ে রেখেছেন। তুমিও চলো মজীদ!

মজীদ কিছু বলতে যাবে এমতাবস্থায় মহিন্দরের মা দরজা খুলে ওদের দিকে গভীর ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকান। বলেন–তোমাদের মধ্যে সলীম কে?

সলীমের জবাব দেয়ার পূর্বেই মহিন্দর বলল–মা! ওর নাম সলীম। ও আমাদের বাড়ী আসে না।

মমতাভরে সলীমের মাথায় দু'হাত রেখে মা বলেন- খোকা! যুগ যুগ জিয়ে! আজ তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। এসো না গরীবালয়ে বসবে খানিক। 'আর এ?' মজীদের দিকে তাকিয়ে তার প্রশ্ন, 'তোমার ভাই বুঝি! খোকা তুমিও চলো। তোমরা সবে চলো!'

খানিক পর। সলীম, মজীদ ও গাঁয়ের অন্যান্য ছেলেরা মহিন্দরের উঠানে বৃক্ষের ছায়ায় বসে আম খাচ্ছিল। মহিন্দরের বোন বয়সে ওর বছর দুয়েকের মত ছোট। খানিক দূরে ওদের দিকে তাকিয়েছিল। দু'তিনটা আম খাওয়ার পর সলীম ঝুড়ির অদূরে সরে বসল। মা ওর কাছে এগিয়ে এসে আর একটি আম বের করে বললেন–খাও বেটা! বেজায় মিঠে নাও!

সলীম আম নিল। কচি মেয়েটা আরো ক'টা আম এনে বলল–নাও! খাও!

সাথীদের লাগাতার হাসি সলীমকে ভাবনায় ফেলল।

মেয়েটা বলল–নাও না! সত্যি বলছি খুব মজা।

মেয়েটার মা বললেন–নাও বাবা! ও তোমার বোন!

মেয়েটার হাত থেকে সলীম আম গ্রহণ করল। খুশীতে মেয়েটা বলল–তোমার নাম বুঝি সলীম!

ঃ হ্যাঁ, আস্তে জবাব দেয় সলীম। রাজ্যের লাজুকতা ওর সে জবাবের মাঝে।

খামোশ সলীম। মেয়েটা খানিক ভেবে বললো–মহিন্দরকে খাল থেকে উদ্ধার করেছিলো যে, সে কি তুমি?

সলীমের নিরুত্তাপ ভাব দেখে মহিন্দর বলল–হ্যাঁ বসন্তী। ও-ই আমাকে উদ্ধার করেছিল। ওকে মিঠা মিঠা আম দাও।

মেয়েটা দু'টি আম সলীমকে বের করে পেশ করলে সলীম বলল— বেশ, অনেক হয়েছে। সলীম ওজর পেশ করল। সলীমের অনাগ্রহে হতাশ হয়ে বসন্তী ঝুড়িতে আম রাখল। কি যেন ভেবে অন্দরে ঢুকল। ফিরে এল ও। সাথে কিছু গুড়। ছেলেরা হেসে ওঠল। মা বললেন— খুকী! মেহমানকে খালি গুড় দিতে নেই।

www.amarboi.org

✪ ✪ ✪

জুলাই মাস।

গ্রীষ্মকালীন ছুটি হয়েছে ওদের।

একদিন সলীম আমবাগানে খাট পেতে গভীর নিদ্রা যাচ্ছিল। মাথার পাশে একটা বই পড়ে আছে। মজীদ এল। সলীমের বাযু ধরে বলল— এই ওঠ্।

সলীমের কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় কিছু ঠাহর করতে পারল না।

মজীদ বলল— এই পুঁচকে! উঠছিস না যে।

ঃ মজীদের বাচ্চা! আমাকে ক্ষ্যাপাস না। সলীম পার্শ্ব পরিবর্তন করে বলল।

ঃ আরে উঠবি কিনা বল?

মজীদ খাটের এক কোণ তুলে বলল— এক-দুই-তিন। সলীম খাটের তলায় পড়ে গেল। রাগে ও অগ্নিশর্মা। আশেপাশে কার্যকরী কোন বস্তু নেই। শুকনো আমের ডাল নিয়ে পিছু নেয়। মজীদ দ্রুত গাছে ওঠে। সলীম এবার দু'টি কাঁচা আম হাতে নেয়। মজীদ বলে— আরে এদিকে দেখো।

'ওদিকে পরে দেখব।' বলে সলীম একটা আম ওর দিকে নিক্ষেপ করে। একটা ডালকে আড়াল করে মজীদ করে আত্মরক্ষা।

ঃ আরে করছ কি! আমি তোমার দোস্তকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' ডালের আড়াল থেকে মুখ বের করে বলল মজীদ।

ঃ জানি তা।

ঃ আরে তোমার কাছেই তো আরশাদ।

আরশাদের নাম শুনেই সলীম পেছনে তাকাল। ওর গোস্বা পেরেশানিতে এবং তিক্ততা খুশীতে রূপ নিল। আম ছুঁড়ে মারল ভূতলে।

ঃ খুব ঘুমালে যে আজ।' আরশাদ অগ্রসর হয়ে হাসল।

ঃ না, না। আমার ধারণা, মজীদ খামাখাই আমাকে বিরক্ত করছিল। তুমি জাগালে তোমার আওয়াজ শুনেই উঠে বসতাম। বলে সলীম মালিকে ডেকে বলল— সিন্দুর ও গোল আমের ঝুড়ি পানিতে ফেলো, তার আগে মেহমানের খানার ইন্তেযাম করো।

আরশাদ বলল— ভাই! খানা, সে পাঠ তো ঘরেই চুকে এসেছি।

ঃ পানি পান করায় তো আপত্তি থাকার কথা নয়।

ঃ মজীদ পানি পান করিয়েছে।

সলীম মালিকে লক্ষ্য করে বলল— আচ্ছা, পাকা আম নিয়ে এসো।

মালি বলল— সিন্দুর ও গোল আম সকালে পেড়ে বাড়ী রেখে এসেছি। এক্ষণে অন্য কোন গাছ থেকে পেড়ে দিচ্ছি।

ঃ তার দরকার নেই। আমরা অন্য বাগানে যাচ্ছি।

মজীদ বলল— সলীম! আরশাদকে ভালো আম খাওয়াতে চাইলে সাধুর বাগানে নিয়ে চলো। আমাদের সিন্দুর ও গোল আম খারাপ নয়।

www.amarboi.org

মালি বলল— হ্যাঁ তাই-ই। ওই ধরনের মজার আম গোটা এলাকায়ই নেই।

সলীম বলল— কিন্তু তা যে বহুদূরে।

ঃ পায়দল নয়। আমরা ঘোড়ায় চেপেই যাব।

ঃ কি আরশাদ! ঘোড়ায় চাপতে পারবে তো? প্রশ্ন সলীমের।

ঃ সত্যি বলতে কি, আমের চেয়ে ঘোড়ায় চাপার শখ বেশী আমার। অবশ্য বেলায়েত শাহ্ -এর মত ঘোড়ায় চাপতে যত ভয় আমার। বলল আরশাদ।

ঃ এখন আমার ঘোড়া সেই আগেরটি নেই। তথাপিও মজীদের ঘোড়া দেব তোমায়।

মজীদ! তুমি আফজাল চাচার ঘোড়ায় চাপো।' বলল সলীম।

ঃ 'তুমি আফজাল চাচাকে বলবে।' বলল মজীদ।

ঃ 'চলো।'

কাঠফাটা রোদ্দুর। এর পাশাপাশি আমপাকা গরম। আরশাদের সাথে সলীম ও মজীদ হাবেলীমুখো হতে গিয়ে ভাবল, চাচা এই রোদ্দুরে সওয়ার হতে অনুমতিই দেবেন না।

আফজাল হাবেলীর বাইরে গাছের ছায়ায় বসে পুঁথি পাঠ করছিলেন। পাশে শের সিং উপবিষ্ট। এর ঠিক অল্প দূরে ইসমাঈলসহ জনাআষ্টেকও আড্ডায় মেতেছে। খানিক ভেবে সলীম আফজালের কাছে এসে দাঁড়াল। আফজাল এক লাইনের মাঝে থেমে সলীমকে ঝুঁকে দেখে নিল। শের সিংয়ের দিকে বই বাড়িয়ে দিয়ে ও বলল— নাও তুমি পড়!

শের সিং অগত্যা পুঁথি খুলল। আফজালের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। সলীম বলল— চাচা! চশমা লাগিয়ে নিন না?

ঃ না, ভাইপো! এভাবেই পড়তে দাও। পরশু দিন চশমা চোখে ঝাপসা লেগেছিল। তুমি খামাখাই আমার দু'টাকা খরচ করিয়েছ।

ঃ আচ্ছা চাচা, পড়ো না একটু!

সে পড়তে শুরু করল— 'নাম ছিল তার অসিমুদ্দি... নাহি ছিল বিদ্যাবুদ্ধি...।

আরশাদ যে এখনো ফটকের কাছে দাঁড়ান ছিল হাসতে হাসতে দম আটকে আসার মত।

সলীম আফজালকে বলল— চাচাজী! আপনার ঘোড়াটা কিছু সময়ের জন্য বাইরে নিতে চাই।

ঃ এই তাতানো রোদ্দুরে! খবরদার ওর গায়ে হাত লাগিও না। ঘোড়াটি দিনে দু'বার গোসল করাই। আমার ঘোড়ার জান নেই।

ঃ চাচা! শহর থেকে আমার দোস্ত এসেছে। বাগানের ভালো আমগুলো মালি সকালেই পেড়ে ফেলেছে। আমরা সাধুর বাগানে যেতে চাই।

ঃ 'দোস্ত' শব্দের সঠিক মর্ম আফজাল ছাড়া ভালো আর কে অনুধাবন করবে। তার কণ্ঠস্বরে আচমকা নম্রতা পরিলক্ষিত হল— কৈ তোমার দোস্ত?

ঃ ওই যে দাঁড়িয়ে। সলীম আরশাদের দিকে তাকাল।

www.amarboi.org

ঃ আরে লেখাপড়া করা দোস্ত দেখছি। তা ওইভাবে দাঁড়িয়ে রাখতে আছে? এসো বেটা!

আরশাদ মাথা অবনত করে সামনে এগিয়ে এল।

ঃ বস বেটা!

লাজুক আরশাদ আফজালের কাছটিতে বসল।

ঃ যাও সলীম! শরবত নিয়ে এসো।

ঃ জ্বি-মানে-আমি পানি পান করেছি।

আফজালের তৃষ্ণা একটু বেশী লাগারই কথা।

সলীম দৌড়ে শরবতের গ্লাস নিয়ে এল। অগত্যা ওকে এক গ্লাস পান করতেই হল।

আফজাল বলল— কি সবজান্তা! ঘোড় সওয়ারীর খায়েশ আছে এখনো তোমার?

আরশাদ জবাব দেয়— জ্বি হ্যাঁ। এটাতো পুরুষের স্বাভাবিক খায়েশ। আব্বাজী মহল্লার রোগিদের জন্য ঘোড়া পাঠালে তাতে চাপি আমি। অবশ্য প্রথম প্রথম আমাকে ছোট ঘোড়ায় চাপতে হবে।'

ঃ তুমি ডাঃ শওকতের ছেলে বুঝি?

ঃ জ্বি।'

ঃ তিনি তো আমাদের প্রতি নেহায়েত মেহেরবান ও ভাইজানের দোস্ত। সলীম! দোস্তের জন্য ঘোড়ার জিন আচ্ছা করে কষে দাও।

ঃ শোকরিয়া চাচাজান!

সলীম ও মজীদ খানিকপর ঘোড়ার পিঠে জিন লাগিয়ে নিয়ে এল।

ওরা ঘোড়ায় চাপলে আফজাল বললেন— দেখ বেটা। ঘোড়ার গতি দ্রুত করতে যেও না। তোমাদের সাথী নতুন। আজ গরমও পড়েছে বেশ। সন্ধ্যার দিকে হয়ত ঝড়-বাদলও নামতে পারে। শীঘ্র ফিরে এসো।

ঃ বহুত আচ্ছা, চাচাজান! তাই হবে।

বাগানে পৌঁছে ওরা ঘোড়া থেকে নেমে আম পেড়ে পানি ভর্তি বালতিতে চুবাল। মালি নামল গোসল করতে। ওরা তিন বন্ধু খালের কিনারে বসে মজা করে আম খেতে লাগল।

দীর্ঘদিন পরে আফজালের ঘোড়ার পিঠে বসার সৌভাগ্য হয়েছে মজীদের। দ্রুত আবার জিন লাগিয়ে সরে পড়ে।

সলীম বলে— কৈ যাচ্ছ?

ঃ একটু চক্কর লাগিয়ে আসি। তোমরাও এসো।

ঃ না, না! ঘোড়া আর কোথাও চালাব না। কিন্তু খালের ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে আরশাদের কাছ দিয়ে অতিক্রান্ত হল, তখন সলীম আপনার প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকতে পারল না। ঝট করে জিন লাগানো ছাড়াই ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল।

আরশাদের জন্য দু'সওয়ারের প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেক দিন ধরেই। হয়রান হয়ে ও ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাগানের মালি ওর কাছে এসে বলে— ভাই! তুমিও তো চাপতে পার।

www.amarboi.org

আরশাদ মালির কথার তেমন একটা গুরুত্ব দিল না। তবুও নিরব দর্শকের ভূমিকা ওকে পীড়া দিল। সলীম ওর কাছে এসে বলল— আরশাদ! তুমিও চড়ো। এ ঘোড়া দাম্ভিক নয়। ওকে চালিয়ে দেখতে পার। পরবর্তীতে আমার ঘোড়াই তোমাকে দেব।

আরশাদ জবাব দেয়— আমি তোমাদের মত জিন ছাড়া ঘোড়ায় চাপতে পারব না।

ঃ আচ্ছা, তোমাকে না হয় জিন কষে দিচ্ছি' বলে ঘোড়া থেকে নেমে আরশাদের ঘোড়ায় জিন কষে দেয়।

খানিক পর। বাগানের অনতিদূরে খোলা মাঠে ওরা ঘোড়া চালাচ্ছিল। দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আরশাদ ভড়কে যায়। অবশ্য বেশীক্ষণ তা স্থায়ী হয় না। অবশ্য কেউ সামনে পড়লে লাগাম কষে। ক্রমশই ওর সাহস বেড়ে চলছিল।

ঃ সলীম! তাই ঘোড়াটি বেশ ভালো তো। খুশীতে ডগমগ কণ্ঠ আরশাদের।

ঃ দেখলে! তুমি এমনিতেই ঘাবড়াচ্ছিলে।

সন্ধ্যার দিকে সূর্যের তেজ কমে এল। কিন্তু আকাশে দেখা গেল কালবৈশাখীর কালো মেঘ। সলীম ঘোড়া থামিয়ে বলল— মজীদ! এদিকে দেখ! ঝড় আসবে। চলো বাড়ী ফেরা যাক। ঘোড়া থেকে এক লাফে নেমে মজীদ বলল— ঘোড়ার ক্লান্তি কমে এলে চলতে পারো। নয়ত ঘোড়ার অধিক ঘাম দেখলে চাচা রাগ করবেন।

আরশাদ বলল— আমারও দেরী হয়ে যাচ্ছে, চলো!

ঃ আজকের রাতটা থেকে যাওনা আমাদের এখানে!' বলল সলীম।

ঃ না, ভাই! বাড়ীতে বলে আসিনি! আব্বাজান চটবেন।' বলল আরশাদ।

ঃ সে চিন্তা না হয় নাইবা করলে। সলীম তোমাকে ঘোড়ায় চেপে দিয়ে আসবে। বলল মজীদ।

ঃ হ্যাঁ, আরশাদ। এই ঘোড়ায়ই তোমাকে দিয়ে আসব'। মজীদের কথা সমর্থন করে বলল সলীম।

আরশাদ শান্ত হল। ঘোড়ায় তাজা দম করতে ঘাস-পানি খাইয়ে নিল। সলীম ও মজীদ এক জোট হয়ে ওকে বোঝাল— তোমার ঘোড়ার ঘাম শুকিয়েছে। সুতরাং দেরী করো না। মজীদও বারবার বলছিল, সন্ধ্যা হতে ঢের বাকী এখনও। এত তাড়া দিচ্ছ কেন? সন্ধ্যার কালো চাদর ঢেকে নিচ্ছে প্রকৃতি। সূর্য ডুবেছে সেই কখন। মালি হেঁকে বলছে— ভাই! ঝড় আসছে জলদি হাবেলীতে ফিরে যাও।

সলীম বলল— তাই চলো!

সলীম ও আরশাদ দ্রুত ঘোড়ায় চাপল। বেশী দূরে যেতে না যেতে মজীদ ওদের নাগাল পেল। কাঁচা রাস্তা দিয়ে ওদের ঘোড়া ছুটছে। ক্ষেতের মধ্যে নেমে সলীম নিজের ঘোড়া সামলে নিয়ে আরশাদকে লক্ষ্য করে বলল— আমাকে অনুসরণ করো। মজীদ! তুমি থাক ওর পিছে।

সরুপথ ধরে ওরা চলছে। পথিমধ্যে কোন গর্ত এলে সলীম আরশাদকে সাবধান করত। মেঘের কারণে পরিবেশ অন্ধকারে ডুবে গেল। দিগন্ত প্রসারী ধূলি সে অন্ধকারে

www.amarboi.org

সৃষ্টি করল বিভীষিকা। কদ্দুর যেতে না যেতেই ঝড় ওদের পেয়ে বসল। ঝড়ের প্রথম ঝাপটা খুব একটা প্রবল ছিল না। কিন্তু ধূলিঝড় মাড়িয়ে ওদের পথ চলা হয়ে দাঁড়াল মুশকিল।

আরশাদ চিৎকার দিয়ে বলে— ভাই! কিছুই দেখছি না।

মজীদ ওকে সান্ত্বনা দিল— তুমি এত্মিনানের সাথে ঘোড়ায় বসে থাক। ওটি তোমাকে সোজা হাবেলীতে নিয়ে যাবে।

আচমকা ঝড়ের প্রচণ্ড এক ঝাপটায় রাজ্যের ধুলোবালি ওদেরকে ঢেকে দিল। আরশাদ দু'হাতে খড়কুটোর থেকে বাঁচতে চোখ ঢাকল।

সাথে সাথে শোনা গেল মেঘ-গর্জন। বৃষ্টির বড় ফোঁটা পড়ছে। বড় একটা বৃক্ষের তলে এসে সলীম ঘোড়ার লাগাম কষল। ওর পিছে আগুয়ান ঘোড়াগুলোও থেমে গেল অবলীলায়।

ঃ থামলে কেন? প্রশ্ন মজীদের।

ঃ খানিকটা জিরিয়ে নেই— বলল সলীম।

উভয় হাতে চোখ বন্ধ করে বলল— হ্যাঁ! ভাই খানিকটা জিরালেই ভালো। ধুলোয় চোখের অবস্থা কেরোসিন। ধুত্তুরি ছাই। কিছুই দেখছি না।

মেঘ গর্জনের সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। অবশ্য ক্ষণিকের মধ্যে তা থামল কিন্তু ঝড়ের দাপট কমল না, বরং বেড়েই চলল।

মজীদ বলল— রাত হয়ে যাচ্ছে। খামাখা ভিজে কি হবে?

আরশাদ কিছু বলতে যাবে ঠিক এই মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা আম-ডাল মড়মড় করে যমীনের দিকে পড়ছে। ঘোড়া ভয়ে আরেকদিক ছুটল। সলীম ও মজীদ ফওরান ঘোড়া সামলে নিল, কিন্তু আরশাদের ঘোড়া দূরে চলে গেল। ঘাবড়ে ও ঘোড়া ছুটাল। দূরের একটি গাছের নিচে এসে থামল ও। এখানেও সেই বিপদ। একটা ডাল ওর মাথায় পতিত হওয়ায় ও আছড়ে পড়ে যমীনে। সলীম ও মজীদ এসে দেখল ও বেহুঁশ হয়ে যমীনে পড়ে আছে। ঘোড়া থেকে নামল ওরা। আরশাদ! আরশাদ! বলে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

সলীম ওর মাথা কোলে তুলে নিল। বিজলীর আলোকে ওরা দেখল, ওর মাথা দিয়ে রক্তের ফোয়ারা বইছে। প্রতি ফোঁটা রক্ত জমে গেছে। সলীম বোবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

ডাকল পাগলের মত— আরশাদ! আরশাদ!! তুমি কথা বলছ না কেন। ওর কণ্ঠনালীতে কথা আটকে যায়।

অসহায়ভাবে ও মজীদের চেহারায় তাকায়। মজীদ দ্রুত পাগড়ী খুলে ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধে।

'মজীদ!' সলীম ডাকল ক্ষীণকণ্ঠে, 'এখন...।' মাত্র এ একটি শব্দে সলীম অনেক প্রশ্নের জবাব চায়। অর্থাৎ তুমি বড়। বহুত কিছু বোঝ, অনেক কিছু করতে পার। বলো কি করতে হবে এখন, কি করণীয়?

www.amarboi.org

মজীদ এই প্রশ্নের জবাবে জলদি উঠে দাঁড়াল। বলল— তুমি আমার ঘোড়া ধরো। ওকে কোলে করেই বাড়ী যাব। তুমি এখান থেকে সোজা ওদের বাড়ী যাও। ডাঃ সাহেবকে ডেকে এনো। ছোট ঘোড়াকে ওর মর্জির ওপর ছেড়ে দাও। নিজ ইচ্ছায় বাড়ী যাবে ও।

সলীম অনুভব করল, তার মধ্যে কি এক অদৃশ্য শক্তি কৈশোর মনে উদ্দীপ্ত হচ্ছে। দ্রুত মজীদের ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল। মজীদ আরশাদকে উঠিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল। পরে সলীমের সহায়তায় যুত করে শোয়ালো। এ ঝড়ের মুহূর্তে বেহুঁশ সাথীকে নিয়ে ঘোড়া হাঁকানো সোজা কথা নয়। কিন্তু মজীদ কিশোর হলেও যুবকের শক্তি ওর গায়ে। ওকে দ্রুত পেছনে নিয়ে নিজ পিঠের সাথে মিলিয়ে বসাল। এক হাতে ওকে অপর হাতে লাগাম ধরল। বলল— সলীম! ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে এলে তোমার দোস্তের জান বেঁচে যেতে পারে।

সলীম একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে নারাজ। এক লাফে চাপে ঘোড়ার পিঠে। ক'কদম যাওয়ার পর মজীদের দিকে তাকিয়ে বলল— দেখো মজীদ! ও যখমী। সতর্কতার সাথে বাড়ী নিয়ে যেও। ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে আসছি।

মজীদ জবাব দেয়— 'আরশাদ আমারও দোস্ত। সলীম ওই চিন্তা করো না। দ্রুত যাও!' সলীম ঘোড়ায় পদাঘাত করল।

প্রচণ্ড ঝড়ের দাপট উপেক্ষা করে ঘোড়া মাথা নীচু করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তমসাচ্ছন্নতা বাড়ছে ক্রমশ। সলীমের জানা আছে, সে শহরের দিকে ছুটছে। সরুপথ ছেড়ে খোলা ময়দান দিয়ে ছুটছে ওর পাগলা ঘোড়া। দেড় মাইল চলার পর ও শহরে প্রবেশের সরু রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল।

জীবনে বোধহয় এ প্রথম একনিষ্ঠ, কায়মনোবাক্য ও সহমর্মিতার সাথে আসমান ও যমীনের স্রষ্টার কাছে করুণা ভিক্ষা করল যিনি মহাশক্তিধর ও প্রতাপশালী। প্রতি শ্বাসে ওর হৃদয় কন্দর থেকে বেরিয়ে আসছিল এই দোয়া— আয় আল্লাহ! আরশাদের জীবন ভিক্ষা দাও! মাওলা আমার! ওর প্রতি রহম করো! এটা আমার ভুল— এর প্রায়শ্চিত্ত ওকে দিতে যেও না।

সলীমের দৃঢ় বিশ্বাস, খোদাতাআলা নেককার বান্দাদের দুআ কবুল করে থাকেন। এজন্য ও বলছিল— আয় মাওলা! আমি তোমার এক বান্দা! সামনের থেকে আমি নামায-রোযা কাযা করব না। আমি আরশাদকেও নেক বান্দা হওয়ার রাহা দেখাব। হে মাবুদ! বাবা-মা ওকে পেয়ার করে। ওর ছোট ভাই ও আদরের বোন রয়েছে। যদিও...?' সলীমের চোখে অশ্রুর প্লাবন। ঝড়, বৃষ্টি ও কাদা-পানির অনুভূতিটুকু লোপ পেয়েছে ওর। ঘোড়া বেশ ক'বার পড়তে পড়তে বেঁচে যায় কিন্তু গতি কমায় না ও এতটুকু।

আরশাদদের উঠানে এসে দেখল অন্দরের দরোজা বন্ধ। সলীম ডাকল— ডাক্তার সাহেব! ডাক্তার সাহেব!' কিন্তু অনুধাবন করল ঝড়-বৃষ্টিতে ওর আওয়াজ পাষাণ দরোজা ভেদ করে ভেতরে যাচ্ছে না। বারকয়েক ফটক ধাক্কা-ধাক্কি করে অনুমান করল ফটকের মাঝে যে ফাঁক তাতে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খোলা যায়। ওকে ওই ফন্দি

www.amarboi.org

করতে হল। বাতাসের ঝাপটায় ফটক খুলে গেল। ফটক দিয়ে ভেতরের উঠানে প্রবেশ করল সলীম। কামরায় ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। জানালা ও দরোজার ফাঁক দিয়ে আলো বেরিয়ে পড়ছে।

ঃ ডাক্তার সাহেব! ডাক্তার সাহেব!! সলীম ডাকল।

কামরা থেকে কেউ বেরিয়ে টর্চের আলো ফেলল। বলল— কে?

লোকটা আরশাদদের নওকর। আরশাদের সাথে সলীম একে বারংবার দেখেছে। কিন্তু আজ একেতো ও কাদামাটিতে একাকার উপরন্তু এই আগমন অপ্রত্যাশিত।

সলীম বলল— ডাক্তার সাহেব ডাকুন!

ঃ ডাক্তার সাহেব বাড়ী নেই!

ঃ কোথায়।' সলীমের কণ্ঠে হতাশা।

ঃ মাইল তিনেক দূরে রোগি দেখতে গেছেন।

ঃ আমিও যাচ্ছি সেখানে। ওই গ্রামের নাম কি?

ঃ গ্রামের নাম... তা ঠিক স্মরণ নেই ভাই। আরশাদ জানত। কিন্তু ও তো বাড়ী নেই। বোধহয় ডাক্তার সাহেবের সাথে গেছে। বাড়ীর লোক সকলেই পেরেশান।

সলীমের আরশাদের নামোল্লেখ অনুচিত মনে করে বললো-ঘরে যারা আছে তাদের জিজ্ঞেস করুন— তাঁরা জানতে পারেন।

ঃ প্রথমত ওদের জানার কথা নয়। জানলেও এই প্রলয়ংঙ্কারী ঝড়-বাদলে তুমি যেতে পারবে না সেখানে। দ্বিতীয়ত ডাক্তার সাহেব ওই রোগিকে ছেড়ে তোমার সাথে যাবেন না। তার চে' তুমি ভেতরে যাও। খুঁটির সাথে ঘোড়া বাঁধো। কিছুক্ষণের মধ্যে নাম মনে এসেও যেতে পারে। ওই গ্রামে চৌধুরী রহীম বখশ বাস করেন। তার চিকিৎসায়ই উনি গেছেন।

ঃ লাঙ্গলওয়ালার চৌধুরী রহীম বখশ?

ঃ আরে তবে কি বলছি। শুধু লাঙ্গলওয়ালা নয়— বড় লাঙ্গলওয়ালা।

ঃ তাহলে আমি উঠি। ঘোড়ার রেকাবে পা রাখতে গিয়ে বলল সলীম।

ঃ ভাই! তোমাকে বহুবার আরশাদের সাথে দেখেছি। ওই গ্রামে গেলে ওর বাবার কাছে আরশাদ তার সাথে গেছে কি-না, বাড়ীর সকলে পেরেশান ওর কথা ভেবে।

আরশাদের মা বাইরে এসে বললেন— কে গোলাম আলী?

ঃ জ্বি। একটি বালক। ডাক্তার সাহেবকে ডাকতে এসেছে। এখন ওনার কাছেই ছুটছে।

আমি ওর কাছে আরশাদের কথা বলে দিয়েছি। ও ওখানে থাকলে ডাক্তার সাহেবকে খবর দেবেন।

আরশাদের মা বললেন— হ্যাঁ, বেটা! কাজটা অবশ্যই করো।

ঃ জ্বি হ্যাঁ।

www.amarboi.org

বিজলীর চমকে মা ওর চেহারায় গভীর নযরে তাকালেন। বললেন— বেটা! এ ঝড়ে বেরোতে তোমার বুক কাঁপল না? বাড়ীতে ঝড়ে কেউ নেই?

নিরুত্তর সলীম। মা বললেন— তোমাদের রোগি কে?

সলীম থতমত খেয়ে জবাব দেয়— জ্বি মানে হ্যাঁ, আমার ভাই ঘোড়া থেকে পড়ে চোট খেয়েছে।

ঃ আচ্ছা খোদা হাফেয বেটা! খোদা তাকে চাঙ্গা করেন।

ঃ আরশাদ সম্পর্কে চিন্তা করবেন না। ও ওর বাবার সাথে না থাকলে পাশের গ্রামে কোন দোস্তের বাড়ী থাকবে হয়তবা। সকালের পূর্বেই ওর খবর পেয়ে যাবেন।

ঃ আরশাদকে চেন তুমি?

ঃ জ্বি হ্যাঁ। ও আমার ক্লাস ফ্রেন্ড।' বলে সলীম ঘোড়ায় পদাঘাত করল।

ক্ষেত, সরুপথ ও গ্রাম্যরাস্তা চাপ চাপ কাদা। বাতাসের ঝাপটা ক্রমশ কমছে। কিন্তু বৃষ্টি তথৈবচ। রাস্তা তালাশ করতে ওকে তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি। ওই জনপদের একটা বৃক্ষও ওর কাছে অপরিচিত নয়। ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে ও বহুবার এসেছে।

জনপদে পৌঁছার পর বৃষ্টির ফোঁটা কমে এল। তবুও গ্রাম যেন শ্মশানপুরী। একটি বাড়ী এসে ও ছিটকিনিতে হাত রাখল। ভেতরে কুকুর ডেকে উঠল। ওই ডাকের সাথে আরো ক'টি কুত্তা ডেকে উঠল। মাঝবয়সী এক লোক দরোজা খুলে বেরিয়ে এলেন। সলীম তার প্রশ্নের অপেক্ষা না করে বলল— চৌধুরী রহীম বখশের বাড়ী কোনটা?

ঃ সামনের মোড়ের প্রাচীর ঘেরা বাড়ীটা।

ঃ কাকা! আমার সাথে একটু যাবেন কি? ডাক্তার— বাড়ী গিয়েছিলাম। তার তালাশে আমার এখানে আসা।

ঃ 'চলো।' লোকটা একথা বলে ওর সাথে চললো।

দেউড়ির সামনে এসে তিনি বললেন— এ বাড়ীটা।

দেউড়িতে এক লোক হুক্কা খাচ্ছে। গ্রাম্য লোকটা তাকে বললেন— ভাই ফজলে হক! ডাক্তার সাহেব এখানে আছেন কি?

ঃ ডাক্তার সাহেব বৈঠকখানায়। আর কে এ ঘোড় সওয়ার? এসো ঘোড়া নিয়ে ভেতরে ঢোক। বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কেন?

ঃ না, না। আমার হাতে সময় খুব একটা নেই। আপনি দয়া করে একটু ওনাকে ডেকে দিন।

ঃ তুমি তাঁকে নিতে এসেছ বুঝি?

ঃ হ্যাঁ। তবে ছেলে মারাত্মক যখমী। জলদি ডাকুন তাঁকে!

নওকর দ্রুত ভেতরে গেল। খানিক বাদে সে ফিরে এল। সাথে ডাক্তার শওকত।

ঃ কে? ডাক্তার সাহেব দরোজার থেকে মুখ বের করে বলেন।

www.amarboi.org

ঃ ডাক্তার সাহেব! এখনি আমার সাথে যেতে হবে। আরশাদ যখমী।

ঃ আরশাদ যখমী! কিন্তু তোমার পরিচয়?

ঃ আমি সলীম! আরশাদ আজ আমাদের বাড়ী গিয়েছিল। আমাদের সাথে ঘোড়ায় চেপেছিল। ওর মাথায় গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে। শহর হয়েই এসেছি আমি।

ঃ এখন কোথায় আরশাদ?

ঃ আমাদের বাড়ীতে। জলদি করুন।

ডাক্তার শওকত নওকরের দিকে তাকিয়ে বললেন— আমার জন্য চৌধুরী সাহেবের ঘোড়া তৈরী করো।

ঃ ডাক্তার সাহেব! ঘোড়া তৈরী করতে দেরী হবে। আপনি আমার পিছে বসুন। নিমিষে আমরা পৌছে যাব। আরশাদ এখনো বেহুঁশ।

ঃ দাঁড়াও। আমার ব্যাগ নিয়ে আসছি।

নওকরের হাত থেকে লণ্ঠন ছিনিয়ে নিলেন। মুহূর্তে নিয়ে এলেন ব্যাগ।

ঃ দিন! থলেটা আমার হাতে দিন। সলীম ঘোড়া দেউড়ির কাছে দাঁড় করাল। আপনি রেকাবে পা রেখে আমার পিছে সওয়ার হোন!' যেন নির্দেশ জুনিয়রের প্রতি সিনিয়রের।

ঃ ভাই! ডাক্তার সাহেবকে সামনে বসাও। আর নিজে বসো পেছনে। বলল নওকর।

ঃ ডাক্তার সাহেব সামনে বসলেও রাস্তা চিনবেন না।

সলীম ডাক্তার সাহেবকে পেছনে বসাল! ঘোড়া ঘুরিয়ে পদাঘাত করল সলীম।

ঃ সাবধানে চলো বেটা!

ঃ সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না।

জনপদ থেকে বেরুনোর পর ডাক্তার সাহেবের প্রশ্নের জবাবে সলীম পুরো কাহিনী শুনিয়ে গেল।

ডাক্তার সাহেব প্রশ্ন করেন— আরশাদ যখমী, এ কথা আমাদের বাড়ীতে বলেছ কি?

ঃ জ্বি না। ওদের খেয়াল, ও আপনার সাথে থাকবে। আমি ওদের পেরেশান করতে যাইনি।

ঃ বহুত আচ্ছা। ভালো কাজই করেছ।

বৃষ্টি থেমেছে। মেঘের আড়াল থেকে দু'একটি তারকা উঁকি মারছে। ব্যাঙ ও ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে অবিরাম। পরিশ্রান্ত ঘোড়া মাথা নুয়ে অপারগতার কথা জানাল। কিন্তু সেদিকে খেয়াল করার ফুরসত কৈ সলীমের। জনপদে পৌছুতে পৌছুতে সলীমের মত কাদাপানিতে একাকার হয়ে গেলেন ডাক্তার শওকতও।

আফজাল ও হাবেলীর ক'জন ফটক খুলে দাঁড়িয়ে। ঘোড়ার আওয়াজ শুনে তিনি দূর থেকে আওয়াজ দেন— সলীম! ডাক্তার সাহেব এসেছেন কি?

ঃ এসেছেন চাচা!' বুলন্দ আওয়াজে জবাব দেয় সলীম।

ঃ বেশ দেরী করেছ তুমি।

ঃ চাচা দূরের এক জনপদ থেকে ওনাকে ডেকে এনেছি। আরশাদের অবস্থা কি?

www.amarboi.org

ঃ শোকর খোদার, ওর হুঁশ ফিরেছে।

হাজারো মিনতির জবাব হচ্ছে এটা, যার আকাঙ্খা করেছে ও সারাপথ। আফজাল অগ্রসর হয়ে ওর ঘোড়ার লাগাম হাতে নেন।

অন্দরে আরশাদ বিছানায় শায়িত। সলীমের মার কোলে ওর মাথা। ঘরের নারী ও তরুণীরা ওর পাশে।

আফজালের নির্দেশে নারীরা ওপাশের কক্ষে চলে গেলেন। বাপের দিকে তাকিয়ে আরশাদ অনুতপ্ত হয়ে চোখ বুজল। ডাক্তার সাহেব ওর পাশে বসে বললেন— শাহ্ সওয়ার হওয়া চাট্টিখানি কথা নয় বেটা।

ডাক্তার সাহেব পুত্রের ক্ষত ধুয়ে যখন পট্টি বাঁধছেন তখন গোসল করে কাপড় পাল্টে মসজিদের পথ ধরেছে সলীম।

বাদ নামায আরশাদের কামরায় প্রবেশ করলে মিঃ শওকত ওর দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান। বলেন— কোথায় গিয়েছিলে বৎস?

ঃ জ্বি, মানে। নামায আদায় করতে।

ডাক্তার এবার সলীমের দাদাকে লক্ষ্য করে বলেন— চৌধুরী সাহেব! আপনার পৌত্র খুবই বাহাদুর। শহর হয়ে এসেছে বলে যখন ও মত ব্যক্ত করে তখন বিশ্বাসই করতে পারিনি ওকে।

ঃ ও আফজালের শাগরেদ। ঘোড়া ছাড়া কাউকে বন্ধু ভাবতে পারে না। খোদা আপনার পুত্রকে শেফা দিন। বহুত পেরেশান ছিল ও। ভয়ের কিছু নেই তো ডাক্তার সাহেব?'

ঃ তা অবশ্য নেই। তবুও আগামীকাল ও পরশু ওকে আপনাদের আতিথ্যে থাকতে হবে। পরদিন এসে নিয়ে যাব।

ঃ না, ডাক্তার সাহেব। আপনার পুত্রের পুরোপুরি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আমাদের এখানে থাকবে। সলীমের দাদী ওর শেফায় একটা বকরী মানত করেছেন ইতোমধ্যে। আপনার পরিবারকে নিয়ে আসুন না এখানে। হাবেলীর একটা অংশ খালি করে দেব। কোনই কষ্ট হবে না। আর হাসপাতাল থেকে ছুটি না হলে আমাদের একটা ঘোড়া দেব আপনাকে। দিনে অন্তত দু'বার দেখে যাবেন ওকে।

আফজাল বললেন— ডাক্তার সাহেব! আরশাদকে নিয়ে হয়ত বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে গেছে। আপনি ওদের সান্ত্বনাস্বরূপ দু'খোঁচা লিখে দিলে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি।

ঃ আপনার ভাতিজা বড় সমঝদার। ও ওখানে যখমী হবার ঘটনা প্রকাশ করেনি। এটা ঠিক, ওরা সত্যিই পেরেশান।

সলীম বলল— ডাক্তার সাহেব! আরশাদের আম্মার কাছে ওয়াদা করেছি, অতি সকালেই ওর খবর পৌছে দেব।

ঃ 'তুমি পরিশ্রান্ত বেটা!' ডাক্তার শওকতের কণ্ঠে মহব্বতের সুর।

www.amarboi.org

সলীমের স্থলে আফজাল জবাব দেন— দোস্তের জীবন বিপন্ন হলে পরিশ্রম মাথা কুটে মরে। ডাক্তার তাকান সলীমের দিকে। বলেন— আচ্ছা বেটা! দু'খোঁচা লিখে দিচ্ছি তোমায়। আমার থলেতে কিছু ওষুধ আছে যার দরকার এক্ষণে। আরশাদের মা দিয়ে দেবেন। সাবধানে এনো। ওর মা এখানে আসতে চাইলে বলো, ৮/৯ টার দিকে আমি বাসায় ফিরছি।

চৌধুরী রহমত আলী বললেন— আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি সলীমের সাথে আসবেন। সলীম! তুমি মজীদকেও সাথে নিয়ে নাও। তিনি তোমাদের সাথে আসতে চাইলে ঘোড়ার পিঠে করে নিয়ে আসবে। তুমি তখন কেবল লাগাম ধরে হেঁটে চলবে।

✪ ✪ ✪

চৌধুরী রহমত আলীর ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হল। অতি প্রত্যূষে আরশাদের বাবার চিরকুট ও সলীম-মজীদকে ক'টি প্রশ্ন করার পর বাল-বাচ্চা নিয়ে চলে আসতে প্রস্তুতি নেন। আরশাদের ছোট ভাই আমজাদ মজীদের ঘোড়ায় চাপল। বাকী দু'মেয়ে ইসমত ও রাহাত সলীমের ঘোড়ায়। সলীম ও মজীদ ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে লাগল। নওকর থলে হাতে ওদের পিছে। পথিমধ্যে সলীমকে মা প্রশ্ন করেন— বেটা! তোমার ঘোড়া বহুত ভয়াল মনে হচ্ছে। লাগাম ছিঁড়ে ফেলবে নাতো?

ঃ সে চিন্তা করতে হবে না আপনাকে। এ ঘোড়া তেমন নয়।

ঃ যাই হোক বেটা! লাগামটা শক্ত হাতে ধরো। জানোয়ারের ওপর অধিক আস্থা ভালো নয়।

ঃ বেশ তাই হবে।

কিছুক্ষণ ওদেরকে আরশাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

ইসমত ঘাড় কাত করে রাহাতের কানে কিছু বলল এবং মায়ের নামে শেকায়েত করল।

ঃ আম্মি! ইসমত বলছে, 'ঘোড়া আমায় খেয়ে ফেলবে।' অভিযোগ রাহাতের।

মজীদ ও সলীম মুখ টিপে হাসল। ইসমতের চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে রাহাতের বাযু ধরে ঝাঁকুনি দিল। চিৎকার করে রাহাত বলল— আম্মি! ইসমত মারছে।

ঃ 'কি করছ ইসমত?' মায়ের কণ্ঠে বকুনি।

ইসমতের বয়স সবেমাত্র নয়। রাহাত সাত-এ পা দিয়েছে। আমজাদ চার বছরের শিশু। মায়ের বকুনীতে ইসমত খামোশ। তদুপরিও রাহাতের কানে কানে বলল— ওদের গ্রামে ভূত আছে।

ঃ মিথ্যো বলছ তুমি।' রাহাত বেপরোয়া জবাব দেয়।

রাহাত খানিক ভেবে প্রশ্ন করে— ভাইয়া! তোমাদের গ্রামে নাকি ভূত আছে?

ঃ না।' সলীম জবাব দেয়।

ঃ বাঘ ?

ঃ না। তাও না।

আরো খানিক পরে ও প্রশ্ন করে— সাপ?

www.amarboi.org

ইসমত লঘু কণ্ঠে বলে— গ্রামে বিশাল বিষধর সাপ আছে। ছোট বাচ্চাদের গিলে খেয়ে ফেলে।

রাহাত মায়ের কাছে আবারও অভিযোগ করে— আম্মি! আপা বলছে, সাপ আমাকে গিলে খাবে। আমি গ্রামে যাব না।

মা বকুনি দেন। সলীম ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— গ্রামে সাপ থাকেই না। পথিমধ্যে বর্ষাপ্লাবিত নালা দেখে ইসমত বলল— এবার তুমি ডুবে যাবে!

ঃ কি বললে ডুবে যাব?' রাহাত চিন্তিত মনে সলীমকে প্রশ্ন করে।

ঃ না রে। এখানে অল্প পানি! তোমার আপা খামাখাই ভয় দেখাচ্ছে।

✪ ✪ ✪

আরশাদের মা বাল-বাচ্চাসহ সলীমদের পরিবারের সাথে ভাব জমিয়ে ফেললেন। সলীমের ছোট ভাই ইউসুফ আমজাদকে সাথে নিয়ে বালকদের সাথে খেলাধূলায় মগ্ন। ইসমত ও রাহাত আমেনা, ছোগরা ও যুবায়দার বান্ধবীতে পরিণত হয়। আরশাদ সম্পর্কে ওর বাবার বক্তব্য, আশংকা কেটে গেছে ওর। দুপুরের পর এসে সকলকে নিয়ে যাবার কথা বলে শহরে গেছেন।

যুবায়দার পীড়াপীড়িতে সলীম হাবেলীর বাইরের এক গাছে দোলনা বানায়। ছোট মেয়েরা ওখানে ঝুলত। আরশাদের বাবা ওর সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন বিধায় মা সেদিকে খুব খেয়াল রাখতেন। অযথা গ্রাম্য মহিলারা যেন ভিড় না করে। সলীম আরশাদের মায়ের পাশে বসে থাকত চুপচাপ। সলীমের জন্য এই নির্লিপ্ততা নেহায়েত কষ্টদায়ক। যতক্ষণ কামরায় থাকত ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আরশাদের চেহারায়।

আসরের সময় সলীম নামাযের জন্য বেরুলে আরশাদ ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল— সলীম! সলীম ওর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

আরশাদ বলল— কোথায় যাও, বসো না!

সলীম ওর বিছানায় বসে বলল— নামায আদায় করতে।

আরশাদ ওর হাত ধরে বলল— আজকালের মধ্যেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠব। রাতে আমাকে গল্প শোনাবে তো?

গল্প শোনানোর মেযাজ বদলেছে ওর। এতদসত্ত্বেও আরশাদের আর্জি ফেলতে পারে না ও। বলে-শোনাব।

রাতের আকাশ খুব ভারী মনে হল। আকাশ কেঁদে ওঠল। সেই অশ্রু ভেজাতে লাগল গোটা প্রকৃতিকে।

আরশাদ বারান্দায়। আরশাদের বাবা সন্ধ্যার দিকে এসে সপরিবারে অন্দরের এক প্রশস্ত কামরায় ঘুমালেন। বাদ ইশা আরশাদের কাছটিতে বসে কাহিনী বলা শুরু করল সলীম। আমেনা, ছোগরা, যুবায়দা ও আরশাদের বোনেরাও বসল। মেয়েরা পরস্পর কথা বলছিল।

হঠাৎ যুবায়দার কানে সলীমের আওয়াজ গেল। বলল— আমেনা! ভাইজান গল্প বলা শুরু করেছেন।

www.amarboi.org

ওরা এবার আরশাদের খাটে চলে এল—। রাজিয়া বলছিল— ভাইজান! আমরাও শোনব। শুরু থেকেই বলুন।

ছোগরা বলল— এসো ইসমত। সলীম ভাইয়া বড় মজার কাহিনী বলে থাকেন।

সলীম কিছুটা টালবাহানা করল। কিন্তু ইসমত ও রাহাত এলে ওর টালবাহানা দূর হল। বলল— তোমাদের কেউ শোরগোল করলে পেটাব কিন্তু।

রাহাত গোবেচারা ভাবে বলল— পেটালে আমি ঘরে চলে যাব। সলীমের মা-চাচী যারা ওপাশের কামরায় কথা বলছিলেন হেসে দিলেন।

ঃ 'তোমাকে নয়। এসো বসো।' বলল সলীম।

রাহাত অকৃত্রিমভাবে সলীমের পাশটিতে এসে বসল। আমেনা একটা বেঞ্চ নিয়ে খাটের পাশে এল। মেয়েরা বসল তাতে।

সলীম কাহিনী সংক্ষেপ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। অন্য সময় শোনালে মাঝপথে বন্ধ করত কিন্তু আজ সে চেষ্টা করার পূর্বেই আরশাদ বলে রাখল— না ভাই, কাহিনী মাঝপথে বন্ধ রাখবে না। পুরোটাই শোনাবে।

ইসমত সম্পর্কে সলীমের ধারণা, ভাইয়ের মত ও মেধাবী। কাহিনী শোনানোর পূর্বে ওর অধরে দেখা দিয়েছিল দুষ্টুমির হাসি। কিন্তু গল্পের মাঝপথে দেখা গেল ও-ই সবচে' অধিক সমঝদার শ্রোতা।

সলীমের গল্পের শাহাজাদা কোন মরুতে পিপাসায় কাতরাচ্ছিল। মোমবাতির আবছা আলোয় ইসমতের অব্যক্ত দৃষ্টি যেন বলছে— হায়! আমি যদি ওকে পানি পান করাতে পারতাম। সলীমের কেচ্ছায় স্বপ্নের শাহ্জাদা রক্তপিপাসু ডাকাতদের শেকলে বাধা; ইসমতের মুখ ও চোখের আকৃতি যেন এ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে যে, হায়! কেউ যদি ওর শেকল খুলে দিত। তাহলে ওর খুবছুরত চেহারা খুশীতে ঝিলিক মারত। কাহিনীর পরিশিষ্ট খুবই বেদনাদায়ক। শাদীর মাহেন্দ্রক্ষণে শাহাজাদা ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যাবে। শাহজাদী জানাযা দেখে উঁচু মহল থেকে ঝাঁপ দেবে; কিন্তু সলীমকে ইসমতের দিকটা চিন্তা করার দরকার পড়ল। তাই কাহিনীটা একটু ঘুরিয়ে বলল— শাহজাদা ঘোড়া থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। সুতরাং শাহ্জাদীর মহল থেকে ঝাঁপ দেয়ার দরকার পড়ল না।

এ কাহিনী শেষ হলে মেয়েরা আরো একটা কাহিনীর আবেদন জানাল। কিন্তু সলীমের মা বললেন–না! কালকে শোনা যাবে। এখন আরশাদের বিশ্রামের প্রয়োজন।

সলীম উপরতলায় শুতে গেল। হাবেলীর বাইরে মানুষের শোরগোল চরমে। চাচা ইসমাঈল হাসছেন। মজীদও ওখানে থাকবে হয়ত, এ ভেবে সলীমের ওখানে যাবার ইচ্ছে হল। কিন্তু পরিশ্রমের দরুন ওর আর যাওয়া হল না। ঘুম নামলো দু'চোখে। স্বপ্নের রঙিন জগতে পৌছে যায় ও।

ও এক শাহজাদা। এক শাহজাদী তাকে স্বপ্নের উপত্যকায় হিংস্রপশুদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে। এরপর শাহজাদীকে এক ভয়ানক জ্বিন এমন ভয়াল পাহাড়ে নিয়ে

www.amarboi.org

য়ায় যেখানে পৌঁছার তামাম পথ রুদ্ধ। হাওয়ায় উড়ে যাওয়াও সেখানে সম্ভব নয়। সাহারা মরুতে তৃষ্ণায় সে তড়পাচ্ছে। জনৈকা শাহ্জাদী তার জন্য নিয়ে আসছে শরাবান তহুরা। সে শাহ্জাদীকে দেখতে অবিকল ওই চেহারার মত যে চেহারাখানি এক্ষণে ওর সম্মুখে বিচরণ করছে।

সকালে নিদ্রাঘোরে সলীম অনুমান করছে কে যেন ওর চেহারায় পানি ছিটাচ্ছে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে ও। পানির বদনা হাতে আমেনা দাঁড়িয়ে।

ঃ দাঁড়া আমেনার বাচ্চী!'— রাগতকণ্ঠে বলে সলীম। ওর পেছনে যুবায়দা ও ইসমতকে দেখে সলীমের রাগে পানি পড়ে।

আমেনা বলে— দেখলে! ভালো কাজের বিনিময় একগুচ্ছ গালি। নামাযের ওয়াক্ত যেতে বসেছে আর উনি দিব্যি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন!

সলীম কোন বাক্যব্যয় না করে পানির বদনা হাতে তুলে নেয়। বাইরে বেরুতে ইসমতের চেহারায় একবার আড়চোখে তাকায়। এ যেন স্বপ্নের শাহ্জাদীকে চর্মচোখে এক ঝলক দেখে নেয়ার কসরত।

এর ঠিক ছ'দিন পর ডাক্তার শওকত আরশাদকে নিয়ে যান। বিদায়বেলা আরশাদের মা সলীমের মা-চাচীদের বলে যান— মাঝে মধ্যে তিনি এভাবে জ্বালাতন করতে আসবেন। আমেনা, যুবায়দা ও ছোগরার থেকে বিদায় নেয়ার সময় ইসমত ও রাহাতের চোখে অশ্রু-প্লাবন। সলীমের দাদীকে এ ওয়াদা করতে হল, ওদের সখীদের মাঝে মধ্যে শহরে পাঠাবেন।

পরবর্তীতে সলীমের মা দু'তিন সপ্তাহ অন্তর এ জনপদে পা রাখতেন। ওদের আনতে দেরী হলে সলীমের মা-চাচীরাই খোদ্ ওদের বাড়ীতে যেতেন।

আরশাদের বাবা ছেলেকে বাইসাইকেল কিনে দেন। এজন্য প্রতি রোববার ও সলীমদের বাড়ীতে আসত। ও না এলে সলীম ঘোড়ায় চেপে শহরে যেত।

ছুটির দিনে মজীদ ছেলেদের নিয়ে কাবাডি খেলায় মেতে উঠত। কুস্তি লড়ত। আফজাল থেকে কৌশল রপ্ত করত। সলীমের কর্মব্যস্ততা ও চিন্তা-চেতনায় এ বয়সেই বড় রকমের একটা ফারাক পরিলক্ষিত হতে লাগল।

✪ ✪ ✪

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিন।

শীত মৌসুমের নিষ্ঠুর আবহাওয়া পত্রপল্লবের প্রতি যে চরম আঘাত হেনেছিল এক্ষণে সবুজ কুঁড়ি ও মুকুল-এর অলঙ্কারে তা ঢাকা পড়েছে। নাশপাতি, আমড়া ও আপেলের বাগানে এল নব উন্মাদনা। পত্র পুষ্পে পল্লবিত বন-বিথীকা। ক্ষেত-খামারের গম ফিরে পেল প্রাণ। শুষ্ক ডাটা লকলকিয়ে উঠছে যেন। কনের গায়ে হলুদের মতই সর্ষে বনে পরিবর্তনের দোলা। গোটা প্রকৃতিতে ঋতুরাজ বসন্তের আবীর ছোঁয়া। প্রকৃতিকে নববধূর সাজ দিতে যেন তার মিশন। কুঞ্জ বিথীকায় কোকিল পাপিয়ার কুহুতান। যেসব পুষ্পের জীবনকাল মাত্র কেবল একদিন; সেগুলো তার ফুলকলিতে

www.amarboi.org

জমরুদ ও ইয়াকুতের প্রলেপ দিয়ে যাচ্ছে। এগুলো বিধাতার মহাশক্তির এক অপার কারিশমা। ধনধান্য আর পত্রপুষ্পের এ মনমাতানো রূপ, এ রং ও সুবাসের মাহাত্ম্য-গুনে কবি-সাহিত্যিকগণ বোধহয় রচনা করতে পারেনি স্বতন্ত্র শব্দমালা। নীরব প্রকৃতি মর্ত্যের মানুষকে তার বোবা কণ্ঠ দিয়ে যেন ডেকে বলছে— আমাকে দেখো, সুবাস নাও, অধর নামিয়ে দাও, কোথায় যাচ্ছ হে উদাসীন পথিক? কিসের নেশায়, কার অন্বেষায়? আমার জীবন ক্ষীণ, স্বল্প ; কিন্তু তোমার জন্য আমি এক অম্লান বাস্তবতা নিয়ে এসেছি। কেউ আমাকে গড়েছে, কেউ দিয়েছে প্রাণ, সিঞ্চিত পানিতে করেছে ধন্য, আমার সুবাস-সৌরভ ও মাদকতা বিশ্ব নিয়ন্তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব প্রমাণ করছে। এ সেই সত্তা যার কথায় বায়ুর চলন, মেঘের গর্জন, বৃষ্টির বর্ষণ, অবশেষে শুষ্কপ্রায় যমীনে প্রাণের সঞ্চার। সেই মহামহীমের কুদরতি হাতের ছোঁয়া অমানিশার বুক চিরে গজিয়েছে আমায়, যা আমার হাসি, কানাকানি ও সৌরভ সবই অন্তরীক্ষের তারকার মিটিমিটি চাহনী আর জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অবদান। রাতের বিশ্বপ্লাবী তমসা দূর করে সুব্‌হে সাদিকের আলোকবন্যার বার্তা নিয়ে আসে যে সূর্য; তার ছোঁয়া থেকে তোমরা কোথায় পালাচ্ছ ? কোথায় যাচ্ছ ? এসো! আমার ভুবনে— খোশ্‌ আমদেদ।

ঋতুরাজ বসন্তের এ সুন্দর পরিবেশে সলীমের দিল-মন গ্রামেই লেগে থাকতে চায়। অতি সকালে উঠে নামায পড়ে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। গাঁয়ের কোন উঁচু পর্বতে দাঁড়িয়ে বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ের ওপাশ থেকে উদীয়মান সূর্যের নয়নাভিরাম- দিলকাশ দৃশ্য উপভোগ করত। শিশিরসিক্ত পত্রপল্লব থেকে জুঁই-চামেলী ও রজনীগন্ধার থোকা তুলে নিত। দলবদ্ধ শকুনের অজানার উদ্দেশে পাখা মেলে উড়ে যাওয়ার দৃশ্যও ওর দৃষ্টি থেকে এড়াত না। শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়ানোর আনন্দও আলাদা। সে আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হয়না ও। ঊষালগ্নের এ দিলকাশ প্রকৃতি উপভোগ করে ঘোড়ার পিঠেই বাড়ী এসে নাস্তা-গোসল সেরে গাদা বই বুকে আগলে স্কুলের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়া ওর নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

কোন এক রোববারে ও বাড়ীর ছাদে আরশাদের অপেক্ষা করছে। কিন্তু সময়মত আরশাদ এল না। পরদিন আরশাদকে স্কুলে মনমরা অবস্থায় পেল ও। বলল— কি আরশাদ! কেউ তোমায় মেরেছে?

নিরুত্তর আরশাদ।

ঃ 'গত রোববার তুমি আমাদের বাড়ী যাওনি। এ রোববারে কিন্তু যাবে।' জবাব দেয়ার স্থলে আরশাদ অশ্রুসজল নয়নে ওর দিকে তাকায়। সলীম চিন্তান্বিত হয়ে প্রশ্ন করে— হয়েছেটা কি বলো আরশাদ। ঘরের কারো অসুখ করেনিতো?

ঃ সলীম! আব্বাজান বদলী হয়েছেন। পরশু যাচ্ছি আমরা?

ঃ কোথায়?' অবরুদ্ধ কণ্ঠ সলীমের।

ঃ 'অমৃতসর!'

সলীম প্রতিক্রিয়া জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেছে ইতোমধ্যে। জাতীয় সংগীতের পর সকলেই ক্লাসরুমে গেল। পালাক্রমে ওস্তাদ এলেন।

www.amarboi.org

ক্লাস নিয়ে গেলেন। কিন্তু মন মুকুরে কেবল 'অমৃতসর' শব্দটা গুঞ্জন করে ফিরল। বারবার এ ভরসায় আরশাদের দিকে কাতর নয়নে তাকায়, যেন আরশাদ বলে— আমি ঠাট্টা করেছি। কিন্তু আরশাদের মলিন মুখ ওর কাতর দৃষ্টিকে ব্যথিত করে ফেরায়।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল। ছেলেরা সকলে বইখাতা নিয়ে বাড়ীর উদ্দেশে ছুটল। আরশাদ ও সলীম কেবল অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। অন্যান্য সাথীরাও ওর অপেক্ষায় বাইরে।

মজীদ দরোজায় দাঁড়িয়ে বলল— এসো সলীম! নয় তো আমরা চললাম!

ঃ 'এই আসছি!' বলে সলীম ব্যাগ ওঠাল। কিন্তু দু'চার কদম আগে বেড়ে আবারো আরশাদের দিকে তাকাল।

ঃ 'আমাদের বাড়ী যাবে না? আম্মীজান তোমার স্মরণ করেছেন!'

ঃ চলো!'

আরশাদ সলীমের সাথে বেরুলে মজীদ বলল— তোমাদের কথা দেখছি শেষ হতেই চায় না?

ঃ মজীদ! আমাকে একটু ওদের বাসায় যেতে হয়!'

ঃ তা আমি আগেই জানতাম।

ঃ আম্মিজান হয়ত সলীমের কাছে কোন খবর দেবেন— চলো তুমিও!' বলল— আরশাদ।

গুলতি দিয়ে শেষ বিকেলে ঘুঘু শিকারের প্রোগ্রাম ছিল মজীদের। তাই ও বলল— না আমি যাব না।

সলীম ও আরশাদ বাসায় এল। আরশাদ বলল— একটু দাঁড়াও! তোমাকে একটু তামাশা দেখাই।

সলীম দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। আরশাদ মুচকি হেসে অন্দরে প্রবেশ করল। মা বললেন— বেটা! তোমাকে না বলেছি, সলীমকে নিয়ে আসবে?

ঃ 'আম্মিজান! ও আসেনি!' আরশাদের মলিন উত্তর।

ঃ আমরা চলে যাচ্ছি, তা ওকে বলোনি?

ঃ বলেছিলাম, কিন্তু তারপরও এল না!

ইসমত এসে বলল— আম্মিজান! বললে ও না এসে পারত না। ভাইজান আসলে বলেনি!

ঃ 'ও বলেছিল, ইসমত একটা ডাইনি। ও আমাকে জ্বালাতন করে আমি যাব না।' আরশাদের মুখে দুষ্টুমির হাসি।

ঃ আপা ডাইনি! আপা ডাইনি! তালি বাজাতে বাজাতে রাহাত বলল।

ঃ তুমি অসত্য কথা বলছ! ও আমাকে ওকথা বলতে পারে না।

ঃ তোমার মুখের ওপর বললেও বিশ্বাস করবে না?

আরশাদের চেহারায় হাসির বন্যা দেখে ইসমত দেউড়ির দিকে ছুটল। সলীম ওকে দেখে হেসে পড়ল। ইসমত অপ্রস্তুত হয়ে মুখ কাচুমাচু করল। অবশ্য খুশীতে ওর নয়ন পুঁতলী চকচক করছে।

www.amarboi.org

সলীম স্কুল ব্যাগটা ওর মাথায় তুলে দিল। মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে হাসল খানিক।

ঃ দেখো! ফেলে দিও না যেন। আমার শ্লেট ভেঙ্গে যাবে।' সলীম হাত নামাল। ইসমত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ব্যাগ পড়ে যেতে লাগলে শক্ত করে দু'হাতে ধরল।

সলীম অগ্রসর হয়ে মাকে সালাম করল।

ঃ দীর্ঘজীবী হও বেটা! বসো!' পাশের মোড়ার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

রাহাত মায়ের হাত ধরে বলে— আপা ডাইনি না?

ঃ না, তা হবে কেন? ডাইনির চুল ইয়া বড় আর উস্কু খুস্কু। সে জুতা পায়ে দেয় না কোনদিনও।

রাহাত পেরেশান হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকায়। মাথার চুলে হাত দেয়। চুল পরিপাটি করে অন্দরে ভোঁ দৌড় দেয়।

মা বললেন— ইসমত যাও! সলীমের জন্য গাজরের হালুয়া বানিয়ে আনো। টি টেবিল এক কোণ থেকে সলীমের সামনে রাখল আরশাদ। বসল তাতে।

ঃ বেটা! চা বানাব কি?

ঃ না।

ইসমত হালুয়ার প্লেট এনে রাখল। মা বললেন— বেটা! মজীদকেও নিয়ে আসতে!

ঃ বলেছিলাম। কিন্তু আসেনি।' বলল আরশাদ।

ঃ ঘুঘু শিকারে পেয়ে বসেছে ওকে। সন্ধ্যায় ঘুঘু ধরা পড়ে। ও সেই ফিকিরে ছিল।

আমজাদ উঠানে ডাণ্ডা-গুলি খেলছিল। এ প্রথম ও সলীমের দিকে নযর করে বলল—

ঃ আমাকে একটা ঘুঘু দেবে কি ভাইয়া?

ঃ দেব না কেন?' বলল সলীম। আমজাদ খেলায় মাতল আবারও।

মা বললেন— আরশাদ হয়ত তোমায় বলেছে, ওর আব্বাজান অমৃতসর বদলী হয়েছেন।

ঃ 'জ্বি হ্যাঁ!'

ঃ তিনি দশদিনের ছুটি নিয়েছেন। আমার যা ধারণা, যাবার পূর্বে তিন দিন তোমাদের বাড়ী বেড়ানোর সুযোগ দেবেন। ওই সময় তোমাদের মা-চাচীদের দাওয়াত করে এখানে নিয়ে আসব।

কিন্তু জলন্ধরে আরশাদের মামার বিয়ে। পরশু আমরা ওখানে যাচ্ছি। তাই কাল সকালে তোমাদের ওখানে যাব। সন্ধ্যায়ই ফিরব ইনশাআল্লাহ।

ঃ 'আম্মিজান! আমিও যাব!' বলল ইসমত।

ঃ আমরা সকলে যাব। তোমার আব্বা মালপত্র গোছানোয় লেগে থাকবেন। সম্ভবত তার যাওয়া হবে না।

ঃ আমি ঘোড়া নিয়ে আসব!

ঃ না! এর দরকার নেই। আমরা টাঙ্গায় যাব। সড়কে টাঙ্গা রেখে ওখান থেকে হেঁটে যাব।

www.amarboi.org

সন্ধ্যার দিকে সলীম যাবার এজাযত চাইল। জনপদের উদ্দেশে করল রওয়ানা। পশ্চিম প্রান্তে সূর্য শেষবারের মত পৃথিবীকে দেখে নিচ্ছে। সান্ধ্য লালিমা পাহাড়কে সিন্দুরের প্রলেপ দিচ্ছে। দূরের সফেদ পাহাড় বরণ ধারণ করছে। কিচির-মিচির করে বিহঙ্গকুল চলছে আপন নীড়ে। শকুন ও চিলগুলো দিনান্তের ক্লান্তি শেষে আরো উপরে উঠছে অজানা গন্তব্যের আশে। পঙ্গপাল ঝাঁকে ঝাঁকে ঠাঁই নিচ্ছে ক্ষেতের মধ্যে।

সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু তার বিদায়ী কান্না লালচে বরণ ধারণ করে আছে গোটা আকাশ জুড়েই।

একটা জলাশয়ে অযু করে নামাযে দাঁড়ায় সলীম। সরুপথে একটা খরগোশ ওকে দেখে পালায়। কিন্তু এগুলোর প্রতি ওর নযর নেই। নালার অপর পাড়ে দুটো সারস পাখি চঞ্চুতে চঞ্চু মিলিয়ে প্রেম নিবেদন করছে। সলীম সেদিকে তাকিয়েও তাকায় না।

ও বড্ড পেরেশান— আরশাদ যাচ্ছে, আমজাদ যাচ্ছে। যাচ্ছে ইসমত ও রাহাত; আমার নিষ্পাপ হাসি-কোলাহলের জানাযা দিয়ে।

পরদিন।

✪ ✪ ✪

এক মাইল দূরের সড়কে ও দণ্ডায়মান। টাঙ্গার অপেক্ষায় থেকে থেকে সর্ষে ফুল ছিঁড়তে থাকে। বানায় তদ্দারা তিন গাছা মালা। সর্বাপেক্ষা বড়টা ইসমতের। তদপেক্ষা ছোটটা রাহাতের। সর্বকনিষ্ঠটি আমজাদের। পরে কি ভেবে মালা তিনটি ছিঁড়ে সর্ষে ভিটেতে লেলে দেয়। তারপর সরুপথের কোণে বসে পড়ে। পকেট থেকে চাকু বের করে জমি ফুটা করে। এক বিঘত খোদাই করার পর মাটি দ্বারা তা ভরাট করে ফেলে। উঠে তাকায় চারদিক। ক'জন পথিক চলে যায়, কিন্তু দৃষ্টির শেষ সীমায়ও কোন টাঙ্গার টিকিটি নেই। হতাশ হয়ে বসে পড়ে। চাকু দ্বারা সরুপথের উঁচুনীচু মাটিতে রেখা টানতে থাকে। সর্ষে ক্ষেতের সজীবতা তখনও তথৈবচ। কিন্তু ইসমতের জন্য মালা বানানো ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। রেখায় রেখায় চারদিক ভরে তুলল সলীম।

অতঃপর একটি রেখাহীন জায়গা বেছে নিল। এবার রেখা টানার স্থলে বৃত্ত বানিয়ে নাম লিখতে লাগল। নিজের নাম লিখবার পর মজীদ, আমজাদ ও স্কুলের অন্যান্য বন্ধুদের নাম লিখতে লাগল। পরে প্রাইমারীর সাথীদের নাম মনে এল, তাদের নামও লেখা শেষ। ওই জায়গাটিতে নামে নামে একাকার হয়ে যাওয়ায় অন্যস্থান বেছে নিল। সুতা ছেঁড়া ফুলগুলোর পাশে এবার আরেকটি নাম লিখল। এ নামটিকে প্রথমেই লেখার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল। 'ইসমত' নামটি উচ্চারণ করার সাথে সাথেই ওর চোখে ভেসে ওঠে হাসি-কোলাহলমুখর একটি প্রাণোচ্ছল মুখ। কানে গুঞ্জরিত হয় মিষ্টি মধুর আওয়াজ। আচমকা ওর মনে হল, বন্ধুদের নামগুলো যেন ওর দিকে চেয়ে হেসে উঠছে। দ্রুত ও ইসমতের নামটি মুছে ফেলে। তাকায় সড়কের দিকে। দু'ফার্লং দূরে টাঙ্গা দেখা গেল। দ্রুত অপরাপর নামগুলো মিশিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সলীম।

www.amarboi.org

টাঙ্গা কাছে এল। ফুলের মালা ওঠাল কিন্তু কি ভেবে ছেঁড়া মালা আবারও ছিঁড়ে ফেলল। টাঙ্গা সরুপথের মোড়ে থামল। আমজাদ ও রাহাত ওর ছেঁড়া মালা খামচে নিল। ইসমত ঘাবড়ে দূরে দাঁড়াল। রাহাত বলল— আপাকেও দাও না তোড়া একটা!

ঃ 'আমি ফুল নেব না!' গোমড়া মুখে চাপা আওয়াজ ইসমতের।

মা বললেন— বেটা! এখানে কতক্ষণ ধরে তুমি?

ঃ দীর্ঘক্ষণ ধরে।

ঃ 'আমরা দেরী করে ফেলেছি। আমার ধারণা ছিল তুমি ঘোড়া নিয়ে শহরে যাবে!' বলল আরশাদ।

ঃ এখানে পায়দল না এলে হয়ত অমনই করতাম।' বলল— সলীম। আরশাদের মা কোচোয়ানকে বললেন— এখন তুমি যাও। সন্ধ্যার দিকে আমরা পায়ে হেঁটে যাব!

আরশাদ আমজাদের হাত ধরে আগে চলল। মা, ইসমত, রাহাত ওর পেছনে। সলীম ক্ষেত থেকে ছেঁড়া ফুল দিয়ে স্তবক বানাতে বানাতে চলল। তোড়া তৈরী হলে তা চুপে চুপে ইসমতের মাথায় পরিয়ে দিল। ইসমত প্রথমে চমকে গেলেও পরে ফিক করে হেসে উঠল। মুঠে নিল তোড়া।

এবার রাহাতকে বলল— দেখো! তোমার তোড়াটি কিন্তু ছোট। আমারটা বড়। তোমার তোড়া এক রঙের, আর আমারটা রকমারী।

রাহাত হাসছে। কিন্তু এক সময় ও কি বুঝে রেগে উঠল। মুহূর্তে বসে পড়ল মাটিতে। আরশাদ ও ওর মা হাসছেন। সলীম ওকে বুঝাচ্ছেন, দেখো ভাই! সামনে আরো ফুল আছে। তোমাকে ইয়া বড় তোড়া বানিয়ে দেব।

ঃ আমাকে লাল ফুলের তোড়া বানিয়ে দিতে হবে।

ঃ আচ্ছা, তাই দেব।

এবার আমজাদের পালা। সে তোড়া ছুঁড়ে মেরে বলল— আমিও লাল ফুল চাই! সলীম সান্ত্বনা দিয়ে বলে— আচ্ছা তাই হবে।

হাবেলীতে পৌছে ইসমত, রাহাত, যুবায়দা ও ছোগরা খেলায় মেতে ওঠল। ওদিকে আরশাদ, সলীম, মজীদ ও গোলাপ সিং ক্ষেত-খামারে বিচরণ করতে লাগল। হাবেলীর মহিলাদের আশা— আরশাদরা অন্তত একটা রাত থাক। কিন্তু ওর মা কাল দশটার গাড়ীর বুকিং-এর কথা জানালে তাঁরা আর তেমন পীড়াপীড়ি করলেন না।

আরশাদের মাকে সলীমের মা চিঠিপত্রে খোঁজ-খবর রাখার ওয়াদাও করালেন।

মাঝে মধ্যে বেড়ানোরও আহ্বান রাখলেন। সলীমের ছোট বোন যুবায়দা ও চাচাত বোন আমেনা ও ছোগরা পত্র লেখার অঙ্গীকার করল। বিদায়বেলা আরশাদ মায়ের কানে কি যেন বলল। তিনি সলীমের মাকে বললেন— বোন! সলীমকে আমাদের সাথে যাওয়ার অনুমতি দিন। রাতটা আমাদের সাথে থেকে গাড়ীতে ওঠার পর ওখান থেকে ও স্কুলে যাবে।

মা সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

www.amarboi.org

রাতের বেলা ইসমত, রাহাত ও আমজাদ ওদের বাড়ীর এক প্রশস্ত কামরায় বসে কেচ্ছা শুনছিল সলীমের মুখ থেকে। ওপাশের কামরায় ডাঃ শওকত ইজি চেয়ারে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। আরশাদের মা বক্স খাটে কাত হয়ে সোয়েটার বুনছিলেন।

ঃ 'সলীম বড় গুণধর ছেলে!' ডাক্তার সাহেব বিবির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আজ আমি আরশাদের টি,সি আনতে গিয়েছিলাম। হেড মাস্টার ওর প্রশংসা করলেন।

বিবি মুচকি হেসে বললেন— আজ আমি ওর মাকে বলেছি, বউ তালাশের খোঁজে বের হলে প্রথমে আমার কাছে এসো। রাগ করেননি তিনি এতে; বরং ইসমতকে কোলে তুলে আদর করেছেন। শুধু কি তাই! তিনি আরো বললেন, তালাশ করার দরকার কি বোন! বউতো আমি নির্বাচিত করেই রেখেছি। কাজেই উদ্বোধনী মিষ্টিটা তুমিই বিলি করো!

ঃ আরে এটাতো মেয়েলি প্যাঁচাল! ওরা দুধের বাচ্চা এখনও। আর তুমি সানাই খুঁজছো?

ঃ উঠে দেখুন না! জুটি মানিয়েছে কি সুন্দর। আমার কথা হল, দু'তিন বছরের মধ্যে কথা পাকাপাকি হয়ে যাবে। আজকাল ভালো বংশ পাওয়াই মুশকিল। খান্দান ভাল হলে ছেলে হয় আওয়ারা।

ডাঃ সাহেব খানিক নরম হয়ে বলেন— ওদের খান্দান মন্দ নয়। ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিলে পরে ওসব ভাবা যাবে।

ঃ এ ধরনের ছেলেকে মূর্খ বানায় যে সেও মূর্খ। ওর মার ইচ্ছে, ও উচ্চ শিক্ষাই পাবে।

ঃ বিলেত থেকে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে আসলে তুমি কোন আশা করতে পার না। কেননা, সে তখন না তার বাবা-মার কথা শুনবে, না আমাদের। এটাই বিলেতের উচ্চ শিক্ষার পরিণাম।

ঃ খোদার দিকে চেয়ে অমন কথা মুখে আনবেন না।' মার চোখে পানি। পরদিন সলীম স্টেশনে সকলকে বিদায় জানাচ্ছিল। রাজ্যের ধূলিঝড় উড়িয়ে গাড়ী এল। সকলেই চাপল তাতে। আরশাদ বাবার সাথে পুরুষ কম্পার্টমেন্টে বসল। ইসমত, রাহাত ও আমজাদ নারী কম্পার্টমেন্ট-এ। ওদের নওকর ট্রাকে মাল বোঝাই করে সকালেই রওয়ানা হয়ে গেছে।

গাড়ী সিটি বাজাল। জানালা দিয়ে হাত বের করে ডাঃ সাহেব হাত নাড়ালেন। সলীমের সাথে আখেরী মোসাফাহা করলেন। এরপর আরশাদ। আরশাদের চোখ অশ্রুতে টইটম্বুর। হাত দিয়ে গড়ানো পানি জামায় মুছল ও। নারী মহল থেকে ইসমত ও রাহাত ঝুঁকে ওর দিকে তাকায়। গাড়ী শেষ বাঁশি বাজায়। দৈত্যাকৃতির ইঞ্জিন এক সময় নড়ে ওঠে। 'ঝম ঝম' করে গাড়ী চলে। ইসমত ওড়নায় মোছে প্রিয়জনহারা বেদনাশ্রু। এক সময় সলীম ও তার দৃষ্টির সামনে আড় হয় বাঁধভাঙ্গা অশ্রু। সিটে গিয়ে বসে ইসমত। সলীম কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ওই তো গাড়ীটার শেষ ঝলক দেখা যাচ্ছে। ওই গাড়ীতেই তো ওর হাসি কোলাহল। ওই গাড়ীতেই ইসমত।

ঃ আরে! তুমি কাঁদছ?' কেউ ওর কাঁধে হাত রেখে বলে।

মজীদের কণ্ঠ শুনে সলীম রুমালে চোখ মোছে। কোন বাক্য ব্যয় না করেই স্কুলের উদ্দেশে পা বাড়ায়।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় খণ্ড

ঝকঝকানি

www.amarboi.org

www.amarboi.org

২

সময় চলে আপন গতিপথে। দিন যায়, রাত আসে। জীবন চলার রাজপথের হাজারো রঙিন স্বপ্নজাল অতীতের স্মৃতিকে ঝাপসা করে তোলে। সলীম ম্যাট্রিক পাস করার পর লাহোরের এক কলেজে ভর্তি হয়। ম্যাট্রিক ফেল করে মজীদ ফৌজে ভর্তি হয়। ওদের গ্রামের গোলাপ সিং ও রামলাল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার পূর্বেই স্কুল ছাড়ে। রামলাল শহরে একটা ফ্যাক্টরীতে কেরানীর কাজ নেয়। গোলাপ সিং ক্ষেত-খামারে বাবা-চাচাদের সাহায্য করে।

বলনাথ সিং ও কন্দন লাল অমৃতসর কলেজে ভর্তি হয়। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার-পুত্র শহরের একটা অফিসের ক্লার্ক ও পাটোয়ারীর পুত্র মেরাজুদ্দীন রেলওয়েতে চাকরী নেয়।

ডাক্তার শওকতের বদলীর পর আরশাদের সাথে সলীমের বেশ কিছুকাল পত্র যোগাযোগ জারী থাকে। পরবর্তীতে সলীমের বেশ ক'টি পত্রের জবাব না আসায় চিঠি চালাচালির পরম্পরা বন্ধ হয়।

যুবায়দা, আমেনা ও ছোগরার নামে ইসমতের পত্র আসে, কিন্তু ওদের জবাব না পেয়ে ইসমতও লেখালেখি ছেড়ে দেয়।

কলেজে হাজারো চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। ও সেসব ছাত্রের অন্যতম যার পাশে বহু বন্ধু-বান্ধব। হোস্টেলে ওর মিশুক প্রকৃতি ও উদারচেতা ভাব সকলের কাছে পরিচিত। ছাত্রদের আড্ডায় ভালো, মেধাবী, গুণধর ও মিশুক কোন ছেলেদের আলোচনা এলে সে আলোচনার অনেকখানি জুড়ে থাকত সলীম।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর বেশ কিছু ছড়া ও ছোট গল্প লিখেছিল। পত্রিকার পাতায়ও তা স্থান পেয়েছিল ; কিন্তু খোদাপ্রদত্ত এই মেধাও ওর একদিন সকলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। সলীম অতি সংগোপনে কলেজের স্মারক-এ একটা লেখা পাঠাল। এডিটর কেবল সেটি ছেপেই ক্ষান্ত হলেন না ; বরং এর প্রশংসায় একটু ফুটনোটও লিখে দেন। পরবর্তীতে গ্রাম্য জীবনের অতীত নিয়ে একটা কাহিনী লিখল; সকল মহলে তা প্রশংসার্হ হল।

এ লেখাটা ওকে আখতারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। আখতার ওর এক বছরের সিনিয়র। ওর পরিচয় গোটা কলেজের সেরা ছাত্র হিসাবে। কলেজের স্মারক, ম্যাগাজিন ছাড়াও বেশ ক'টি পত্রিকা ওর লেখা ছাপাত। ওর লেখার অনেকখানিই জুড়ে থাকত রাজনৈতিক পর্যালোচনা। লিকলিকে শরীরের ছিল এ আখতার। কিন্তু প্রশস্ত ললাট, ডাগর ডাগর চক্ষু আর দু'ঠোঁটে লেগে থাকা অম্লান হাসি সকলের চোখ জুড়াত। হোস্টেলের সব ছেলেদের সাথে ও মিশত না। ডাইনিং-এ ছাত্ররা হাসি-কোলাহলে মুখরিত থাকলেও ওর গাম্ভীর্যে তেমন একটা ফারাক আসত না। ছেলেরা কোন একটা বিষয় তুললে বক্তা না সেজে সর্বদা শ্রোতার ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করত। কোন বিষয়ে ওর আগ্রহ না থাকলে মাঝপথে ডাইনিং ছেড়ে আসত। কিন্তু ভাগ্যচক্রে এ

www.amarboi.org

আখতারই কখনও বক্তা হলে শ্রোতারা মনে করত— কোন বিজ্ঞ বিশ্লেষকের রায় শুনছে। কলেজে মাঝেমধ্যে জ্ঞানগর্ভ, সাহিত্য, শিল্পকলা ও রাজনৈতিক আলোচনা হলে ও অংশগ্রহণ করত। বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক তাতে আখতারই জিতে যেত।

সলীমের সাথে ওর পরিচয় সংক্ষিপ্ত। সলীম একদা হোস্টেল থেকে নামছে, আখতার উঠছে। সিঁড়ির মোড়ে উভয়ের লাগল ধাক্কা। আখতারের বই পড়ে গেল।

ঃ 'সরি!' বলল সলীম।

ঃ এ তেমন কিছু না!' মুচকি হেসে বলে আখতার।

সলীম বইগুলো উঠিয়ে ওর হাতে তুলে দেয়। আখতার হা করে তাকিয়ে দেখে। আখতার বলে— কোথায় যাচ্ছেন?

ঃ পোস্টবক্সে চিঠি ফেলতে।

ঃ কিছু মনে না করলে আমার পত্রটাও নিতে পারেন। গতকাল লিখে রেখেছি। বাইরে বেরিয়েছিলাম কিন্তু নিতে মনে নেই।

ঃ বহুত আচ্ছা! দিন না!' আখতারের পেছনে পেছনে সলীম রুমে আসে। টেবিল থেকে চিঠি উঠিয়ে আখতার বলে— কলেজের ম্যাগাজিনে আপনার 'শেষ হাসি' শীর্ষক গল্পটি ছাপা হয়েছে।

ঃ আরে! আমার লেখা! তেমন আহামরি কি আছে ওতে!

ঃ আপনার লেখার ভাব আমাকে মুগ্ধ করেছে। কাহিনীর ঢং-ও চিত্তাকর্ষক। বিশেষ করে আপনাদের গ্রাম্য দৃশ্যাবলী চমৎকার হয়েছে। এ গল্পের মাধ্যমে গ্রাম সম্পর্কে কিছু একটা ধারণা পেয়েছি। গ্রাম নিয়ে এমন কি আর লিখছেন?

ঃ গ্রীষ্মের ছুটিতে এমন একটা লিখেছিলাম। ওটির নাম— 'আমার গ্রাম'। বেশ লম্বা। সময় পেলে অবশ্যই দেখাব।

ঃ অবশ্যই দেখাবেন। আপনার কাছে থাকলে এখনই দিয়ে যেতে পারেন। এখন আমার কোন কাজ নেই।

সলীম থতমত খেয়ে বলল— এর কিছু অংশ এমনও আছে যা পড়লে আপনি না হেসে পারবেন না।

ঃ তাও পড়ব। আনুন না।

সলীম রুম থেকে একটা কপি এনে আখতারের হাতে তুলে দেয়। পরে চিঠি ফেলার জন্য বেরিয়ে যায়।

সন্ধ্যার দিকে সলীমের কামরায় এল আখতার। হাতে সলীমের দেয়া সেই কপি। নিন সলীম সাহেব! পড়েছি আপনার লেখাটা।

ঃ 'বসুন!'

আখতার চেয়ারে বসল। সলীমের হৃদয়ে খুশী ও শিহরণের হালকা ধুকধুকানি। আখতারের চেহারায় স্ফীত হাসির রেখা। সলীমের শঙ্কা ও ধুকধুকানি দূর হয়।

ঃ সলীম সাহেব। আপনার লেখাটা খুবই চমকপ্রদ। আমার মনে হচ্ছে, গাঁও-গ্রামে ঘুরে ফিরছি। ওই রমজান আলী জীবিত থাকলে তাকে অবশ্যই দেখব। ছাপার জন্য পত্রিকায় পাঠিয়ে দিন।

www.amarboi.org

আনন্দের হালকা শিহরণ সলীমের দিলমন জুড়িয়ে যায়। এরপর সলীম ও আখতার খুব ক্লোজ হয়ে যায়। সলীম আখতারের মাঝে এক দোস্ত, রক্ষক ও দিশারির সত্তা খুঁজে পেল। আখতার ওর জন্য কলেজের লাইব্রেরী থেকে বই নির্বাচন করত। ওর সাহিত্য সমালোচনা করত খোলাখুলি। পাশের এক মসজিদে দু'বন্ধু তাফসীর শুনত। সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়ত হাওয়া খেতে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি গভীর নযর রেখে আখতার কওমের ভাবনায় বেচাইন হয়ে পড়েছিল। ওর চিন্তার মিছিলে মাঝেমধ্যে সলীমও শরীক হত। কিন্তু তড়পানিতে আখতার ছটফটাত। সে তড়পানির তলা খুঁজে পেতে সলীমকে বেশ ভাবনায় পড়তে হয়। সলীম যে পরিবেশে প্রতিপালিত, তা বসন্তের কোকিল পাপিয়ার কুজনে মোহিত। নানা পুষ্পের ঘ্রাণে যা মাতোয়ারা। ওখানে কষ্টক্লেশ ও দুঃখ-যাতনা নেই বললেও চলে।

একবার দুঃখে পড়লে যে পরিবেশে পরমুহূর্তে হাসা যেত— সেই ধরনের পারিপার্শ্বিকতায় ও মানুষ।

অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের পরও সলীমের জন্য আখতারের সত্তা অসহ্য লাগত। বিশেষ করে কওমের রাজনৈতিক নেতাদের কর্মকাণ্ডের ও সমালোচনা করত। মনে হত, আখতার ওদের ওপর ক্ষ্যাপা। সলীম ওর মনঃকষ্ট দূর করতে গ্রাম্য সজীব কাহিনী বলতে চেষ্টা করত, কিন্তু ওই সময় এ চিত্তাকর্ষক কাহিনী শোনার মুড নেই ওর। ফ্যালফ্যাল করে ও সলীমের মুখে তাকাত। বলত— সলীম! আমরা এক আগ্নেয়গিরির মুখে দণ্ডায়মান। এক নাযুক পরিস্থিতি অতিবাহিত করছি আমরা। সম্মিলিত মুসীবত ও দুঃখ-যাতনা দূর করতে আমাদের যৌথ উপলব্ধির দরকার। এর থেকে বিমুখ হলে আমরা ভারতবর্ষে ওই বর্বরতার সম্মুখীন হব, যা হয়েছিল স্পেনবাসী।

এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য সলীমকে উদ্বিগ্ন করে দিত। রাতের বেলা বালিশে মাথা রাখলে আখতারের কথাগুলো ওর কানে গুঞ্জন করে ফিরত। ঘুম আসত না। এরপর ওর চিন্তার জাল নিজ জনপদকে কেন্দ্র করে ঘুরত। এক ভয়ানক মরু সাহারায় ওর বিচরণ হত। এমন এক মরু যেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের হাসি কোলাহলমুক্ত। ও ঘুমাত। চড়ুই পাখির আওয়াজ কানে ঢুকত। শস্যক্ষেতে কিষাণদের মরমী গান কানে আসত। ঝিলের কূপে পানি ফুলে ওঠত। ফলের ভারে আম গাছকে নুয়ে পড়তে দেখত। লকলকিয়ে উঠতে দেখত গমক্ষেতকে। কখনও বা শৈশবের ঘোড়া ছুটানোর দৃশ্যপট ভেসে উঠত। জীবন চলার বালুপথে কখনও বা ভেসে উঠত সাক্ষাত অপ্সরা স্বপ্নের শাহযাদী ইসমত। এ মিষ্টি স্বপ্নভঙ্গ হলে আখতারের কথাগুলো ওর কাছে অর্থহীন মনে হত।

✪ ✪ ✪

কিন্তু বর্তমানের বিদায়ে ভবিষ্যতের পর্দায় এমনও দৃশ্য পরিস্ফূটিত হতে থাকে, যা ক্রমশ বিভীষিকাময় ও ভয়ানক থেকে ভয়ানকতর। জীবন আকাশের ঈশাণ কোণে দিগন্ত প্রসারী ধূলিঝড়, সলীম যাকে অর্থহীন বাগাড়ম্বর মনে করত— তা বাস্তবে রূপায়িত হতে লাগল একে একে।

www.amarboi.org

শৈশবেই এক গল্পকারের মুখে ও শুনেছিল, জনৈক মুসাফির কোন এক শহরে ঢুকেছিল। বাজার ও অলি-গলিতে ঘোরাফেরা করত সে। শহরের কোথাও বরযাত্রীর আনাগোনা ছিল। ছিল কবি ও জারী গানের আসর। মুসাফিরের প্রতি কারো তেমন কোন আগ্রহ নেই। মুসাফিরের গন্তব্য জানা নেই। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে? আচমকা উত্তর গগনে মেঘ বিভীষিকা ধারণ করল। মুহূর্তে তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেল গোটা প্রকৃতি। মানুষ ভয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। মুসাফির হতাশ হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করল— তোমরা পালাচ্ছ কেন? কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার কারো হিম্মত নেই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেদিক পারছে ছুটছে। এ হুলস্থুল মুহূর্তে অনেকেই পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা পড়ে।

মুসাফির ভয়ে একটি গাছে চড়ল। আচমকা ঝড় থামল। হালকা বৃষ্টি নামল। কিন্তু ঝড় থামা সত্ত্বেও মানুষের পেরেশানিতে ভাটা না দেখে মুসাফির হয়রান। তারা পূর্বের তুলনায় হতাশ হয়ে অপরের উপর পড়তে লাগল।

আচমকা এক প্রিয়শত্রু দেবতার আবির্ভাব হল। গায়ের রঙ তার কালো কুৎসিত। রক্তজবার মত লাল টকটকে দু'টো চোখ। মূলার মত বিশাল দন্তমালা দিয়ে লালা বেয়ে পড়ছে। মাথায় চুলের স্থলে হাজারো সাপ ফণা তুলে আছে। তাঁর পদভারে যমীনে ভূমিকম্প। তার অট্টহাসি বজ্রবিদ্যুৎমাফিক। ভয়ে দৌড়াদৌড়িরত মানুষকে সে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে মারত। যমীনে পড়ে গেলে সকলকে পদতলে পিষ্ট করত। যুবতীরা চিৎকার দিয়ে কূপ-নহরে লাফ মেরে আত্মহত্যা করত। অনেকে ভয়ে দরোজা-জানালা বন্ধ করে ভয়ে কাঁপছিল। কিন্তু যমদূতের লোমশ কালো হাতের সামনে দরোজা-জানালা মোমে পরিণত হল। হাত ও পায়ের এক ধাক্কা তাসের ঘরের মত উড়িয়ে দিত ওই ইট-পাথরের ঘরগুলো। অতঃপর সে অট্টহাসি দিয়ে বলত— এবারে যাবে কোথায়, এখন আমি মুক্ত। বছরের পর বছর ধরে বন্দী থাকার পর মুক্তির শ্বাস নিতে পারছি। বন্দীদশায় আমার হাতে-পায়ে লাগানো ছিল লৌহকঠিন জিঞ্জির। অসহায়ভাবে তখন দাঁত কামড়াতাম। আমার কান সুন্দরী যুবতীদের আর্তনাদ শোনার আশায় উৎকর্ণ। আমার পা তোমাদের শূন্যে উত্তোলনের পর পিষে পিপীলিকার মত মারার আশায় চুলকাচ্ছে। তোমরা চিৎকার করছ। কিন্তু কয়েদখানায় আমার নিঃসঙ্গ আর্তনাদের কল্পনা করে দেখ। তোমাদের হাড্ডি মটমট্ করে ভাঙ্গার আশায় কারার লৌহশলাকা মোচড়াতাম। ওই সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মনের ঝাল মুক্তি পেলেই তবে মেটাব। আজ স্বাধীনতার বাঁদর নাচ নাচব। তোমাদের লাশগুলো বিছিয়ে দাও। ওগুলোই হবে আমার নাট্যমঞ্চ। ভারত মাতা হিন্দু সাম্রাজ্যে এমন একদল সন্তান জন্ম দিয়েছিল, যাদের মন মুকুরে আযাদীর অর্থ ছিল— দশ কোটি মুসলমানদের স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া। ওই সাপ গর্ত থেকে মুখ বের করেছিল যার বিষাক্ত ছোবলে শতাব্দীকালের অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য জাতির নাড়ীর স্পন্দন শিথিল হতে পারে।

শতাব্দীকাল ধরে হিন্দুরা স্বীয় দেবতাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অচ্ছুৎদের বলিদান কার্যকর করে আসছিল। আর দেবতারাও ভক্তদেরকে অচ্ছুৎদের বস্তি জ্বালিয়ে এর

www.amarboi.org

ছাইভস্মের ওপর প্রমোদ ভবন নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিল। যুগ যুগান্তরে ভারতমাতার এই যালিম সন্তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পর অচ্ছুৎদের বাযু ঢিল হয়ে এসেছিল। ওরা ব্রাহ্মণ ও উঁচু জাতের হিন্দুদের ভক্তির সামনে নিম্নজাতের লোকদেরকে গোটা প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতেও পিছপা হত না।

কিন্তু এখন হিন্দুদের সামনে দশ কোটি মুসলমানের ভাগ্য। এ সেই জাতি যারা এ দেশ শতাব্দীকাল ধরে শাসন করে আসছিল। হিন্দুরা অচ্ছুৎ জাতিকে বর্ণ আশ্রমের আখেরী টার্গেট বানানোর পূর্বেই তাদেরকে তলোয়ারের মুখে পরাজিত করত। কিন্তু ওদের এ তলোয়ার মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের যুগ থেকে আহমদ শাহ আবদালীর যুগে ভোঁতা প্রমাণিত হয়েছিল। পানিপথের যুদ্ধে ওই তলোয়ার আরেকবার অর্থহীন হওয়ার পর হিন্দুরা অনুধাবন করতে পেরেছে, সম্মুখ সমরে এ জাতির সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। সুতরাং ওরা সনাতন দেবতাদের ওপর নাখোশ হয়ে এক নয়া দেবতার শরণাপন্ন হল। এ নয়া দেবতা হলো ইংরেজ।

ইংরেজরা ভারতবর্ষে ঠিক তখনই পা রাখে যখন মুসলিম শাসনের স্তম্ভগুলো খোক্‌লাপ্রায়। এতদসত্ত্বেও বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ্‌ এবং দক্ষিণ ভারতের টিপু সুলতানের মধ্যে জাত্যাভিমানী জাতির শৌর্যশক্তি ধিকিধিকি জ্বলছিল। ইংরেজরা প্রমাদ গুনল, এ জাতির ছাইভস্মে এখনও স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। সুতরাং মুসলিম জাতিকে কুপোকাত করতে ওরা হিন্দুদের দিকে হাত বাড়াল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর মুসলমান ইংরেজদের দৃষ্টিতে আরো চিহ্নিত হল। এরপর মুসলমানরা ইংরেজ ও হিন্দু নামী দু'যাঁতাকলে পিষ্ট হতে লাগল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হিন্দুস্থানে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র হিন্দুদের পুরানো চরিত্রের পৈশাচিক দিকটা জাগরিত করল। যে পৈশাচিক চেতনা ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থানের মুখে নিম্নজাতের গলা টিপে ধরার কার্যক্রম পাকাপোক্ত করেছিল। হিন্দুরা জানত, একটি কেন্দ্র থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে হলে মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অচ্ছুৎ বানিয়ে পর্যুদস্ত করা যাবে। সুতরাং হিন্দু আশ্রমের জায়গাটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ দখল করল।

✪ ✪ ✪

হিন্দু জাতীয়তাবাদ অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেসের লেবাসে আবির্ভূত হল। এ নয়া আন্দোলন মনুজীর বর্ণবাদী আশ্রমের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। স্রেফ পার্থক্য ছিল এতটুকু যে, মনুজীর আন্দোলন কেবল ব্রাহ্মণদের শক্তিবৃদ্ধির নিমিত্তে আর কংগ্রেসের আন্দোলনের ভিত্তি ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মনুজীর হাতে ছিল বিষাক্ত ধার ছোরা, যদ্বারা সে অচ্ছুৎদের গলায় ছুরি ধরে ব্রাহ্মণদের পায়ে ফেলেছিল; কিন্তু গান্ধীজীর আস্তিনে এমন বিষাক্ত ছোরা ছিল যাকে ব্যবহারের পূর্বে তিনি মুসলমানদের রশিতে বাঁধার জরুরত মনে করলেন। মনুজীর সংকল্প ছিল, অচ্ছুৎদের একঘরে করে রাখা আর গান্ধীজীর চিন্তা ছিল— যে কওমকে তিনি ভারত

www.amarboi.org

ছাড়া করতে চান, প্রয়োজনে দেবতাদের চরণে উৎসর্গ করতে চান; তারা ঘুমন্ত শার্দুল— মুর্দা নয়। সুতরাং ওই বিষাক্ত ছোরা ব্যবহারের পূর্বে মুসলিম জাতিকে অজ্ঞানের টিকা লাগানোর অপরিহার্যতা মনে করলেন গান্ধীজী।

যদি গান্ধীজীর কর্মকাণ্ড মনুজীর অনুরূপ হত তাহলে হয়ত ঐতিহাসিক পানিপথের আরেকটা যুদ্ধ এবং ইংরেজ-বিদায়ের পর দিল্লীর লালকেল্লায় অশোকের গেরুয়া পতাকার পরিবর্তে মোহাম্মদ বিন কাসিমের তলোয়ার খচিত হেলালী নিশান দেখত। গান্ধীজী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে গতিশীল করতে অচ্ছুৎদের জন্য ভারত মাতার আঁচল প্রশস্ত করে দিলেন। তাদের জন্য যে মন্দিরের দরোজায়ও যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল— আজ থেকে তা খুলে দেয়া হল। সমাজের উঁচু বাবুদের মত তারা এক কূয়া থেকে জলপান করতে লাগল। পরিণাম এ দাঁড়াল, যে জাতি এতদিন বর্ণবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল তারা ভারত মাতার কোলে শান্তিতে ঘুমাতে পারল। মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তি খতম করার জন্য গান্ধীজী তাদেরকে আযাদীর শ্লোগানে মুখরিত করলেন। আর মুসলিম স্বার্থরক্ষাকারীদের হীনমন্য, সাম্প্রদায়িক, ইংরেজ দালাল ও ভারতমাতার দুশমন বলে চিহ্নিত করলেন। মুসলিম বলয়ে তখন এমনও লোক ছিলেন— যারা গান্ধীজীর এ মারপ্যাঁচ আঁচ করতে পারলেন। এঁরা গান্ধীজীর আস্তিনের তলে লুকানো বিষাক্ত ছোরা মুসলিম জাতির শাহ্‌রগে উত্থিত দেখলেন। হিন্দুবাদী উত্থান দেখে তারা অনুমান করলেন, তিনি ভারতবাসীকে এক নয়া রামরাজত্বের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। আরো হুঁশিয়ারী দেন— এ নেতা তোমাদেরকে অচ্ছুতের জাতিতে পরিণত করার পক্ষপাতী। পরিণতিতে জীবন-মৃত্যুর দোলায় দোল খেতে চলেছ তোমরা।

মুসলিম নেতৃত্বের এ আশঙ্কা সত্যিই একদিন বাস্তবে রূপ নিল। বিশেষ করে গোলটেবিল কনফারেন্সে এ কথাটা প্রমাণপুষ্ট হল যে, কংগ্রেস যে আন্দোলনের নারা বুলন্দ করছে তার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু নয় যে, ইংরেজ বিদায়ের পর মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর চাপাবে।

কংগ্রেস বারবার ইংরেজদের সাথে আপোষ করতে চেয়েছে, কিন্তু প্রতিবার তাদের প্রথম শর্ত ছিল, সংখ্যালঘুদেরকে এড়িয়ে কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের একচ্ছত্র শাসক বানাতে হবে ; কিন্তু ইংরেজরা দশ কোটি মুসলমানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেনি। ভারত মাতার সন্তানদের সাথে আপোষ করার জন্য সংখ্যালঘু দশ কোটি মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া ছাড়া কোন উপায় দেখল না ইংরেজ শাসন। ইংরেজদের সম্পর্কে কংগ্রেসের পলিসি বারবার বদলেছে, কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারে গান্ধী নামের মহাত্মার পলিসি কোনদিনও বদলায়নি। অবশ্য স্বাধীনতার সবুজ শ্লোগানের মধ্যে কিছু একটা মাদকতা ছিল বলেই মুসলমানদের একটা অংশ কংগ্রেসের নৌকায় চেপেছিল।

✪ ✪ ✪

মুসলিম জাতির চোখ ঠিক তখনই খুলল যখন তারা অনুধাবন করল যে, কংগ্রেস যাকে স্বাধীনতা বলছে সেটা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপর নাম। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রথম বারের মত নিখিল ভারত কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সাতটি প্রদেশে ভাগ

www.amarboi.org

করল। রাজনীতিজ্ঞরা মুসলমানদের নাগাল পেতে যতটা স্থিরতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিল তার চেয়ে এ নাগাল হাতছাড়া হবার আশঙ্কা করল। সুতরাং এ ব্যাপারে তারা যতটা পারল ক্ষিপ্রতা দেখাল। অহিংস নীতির দেবতা মহাত্মা গান্ধীর বিষাক্তধার ছোরা এবার আস্তিন থেকে বেরিয়ে এল। রামরাজত্বের ইবলীশী নেশা মসজিদ ভেঙ্গে মন্দিরে পরিণত করার দ্বারা প্রকাশ পেল।

কাবার রবের সামনে সিজদাবনত কওমের মাদ্রাসাগুলোত গান্ধীজীর মূর্তির সামনে হাতজোড় করার সবক দেয়া হল। তৌহিদমনা ছাত্রীদের শিক্ষা সিলেবাসে দেবদাসীদের নৃত্য অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল। মুসলমানদের গলায় এ বিষ প্রয়োগের যিম্মা জাতির এমন কিছু কর্ণধারের কাঁধে চাপানো হল, যাদের আঙ্গুলে তখনও কুরআনে কারীমের তাফসীর লেখার কালি বিদ্যমান ছিল।

রামরাজত্ব কায়েম করার জন্য মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ময়দানে পর্যুদস্ত করা ছাড়াও তাদের ভাষা বদলের প্রয়োজন অনুভব করা হল। সুতরাং উর্দুর স্থলে হিন্দি ভাষা চালুর জোর প্রচেষ্টা চালানো হল।

এ কথায় কোন দ্বিমত নেই যে, গান্ধীজী মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করতে যে মোক্ষম সময়ের অপেক্ষা করছিলেন— এখনও আসেনি তা। কিন্তু হিন্দু আওয়াম যারা মুসলমানদের কচুকাটা করার জন্য খড়গহস্ত হয়েছিল; অচ্ছুতদের মন্দিরে ঠাঁই দেয়ার জ্বালা-মর্মপীড়া সহ্য করতে পারছিল না। এদের বুনিয়াদের ওপরই তো হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং মধ্যভারতের প্রদেশগুলোয় লুটতরাজ ও দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল।

যে শহরগুলোয় হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর হামলা করত সেখানে কংগ্রেসী হুকুমতের পুলিশ তৃতীয় পক্ষ হয়ে মুসলমানদের অপমানকর ন্যক্কারজনক শর্ত মানতে বাধ্য করত। মুসলিম লীগের আপোষ ও সহযোগিতাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। জওহরলাল নেহরুর একটি ঘোষণা আকাশে-বাতাশে গুঞ্জরিত হচ্ছিল— ভারতে কেবল দু'টি জাতি থাকবে। তন্মধ্যে একটি ইংরেজ, অপরটি কংগ্রেস।

রামরাজত্বের এ স্থায়িত্বকাল যদিও কম ছিল তথাপিও মুসলমানদের অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য এটা যথেষ্ট যে, তারা এখনও সজাগ না হলে ভারতবর্ষে আরেকটা স্পেন নাটক মঞ্চায়িত হবে। সুতরাং ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম প্রতিরোধ দুর্গ হিসাবে 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা' কার্যত ঘোষিত হয়।

'পাকিস্তান' দাবী মূলত প্রতিরোধ দুর্গ নয় বরং ফ্যাসিবাদের নবোত্থিত সয়লাবকে রুখবার ইস্পাত কঠিন রেখা। ওই দাবীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দুদের আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়া। মুসলিম লীগ ভারতের তিন-চতুর্থাংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তাব রেখেছিল আর নিজেরা যা দাবি রেখেছিল তা আনুপাতিক হারেও চাহিদার তুলনায় কম; কিন্তু অখণ্ডতার আওতায় খাইবার গিরিপথ থেকে বঙ্গোপসাগর অবধি সুবিশাল এককেন্দ্রিক রাম রাজত্বের স্বপ্ন দেখেছিল কংগ্রেস।

www.amarboi.org

আরাধনার মন্দিরগুলোর ওইসব স্কীম তৈরী করা হয়েছিল, যার বদৌলতে মাত্র ক'বছরের মধ্যেই মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্বে পরিণত হতে হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দেখে ভারতমাতার সন্তানরা অনুধাবন করল, তাদের শিকার এই বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। একত্ববাদীগণ একজাতি তত্ত্বের এই সুকৌশলী প্রতারণার উপসর্গ আঁচ করতে পারলেন, যা বাহ্যত অহিংস নীতির চুল্লীতে রং চড়িয়ে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সুতরাং তারা শঙ্কামুক্ত থাকতে পারল না। জাল পাতা শিকারী, যে কিনা এ চিন্তায় বসেছিল যে, ছুটন্ত ঝাকছাড়া পাখি এ ফাঁদে পা দেবে— পক্ষীকুলকে অন্যত্র ধাবমান দেখে তখন জাল গুটাতে থাকে। এ অবস্থা-ই দেখা যায় কংগ্রেসের বেলায়। এ সময় তারা চেহারার ওই নেকাব খুলে ফেলে, যা মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য পরেছিল।

মুসলমানরা দেখছিল, স্বাধীনচেতা হিন্দু, হীনমন্য হিন্দু, দেবতাপূজক হিন্দু, দেবতা বিদ্বেষী হিন্দু, অচ্ছুৎদের সাথে গলাগলি করা হিন্দু, অচ্ছুৎদের 'স্রষ্টার নিকৃষ্ট সৃষ্টি' মনে করা হিন্দু; ইংরেজ চাটুকারিতা ও তোষামোদ দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকামী হিন্দু এবং স্রেফ বকরীর দুধ ও ফলের রসের ওপর স্বপ্নতুষ্টির হিন্দু-সব একজোট হচ্ছে। কুফরী শক্তি তার তূনীরের সবক'টি তীর-ই জমায়েত করেছিল, কিন্তু মুসলিম জাতি তখনও বিক্ষিপ্ত তীর ও ভাঙ্গা ধনুক গুনছিল।

মুসলমানরা আরো ১০[১] বছর পূর্বে স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করলে অহিংস নীতির দেবতা ও তার পূজারীরা তখনও প্রকৃতরূপে আত্মপ্রকাশ করত।

মুসলমানরা অবশ্য আত্মরক্ষার তখন প্রচুর সময়ও পেত। কিন্তু তারা ওই সময় ভাঙ্গা ঘরের ছাদ ও দেয়াল মেরামতের খেয়াল করল যখন গোটা আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস। হিন্দু জাতি যে নিশ্চিত আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা পূরণের লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছিল, মুসলমানদের বেলায় তা ছিল একেবারেই শূন্যের কোঠায়। আরাধনার দেবতার অহিংস নীতির প্রতারণা আধো ঘুমে উপলব্ধি করতে পেরেই ধড়ফড়িয়ে ওঠা মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলনের ডাক দিল।

হিন্দুরা যেখানে বিগত ১৫ বছর ধরে একজাতি তত্ত্বের আসন পাকাপোক্ত করেছিল সেখানে মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদেরও বীজ বুনে রেখেছিল। বিভেদের বীজ বুনানোর জন্য কিছু জ্ঞানপাপীকে ঠিক করা হল। যদি একজাতিতত্ত্ব, অহিংস নীতি ও অখণ্ড ভারতের শ্লোগান মুসলমানদের মরণঘুম পাড়াতে না পারে তখন তাদের শাহ্‌রগে বিষাক্ত তলোয়ার উত্থিত করে চমকে দেয়ার দায়িত্ব ওইসব বুযুর্গদের হাতে দেয়া হবে, যাদের

টীকা : ১. দশ বছর পূর্বে আল্লামা ইকবাল আলাদা মুসলিম আবাসভূমির দাবী করেছিলেন। কিন্তু একে কেবল কবির কল্পনা বলে মনে করা হতো তখন। চৌধুরী রহমত আলীকে সম্ভবত পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম অগ্রপথিক মনে করা হয়। কিন্তু তিনিও ছিলেন গ্রাম্য এক অখ্যাত লোক। তাছাড়া মুসলমানদের শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা, রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা ছাড়াও হিন্দু ফ্যাসিবাদের প্রবঞ্চনা পুরোপুরি প্রকাশ না পাওয়াও পৃথক আবাসভূমি দাবী না করার নেপথ্য কারণ হতে পারে।

www.amarboi.org

ইয়া বড় জুব্বা ও বিশাল পাগড়ি দেখে বোঝা যায়— এরাই বুঝি জান্নাতে পৌছানোর সোল এজেন্ট। সুতরাং কংগ্রেস ধর্ম ব্যবসায়ী এমন কিছু মুসলমানকে নিযুক্ত করল, যারা এক হাতে মুসলমানদের কুরআন মাজীদ দেখাত আর অপর হাতে দেখাত তাদের গলে হিন্দুত্বের গোলামীর জিঞ্জির পেঁচানোর তরীকা।

✪ ✪ ✪

অভিজ্ঞ শিকারী যখন শিকারকে তার জালের দিকে আসতে দেখে তখন তাকে পোষ মানানোর জন্য সমজাতীয় পোষমানা এক শিকারকে পিঞ্জিরাবদ্ধ করে আশেপাশে রেখে দেয়। পোষমানা শিকারী পাখি তখন সমজাতীয়দের ডেকে ওই ফাঁদে ধরা পড়ার আহ্বান রাখে। এ তরিকায় সাধারণত তিতির ও ঘুঘু শিকার করা হয়।

অহিংস নীতির দেবতা যখন দেখলেন, মুসলমানগণ হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের প্রতারণাসর্বস্ব বেড়াজালে বন্দী হওয়া থেকে মুক্তি পেতে পাকিস্তানমুখো হচ্ছে তখন তিনি কিছু নগণ্য অখ্যাত ওলামায়ে দীনকে ওই নাপাক এরাদায় ময়দানে ছেড়ে দেন— যারা খোদার ইবাদত ছেড়ে দেশ পূজায় লেগে যান, যারা মোহাম্মদে আরাবী (সাঃ)-এর শিষ্যত্বের প্রতি বিমুখ হয়ে নেংটিপরা গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের স্কন্ধে ঠিক ওই দায়িত্ব-ই দেয়া হয়, যে দায়িত্ব পালন করে শিকারী ঘুঘু বন্য ঘুঘু শিকারের বেলায়।

এ ওলামায়ে কেরাম হিন্দু সাম্রাজ্যবাদীদের শিখানো বুলি কপচাতে থাকেন। মুসলিম জনতার মাঝে তারা ঘোষণা করেন— মুসলিম হে! এসো! এ সেই দেশ যা তোমাদের আযাদীর স্বপনীড়। দেখো! আমরা আযাদ। একথা মিথ্যে যে, তোমাদের নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। চোখ খুলে দেখো! এখানে শস্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ, পানি অযাচিত— পাকিস্তান বুভূক্ষু। এ নেয়ামত তোমরা ওখানে পাবে না। আমাদের দেখো! আমাদের চিনে রেখো! আমরা তোমাদের নেতা। তোমরা বুঝেছ, এ হিন্দুরা তোমাদের গিলে খাবে? ওরা তো সেই জাতি, বহু শতাব্দী ধরে তোমরা যাদের শাসন করেছ! এটা কি কাপুরুষতা নয় যে, তোমরা হিন্দুদের থেকে বাঁচতে চাও? কসম খোদার! হিন্দুরা যখন তাদের দাবী-দাওয়া উত্থাপন করবে তখন আমরা তাদের নেতাদের কান ধরে আমাদের দাবী আদায় করে নেব। হিন্দুদের নিয়ত খারাপ হলে আমরা কি ওদের সাথে থাকতাম? ওরা কিছুতেই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না, যারা মহাত্মা গান্ধীর মত সহজ-সরল মানুষের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালায়। মহাত্মা তোমাদের গোলামীর জিঞ্জির কেটে দিয়েছেন। তিনি বকরীর দুধ পান করেন। চরকায় সুতা কেটে কাপড় পরেন। বৈরাগীর জীবনযাপন করেন। এ মহাত্মার বিরুদ্ধবাদীরা দেশমাতার দুশমন, দুশমন ইসলামের, দুশমন খোদার! ওদের সঙ্গ ছাড়। পাকিস্তানের খেয়াল পরিত্যাগ করো। এসো! ভারত মাতার আঁচল ধনধান্যে ফসলে পরিপূর্ণ। এখানে কোন ভয় নেই, এসো! আমাদের পতাকাতলে এসে নারা লাগাও— 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

www.amarboi.org

মুসলমানরা পাকিস্তান দাবীর পূর্বে হিন্দুরা যখন এ অনুমান করল যে, আত্মরক্ষার জন্য তারা স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করবে তখন তারা ইংরেজ বিরোধী কিছু নারা লাগায়। শিকারী ঘুঘুর ওপর বন্য ঘুঘুরা যেমন রাগ করে তেমনি ইংরেজ বন্যরা মুসলমানদের ওপর এতে ক্ষেপে যায়। স্বাধীনমনা মুসলমানরা হিন্দুদের দলভুক্ত হয়ে জেলে যেতে থাকে। এ সময় ইংরেজদের সাথে আপোষের কথা চলত। হিন্দুরা এ আপোষের কিছুতে হত সফল আর কিছুতে বিফল।

হিন্দুরা পাকিস্তান আন্দোলনকে ধূলিস্মাৎ করার জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসাবে এ শ্লোগান তুলল— "মুসলিম লীগ ইংরেজদের চর। কায়েদে আযম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতি জেদী মনোভাব দেখিয়ে গেলে ইংরেজ-মুসলিম যুদ্ধ হলেও এ মুলুকে তারা পা জমিয়েই বসবে। পাকিস্তান মুসলমানদের প্রাণের দাবি নয়— ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের ফসল। সুতরাং ওই দেশটি গান্ধারীর গর্ভজাত সন্তান ও ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন। এ দেশে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত লাগিয়েছে এ ইংরেজ জাতি-ই। ইংরেজই উপমহাদেশের দুশমন।"

শুধু কি তাই! কংগ্রেস বারংবার ইংরেজ প্রশাসনকে চাপ দিয়ে বলল— পাকিস্তানের বিরোধিতায় ইংরেজ কিছু একটা করুক, নইলে কংগ্রেস যুদ্ধ শুরু করে দেবে। ইংরেজ সর্বাবস্থায় দাদাদের খুশী করতে চাচ্ছিল, কিন্তু তারা যে বাধা একটা জায়গায়। ইতালী, জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে লাখো মুসলমান ইংরেজদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে ; আর তাই ধুরন্ধর এ সাদা চামড়াধারী কুত্তারা ওদেরই বিরুদ্ধবাদী হিন্দু মহাসভাকে এতটুকু বিরাগভাজন করতে চাচ্ছিল না।

কংগ্রেস কখনও চাটুকারিতা আবার কখনও ধমকের দ্বারা কাবু করছিল। তাদের এ কথার ওপর এতটুকু আশা ছিল না যে, ইংরেজ এদেশ ছেড়ে ঘটা করে বিদায় নেবে। কংগ্রেস ইংরেজ বিতাড়নে ভূমিকা পালন করেনি, করেছিল সংখ্যালঘুদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে ভারত মাতাকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার দাবীর ভূমিকা।

১৯৪২ সালে হিটলারের তোতা (গোয়েবল্‌স) বুলি আওড়াচ্ছিল। ইউরোপের তখতে তাঊস দু'পায়ে দলে হিটলারের বাহিনী রুশ অভিমুখে যাত্রা করছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, নাৎসী আজদাহার সম্মুখে গোটা দুনিয়া বুঝি পরাজিত হবে। জার্মানীর সাবমেরিন আমেরিকা অভিমুখে ধেয়ে যাচ্ছিল। লন্ডনে হচ্ছিল বোমাবর্ষণ। গান্ধীজীর এসব দেখে মন উথলে উঠত। তিনি উভয় দলকে অহিংস নীতির সবক শোনাতেন। কিন্তু জাপান যখন রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন অহিংস নীতির এ মহাদেব ইংরেজদের পরাজয়কামী হয়ে জাপানের পক্ষপাতী হয়ে আসমুদ্র হিমাচল রামরাজত্ব কায়েমে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। সুতরাং এ সময় 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেসের এ মহাত্মা কোন এক সময় বলেছিল, পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে আমার উদ্দেশ্য, বিদেশী হুকুমত ইংরেজদের আর আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় হুকুমত আমাদের। কাজেই এক্ষণে পূর্ণ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য ইংরেজ স্থলে জাপানকে বেছে নেয়ার রাস্তা কণ্টকমুক্ত করতে হবে। হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল— তারা এ নাযুক মুহূর্তে নিজেদেরকে ইংরেজ-বৈরী

www.amarboi.org

প্রমাণ করে এ দেশের নয়া বিজয়ী অর্থাৎ জাপানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করবে। অন্ততপক্ষে সে ক্ষেত্রে জাপান সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যাপারে কংগ্রেসের পন্থাবলম্বন করবে অতি অবশ্যই। তবে এটা মুসলমানদের খোশ্ কিসমত যে, জাপানীদের সয়লাব বার্মা থেকে পশ্চিমে আর অগ্রসর হতে পারেনি আর অহিংসনীতির পূজারীরা কিছু পুল উড়িয়ে, টেলিফোনের তার কেটে, পোস্ট অফিস জ্বালিয়ে, কিছু সাহেবদের চড়-থাপ্পড় দিয়ে এবং কিছু সরকারী ইমারতে ইংরেজদের ঝাণ্ডা খুলে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা উড়িয়ে খামোশ হয়ে যায়। প্রাচ্যের এ নয়া দেবতা, যে কিনা কংগ্রেসীদের ধারণা মোতাবেক ভারত মাতার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে; মনিপুরের সামনে অগ্রসর হতে পারল না।

✪ ✪ ✪

সলীম এক সাহিত্যিকের খেতাবে হোস্টেলের হিরো প্রমাণিত হল। ওর কাব্যে বর্ষাপ্লাবিত নদীর স্রোতধারা, বিহঙ্গকুলের সঙ্গীত ও পুষ্পকলির সৌরভ ছিল। ওর নিবন্ধ-প্রবন্ধের অনেকখানি জুড়ে থাকত পল্লীর ছোঁয়া। ওর সাহিত্য চর্চার মূলে আখতারের অবদান অনস্বীকার্য।

ঃ 'সলীম!' আখতার বলত— 'তোমার কথা বড় মিষ্ট, সুন্দর লেখ। কিন্তু এ উদ্দেশ্যহীন কথা ও লেখা ওই কওমের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে না, যাদের চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে মুসীবত ও বিপদ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমাদের গ্রাম্য কাওয়ালীদের গান বড় হৃদয়গ্রাহী, তোমাদের বাগিচার পুষ্পকলি সৌরভময়, কাহিনীকারদের কেচ্ছা-কাহিনী দিলকাশ, কিন্তু ওই তুফান ও সয়লাবকে উপেক্ষা করতে পার না যা অচিরেই তোমাদের হাসি-কোলাহলকে অশ্রুতে পরিণত করবে। ওই আগুনকে পাশ কাটিয়ে যেতে পার না, যা তোমাদের ফসলের স্ফীতিকে ছাইভস্মে পরিণত করবে। বেশক্ তোমাদের গ্রাম্য মজমাগুলো খুবই চমকপ্রদ, কিন্তু ওই কওমকে একটু চিন্তা করে দেখো যারা এ দেশে দীর্ঘ ৮০শতাব্দী ধরে স্বাধীনভাবে বসবাস করেছে। এ জাতির কবিবর্গের কাব্যমালায় তোমার নদীর কলনাদ, বসন্তের আবীর ছোঁয়া ছিল। তোমাদের জনপদের মত তারা আসর জমাত। ওখানে রঙ্গরস ও হাসি-কোলাহল উচ্চকিত হত, কিন্তু একদিন মানুষরূপী দু'পেয়ে জানোয়ার এসে তাদের বস্তি ছিনিয়ে নিল, ফলে এই আসর উল্টে গেল। জানো-কারো এরা?

অতঃপর আখতার নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিত— ওরা হিন্দুস্থানের কোটি অচ্ছুৎ যারা আর্য হামলাবাজদের মোকাবিলা করতে পারেনি। শুধু কি তাই! ওরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিকতায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল।

সলীম! তুমি বলবে, 'ওরা আহাম্মক যারা দুশমনের মোকাবেলায় মাথা গরম করেনি। কিন্তু ওদের কবি ও বুদ্ধিজীবীদের কি বলবে, যারা দুর্যোগের কালে ওদের জাগ্রত করেনি? কি খেতাবে ওদের ভূষিত করবে, যারা [illegible] বংশীবাদক হয়ে দিন কাটাত অথচ মানবরূপী হায়েনা ওদের [illegible] কায়েম করেছে?

www.amarboi.org

দোস্ত আমার! ঘৃণা ও ধিক্কারের ওই তুফান যা ব্রাহ্মণদের পবিত্রতা ঘোষণাকল্পে অচ্ছুৎদের বলির পাঠা করেছিল, আজ জেগে উঠছে তা আবার। এবার ওদের টার্গেট আমরা। আর সেটা হচ্ছে হিন্দু ন্যাশনালিজমের পুনর্জাগরণের বেশে। ফুঁসে ওঠা হিন্দু জাতীয়তাবাদের এ তুফানকে এখনই রুখতে না পারলে আমাদের অবস্থা অচ্ছুৎদের তুলনায় বেশী বৈ কম হবে না। অচ্ছুৎ জাতি হিন্দু সোসাইটিতে ঘৃণ্য সম্প্রদায় হিসাবেই বাঁচার অধিকার চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের সামনে কেবল দু'টো পথই খোলা থাকবে— হয় মৃত্যু না হয় দেশত্যাগ।

সলীম!' আখতারের কণ্ঠে দৃঢ়তা— 'জাতির চিন্তা না করলেও কমপক্ষে ওই জনপদের চিন্তা অবশ্যই করবে যার আশেপাশে হাসি-কৌতূহলে কেটেছে তোমার শৈশব। আগুন ও তুফান যখন মুসলমানদের বস্তি জ্বলিয়ে দেবে তখন তোমাদের জনপদ বাদ যাবে কি? এ চিন্তায় কি তোমাদের বস্তি বাদ রাখা হবে যে, এখানে একজন কবি একজন সাহিত্যিকের বাস? বর্বরতার তুফান উছলে উঠে যখন হাজারো আসর বিরান করবে তখন তাদের এ বলে রুখতে পারবে না যে, ওখানে কেবল হাসি-তামাশাই দেখেছি অন্য কিছু দেখতে চাই না। ওই সময় তোমার অনুভূতির শিরাতন্ত্রী সটান হয়ে উঠবে যে, সম্মিলিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রতিরোধ অপরিহার্য। সে সময় বলবে, হায়! জাতিকে 'সা-রে-গা-মা'র টোন না শুনিয়ে যদি ঝাঁকুনি দিয়ে স্বাধীনতার টোন শোনাতাম।

অতঃপর আখতার সলীমের দিকে তাকিয়ে ধিক্কারের সুরে বলত— সলীম! আমার কথা কিছুটা তেতো! কিন্তু বাস্তবতার হৃদয়গ্রাহী অবয়বে পর্দা ফেলতে পারছি না। কুদরত তোমাকে যে কুদরতী প্রতিভা দিয়েছেন তা যেন অকাজে এস্তেমাল না হয়। তোমার লেখায় জাদু আছে। আমি চাই, ওই যাদু জাতিকে ঘুম না পাড়িয়ে তাদের সুপ্ত চেতনাবোধ শানিত করে তুলুক। বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তান-ই হতে পারে আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। এ সেই প্রান্তর যাতে দাঁড়িয়ে আমরা হিন্দু ফ্যাসিজমের উছলে ওঠা তুফানকে রুখতে পারব। দুনিয়াতে এমনও কবি আছে বলে শুনেছি, যারা জাতিকে কবরের নিস্তব্ধতায় রেখেছে। আবার এমন কবিদেরও জানি, যারা পলায়নপর দিশেহারা সৈন্যদলের মনে নয়াজীবনের পয়গাম এনেছে।

খাইরুল কুরুনের এমনও কবিবর্গকে আমরা জানি, যারা রোম-ইরানের মত পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইরত মুসলিম সেনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছে। আজকের কবি পাকিস্তানের গুরুত্ব অনুধাবন না করলে বুঝব— যুগ জিজ্ঞাসার চাহিদা সম্পর্কে সে নাদান।

আখতারের সাথে এ ধরনের উষ্ণ মোলাকাতের পর সলীম নিজকে নতুনভাবে খুঁজে পায়। তার মনে ডেকে যায় আন্দোলনের কোকিল-পাপিয়া। গ্রাম্য আসরগুলো ওর কাছে প্রিয় নিশ্চয়ই। দৃষ্টিনন্দন ছিল কুঞ্জবীথির পুষ্পকলি। শ্রুতিনন্দন ছিল গ্রাম্য সাদাসিধে মানুষের হাসি-কোলাহল। যারা সেকেন্ডের স্থলে মিনিট, মিনিটের স্থলে ঘন্টা, ঘন্টার স্থলে দিন, দিনের স্থলে মাসকে মাস ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করত না। কল্পনায় সে এসব লোকের জিগর ফাটা আর্তনাদ এখন শুনতে লাগল। আর্তনাদ শুনতে লাগল জনপদের

www.amarboi.org

বধূ-মাতাদের। ওর গোটা দেহ কেঁপে উঠল এ কল্পনায়। সে কল্পনার হিংস্র দেবতাকে রুখতে পাকিস্তানের চার দেয়ালের দোরগোড়ায় পৌছুতে চায়। অতঃপর এ সংকল্পে কাগজ-কলম নিয়ে বসে যেত এবং পাকিস্তান নিয়ে ফিচার লিখত। ওর লেখার শুরুটা থাকত কতকটা এমন— 'ওরা যালিম, সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিবাদী। ওরা আমাদের সাথে ঠিক ওই ব্যবহার করবে, যা করেছিল আর্য সন্ত্রাসীরা বিজিত অচ্ছুৎদের বেলায়। কিন্তু কেন?' ও ভাবত, ওরা কি মানুষ নয়? আমরা কি মানুষ নই? একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে কেন এ ব্যবহার করে?

ফের খোদ্ ও নিজেই জবাব দিত— হিন্দুস্তানের প্রাচীন বাসিন্দারা কি মানুষ ছিল না— ব্রাহ্মণরাই কি কেবল মানুষ? কিন্তু সেতো আদিকালের ইতিকথা। এখন শিক্ষার আলোতে অন্ধকার দুনিয়া উজ্জ্বল।' সলীম নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়।

বাস্তবের ভয়ানক চেহারা ক্ষণিকের তরে কল্পনার রঙিন আবছায়ায় ঢেকে যেত। ওই কল্পনার রঙিন পাখায় ভর করে ও নিজ জনপদে পৌছে যেত। গ্রামের কচি বাচ্চারা যেন ওকে দেখে চারপাশে ভীড় জমাত। মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান ও হিন্দুদের সন্তান সকলকেই পেয়ার করত সমভাবে। ওদের কোলে তুলে নিত। কেউ কাঁধে চড়তে, কেউ কোলে উঠতে কোশেশ করত। কেউবা ঢুকাত পকেটে হাত। পলেস্টার পাজামাটা ধুলোবালিতে একাকার হয়ে যেত ওর। হাওয়াই মিঠা দু'হাতে ভাগ করে দিত ওদের। কাউকে না দিয়ে হাত পিছে নিয়ে সে বলত— আমাকে দিন ভাইজান! সলীমের ঠোঁটে খেলে যেত মুচকি হাসি।' এটা শিক্ষার গুণ। ঘটনা-কল্পনা সেই যুগেরই। স্থিরচিত্তে কলম রেখে দিত ও। কিন্তু আচমকা ওর দিলে একটা আওয়াজ গুঞ্জরিত হত— এ আলোকোজ্জ্বল যুগে কি ওই দেবতাপূজা হয় না, অতীতে যাদের সামনে অচ্ছুৎদের বলীদান করা হত?

✪ ✪ ✪

কলেজে জ্ঞানগত ও সাহিত্যগত মজলিসের আকারে মাঝেমধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হত। এ বিতর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও সমকালীন রাজনৈতিক সমালোচনার চেয়ে হাসি ও ব্যঙ্গ-রসকে প্রাধান্য দেয়া হত অধিকতর। কাব্য-চর্চা হলে সৃজনশীল কবিতা না বুঝেই অনেকে শোরগোল করে উঠত। প্রতিযোগী কবিরা ওই শোরগোল শুনে বুঝত না— তারা কি ধন্যবাদ পাচ্ছে, না নিন্দাবাদ!

এ ধরনের কোন বিতর্কানুষ্ঠান হলে একদল ছাত্র পূর্ব পরিকল্পনা করত যে, আজ অমুকের বেলায় তালি আর অমুকের বেলায় উপহার দেয়া হবে হাসি। কখনও বা ছেলেরা আখতারকে টেনে নিত। আখতার 'পাকিস্তান আন্দোলনে'র পাক্কা সমর্থক আর ওরই এক সাথী আলতাফ অখণ্ড ভারতের তথা হিন্দু কংগ্রেসের। সে গান্ধীজীকে বিংশ শতাব্দীর অবিসংবাদিত নেতা, আর ওইসব মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতা ঠাওরাত তাদেরকে যারা রাম রাজত্বের জরুরত মোতাবেক কুরআন মজীদ থেকে রেফারেন্স টানত। কলেজের সে এমন এক ছাত্র, যে জাতীয়তাবাদী নেতাগিরি ফলানোর জন্য হাঁটু অবধি খদ্দরের পাঞ্জাবী লাগাত। আখতার বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে আলতাফ উঠে

www.amarboi.org

প্রতিবাদ জানাত। বলত— মাননীয় সভাপতি! 'পাকিস্তান' একটি বিতর্কিত বিষয়। আখতারের বক্তব্য দেশপ্রেমিক জনতার অনুভূতিতে আঘাত হানার শামিল। সুতরাং এ ধরনের দেশ বিভক্ত করার বিষয় আলোচনার টেবিল থেকে বাদ দেয়া হোক।

আলতাফের সাথীরা একে একে ওর সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেত। পক্ষান্তরে এর প্রতিবাদে আখতারের সমর্থকরা বলত— আমরা অবশ্যই ওর কথা শুনব। দু'দলের কথা কাটাকাটি চরম আকার ধারণ করলে ৬ ফুট লম্বা এক পাঠান যুবক এসে আলতাফের টেবিলের সামনে টেবিল চাপড়ে বলত— আলতাফ! তুমি আখতারের বক্তব্য শুনতে না চাইলে বেরিয়ে যাও। নয়ত আমরা সসম্মানে কান ধরে বের করে দেব। তুমি খামাখাই বিতর্ক অনুষ্ঠানে গোল বাধাও!'

সলীম আলতাফের দু'কাঁধে হাত রেখে বলত— আলতাফ সাহেব! বসুন না!' এ শব্দমালা যে পরিমাণ নম্র ছিল তদপেক্ষা গুরুভারও। আলতাফের জন্য যা ধৈর্যাতীত। আলতাফ সাহেব!' আহ্বান তো নয় যেন সলীমের প্রচণ্ড দু'টি মুষ্ঠাঘাত। কলেজের মনসুর কাবাডি খেলায় পারদর্শী ছিল। ওর পাঞ্জা আলতাফের মতই। ও সলীমের চোখ ইশারা পেয়ে আলতাফের কাঁধে এসে হাত রাখত। চিরাচরিত ঢং-এ বলত—

'আরে দোস্ত! অস্বস্তি দেখাচ্ছ যে খুব। বসো না খানিক!'

আলতাফ বসে যেত। শোরগোলের মধ্যে ছাত্ররা মনে করত— সে বসেনি, তাকে বসানো হয়েছে।

সলীম নিজের পক্ষ থেকে বলত— ভায়েরা! আসন গ্রহণ করুন। আলতাফ সাহেব তার কথা ফিরিয়ে নিয়েছেন।

আলতাফ উঠে দাঁড়াতে কোশেশ করত ; কিন্তু সলীম ও মনসুরের লৌহকঠিন মুঠির সামনে হয়ে উঠত অসহায়।

মজলিসে পিনপতন নীরবতা দেখে আফতাব বলত— দেখো আলতাফ! কসম খোদার! বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করলে আমরা সমুচিত জবাব দেব। বলার কিছু থাকলে আখতারের কথা শেষে স্টেজেই বলো।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হোস্টেলের সিনিয়র কোন ছাত্রই হতেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই রায় দিতেন। দেখা যেত আখতারের কথা শোনার দলই সংখ্যাগুরু।

বি. আই. ডিগ্রী নেয়ার পর সলীম আখতারের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। এম, আই-তে ভর্তি হল। কলেজে আখতার 'পাকিস্তান'-এর কট্টর সমর্থক। বেশ কিছু জোয়ান ওর মতাবলম্বী হয়েছে ইতোমধ্যে। পাকিস্তান সম্পর্কে হিন্দু প্রচার মাধ্যমে যে পক্ষপাতাপন্ন প্রোপাগান্ডা চলছিল তা-ই মূলত ওদেরকে আখতারের অনুসারী বানাতে সহায়তা করে।

হোস্টেলে একটি বিতর্কানুষ্ঠান আসন্ন। এবারের অনুষ্ঠানের বিষয় 'পাকিস্তান কি মুসলিম জাতির সমস্যা সমাধান করতে পারবে?' ওই হোস্টেলের ছাত্র-কলার ছাড়াও অপর হোস্টেলের ছাত্রদেরও অনুষ্ঠিতব্য বিতর্কে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

www.amarboi.org

অনুষ্ঠানের দু'দিন পূর্বে আখতারকে সর্দি-কাশিতে পেয়ে বসে। হয় প্রচণ্ড জ্বর। প্রথম দিন ও ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জরুরত মনে করল না। পরদিন জ্বর মারাত্মক আকার ধারণ করল। ডাক্তার বলে দিলেন— তোমার নিউমোনিয়া হয়েছে।

ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক সলীম ওষুধ প্রয়োগ করল। রাতের বেলা সলীমের সাথে আফতাব এবং মনসুরও ওর সাথে বিনিদ্র কাটাল। রাত দু'টোর দিকে আখতার চোখ বুজল। আফতাব ও মনসুর কামরায় চলে গেল কিন্তু সলীম গেল না।

নিঃসঙ্গতা দূর করতে সলীম আখতারের টেবিল হতে একটা বই তুলে নিল। ক'লাইন পড়ে বই যথাস্থানে রেখে দিল। ওঠাল আরেকটা। পরে চোখ বুলালো আখতারের টেবিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লিখিত কাগজের ওপর। কাগজের প্রথম লাইনই ওর নজর কাড়ল। এগুলোই ওর বিতর্ক অনুষ্ঠানের মূল পয়েন্ট।

ধ্যান-খেয়ালের সাথে সলীম ওগুলো আওড়াল। অতঃপর যথাস্থানে রেখে আখতারের চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ওর আফসোস, আখতার সাধের ওই পয়েন্টগুলো কালকের অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করতে পারবে না। আলতাফ ও তার সাথীরা গাঁটে গামছা বেঁধে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই বিতর্কে নামছে। আখতারের অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানের সমর্থনে বক্তব্য রাখার কণ্ঠ খুব একটা নেই। ওর পক্ষ হেরে গেলে আখতার খুব কষ্ট পাবে। পাকিস্তান কেবল আখতারের চিন্তাকেন্দ্রিক বিষয় নয় বরং এটা ওর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় বাস্তবতা। এ এমন এক প্ল্যাটফর্ম যেখানে ওর চেতনার বিকাশ ঘটবে। এমন এক উপকূল যেখানে উপনীত হওয়ার জন্য হাজারো তুফান মোকাবেলা করতে পারে। এমন এক নারা যাকে হাসিল করতে ও জীবনের সুখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়েছে।

ও বলত— পাকিস্তানের জন্য আমার মন-মুকুরে দশ কোটি মানুষের ধুকধুকানি। আমার এ আওয়াজ একদিন দশ কোটি মানুষের আওয়াজে পরিণত হবে। আমাদের চলার পথ কন্টকাকীর্ণ তথাপিও ওই কাঁটা মাড়িয়ে আমরা মানযিলে-মাকসুদে পৌঁছবই। একবার ও বলেছিল— সলীম! তোমার মাঝে জাতীয় চেতনাবোধ জাগ্রত হয়নি এখনও। এখন যদিও দু'এক কলম ছড়া ও প্রবন্ধ লিখে কাটাচ্ছ, কিন্তু অচিরেই এমন একদিন আসবে যেদিন ওই সময়টার জন্য তোমার আফসোস হবে, যে সময়টা তুমি পাকিস্তান আন্দোলনে কাটাওনি। আজ তুমি কোন কাল্পনিক প্রেমাস্পদকে জীবনের অবলম্বন মনে করছ, কিন্তু এমন একদিন আসছে যখন পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষা করাকে জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় খায়েশ মনে করবে। সলীম! আমি কল্পনায় তোমার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ ধারণ করতে দেখছি— একে যদিও তুমি মনে করছ আমার ভ্রান্তবিলাস ; কিন্তু এ মেঘ বিভীষিকারূপ ধারণ করলে বতই অনুধাবন করতে পারবে যে, পাকিস্তান ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। বর্ষণের পূর্বেই আমি গৃহের ছাদ নির্মাণ করতে চাই। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে ছাদ ঢালাই করতে চাও তুমি। দোস্ত আমার! পাকিস্তানের যুদ্ধ একটি সম্মিলিত যুদ্ধ। দশ কোটি মুসলমানের জীবন-মৃত্যুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে এর থেকে বিরত থাকতে পার না। এসো! আমরা কাঁধে কাঁধ

www.amarboi.org

মিলিয়ে চলি! চলার পথে পদস্খলন ঘটলে তোমার লৌহকঠিন বাযু ধরে বাকী পথটা চলব। কমপক্ষে এ সান্ত্বনাটুকুন তো পাব যে, আমি নিঃসঙ্গ নই। কিন্তু কাল তোমাকে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পাকিস্তানের পথ দেখিয়ে দিতে হবেই।

ঃ 'আখতার! তুমি নিঃসঙ্গ নও! তোমার শহীদী কাফেলার অকুণ্ঠ সহযাত্রী আমিও।' টেবিল থেকে কলম ওঠায় ও। লেগে যায় কলমযুদ্ধে। থমকে থমকে লিখে ফেলে গোড়ার কথা। কিন্তু পরে ওর কলম যেন থামতেই চায় না।

ও যখন কাজ থেকে ফারেগ হল তখন মুয়ায্যিনের কণ্ঠ দরাজ হয়েছে। সুবহে সাদেকের মিনারে তিনি খোদার নাম বুলন্দ করে দিয়েছেন। বাদ নামায লেখাগুলো রিভিউ করল। বিনিদ্র রাত কাটানোর দরুন মাথাটা কেমন চক্কর দেয়। অলসতাভরে টেবিলে কনুই ঠেকায়। কব্জিতে মাথা। মুহূর্তেই দু'চোখে নামে রাজ্যের ঘুম।

আফতাব কামরায় ঢুকে দেখে, আখতার সলীমের লেখা কপিতে ঠেস্ লাগিয়ে চোখ বুলাচ্ছে।

ঃ 'আখতার! আপনার জীবনের ওপর অমন যুলুম করতে যেও না।' বলে আফতাব ওর হাত হতে কপি ছিনিয়ে নিল। অতঃপর নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করে বলল— ভাই! তোমার জ্বর এখনও পুরোপুরি সারেনি। খানিকটা ভালো অবশ্য। খোদার দিকে চেয়ে আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যেও না। তোমার স্থানে কাউকে পেশ করব।

আখতার শান্ত নদীটির মত বলল— আফতাব! একটু দেখলেই অনুমান করতে পারবে।

ঃ পড়ার পূর্বেই তোমায় ধন্যবাদ দিতে কুণ্ঠিত নই। কিন্তু কি এমন মুসীবত ছিল, যার জন্য তুমি রাত জেগে লিখতে গেলে? আগে জানলে গোটা রাতটাই তোমার পাশে থাকতাম।

ঃ আস্তে কথা বলো! সলীম ঘুমুচ্ছে।

ঃ সলীমও কেমন নালায়েক। তোমাকে বারণ করল না কেন?

ঃ আমি এইমাত্র উঠেছি। জানি না ডাক্তারের ঔষধে কি ছিল। আমি পার্শ্বও পরিবর্তন করিনি। যা দেখছ তা কেবল সলীমেরই কর্মকাণ্ড।

ঃ কিন্তু তা কেমন সম্ভব?

ঃ এটা পড়লেই সব প্রশ্নের জবাব পাবে।

আফতাব আখতারের পাশটিতে বসল। শুরুটা পড়ে ওর মতিভ্রম। খানিকবাদে আখতারকে পড়ে শোনাতে লাগল। শব্দচয়ন ও পড়ার তরঙ্গ বড়ই চমৎকার।

ওই লেখায় পাহাড় ও নদীর স্রোতধারা, ভাবের স্বাচ্ছন্দ গতি, ছন্দবদ্ধতা, চমকপ্রদ উপমা নিহিত। সলীম কখনও পাকিস্তান সম্পর্কে কাব্যিক পরিকল্পনায় জাতির সন্তানদের হাজারো তুফান থেকে সতর্ক করে, যার মাঝে নানান জিনিসের দুর্যোগ ওঁত পেতে আছে। আবার কখনও পর্বতসম প্রমাণ পেশ করে পাকিস্তানের পথের কন্টক দূর করে। শেষের দিকের কিছু কথা আফতাব জোরে বলে ওঠায় সলীম জেগে ওঠে। ওর চেয়েও আখতারের চেহারায় লেখার প্রতিক্রিয়া দেখে সলীমের মন খুশীতে নেচে ওঠে। ওদের কথা শেষ, শেষ সলীমের নিদ্রাও।

আফতাব বলল— ভাই সলীম! তোমাকে মোবারকবাদ জানাই। এ প্রথম তুমি তোমার কলমের সহীহ্‌ এস্তেমাল করলে। সময় খুব কম। তুমি বক্তৃতা প্র্যাকটিস করলে ভালো হয়।

আখতারের অসুখে আলতাফের পোয়াবারো।

সলীম বলল— এ বক্তব্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার নিয়তে লিখিনি। আখতারের একটা ফিচার অবলম্বনে মনের ভাব ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। জানি না কি লিখেছি।

আখতার বলল— সলীম! এমনও মানুষ এ জগতে আছে, যারা সময়মত উপলব্ধি করতে পারে— কি তাদের করণীয়। কওমের কিছু লোকের মাঝে সেপাই হবার যোগ্যতা থাকে। কুদরত এদেরকে কওমের মুহাফেয করে পাঠান। আবার কিছু লোক কবি, নকলকার ও কথাশিল্পী হন। এদের কেউ থাকেন নিছক কবি— এরা কওমের দুর্ভাগা লিডার। আবার কিছু এমন যারা উচ্চাঙ্গের মেধাবী, কিন্তু বিলাসী ও কৌলীন্য প্রিয়। আবার কতেক এমনও আছেন যারা নিজেরদেরকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না করে কওমের বৃহত্তর চিন্তা করেন। ব্যক্তিস্বার্থকে তারা কোরবান করেন। সে এক কবি, এক সাহিত্যিক, যার হৃদয়ে থাকে এমন এক গিটার, যার সুচিকন তারগুলো ঢোলকের ভূমিকায় গুণগুণিয়ে যায়। সে এক পরিকল্পনাবিদ, হৃদয়ে যার শৈল্পিক নমুনা হাজারো। সে এক গায়ক, অধরে-কণ্ঠে জলপ্রপাতের ধ্বনি তার। আজ কওমের দুর্দিন। কওম মাটি ও রক্তে একাকার। জাতির বধূ-মাতাদের ইয্‌যত-সম্ভ্রম হুমকির মুখে। জাতির এ দুর্দিনে ওইসব কবি-বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত প্রতিভা কাজে লাগাতে হবে। কবির হৃদয়কাড়া কাব্যমালা জাতিকে মুচকি হাসি উপহার না দিয়ে দেবে জেহাদী উদ্দীপনা। তারা কওমকে ফুলের সুতা না দিয়ে উপহার দেবে জেহাদী ঝাঁকুনি। প্রকৌশলী কলম ফেলে হাতে তুলে নেবে তলোয়ার, গায়ক গানের গুঞ্জন ফেলে তুলবে তেগ-এর ঝংকার ও কামান দাগানোর গুরু গম্ভীর ধ্বনি ; কিন্তু হায়! আমাদের কবি-সাহিত্যিকবর্গ এখনও এদিকটা সম্পর্কে বে-খবর। উপরন্তু জাতীয় চেতনা শানিত না করে তারা এমন এক গোলমেলে চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছেন, জাতিকে যা কেবল সমস্যার মুখেই ফেলবে। ঢিল মারার অপরাধে দুশমন আমাদের ওপর পাটকেল মারতে খড়গহস্ত হয়ে আছে। অথচ আমাদের কবিবর্গ তরুণ-যুবাদের বলছেন— দাঁড়াও! আমরা তোমাদের এক নয়া গীত শোনাব। অভিনব ছন্দ লিখছি আমরা। এ সাহিত্য নামকাওয়াস্তের। এখন নতুন যুগের সূচনা।'

আমরা এক দোদুল্যমান কিশ্‌তীতে চড়ে পাকিস্তানমুখো হচ্ছি। হর কদমে আমরা এক নয়া ভোর দেখছি যা ওই সাধের কিশ্‌তীকে ফুটো করে দেবে। সলীম! তোমার লেখা প্রতিক্রিয়ায় এ গরল ঝাড়ছি না ; বরং এক সাহিত্যিকের জাতীয় চেতনাবোধ আমাকে প্রভাবিত করছে তাই। তোমার মনে সমস্যাটি দাগ কেটেছে অবশেষে। হৃদয়ের স্পন্দন বেড়েছে। দশ কোটি তৌহিদী জনতার হৃদয়ের কম্পন দেখে মোহিত আমি দোস্ত। অনুষ্ঠিতব্য বিতর্কে আমি অংশ নিচ্ছি না। ডাক্তারের অবজার্ভেশনে থাকতে হবে। এতে কোন কষ্টও হবে না। অবশ্য তোমার বক্তব্য শুনব অতি অবশ্যই।

www.amarboi.org

আফতাব বলল— সলীমের স্থলে আজ তুমি দেখছি কবি হয়ে গেছ। এখন খোদার দিকে চেয়ে বিশ্রাম নাও। আর সলীম তুমি রুমে গিয়ে বক্তৃতা প্র্যাকটিস করো।

✪ ✪ ✪

রাত ৮টা।

হোস্টেলের কমনরুমে অনুষ্ঠানপূর্ব সাজ সাজ রব।

সভাপতির দায়িত্বে আছেন কলেজের এক জোয়ান প্রফেসর। আখতার কমনরুমে না গিয়ে নিকটস্থ এক রুমে বক্তৃতা শোনার জন্য শুয়ে গেল। মনসুর ওর সেবার চেয়ে স্বাধীনভাবে হুক্কা পান করতে ওই রুমে থেকে গেল। খাট ও নিকটদূরের জানালা থেকে পুরো অনুষ্ঠান দেখা যায়।

আলতাফ ও তার সাথীদের বক্তব্যে ওইসব দলীল ছিল, সাধারণত যা বারবার হিন্দু পত্রিকায় ছেপে আসত। আখতারের ঠোঁটে কখনও ঘৃণাসুলভ হাসি আবার কখনও গোস্বায় ও ঠোঁট কামড়াত। মনসুর ওর চেহারায় প্রভাবিত হয়ে বারবার বলল— বকবক করছে গাধাগুলো। এবার আফতাব ওদের ধোলাই করবে।

আলতাফ গান্ধী-পাগল কিছু সাথী নিয়ে এসেছিল। বক্তৃতার মাঝে ওরা পূর্ব পরিকল্পনামত তালি বাজাত। আফতাবের পালা এলে তার চেহারায় গোস্বার ভাবই সুস্পষ্ট দেখা গেল। ওর বক্তব্য পাকিস্তান বিরোধী গ্রুপের জন্য প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। নিরপেক্ষ শ্রোতারা উপলব্ধি করছিল, সভাপতি সুহৃদ হলে এতক্ষণ এসে ওকে আলিঙ্গন করা দরকার ছিল।

পাকিস্তানের সপক্ষে আরেক বক্তার উপস্থাপনও ছিল নেহায়েত তথ্যপূর্ণ। কিন্তু চিকন গলার দরুন তার ওই উপস্থাপন তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত সভাপতি ঘোষণা করলেন— এবার মিঃ সলীম নির্ধারিত বিষয়ের সপক্ষে বক্তব্য রাখবেন।

সলীম টেবিলে বসে কাগজপত্র ওলটাচ্ছিল। এগুলো গত রাতে লিখেছে ও। বক্তব্য মুখস্থ করে এনেছিল ও। কিন্তু আলতাফের বক্তব্য ওর সাজানো বক্তব্যকে কেমন যেন গোলমেলে করে দেয়। আলতাফের বক্তৃতার মাঝে সলীম উপলব্ধি করছিল, কল্পনার যে রঙিন যানে শ্রোতাদেরকে চড়িয়েছে সে, তাতে ওর এ লিখিত বক্তব্যে শ্রোতাদের মন ভরাতে পারবে না এবং তা বিপক্ষের মুখ বন্ধ করার জন্যে যথেষ্ট নয়। সলীম প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে ওর গালির জবাবে কাব্য রচনা করল। আলতাফের অপরাপর সাথীদের বক্তব্যকালে ঠোঁট কামড়িয়েছে ও। ওর ব্রেনে তখন প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করার নয়া নয়া পয়েন্ট স্থিত হল। অবশ্য বক্তৃতার জন্য যখন ওর নাম এল তখনও ও জানে না— কি বলবে? ঘোষণা শুনেই দ্রুত মঞ্চে এসে দাঁড়াল। ওর মনে ভাসতে লাগল, বিরোধীদের এক একটা গালি ও দলীলের জবাব। আলতাফ অবজ্ঞাভরে বললেন— মিঃ সলীম কি পাকিস্তানের পক্ষে বক্তব্য দেবেন, না কাব্যচর্চা করবেন?

আফতাব জবাব দিল— সলীম জাতীয় গাদ্দারদের মর্সিয়া করবে।

www.amarboi.org

শ্রোতাদের মধ্যে ক্ষণিকের তরে শোরগোল শুরু হল। মান্যবর সভাপতি উঠে দর্শক-শ্রোতাদের খামোশ করলেন। সলীম কম্পিত গলায় বক্তব্য শুরু করে। কিছু কথা বলে সলীম লিখিত কাগজগুলোয় নজর বুলিয়ে নেয়। দ্বিতীয়বার কথা শুরু করে। কথা আসতে থাকে থমকে থমকে। শ্রোতাদের মাঝে শুরু হয় কানাঘুষা। আচমকা নিজকে সামলে নেয় সলীম। গলার ভয়েস যায় পরিষ্কার হয়ে। কল্পনার এক নয়া বক্তা শুরু করে তার বক্তব্য। মাইকে ভেসে আসে বক্তৃতার অনলবর্ষণ ঃ

'সুধীবৃন্দ! আলতাফ ও তার সাথীদের অখণ্ড ভারতের পক্ষে বক্তব্য দিতে লজ্জাবোধ না হলে পাকিস্তান সম্পর্কে কাব্য চর্চা করলে আমার লজ্জিত হওয়ার কথা নয়। আলতাফ সাহেবদের অখণ্ড ভারত হিন্দু কংগ্রেস পৈতাধারী ব্রাহ্মণদের গোলামীর শেকল পরালে স্বাধীন পাকিস্তান আমাকে দেবে স্বাধীনতা ও সুহাসিনী ভোরের পয়গাম। হিন্দুদের চিরন্তন গোলামী তার শখ থাকলে আমার আছে স্বাধীনতা ও ইয্যতের যিন্দেগীর স্পৃহা। পূজার বেদীতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে আলতাফ সাহেবদের দেবতাদের গুণ-কীর্তন করার খায়েশ থাকলে আমার আছে রবের কাবার সম্মুখে মাথা নোয়ানের জয্বা। আলতাফ সাহেবদের বিংশ শতাব্দীতে আরেকটা দীনে ইলাহী কায়েমের হবি থাকলে আমার আছে 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি'-এর মত দীনে মোহাম্মদী প্রতিষ্ঠার সুখস্বপ্ন। হেলালী নিশানের পরিবর্তে যারা গেরুয়া নিশানে প্রভাবিত তাদের প্রতিবাদ করে শ্রোতাদের মূল্যবান সময় খরচা করব না আমি।

কিন্তু হায়! ব্যাপারটা আলতাফ সাহেব, শ্রোতামণ্ডলী ও আমার মাঝে সীমাবদ্ধ হলে স্ব স্ব মতের বহিঃপ্রকাশ ঘটালে ল্যাঠা চুকে যেত ; কিন্তু এটা দ্বিজাতিতত্ত্বের সমস্যা। সমস্যা স্বতন্ত্র দু'টি জাতিসত্তার তামাদ্দুনিক সংঘাতের। সমস্যা কুফর ও হেলালের। সমস্যা হিন্দু-মুসলিমের। সমস্যা তেত্রিশ কোটি দেব-পূজক ও এক খোদার বান্দাহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর।

হিন্দুরা চায় অখণ্ড ভারত। তাই ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মুসলমানদের ওপর মোড়লী করতে চায়। চায় খাইবার গিরিপথ থেকে আসামের দুর্গম পর্বতাঞ্চল অবধি সুবিশাল রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। শাসন ক্ষমতা দখলের পর কোন এক সময় ওরা মুসলমানদেরকে ব্রাহ্মণ সমাজের নিকট ঘৃণ্য কীটে পরিণত করবে।

মুসলিম জাতি চায় স্বতন্ত্র আবাসভূমি। কেননা তারা একটি ভিন্ন জাতি। একটি স্বতন্ত্র পরিবেশে তাদের লালন। আলাদা পারিপার্শ্বিকতায় তাদের বর্ধন। এমন একটা জাতির আলাদা আবাসভূমি অপরিহার্য বৈকি। মুসলমানরা মানুষ। কোন মানুষই সমজাতির গোলাম হতে চায় না। যেমনটা চাইবেন না আমাদের আলতাফ সাহেব— নাকি চাইবেন? প্রশ্ন থাকল তাঁর কাছে।

মুসলমানরা পাকিস্তানের নারা বুলন্দ করলে তাদের মনে একটা প্রতিরোধ মোর্চা ভেসে ওঠে যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের আক্রমণাত্মক স্বার্থ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা অখণ্ড ভারতের নারা দিলে তাদের মনে এমন এক প্রশস্ত শিক্ষার ক্ষেত্র পরিস্ফুট হয় যেখানে সংখ্যাগুরু ব্যাঘ্ররা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই সংখ্যালঘু ভেড়াদের ঘাড় মটকে দেয়।

www.amarboi.org

হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐকমত্য ও সুশৃঙ্খল হচ্ছে। মহাসভার হিন্দু, কংগ্রেসী হিন্দু, সনাতনধর্মী হিন্দু, আর্য হিন্দু, কট্টর হিন্দু, নম্র মেযাজের হিন্দু, মুসলিম জাতিকে শান্তি-নিরাপত্তার বাণী শোনানো হিন্দু আর মুসলমানদের নেপথ্যে কচুকাটাকামী রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ও আকালীমনা হিন্দু সবই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ভবিষ্যত থেকে চোখ বন্ধ না করলে আমাদেরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখবেন! সম্মিলিত মুক্তির জন্য একে অপরের সঙ্গ না দিলে সম্মিলিত বিপর্যয়কালে আমাদেরকে অতি অবশ্যই একে অপরের সঙ্গ দিতে হবে।

হিন্দুরা গোটা ভারতবর্ষে দেব-মন্দির নির্মাণ করতে চায়। ওরা ওদের ওই অতীতে ফিরে যেতে চায় যেখানে ওরা নিজেদের দোষ অচ্ছুৎদের ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের বলিদান কার্যকর করত। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা ভারতের এক কোণে তাদের মসজিদগুলো হেফাযত করতে চায়, সেখানে তৌহিদের প্রোজ্জ্বল চেরাগ সর্বদা আলো ছড়াবে থাকবে সর্বদা। থাকবে না সেখানে জাত-পাত ভেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের জিগরফাটা আর্তনাদ। হিন্দুরা চায় ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র শাসন। মুসলমানরা চায় এক খোদার সালতানাত। কিন্তু অদ্যাবধি আমরা জানতে পারিনি, জাতীয়তাবাদী বা গান্ধী-শিষ্য অতি উৎসাহী মুসলমানরা কি চায়?"

আফতাব অনুচ্চস্বরে বলে উঠল— হালুয়া-রুটি। গোটা শ্রোতাই এ কথায় হেসে উঠল।

সলীম খানিক থেমে বলা শুরু করল—

"এরা হিন্দুস্তানী দশ কোটি মুসলমানের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অস্বীকারকারী। এদের দৃষ্টিতে 'পাকিস্তান আন্দোলন' সাম্প্রদায়িকতা, হীনমন্যতা এবং মৌলবাদ। আর এ মারাত্মক অপবাদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল, একজাতিতত্ত্বের মরণবড়ি গিলে দশ কোটি মানুষের ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়া। এ কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন আত্মঘাতী মৌলভীরা কি ভাবছে, অচ্ছুৎ অস্পৃশ্যতার অভিশাপ কেবল পাকিস্তানীদের ওপর পড়বে? ঝড় আসলে কি গরীব-ধনীর বাসভবনের খেয়াল করে নাকি সকলের ঘরকেই দুমড়ে মুচড়ে দেয়? এরা দেশমাতার পূজক, আর দেশমাতার দেবতা দশ কোটি মানুষের বলিদান ছাড়া ক্ষান্ত হবে না। অর্থনীতির এ বুদ্ধির ঢেঁকিরা পাকিস্তানের ভুখানাঙ্গা হওয়ার ভয়ে উদ্বেগাকুল; কিন্তু এই আত্মঘাতিরা যদি হিম্মত করে বলত— হালুয়া-রুটির চিন্তা ওদের নিজেদের, কওমের নয়। কেননা এটা বুভুক্ষুদের কথা— নয় তো কি! পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে ওদের হালুয়া-রুটি বন্ধ হয়ে যাবে, যা তাদের ওপর বর্ষণ করে চলছে অহিংসনীতির দেবতা হামেশাই।

আমি আযাদীর নেয়ামতকে হালুয়া-রুটির সাথে তুল্য করার হীনমন্যতা দেখাতে রাজী নই। যদিও ওরা ভুখা পাকিস্তানের জন্য মায়াকান্না জুড়ে দিয়েছে ইতোমধ্যেই। ওদের সত্যকণ্ঠ উচ্চকিত থাকলে বলতে বাধ্য হত, শস্য শ্যমল পাকিস্তান হাতছাড়া হয়ে গেলে ভারতকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে ভবিষ্যতে। পাকিস্তানীদের কাপড়ের প্রয়োজন হলে গোটা দুনিয়ার টেক্সটাইল মিলগুলো পাকিস্তানেরই সুতার মুখাপেক্ষী।

www.amarboi.org

এরা সমর বিদ্যায়ও পারদর্শী। তাই ওদের ধারণা, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং ওদের মহামূল্যবান নসীহত অবলম্বন করে আমাদের পাকিস্তান দাবী পরিত্যাগ করতে হবে। আর 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলে হিন্দুদের চির গোলামীর শেকল কাঁধে তুলে নিতে হবে। পাকিস্তানের জয় কিংবা পরাজয় কোন পানিপথের রণাঙ্গনে হবে, কিন্তু এ পরাজিত মানসিকতার মানুষগুলোতো মরার আগেই নিজেদের কবর খনন করে ফেলেছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা শক্তিতে কোন পরাজয় এলে তা এ বিকারগ্রস্ত লোকদেরই পরাজয়। অবশ্য তাদের নিশ্চিত করার জন্য বলতে চাই, জাতীয় চেতনা বিনাশের যে চিহ্ন তাদের ললাটে পড়েছে— তা দেখে জাতি সহজেই অনুমান করতে পারবে মীরজাফরদের। এরা বেশীদিন আর জাতিকে তাদের নেক পরামর্শে ধন্য করতে পারবে না। এরা নিরাপত্তাকামী। এদের ধারণা, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বললে মহাসভার দাদারা নাখোশ হবেন। এতে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়বে। অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়লে গান্ধী মহাত্মার আত্মায় রক্তক্ষরণ দেখা দেবে। সর্বোপরি এ দুনিয়া আমাদের হীনমন্য, সঙ্কীর্ণ ও সন্ত্রাসী নামে আখ্যা দেবে। অর্থাৎ আমরা স্বেচ্ছায় অখণ্ড ভারতের রাজনৈতিক কবরস্থানে সমাহিত হওয়ার প্রস্তুতি নিলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা আমাদের মাথার দেখে বলবে— এ সেই কওম যারা আত্মসম্ভ্রম, নিরাপত্তা, সুধারণা ও উদারতা প্রমাণের জন্য নিজের হাতেই নিজেদের গলা টিপে দিয়েছিল।

এ দিল্লী জামে মসজিদ ও লালকেল্লা নির্মাতাদের এমন স্থলাভিষিক্ত এখানে সমাহিত আছেন যারা বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু প্রশাসনের সংসদ ভবন খাড়া করার আশায় নিজেদের ঝুপড়িতে আগুন লাগিয়েছিল। এখানে ওইসব ভেড়া-বকরীদেরও সমাধি আছে যারা নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রদেরকে নিরাপদ রক্ষক মনে করেছিল।

পাকিস্তানকে আমরা আমাদের আখেরী প্রতিরক্ষা মোর্চা মনে করি। হিন্দু ফ্যাসিস্টদের থেকে আত্ম রক্ষার এটা সর্বশেষ দুর্গ। হিন্দুদের জীবনযাপনের পথের কন্টক নই আমরা। গোটা ভারতবর্ষের তিন-চতুর্থাংশ বরং তার চেয়েও বেশী অংশে তাদের শাসনের স্বীকৃতি দেই, কিন্তু হিন্দুরা স্বাধীনতার চেয়েও আমাদেরকে তাদের পদসেবক করার পক্ষপাতী। মুসলমানদের দরদী সেজে হিন্দুদের পাকিস্তান বিরোধিতায় মেকি কান্না করতে দেখলে তখন তাদের ওই ডাকুর চেয়ে কোন অংশে কম মনে হয় না, যে তার প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করে বলে— ভাই! তুমি ঘরের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করছ কেন? এর মতলব তো এই যে, তুমি আমাকে ডাকু মনে করছ— এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝিতে ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট হয়। এজন্য আমি তোমাকে প্রাচীর নির্মাণের অনুমতি দেব না। চৌকস দস্যু সাধারণত ঘরের টিকটিকির সাথে হাত মেলায়। এ টিকটিকি এসে মালিককে বলে, আরে দোস্ত! একি, তুমি সারারাত কষ্ট করছ, ঘরের দরোজায় পাহারা বসিয়েছ! যাও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়!' নয়তো প্রতিবেশী মনে করবে— তুমি তাকে চোর ভাবছ। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী! এ কংগ্রেসী মুসলমানরা আমাদের ঘরের টিকটিকি।"

আলতাফ ও তার ক'সাথী বিরোধিতায় উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওদের আওয়াজ গোটা শ্রোতাদের হাসি ও সম্মিলিত আওয়াজের সামনে ম্লান হয়ে গেল— 'বসে যাও! বসে যাও! পাকিস্তান জিন্দাবাদ! ঘরের টিকটিকি নিপাত যাক!'

www.amarboi.org

আলতাফ চিৎকার করে বলল— সভাপতি সাহেব! সলীমের বক্তব্যের সময় শেষ।

আফতাব দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল— না! আমরা ওর কথা শুনব।

অধিকাংশ শ্রোতাই আফতাবের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাল। সভাপতি বললেন— আমার যদ্দুর বিশ্বাস, উভয় দলই বুঝতে ও বুঝানোর নিয়তে এসেছে। এজন্য আমি মিঃ সলীমের বক্তব্য জারী রাখার অনুমতি দিচ্ছি। পরে অবশ্য বিপক্ষের দলনেতা কিছু বলার অবকাশ চাইলে তাঁকেও বলার সুযোগ দেয়।

উপস্থিত শ্রোতারা তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে একথার সমর্থন করল। সলীম বলতে লাগল—

সুধীমণ্ডলী! পাকিস্তানকে আমি জ্ঞানগত ও চিন্তাধারাগত সমস্যা মনে করলে এ বিতর্কে নামতাম না। বক্তৃতা যেমন আমার নেশা নয়, তেমনি নয় পেশাও। পাকিস্তানের সমস্যা আমাদের জীবন-মৃত্যুর সমস্যা। আমি প্রলয়ঙ্করী তুফানের শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। যারা আজ পাকিস্তানের প্রতি টিপ্পনি কাটছে সেদিন বেশী দূরে নয় তারা পাকিস্তানের দিকে ছুটে যাবে শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবেই। দুপুরের তাতানো রোদ্দুরে হা-পিত্যেশ ওঠা পথিক এমনিতেই বৃক্ষের ছায়াতলে এসে যায়। হিন্দুদের বিভীষিকা ও গোস্বায় আমি পেরেশান নই ; বরং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য একে মনে করছি সুলক্ষণ। তাদের সম্মিলিত পাকিস্তান বিরোধিতা আমাদের সম্মিলিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করতে সহায়ক হয়েছে ; কিন্তু ওইসব নীতিজ্ঞানহীন নগণ্য মুসলমানকে হুঁশিয়ার করতে চাই, যারা পাকিস্তানের বিরোধিতা ও রামরাজত্বের বৈধতায় কুরআনের রেফারেন্স পেশ করতে এতটুকু লজ্জাবোধ করে না। তাতারীরা যখন বাগদাদে হামলা করেছিল তখন এ শ্রেণীর লোকেরা জনগণকে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতে উৎসাহ যোগাত। আজ যখন আমাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত করার জন্য হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘ ও আকালী ফৌজ তৈরী করছে তখন তারা জনগণের মাঝে অযথাই পাকিস্তান বিষয়ে তর্ক লাগিয়ে দিয়েছে। আমার তো ভয় হয় যতক্ষণ হিন্দুদের প্রস্তুতি পুরা না হয়, যতক্ষণ না হিন্দু মন্দির ও শিখ উপাসনালয় বোমা তৈরীর ফ্যাক্টরিতে পরিবর্তন হয়— এরা না আবার ততক্ষণ আমাদেরকে মানসিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখে। এসব লোকের শত্রুমনোভাবাপন্নতার দরুন পাকিস্তান সম্পর্কিত চেষ্টা-কোশেশ ক'বছর এবং নিছক বক্তৃতা-বিবৃতি ও শ্লোগান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। আর এতে আমাদের প্রতিরোধ মোর্চা বানানোর ফেকের ঠিক তখন হতে পারে যখন শত্রুরা চারদিক থেকে ঘিরে নেয়।

আমাদেরকে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ঘামঝরা পরিশ্রম বিনে সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, সুবর্ণ সুযোগের আশায় দুশমন ওঁত পেতে আছে। সম্মিলিত ধ্বংস না চাইলে জীবন-মরণের তোয়াক্কা না করে এখনিই সম্মিলিত ভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় লেগে যেতে হবে।

আমরা ওইসব লোকের আর্তনাদে পেরেশান হতে যাব কেন? যারা আমাদের সঙ্গ ছেড়ে অপরের কিশতিতে চেপেছে। কেন ভাবব ওইসব লোকের জীবন নিয়ে, যারা রব্বে কাবার থেকে মুখ ফিরিয়ে দেবতাদের প্রতি ঈমান এনেছে? আমাদের যাবতীয়

www.amarboi.org

ধ্যান-ধারণা সেসব লোককে কেন্দ্র করে হওয়া চাই, যারা ইসলামের জন্য যিন্দা থাকতে চায় এবং ইসলামের নামেই মরতে চায়। এদের জন্যই আমরা উদ্বিগ্ন। এক্ষণে সময় এসেছে দেশের প্রতিটি কোণে এ ঘোষণা করার যে, ইয্যত-আযাদীর জীবনের জন্য খুনের দরিয়ায় সাঁতরানোর সময় আসন্ন।

বন্ধুরা আমার! এখন বক্তৃতা-বিবৃতির সময় নয়, সময় আন্দোলনের। সময় বিপ্লবের— সময় বিবর্তনের।'

সলীমের বক্তৃতায় আলতাফ ও তার সাথীদের জোশে বরফ পড়ল। বিপক্ষ দলের সভাপতিকে স্টেজে আসার আমন্ত্রণ জানানো হল। আলতাফ উঠলো ; কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে কেউ 'ঘরের টিকটিকি' বলে উঠলে আফতাব বলল 'পটল তোল'। শ্রোতারা হো হো করে হেসে উঠল। আলতাফের আর মঞ্চে যাবার দরকার পড়ল না।

✪ ✪ ✪

বক্তৃতা শেষে সলীমের কিছু সঙ্গী-সাথী ওর কাছে জমায়েত হল। সকলেই ওকে জানাল ধন্যবাদ। দরোজা থেকে বেরুলে নেপথ্য থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এল— 'সলীম সাহেব! আস্‌সালামু আলাইকুম।

এ আওয়াজ কান অতিক্রম করে সলীমের হৃদয় গহীনে গিয়ে দাগ কাটল। 'ওয়াআলাইকুম আস্‌সালাম' বলে সলীম পেছনে ফিরে তাকাল। হাসিখুশী প্রাণোচ্ছল এক তরুণ মুচকি হাসছে। প্রথম নযরে সলীম ওকে চিনল না। কিন্তু ওর হৃদয়ের গহীন থেকে কেউ যেন বলছিল, তুমি ওকে চেন, জান। ওর আওয়াজ তোমার অপরিচিত নয়। পরের দৃষ্টি অতীতের চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট হৃদয় মিনারে ঢেউ খেলে দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হল। সুন্দর এক বালকের প্রফুল্লময় চেহারা বিকশিত হল। কানে গুঞ্জরিত হয় দিলকাশ হাসি। সহসাই ও 'আরশাদ! আরশাদ!' বলে আগন্তুককে বুকে টেনে নেয়। 'কবে এসেছ? কৈ ছিলে এতদিন? চিঠি পর্যন্ত লেখনি আমার কাছে?'

উত্তরের সুযোগ না দিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায় সলীম।

আচমকা ওদের আশেপাশে বেশ কিছু ছাত্র জমায়েত হল। এখানে সব কথা বলা উচিত নয় ভেবে সলীম বলল— চল, রুমে যাওয়া যাক।

আরশাদ অনুসরণ করল। রুমের দরোজা খুলল সলীম। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে আরশাদকে খালি চেয়ার দেখাল সলীম। এবার নিশ্চিতে সলীম প্রশ্নগুলো আওড়াল।

ওইসব প্রশ্নের জবাবে আরশাদ ওর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বলে গেল। 'আমি অমৃতসর মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেছি। তাই এক্ষণে আমাকে ছোটখাটো একজন ডাক্তার বলতে পার। ফৌজে ছিলাম ক'দিন। আবারও ডাক পড়তে পারে। লাহোরে আমার মামা অসুস্থ। আমি আব্বাজানের সাথে তাঁর চিকিৎসা করতে এসেছি। তবে তাঁর চিকিৎসার চেয়েও তোমার সাথে সাক্ষাতের আশা বেশী। সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছে দেখলাম তোমাদের বিতর্ক চলছে। শুনলাম তোমার বক্তব্য। পাকিস্তান আন্দোলনে ফৌজ প্রস্তুতির প্রয়োজন মনে করলে আমাকে ডেকে পাঠিও।

www.amarboi.org

ঃ তা লাহোরে এসেছ কখন?

ঃ এই চারটা-সাড়ে চারটার দিকে।

ঃ কিন্তু আমার অবস্থান জানলে কি করে?

ঃ তোমাদের বাড়ী হয়ে এসেছি।

ঃ কবে?

ঃ গত মাসের শেষ সপ্তাহে। আব্বা-আম্মাও গিয়েছিলেন। এক রাত থেকে রোববার সন্ধ্যায় ফিরে এসেছি।

ঃ এরপর একটা পত্র তো লিখতে পারতে।

ঃ চিঠি না লিখে লাহোরে আসার ইচ্ছে ছিল।

ঃ তোমার খালুজানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি অসুস্থ হয়ে তোমার নেক ইচ্ছে পূরণের আশা পোষণ করেছে। তোমার খানার ইন্তেযাম করি। আমি অবশ্য খাইনি এখনো। আরশাদ জবাব দেয়— সে কষ্ট-না হয় নাইবা করলে। আমাকে মডেল টাউনে যেতে হবে। ওখানে আমার অপেক্ষা করা হচ্ছে।

ঃ না, না! মডেল টাউনে যাওয়া হবে না তোমার। তোমার খানা ও শোওয়ার এন্তেযাম করছি। রাতে এখানেই থাকতে হবে।

ঃ কিন্তু এতে আব্বাজান পেরেশান হবেন। কাল দুপুরে আমাদের ফিরে যেতে হবে। ওয়াদা করছি, অতি সকালে তোমার কাছে আসব।

ঃ না, ভাই তা হয় না। আমার কাছে এসে রাতে না থেকে পারবে না— সে কথা কি বোঝার বাকী থাকবে তোমার বাবার? সকালে তোমার সাথে গিয়ে মাফ চাইব।

ঃ আব্বাজান তো এ আশঙ্কাই করেছিলেন।

হোস্টেল বয় ভেজানো দরোজা ঠেলে বলল— সলীম সাহেব! খানা দেব কি?

ঃ হ্যাঁ! দু'জনার। গেস্ট আছে।

বয় চলে গেল। সলীম তাকাল আরশাদের দিকে— আরশাদ! আমি এক দোস্তের খবর নিয়ে আসছি। এ পাঁচ মিনিট লাগবে সেজন্য। অতঃপর জমে আলাপ করব।

✪ ✪ ✪

খানাশেষে শুয়ে দু'জনে বলে যায় দু'জনার কাহিনী। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা সলীমের মুখে উচ্চারিত হল না। এটা ওর হৃদয়ের সুপ্ত ও ক্ষীণ কম্পনেই সীমিত রইল— ঠোঁটে এর বহিঃপ্রকাশ অনভিপ্রেত।

আচমকা আরশাদ বলে ওঠে— সলীম! বড়দিনের ছুটিতে অমৃতসর এসো। গ্রামের বাড়ীতে গেলে তোমাকে নিয়ে আসব। আম্মা তোমার সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষমান।

ঃ আজই জানলাম তুমি গ্রামেই থাকছ। তুমিই না একদিন বলেছিলে, গ্রামে থাকার পরিস্থিতি তোমার জীবনে খুবই কম এসেছে।

www.amarboi.org

ঃ হ্যাঁ, ভাই! জীবনে ঠিক তখনই গ্রাম দেখেছি, যখন মেট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এক টুকরো জমি ছিল আমাদের। মরহুম দাদা মৃত্যুর পূর্বে এর বেশ কিছু বন্ধক রেখে যান। তাঁর মৃত্যুর পর আব্বাজান পড়াশোনার খরচায় বাদ-বাকীটা বন্ধক রাখেন। বাড়ীটা কর্মচারীদেরকে দেন পাহারায়। আব্বাজান এক্ষণে কেবল বন্ধকী জমিও ছাড়াননি বরং কিনেছেনও দু'চার বিঘে। গ্রামের বাইরেও আমরা একটা বাড়ী কিনেছি।

ইসমত এবং রাহাতও তোমাকে বেশ স্মরণ করে। তাই তোমার যেতেই হবে। ইসমত ওর বান্ধবীদেরকে এখনো তোমার ছেলেবেলার সেই কাহিনী শোনায়।

ঃ কোন্ ক্লাসে উঠেছে এবার ও?' সলীমের দ্রুত প্রশ্ন।

ঃ ইসমত টেন-এ আর রাহাত সেভেন-এ।

বছর ও ঋতুর আবর্তনে বিবর্তিত সলজ্জ হাস্যমুখর দু'বালিকার মুখচ্ছবি কল্পনা করতে থাকে সলীম। বিলীয়মান অতীতের ঝাপসা আলো-আঁধারিতে হাতড়াতে থাকে ও ওর প্রিয় দু'খানা মুখাবয়ব। দেখতে পায় সেখানে বালিকাসুলভ খিলখিল হাসির স্থলে যৌবনপুষ্ট মুখের লাজুক হাসি। ও ভাবে, ইসমত এখন বড় হয়েছে। শরয়ী বিধান ওর চেহারায় হয়ত নেকাব ফেলেছে। ওকে এখন আর হয়তো আগের মত মাথায় পুষ্পস্তবক ও মালা গুঁজাতে পারব না। বলতে পারব না মাথায় হাত রেখে, দেখো! ওটি ফেলো না যেন! কিন্তু এতো জীবন চলার কুসুমাস্তীর্ণ রাজপথের দিলকাশ স্বপ্নের মত অচেনা রাজকুমারীর কোলে আশ্রয় নেয়ার মত কথা।

আরশাদ ঘুমাল। এপাশ ওপাশ করে শোয়ার পর ঘুম নেমে এল সলীমের চোখেও। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নালোকে ও প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে স্বপ্নের অচীনপুরীতে পৌঁছে যায়; যেখানে শৈশবের হাসি, কৈশোরের দামাল দিনগুলো কেটেছে।

✪ ✪ ✪

বড়দিনের ছুটিতে নিজ গ্রামে না গিয়ে সলীমকে অমৃতসরেই নামতে হল। বিগত মোলাকাতে আরশাদ ওকে বলেছে, ডাঃ শওকত চাকরী থেকে রিটায়ার্ড হয়ে দোকান খুলেছেন। অমৃতসরের বাড়ীতেও ঠিকানা রেখে গিয়েছিল।

দুপুর বেলা।

তাতানো রোদ্দুর।

সূর্যের পুরোটা আলোই যেন অমৃতসরে নিবদ্ধ।

টাঙ্গা বাড়ীর উদ্দেশ্য ধাওয়াল সলীম। ডাঃ শওকতের বাড়ী চিনতে খুব একটা কষ্ট হল না সলীমের। মহল্লায় এসে এক দোকানদারকে বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করলে খোদ্ নিজেই তিনি ওকে বাসায় নিয়ে এলেন।

টাঙ্গা থেকে স্যুটকেস নামিয়ে দরোজার সামনে রাখল সলীম। ভাড়া দিয়ে টাঙ্গা করল বিদায়। লাগাল ছিটকিনিতে হাত। এক লাড়কা মাথা ঝুঁকে বলল— ডাঃ বাড়ী নেই। সলীমকে কিছু না বলে দড়াম করে সে বন্ধ করল দরোজা।

www.amarboi.org

খানিকটা মানসিক পেরেশানিতে টানটান হয়ে সলীম পুনরায় ছিটকিনিতে হাত বাড়াল। ওই ছেলেটিই দরোজা ফাঁক করে ফের বলল— বললাম না! ডাঃ বাড়ী নেই। দরোজা এবারও বন্ধ করতে গেলে সলীম মাঝপথে বলল— আরে আমজাদ! মেহমানদের সাথে এ ব্যবহার করতে আছে কি? আরশাদ কোথায়?

ঃ ভাইজান, বাইরে গেছেন। এই এলেন বলে। তা আপনি কোত্থেকে?

ভেতর থেকে কেউ ওর কান পাকড়াও করে বলল— আপনি কি লাহোর থেকে?

ঃ জ্বি হ্যাঁ!' রাহাতের লাজুক কণ্ঠ সলীম চিনতে পেরে ত্বরা করে জবাব দেয়।

রাহাতের চেহারা খুশীতে রওনাক হয়ে ওঠে। আম্মিজান! আম্মিজান!! বলতে বলতে ও অন্দরে চলে যায়।

মায়ের কণ্ঠে ভেসে এল— আরে আকাশ মাথায় তুলছে যে?

ঃ তিনি এসেছেন আম্মি!

ঃ কে, সলীম?

ঃ হ্যাঁ! হ্যাঁ।'

টিপয়ে বই ছুঁড়ে মেরে রিডিং রুম থেকে বেরুল ইসমত। দরোজা ঘেঁষে বাইরে তাকাল। আচমকা সলীমের দৃষ্টি আবদ্ধ হল ওর অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডলে। সহসাই ওর দৃষ্টি নত হয়ে গেল। ইসমত সরে গেল একপাশে।

মা বললেন— রাহাত! বৈঠকখানার দরোজা খুলে দাও। খোদাই ভাল জানেন, কতকাল কোথায় গায়েব হয়ে গেছে?

রাহাত আমজাদকে বলল— আমজাদ! যাও তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়ে দাও। দরোজা খুলে দিচ্ছি আমি।

ঃ পারব না। আমার কান ধরলে কেন?

ঃ 'থাপ্পড় দাও!' মায়ের কণ্ঠে বকুনি।

ঃ 'বড্ড কমিনা।' বলে ইসমত ওকে সামনে ঠেলে দিল।

যে মেহমান আসার দ্বারা মুহূর্তেই ঘরের পরিবেশ বদলে যায় সে ধরনের মেহমান একেবারেই পছন্দের নয় আমজাদের। এতদসত্ত্বেও বড়দের চাপ সহ্য করতে না পেরে দাপাতে দাপাতে বাইরে এসে বলল— আসুন! বৈঠকখানা খুলছি।

ইতোমধ্যে রাহাত দরোজা খুলে দিয়েছে। সলীম স্যুটকেস নিয়ে অন্দরে গেল। রাহাত এক কোণে নেকাবে মুখ ঢেকে মায়ের রুমে গেল। সলীম ভক্তিভরে সালাম দিল।

মা বললেন— বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাক। এই তো খানিক আগেও তোমার কথা আলোচনা করছিলাম। আরশাদ বাইরে গেছে। বসো বেটা! রাহাত! ভাইয়াকে তোমার সালাম করোনি কিন্তু। দুষ্টামীপূর্ণ এক মুখ সালাম ছুঁড়ে মেরে রাহাত বলল— আস্‌সালামু আলাইকুম ভাইজান!' দরোজায় পিঠ করে ইসমতকে দাঁড়াতে দেখে রাহাত অনুচ্চস্বরে বলল— আপা! আপনি বড় হয়ে গেছেন তাই না।

www.amarboi.org

ঃ ডাইনী! খামোশ! ইসমত ওর বাযু ধরে কৃত্রিম বকুনি দেয়।

বৈঠকে মা সলীমকে বলছিলেন— 'নিশ্চিন্তে বসো বেটা! আরশাদ এসে পড়বে। তোমার চা তৈরী করছি। আমজাদ! তুমি তোমার ভাইজানের কাছে থেকো।' বলে তিনি উঠলেন।

সলীম আমজাদের দিকে মনোনিবেশ করল— আমজাদ! এদিকে এসো!' আমজাদ কাচুমাচু হয়ে ওর দিকে গেল। হাত ধরে পাশটিতে বসাল। প্রতিবেশী এক বালকের সাথে ও ঘুড়ি উড়ানোর মনস্থ করছিল। সে চিন্তায় ও পেরেশান। আরশাদ না আসা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। এতক্ষণে তা ওর অনুমান করা হয়ে গেছে। কিন্তু বাচ্চাদের মন জয় করার কৌশল জানা ছিল সলীমের। তাই খানিক সময়ের ব্যবধানে ওরা দু'জনে অকৃত্রিম কথাবার্তা বলতে লাগল।

সলীম বলল— আমজাদ! তুমি গ্রামের বাড়ী যাচ্ছ কবে?

ঃ আগামীকাল। আপনিও গ্রামে থাকেন বুঝি?

ঃ হ্যাঁ! তুমি আমাদের বাড়ী গেছ। অবশ্য তখন খুব ছোট ছিলে।

ঃ গ্রামে সাপ থাকে বুঝি?

ঃ থাকে বৈকি।

ঃ বহুত বড় সাপ। আস্ত মানুষকে গিলে ফেলে?

ঃ না, না। এমন সাপ তো নেই। কে বলল তোমায় এ কথা?

ঃ রাহাত আপা। তিনি বলেছেন, সাপ হা করলে তার মুখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়। লাঠি দ্বারা তাকে পেটালে তাতে আগুন লেগে যায়। তিনি আরো বলেছেন, গ্রামে হুলো বেড়াল ও চিতা বাঘ থাকে।

ঃ তোমার সাথে সে ঠাট্টা করেছে মাত্র।

ঃ সে কথা আমিও বুঝি। ওগুলো জংগলে থাকে। কিন্তু জনপদে ভূত-পেত্নি থাকে— সে কথাতো মিথ্যে নয়। রাতের বেলা ওগুলো মানুষকে ভয় দেখায়।

ঃ মানুষের মনই আসলে একটা ভূত। ওটিই ভয় দেখায়। এ অবস্থায় ছায়া দেখেও মানুষ মাঝেমধ্যে ভয় পায়।

ঃ আপনাকেও কেউ ভয়-ডর দেখিয়েছে কি কখনো ?

ঃ না।

ঃ রাহাত আপা বলেন, ভূত বড্ড খতরনাক বস্তু। ওরা বাচ্চাদের উড়িয়ে নেয়। ওরা ঠাণ্ডা পানিতে না চুবানো পর্যন্ত ছাড়ে না। কিছু ভূত বড় জিদ্দী। মানুষের মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে ছেড়ে দেয়। এ কথা কি সত্যি ?

সলীম বড্ড কষ্ট করে হাসি সংযত করল। ওদিকে দরোজার ওপাশে রাহাত মুখ টিপে হাসছে।

ঃ এর সবই মিথ্যা?

www.amarboi.org

ঃ কথাগুলো তোমাকে রাহাত বলেছে বুঝি?

ঃ জ্বি হ্যাঁ! তিনি বড় মিথ্যুক। তিনি আরো বলেন, বৃষ্টি হলে গ্রাম-গাঁয়ের বাড়ীর অন্দরে পানি ঢুকে যায়। যারা সাঁতার জানেন না, তারা ডুবে মরে।

সলীম ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল— তোমার সাথে নিছক ঠাট্টা করা হয়েছে।

ঃ শুধু কি তাই! তিনি আরো বলেন, গ্রামের মানুষ ঘুমিয়ে গেলে নাকি তাঁদের নাকে-মুখে ইঁদুর-ছুঁচো পেশাব করে। ক্ষেতের থেকে শিয়াল বেরিয়ে...'

আমজাদ কথা শেষ করতে পারল না, দরোজার ওপাশ থেকে রাগতদৃষ্টিতে রাহাত ওর দিকে তাকাল।

সলীমের দৃষ্টি আমজাদের দিকে থাকায় রাহাতকে ও দেখতে পেল না। আমজাদকে মাঝপথে খামোশ দেখে বলল— হ্যাঁ ভাই! ক্ষেতের থেকে শিয়াল বেরিয়ে— তারপর?

ঃ 'ভাইজান! ও বড্ড বাচাল।' বলে রাহাত অন্দরে চলে গেল।

ঃ উহু! কেন আপনি আমায় এ কথাগুলো বলেননি?

ঃ ভাইজান! ও এক কংগ্রেসী। বিশ্বাস করবেন না ওর কথায়। কট্টর কংগ্রেসী ও। বলল রাহাত।

রাহাতের কথায় আমজাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। কংগ্রেসীর খেতাবপ্রাপ্তি বড় একটা গালিই বলা যায়। 'কট্টর কংগ্রেসী' সেতো এক নিকৃষ্ট গালি। বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখার পরতো বটেই। ওর মতে, কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে তাই ও বলল— আমাকে আবারো কংগ্রেসী বলবেন তো সব কথা বলে দেব। আপনি আমাকে ব্যাঙ, কচ্ছপ ও নেউলের কথাও বলেছেন। ওরা বাচ্চাদের লেপের তলে এক সাথে না কি ঘুমায়। মহিষ ছাদে চড়ে। মেষের ছাদে চড়ার কাহিনীতো বড় আপাই বলেছেন।

ইসমত নেপথ্যে বলল— আমজাদ!

আমজাদ জবাব না দিয়ে ফরিয়াদী কণ্ঠে বলল— আপাজান! ছোট আপা আমাকে কট্টর কংগ্রেসী বলেছেন।

ঃ আমজাদ। এদিকে এসো!' ভেতর থেকে আবারও আওয়াজ এল।

মাথা নত করে ভেতরে গেল আমজাদ! রাহাত নাগালে পেয়েই ওর কান ধরে খিঁচে নিয়ে গেল।

সলীম হাসছিল। কিছু পরে আমজাদ ওর কাছে এল। ওর হাসিখুশী মুখ কেমন যেন গুমোটবাধা।

বেশ কিছুক্ষণ পর আরশাদ এল। সলীম ওর সাথে চা পান করল। সন্ধ্যায় বেরুল উভয়ে। ডিনার করে ডাঃ শওকত, তাঁর বিবি, আরশাদ ও সলীম দীর্ঘক্ষণ কথা বলল। রাহাত ও আমজাদ কামরার এক কোণে খামোশ বসে রইল। ইসমতের অনুপস্থিতিতে সলীম যেন ভর মজমাকে অসম্পূর্ণ মনে করল।

www.amarboi.org

আলোচনার বিষয়বস্তু পাকিস্তান। এ ব্যাপারে সলীমের একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতায় প্রভাবিত ডাঃ শওকত বললেন— শোকর খোদার তোমার মত তারুণ্যদীপ্ত যুব সমাজ আজ পাকিস্তান আন্দোলনে লড়ছে। হিন্দুরা সেই কবে ঐকমত্য হয়েছে; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা আজো একথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করতে পারিনি যে, মুসলিম একটা স্বতন্ত্র জাতি। তাদের আলাদা আবাসভূমি দরকার। একজাতিতত্ত্ব আত্মহত্যার শামিল। তোমাদের বহু কাজ করতে হবে। নয়ত ভয় হয়, তুফান এসে যাবে অথচ তখনো আমরা এ তর্কে লেগে থাকব, পৃথক দেশ আমাদের দরকার আছে কি-না!

আরশাদের মা বললেন— বেটা সলীম! আরশাদ তোমার বক্তৃতার খুব প্রশংসা করেছে। তোমার কাছে কোন কপি থাকলে খানিক আমাদের তা থেকে শোনাও তো।

ঃ জ্বি হ্যাঁ। ওই বক্তৃতা আমি অনুষ্ঠানের রাতেই ভুলে গেছি। আমি স্রেফ বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডনের স্বার্থে ওই বক্তৃতা করেছিলাম।

ঃ আচ্ছা যা আছে এর থেকেই শোনাও দেখি!

স্যুটকেস খুলে সলীম একটা কপি বের করল। পড়ে শোনাতে লাগল। ডাঃ সাহেব ওকে বারবার সাবাশ দিয়ে উপসংহারে বললেন— খোদা তোমায় হিম্মত দিন। পাকিস্তানের জন্য তিনি যেন তোমায় নির্বাচিত করেছেন!

আরশাদের মা বললেন— বাবা! তুমি যখন ইসমত ও রাহাতকে বিস্ময়কর কাহিনী শোনাতে তখন থেকে অনুমান করে আসছি। খোদা তোমার দ্বারা জাতির বিশাল খেদমত নেবেন।

রাহাত কি যেন আমজাদের কানে কানে বলতেই সে বিড়বিড় করে উঠল— আব্বাজান! রাহাত আমাকে ফের কংগ্রেসী বলেছে।

মা খানিক বকুনি দিয়ে হেসে ও পাশের কামরায় চলে গেলেন।

রাহাত-আমজাদের ঝগড়া ওই বাড়ীর একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাহাত ওকে ক্ষ্যাপালে মা-বাবার কাছে ফরিয়াদ জানাত। কখনো বা রাহাত বকুনি পেত এবং পরে কথার বয়কট শুরু হত ভাইবোনের মাঝে। পরে আসত আমজাদের পালা। রাহাত আমজাদের সাথে কথা বলত না। আমজাদ বোনের বই, কলম ও সোয়েটার সেলাইয়ের কাটা কেড়ে নিত। রাহাত ওর পিছু নিত। আমজাদ মাঝেমধ্যে ওর হাতে ধরা দিত। গোস্বায় কাঁচা গোশ্‌ত চিবিয়ে খাবার ইচ্ছে থাকলেও ভাইয়ের বৃন্তচ্যুত গোলাপ পাপড়ি সদৃশ মুখের দিকে তাকিয়ে সে রাগ থমকে যেত। 'আর দুষ্টুমি করবে?' কান ধরে এটুকু বলার মাধ্যমেই শেষ হত ওদের কথার অনশন।

ঃ না, না। আপা মাফ করে দাও।' হেসে বলত আমজাদ। গোস্বা ভুলে যেত ওর আপা। বোনের কথার অনশন হলে আমজাদ পরিবেশকে মনে করত ভূতের বাড়ী।

রাহাত উঠে গেলে মা, আরশাদ ও সলীমের এই মজমাকে কেমন শূন্য মনে করল। মনটা কেমন খাঁ খাঁ করে উঠল। রাহাত ও ইসমত ওপাশে করছে কানাকানি।

www.amarboi.org

✪ ✪ ✪

রাহাত অনুচ্চস্বরে বলল— আপা! ওই কংগ্রেসী আমার পিছু ছাড়ে না।

রাতের বেলা ফয়সালা হল, আরশাদের মা ও বাচ্চাদের সাথে সলীম ওদের গ্রামের বাড়ী যাবে। থাকবে দিনতিনেক।

সুতরাং সকাল দশটায় অমৃতসরের আজনালার উদ্দেশ্যে ওরা বাসে চাপল। ডাঃ শওকত কর্মব্যস্ত থাকায় যেতে পারলেন না। আজনালা থেকে ক'মাইল সামনে ড্রাইভারকে বাস থামাতে বলল আরশাদ। বাড়ীর চারজন লোক ডাঃ শওকত যাদেরকে মাল-সামানা উঠানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন ওদের পিছে পায়দল চলল।

মা ও ইসমত কালো বোরখা পরিহিতা ছিলেন। রাহাত মোটর থেকে নেমে বোরখা বগলদাবা করল।

আরশাদ সলীমকে বলছিল— রাহাত বড্ড দুষ্টু। ওর ধারণা, ছোট মেয়েরা বোরখা পরলে তাদের সম্মান বৃদ্ধি হয়। কাজেই ও আমাকে দিয়ে বোরখা তৈরী করানোর জন্য অনশন ধর্মঘট করে। কিন্তু এখন ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে নাকি। এক্ষণে একদিন বোরখা পরলে দু'দিন পরার জরুরত মনে করে না। গ্রামের বাড়ী পৌছার আগে ভাগেই দেখো, বোরখা পরে বাচ্চাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

গ্রাম্য সরুপথে মাইল দুয়েক চলার পর অঙ্গুলি নির্দেশ করে আরশাদ বলল— ওই দেখো, আমাদের গ্রাম। ওই যে আমতলায় আমাদের বাড়ী। আমগাছ দু'টি পুরানো। আমার দাদার হাতে লাগানো।

আরশাদদের এখানে দু'দিন অবস্থান করল সলীম। এ সময়ে রাহাত ও আমজাদের সাথে ওর অন্তরঙ্গতা ও পরিচিতি হয়। রাতের খানা সেরে সকলকে নিয়ে আলাপ করত। বিগত ক'বছরে ওদের জনপদে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা শ্রোতাদের বেশ রসাত্মক পুঁজি বটে। চাচা ইসমাঈল গাঁও-গ্রামে নব জীবনের হাসি ও কৌতুক অবয়বে প্রবৃদ্ধি এনেছেন। বারংবার চৌধুরী রমজান আলী বিপর্যস্ত হয়েছেন। কাকু ঈসায়ী ও হরি সিং-এর বাকযুদ্ধ নতুন পরিবেশ এনেছে। সলীম এসব কথা শোনায়। ও পাশের কামরা থেকে মাঝে মধ্যে হালকা মিষ্টি-মধুর আওয়াজ ও হাসি ওর কর্ণগোচরে আসে। তখন ওর কাছে ওই প্রাচীর-কাঠিন্য উপলব্ধি হয়, কালের বিবর্তন ইসমত ও ওর মাঝে যা প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একরাতে সলীম ওদেরকে 'আমার গাঁও' শীর্ষক প্রবন্ধখানি শোনাচ্ছিল। ওর সামনের টি-টেবিলে মিটিমিটি করে জ্বলছিল কুপি। আরশাদ বসা ওর পাশটিতে। কামরার অপর কোণের এক খাটে ওর মা, আমজাদ ও রাহাত উপবিষ্ট। ইসমত ও পাশের কামরার দরোজা ঘেঁষে দাঁড়ানো। মা ওর দিকে ইশারা করতে আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে খাটে বসে গেল। সলীম ইসমতের উপস্থিতি ঠিক তখন উপলব্ধি করে যখন ঘটনার কোন এক সময় ও হেসে পড়ে। থমকে থমকে লঘু হাসি ওপাশের কামরার স্থলে যখন ওদের কামরায় গুঞ্জরিত হয়।

www.amarboi.org

আচমকা আমজাদ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে— আম্মিজান! বড় আপাও এখন আমাকে কংগ্রেসী বলেছে।' এ কথায় সকলে হো হো করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সত্তাকে সকলের থেকে গুটাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল ইসমত।

এর খানিক পরেই রাহাত কি যেন ইসমতের কানে দিল। চৌকান্না হয়ে তা শোনার কোশেশ করল আমজাদ। ইসমত গোস্বাভরে ওর কাঁধ ঠেলে ধরে বলল— কংগ্রেসী পেছনে সরো!'

দু'আপার কানাকানির মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না আমজাদ। অবশ্য ওর ধারণা, কানাকানির উপপাদ্য সে-ই। সুতরাং আত্মরক্ষায় পুরোপুরি তৈরী হয় ও।

রাহাত সলীমের দিকে মনোনিবেশ করল— ভাইজান! ওই পীরের কাহিনীর খানিক শোনান তো, যে আপনার ঘোড়া খরিদ করতে এসেছিল।

ঘোড়া খরিদকারী পীরের সাথে নিজের সম্পর্কিত কোন মিল খুঁজে না পেলেও সলীমের কথা শুনতে উৎসাহী হল আমজাদ। ও বলল— ভাইজান! এ কথা বড় আপা ছোট আপাকে বলেছে।

মা বললেন— বড্ড দুষ্টু হয়ে গেছ তুমি।

আমজাদ এবার অনুধাবন করল, সব কথায় মাথা ঘামানো উচিত নয়। মা ক্ষেপে গেছেন। রাহাত বুড়ো আঙুল মাটিতে দাবাচ্ছে। ইসমত তাকাচ্ছে বড় চোখ করে। আমজাদ যেন বিষের পেয়ালা গিলছে। অবশেষে ও সলীমের কাছে গিয়ে বসল।

সলীম পীর বেলায়েত শাহ'র পুরো কাহিনী শুনিয়ে গেল। সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। আমজাদ হাসতে গিয়েও মাঝপথে কেন যেন থেমে গেল এবং আরশাদের দিকে তাকিয়ে বলল— ভাইজান! ওই ধরনের ঘোড়া আমাদের বাড়ীতে ঠাঁই দেব না।

আরশাদ সলীমকে বলল— ভাই। তোমাদের গ্রামে গিয়ে ওই ঘোড়াটা একবার দেখেছিলাম। সেটি মারা যাওয়ায় আমার আফসোস হচ্ছে। কি করে মরল সেটা?

ঃ ইউসুফ বাড়ীর সকলের অগোচরে ওকে চনাবুট খাইয়ে দিত। আমার অনুপস্থিতিতে ওর দানাপানি ঠিক হচ্ছেনা— এ ভাবনায় ওর খাইয়ে দেয়া। একবার বেশ কিছু চনা ঘোড়ার সামনে দেয়। বাড়ীর লোকজন জানতে পারে প্রিয় ঘোড়াটি আমার ইউসুফের অতি প্রেমের শিকার হয়ে এ জগতের সফর শেষ করেছে।

আমজাদ বলল— ইউসুফ কে ভাইয়া ?

ঃ আমার ছোট ভাই। খেলত তোমার সাথেই। কেন তাকে মনে নেই তোমার?' বলল সলীম।

ঃ ঘোড়ার সামনে ও অতিরিক্ত চনা দিত সে কথা জেনেও আপনি কিছু বলতেন না?

ঃ ও কি আর জানত— বেশী খেলে ঘোড়া মারা যাবে ?

আমজাদের নিজস্ব এমন কিছু কর্মকাণ্ডের কথা মনে এল। বলল— দেখো! একবার আমি ভাইজানের টেবিলে কালি ফেলে দিয়েছিলাম। আমাকে থাপ্পড় মেরেছিলেন সহসাই। আবার একদিন বড় আপার কলম ভেঙ্গেছিলাম। তিনিও একখানা থাপ্পড় দিয়েছিলেন আমায়।

www.amarboi.org

আরশাদ স্নেহবশে হেসে ওকে কোলে তুলে নিল। বলল— সলীম ভাই! বড় খতরনাক আমার এই জেদী ভাইটি।

রাহাত বলল— ভাইজান! সব কংগ্রেসীই খতরনাক।' আমজাদ রাগে দাঁত কটমট করল।

✪ ✪ ✪

মা বললেন— খবরদার! আমার পুত্রকে কেউ কংগ্রেসী বলবে না...।

পরদিন সলীম মেজবানদের আল-বিদা জানাচ্ছিল। চৌরাস্তার মোড় পর্যন্ত ওর সাথে এল আরশাদ। মোটরে ওকে উঠিয়ে দিয়ে তবেই এল। সন্ধ্যার দিকে সলীম ওই সরুপথের মোড়ে এল, যেখানকার ক্ষেত ও ফুলের দৃশ্য ওর মনকে আন্দোলিত করে। বাড়ীতে পৌছে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল বরই গাছ। নিজেদের জামগাছটি দেখে আরশাদের চালে ছড়ানো গাছটির কথা মনে পড়ে গেল। ও ভাবছিল, হায়! দুটো বৃক্ষ যদি কাছাকাছি হত। আহা! দুটো ঘর যদি পাশাপাশি হত। হায়! যদি ও পাশের সেই ঘর হতে কারো অনুচ্চ লাজুক হাসির আওয়াজ বেরুত। এ অনুভূতির স্বাদ মনের গভীরে গেঁথে থাকে অনেকক্ষণ।

মাগরিবের নামায আসন্ন। গাঁয়ের জলাশায় থেকে অযু সারে সলীম। দাঁড়ায় নামাযে। বাদ নামায দোয়ার জন্য উঠায় হাত। বিগত দিনের মাগরিবের নামাযের দোয়া আর আজকের দোয়ায় বেশ ফারাক লক্ষ্য করা যায়। দোয়া সেরে উঠতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন পেছন থেকে ওর চোখ চেপে ধরে। অন্ধকারে চমকে আগন্তুকের মুঠি চেপে ধরে সলীম বলে ওঠে— কে মজীদ?

মজীদ হেসে পড়ল। উঠে ওকে বুকে চেপে ধরল। মনে হল, সলীমের ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে নেবে। মজীদের পাশে অপর এক তাগড়া জোয়ান দণ্ডায়মান। সলীম ছিল তার দিকে হাত বাড়িয়ে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল মজীদের দিকে। মজীদ বলল—

'বলোতো কে এ?

সলীম ক্ষণিকের তরে পেছন অতীতের দিকে ফিরে এল। হঠাৎ মনে পড়লে চিৎকার দিয়ে বলল— আরে দাউদ।

মজীদ বলল— দাউদ! দাও আমার এক টাকা! দেখ সলীম! ও বাজী ধরে বলেছিল, তুমি ওকে নাকি চিনতে পারবে না।

সলীম বলল— তা অবশ্য ঠিক নয়। কিন্তু চিনতে ওকে খানিক তাক্‌লীফ আমার হয়নি— তাও নয়। ওর টেকো মাথায় চুল গজিয়েছে। তা কবে এলে দাউদ?

ঃ এই ধরো দিনআষ্টেক তো হবেই। আজই শুনলাম, মজীদ বাড়ীতে। ওর কাছেই যাচ্ছিলাম— পথিমধ্যে দু'জনকেই পেয়ে গেলাম দৈবাৎ।

ঃ এখন তুমি আমাদের এখানেই থেকে যাও!

ঃ হ্যাঁ, ভাই। তুমি আজ যেতে পারবে না। 'বলল মজীদ।

www.amarboi.org

রাতের বেলা। মজীদ ও দাউদ তাদের সেনা জীবনের কাহিনী শুনিয়ে গেল। মজীদের প্রমোশন হয়েছে জমাদ্দার-এ, আর দাউদ সেই সেপাই এখনও।

✪ ✪ ✪

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কেবিনেট মিশন হিন্দুস্তানকে আযাদীর ওই বৃক্ষের ফল বণ্টন করতে চাইছিল, যে বৃক্ষকে জার্মানী ও জাপানের লু-হাওয়া থেকে বাঁচাতে তাকে পরাধীন কওমের কাছে খুন ও ঘাম ভিক্ষে করতে হয়েছিল। উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক মঞ্চ-ময়দানে কোন পক্ষাবলম্বন না করে ইংরেজ তৃতীয় পক্ষ হয়েছিল। ১৯৪২ সালের মুসীবতের ছত্রছায়ায় যে কংগ্রেস রামরাজত্ব পুনঃজাগরণের আশায় 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করেছিল, নিরাশ হয়ে তারা এক্ষণে টোকিওর স্থলে লন্ডনকে স্বার্থোদ্ধারের কেন্দ্র বানাল।

ইংরেজকে সর্বাবস্থায় ভারত ছাড়তেই হত এবং ছাড়ছিলও। কিন্তু কখন? কি অবস্থায়? এ নিয়ে কংগ্রেসের তেমন কোন মাথাব্যথা ছিল না। তাদের একটাই লক্ষ্য ও আশা— সাদা চামড়ার স্থলে দিল্লীর মসনদে যেন তামাটে বর্ণের চামড়া বসে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনপ্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছিল, কিন্তু কংগ্রেস ভাবছিল কি করে নিভু নিভু প্রদীপের এ সল্‌তে থেকে রামরাজত্বের মশালে আগুন ধরানো যায়। ব্রিটিশ-ব্যাঘ্র বার্ধক্যের তীরে উপনীত। নড়ছিল তার দাঁত। উপমহাদেশের সুবিশাল শিকার ক্ষেত্র থেকে লেজ গুটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। অবশ্য তখন আগ্রাসনবাদী, সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী কংগ্রেস-শেয়ালের মুখ দিয়ে লালা বেয়ে পড়ছিল শ্রাবণ মেঘের দিনের মত। ওরা হুয়াক্কা হুয়া ধ্বনি দিয়ে বলছিল— অন্নদাতা! তোমরা তো চলে যাচ্ছ। যাওয়ার আগে এ শিকার ক্ষেত্র আমাদের হাতে সোপর্দ করে যাও। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেসব বকরী-ভেড়া 'পাকিস্তান-পাকিস্তান' বলে চেঁচামেচি করছে, তাদের নিয়ে তোমাদের উৎকণ্ঠার দরকার নেই। ওরা আমাদেরই। আমরাই ওদের দেখভাল করব। শিকারী পাখির ন্যায় ওদের নিয়ে খেলব। সুতরাং ওদের নিয়ে ভাবনার কোনই অধিকার নেই তোমাদের।

ফ্যাসিস্ট হিন্দুদের সামনে একটাই লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ওরা ওদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছিল। মুসলিম নিধনের একটা চূড়ান্ত পরিকল্পিত প্রস্তুতি নিচ্ছিল দাদারা। সেই নিধনের বিপক্ষ হচ্ছে ভাগ্য বিড়ম্বিত নিরস্ত্র-নিরীহ মুসলিম জনগোষ্ঠী। কংগ্রেস একদিকে উন্মাদ একদল ফৌজ তৈরী করছিল, যাদের দ্বারা মানবেতিহাসে ন্যক্কারজনক নিপীড়ন ও বর্বরতার ইতিহাস রচিত হবে। অপরদিকে এ ধূর্ত কংগ্রেস বলে বেড়াচ্ছিল— 'মুসলমানরা আমাদের ভাই। সুতরাং স্বাধীন ভারতের যেটা পাওনা, দিয়ে দাও সেটা আমাদের। এমন কি মুসলমানদেরটাও। স্রেফ এতটুকুই নয়— যাওয়ার পূর্বে শাসনের ঘোড়পৃষ্ঠে উঠিয়ে যাও আমাদের। গুলিভর্তি পিস্তল দিয়ে যাও। রশির দুচ্ছেদ্য বাঁধনে আটকে যাও নেড়েদের। অতঃপর আছড়ে ফেলো আমাদের পায়ের কাছে। অতঃপর হে ইংরেজ দেবতা, হে ভগবান! চলে যাও তোমাদের দেশে! কোন বাধা দেব না। করব না কোন প্রকার বিবাদ-বিসংবাদ, কোন

www.amarboi.org

সন্ত্রাস হবে না। এতে বয়ে যাবে এ মুলুকে শান্তির সুবিমল বাতাস। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান নারার প্রতি তোমরা সাড়া দিলে বলব— ইংরেজ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনে যাচ্ছে। আমরা ভারতমাতার বুকে বিভক্তির কালো রেখা টানতে দেব না। কাউকেই না। কিছুতেই না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রিহার্সেল করছিল পৈতাধারী দাদারা। মুসলমানরা পাকিস্তানকে দুর্গ মনে করে ঝড় আসার আগেভাগেই সেখানে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল আর হিন্দু ফ্যাসিস্টরা তাদের ইবলীসি নেশা চরিতার্থ করতে এ প্রতিরক্ষা দুর্গকে মিসমার করতে আদা-নুন খেয়ে নেমেছিল।

হিন্দু ফ্যাসিস্টরা পূর্ণোদ্যমে, শক্তিশালী হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু মুসলমানদের চলার পথে ছিল বেশ ক'টি বাধা। এ কাঁটা বিছাচ্ছিল নগণ্য কিছু তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান যারা অপমানকর কিছু শর্তের বিনিময়ে কওমের ইয্যত-আযাদীকে সওদা করেছিল। তাদের চলার পথে ওই ইউনিয়নিস্ট মুসলমানরা গর্ত খুঁড়ছিল, যাদের পূর্বসূরিরা কখনও শিখ আবার কখনও ইংরেজদের থেকে জাতির শহীদদের খুনের বদলা উসুল করেছিল। এ সুযোগ-সন্ধানীরা ইংরেজ প্রভুদের রাজত্ব খতম হতে দেখে হিন্দুদের সাথে নিজেদের ভবিষ্যত জুড়ে দিয়েছিল। পাঞ্জাবকে এরা মনে করত বাপ-দাদার সম্পত্তি। ওদের যিন্দেগীর একটাই মাকসাদ— এটা হোক ওদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। হোক না সেটা হাসিল ইংরেজদের বুট চেটে কিংবা হিন্দুদের কদমবুসি করে। কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসীরা তলে তলে প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিল পুরোপুরি। ওদিকে মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাতে বিভিন্ন দল নানা বর্ণে, নানা ছন্দে ময়দানে নেমেছিল এবং 'হরিবল' ধ্বনি দিচ্ছিল গলা খাঁকারী দিয়ে। বলছিল— "কংগ্রেস হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তাদের সভাপতি সাব্যস্ত করেছে এক মুসলমানকে। সুতরাং তোমাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কোন দরকার নেই।

পাঞ্জাবের জনৈক মৌলভী প্রফেসর তার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলেছেন— মুসলমানরা পাকিস্তান চায় না। সুতরাং 'পাকিস্তান' নিছক মরীচিকা মাত্র। সিন্ধুর জনৈক সাইয়্যেদ ও হাজি সাহেব বলেছেন— পাকিস্তান মুসলিম জাতিকে চরম ক্ষতির সম্মুখীন করবে। সুতরাং সমঝদার মুসলমান পাকিস্তান বিরোধী।

বেলুচিস্তানে এক ব্যক্তি সুন্নতী টুপি ফেলে গান্ধী টুপি পরিধান করেছেন। সুতরাং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই আসে না।

সীমান্ত শহরে অমুক খান সাহেব গান্ধী আরাধনার সভাশেষে বলেছেন, তিনি এক মহান ব্যক্তিত্ব। বকরীর দুধপান করে জীবন ধারণ করেন, চরকায় সুতা কেটে কাপড় পরেন। অতএব মুসলমানদের মুক্তি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নয়, মুক্তি চরকায় সুতা কাটায়।'

মুসলিম জনগোষ্ঠী নির্বাক, হতাশ ও পেরেশান। তাদের মাঠে ল্যাংড়া-লুলা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শী নেতৃত্বের লাশ। শুধু কি তাই। মুনাফিক ও গাদ্দারদের সাথে তাদের হাত। এ কিসিমের নেতারা বিভিন্নভাবে স্ব স্ব কর্মীদের রাজনৈতিক কবরস্থানের পথ দেখাচ্ছিল যেখানে কংগ্রেস তাদের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করছিল পুরোপুরি।

www.amarboi.org

পথহারা জাতি যখন নেতৃত্বশূন্যতায় ভুগছিল তখনই ইসরাফীলের শিংগা ধ্বনির আওয়াজ নিয়ে এক নেতার আবির্ভাব ঘটল। এক ক্ষীণকায় বয়োবৃদ্ধ রাহবার তাদের মানযিলে-মাকসুদ দেখালেন। ছিপছিপে গড়নের এ মানুষটি তাঁর হাড্ডিসার হাতে কখনও সার্থক কাণ্ডারীর ভূমিকায় জাতির ভাগ্যতরীর ছেঁড়াফাটা পাল মেরামত করতেন। আবার কখনওবা দুশমনের চেহারা থেকে প্রতারণা সাগরের ঊর্মিমালা অপসারণ করতেন। তাঁর বজ্রকণ্ঠ শ্রোতাদের কানে বিদ্যুৎ আওয়াজ হয়ে কলিজা বিদীর্ণ করত। কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে বিরোধিতার বাধা উতরে এগিয়ে যেতেন তিনি। চলার পথের বাধাকে তিনি পরোয়া করেছেন থোড়াই। এ মহানায়ক ও মহামানবের নাম কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

১৯৪৫ সালে কংগ্রেস বলয় মুসলিম লীগের প্রতি যতটা বেইনসাফী করছিল ঠিক ততটা তারা ঝুঁকে পড়ছিল শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের প্রতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ। এক্ষণে উত্তর ভারতে তাই সেপাই পাঠানোর দরকার নেই। এ সময় সেই জোয়ানদের কোন কদর রইল না যারা জার্মান-জাপানের ফুঁসে ওঠা সয়লাবের সম্মুখে বক্ষ টান করে গুলি খেয়েছিল। এক্ষণে ইংল্যান্ডের বড় বড় ধনকুবেরদের সাহায্যের প্রয়োজন। পূর্বভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইজারাদারির আশঙ্কা করে বৃটিশ উচ্ছিষ্টভোগী কংগ্রেস টাটা, বিড়লা ও ডালমিয়াদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

কংগ্রেসের প্রভাবশালী পুঁজিপতি পৃষ্ঠপোষকদের লিডার মিঃ শেঠ বিড়লা বৃটেনে তাদের ব্যবসায়িক গুরুত্বে গান্ধীজীর আশীর্বাদ হাসিল করে এ বাস্তবতার দিকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ইংরেজ ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমঝোতায় ব্রিটিশ বণিক ও হিন্দু মহাজনের পারস্পরিক লেনদেনকে অলঙ্ঘনীয় শর্ত হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে।

কেন্দ্রের গড়িমসিতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের যোগসাজশে শিমলা কনফারেন্স ব্যর্থ হওয়ার কারণ ছিল, কংগ্রেস মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একক মুখপাত্র মেনে নিতে পারছিল না। তাই বরাবরই তারা হিন্দু-মুসলিম মুখপাত্রের ইস্যুকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই তারা ধার্মিক মুসলমানদের অংশে কমপক্ষে একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত করাতে যারপরনাই চেষ্টা করছিল, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে এদেরকে রামরাজত্বের রথে চড়ানো যায়। বাহ্যত এ ন্যাশনালিস্ট বা রাজনৈতিক এতীমদের দল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সমঝোতার পথে চরম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্যি বলতে কি, এরা নিষ্প্রাণ পাথর মাত্র, যাদের ছত্রছায়ায় কংগ্রেস হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে অসাম্প্রদায়িকরূপে পেশ করতে চাচ্ছিল।

শিমলা কনফারেন্স ব্যর্থ হবার পর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় এসেম্বলীর সাধারণ নির্বাচন মুসলিম লীগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের বিষয় ছিল। কংগ্রেস-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন হিন্দু পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারেই অকল্পনীয় ছিল। তারা হিন্দু জনতার মনে একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, ইসলাম বৈরিতা কিংবা পাকিস্তান বিরোধিতায় তাদের অবস্থান হিন্দু মহাসভার মানসিকতার চেয়ে কোন অংশেই হেরফের নয়। অবশ্য মুসলিম লীগ তখন

www.amarboi.org

পড়েছিল মহাফাঁপড়ে। কোন না কোন প্রদেশে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বর্ণচোরা মুসলিম গাদ্দার বিদ্যমান ছিল। মুসলিম বিরোধিতায় এদেরকে 'কাঁটা দিয়ে কাটা' তোলার নীতি অবলম্বন করাতে এতটুকু ভুল করলেন না ধুরন্ধর কংগ্রেসী দাদারা।

পাঞ্জাবের সুযোগসন্ধানী ইউনিয়নিস্টরা ইংরেজী শাসনের যবনিকাপাত আঁচ করতে পেরে তাদের ক্ষমতার পৈতা বেনিয়াদের প্যান্টের বেল্টে বেঁধে দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করল না।

বহিরাক্রমণের তুলনায় অভ্যন্তরীণ হামলা অধিক খতরনাক হয়ে থাকে। দুশমনের চেয়েও গাদ্দারদের গাদ্দারী জনগণের ক্ষতি বেশী করে থাকে; কিন্তু এখানে গাদ্দার কি দু'একটা? হাজার নয় লাখের কোটাও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের কোন বস্তি, লোকালয় ও জনপদ এমন ছিল না যেখানে ওঁত পাতেনি এ কংগ্রেসী আত্মঘাতী মুসলিমরা। সম্ভবত মানব ইতিহাসের পাতায় এমন উপমা খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে, কোন কওম এমন গাদ্দার জন্ম দেয়নি, যারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দেয় যে, অস্তিত্ব রক্ষার্থে আযাদীর দরকার নেই। জনমত যতই দুর্বল হোক না কেন, গাদ্দারদের গাদ্দারীকে তারা কোন মতেই প্রশ্রয় কিংবা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে না। এ ধুরন্ধর শ্রেণীর লোকেরা জাতির সামনে শুধু বিষের পেয়ালা নিয়ে একথা বলেনি যে, দুশমনদের পক্ষ থেকে তোমাদের অভয় দিয়ে বলছি— মৃত্যুর পর কেউ তোমাদের লাশের অবমাননা করবে না, বরং ওরা তলে তলে চালিয়ে গেছে সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল ধরানোর প্রক্রিয়া।

কিন্তু হায়! চরম নিদানকালেও মুসলিম জাতির সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার দিকে তাকালে কেবল আফসোস-ই বাড়ে। যে গাদ্দারদের ২৪ ঘণ্টা দুশমনদের দস্তরখানে হাড্ডি চিবাতে দেখা যেত, বাজারে-বন্দরে ডংকা পেটাত, চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে গলাবাজি করত অথচ তখনও তারা এদের টুঁটি চেপে ধরার প্রয়োজন বোধ করেনি। ওদের দল ছিল, আঞ্জুমান ছিল। জাতির সামনে দাঁড়িয়ে ঢোল পিটিয়ে ওরা দরাজ গলায় বলত— জাতি হে! পাকিস্তান তোমাদের ধ্বংসই ডেকে আনবে কেবল। ইয্যত, আযাদী ও স্বাধীনতা তোমাদের জন্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের পয়গাম নিয়ে আসবে। হিন্দুদের গোস্বা আর মহাত্মা গান্ধীর আত্মায় রক্তক্ষরণ হবে। হে মুসলিম সম্প্রদায়! একি কাপুরুষতার লক্ষণ তোমাদের! হিন্দু প্রশাসনকে তোমরা ভয় করছ যে! দুনিয়ার মানুষ কি বলছে তোমাদের! সঙ্কীর্ণ, বুযদিল ও হীনমন্য ছাড়া আর কি!

ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবকে ভারতবর্ষের তোরণদ্বার মনে করা হত। এ সেই গোল্ডেন ল্যান্ড যেখানে পা রাখা ছাড়া মুসলমানদের পক্ষে পাকিস্তানের পথে এগোনো সম্ভব ছিল না।

বাংলার অবস্থা তখন আশাব্যঞ্জক ছিল। ওখানে যেসব মুসলমানকে কংগ্রেস ক্রীড়নক সাব্যস্ত করেছিল তারা তাদের প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব দুটোই খুইয়ে বসেছিল। কিন্তু হিন্দু ফ্যাসিস্টরা পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্টদের কাঁধে তাদের বন্দুক চাপিয়ে দিয়েছিল। সুচতুর কংগ্রেস আঁচ করতে পেরেছিল যে, নেমকখোর তথাকথিত ন্যাশনালিস্ট

www.amarboi.org

মুসলমানরা তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করছে। সুতরাং পাঞ্জাবে তারা ওই উচ্ছিষ্টভোজী কুলাঙ্গার ন্যাশনালিস্ট মুসলমানদের ওপর ভরসা না করে কাপালিক ইউনিয়নিস্টদের পিঠ চাপড়াল এবং সমঝোতা করল। জানমাল ব্যয় করার গ্যারান্টি দিল। এমনিতেই ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য এরা ইংরেজ পদলেহী প্রশাসনের মাধ্যমে লাখো রুপী সঞ্চয় করেছিল। তদুপরি কংগ্রেস মহাজনদের পৃষ্ঠপোষকতার দরুন ওদের সেই সঞ্চয়ী ফান্ডে আরো ক'কোটি মাল-পানি জমা পড়ল।

জাতির এই দুর্দিনে মুসলিম জোয়ানরা বিশেষ করে ছাত্রসমাজ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। তারা ধুতিপরা, নেংটি পেঁচানো ও পৈতাধারী পৌত্তলিক ঐকমত্যের সৌধচূড়াকে ভেঙ্গে দিতে বদ্ধপরিকর হল। তারা সিংহশার্দুলের মত বীর বিক্রমে ময়দানে নামল। উদ্দেশ্য পৃথক আবাসভূমি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের স্বপ্নের পাকিস্তান। মুসলিম অধ্যুষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত প্রদেশগুলোর মুসলমানদের মনে জেহাদী প্রেরণা অধিক ছিল। কেননা হিন্দুদের ইসলাম বৈরিতা এসব অঞ্চলে সুস্পষ্ট ছিল। এ জন্যই বুঝি আলীগড় ভার্সিটির শিক্ষানবীশ ও স্কলাররা পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্তবর্তী প্রদেশে জেহাদের জন্য পৌঁছে গিয়েছিল।

✪ ✪ ✪

গুরুদাসপুর জেলার একটি ছোট মহল্লায় স্থানীয় মুসলিম লীগের নির্বাচনী জনসভা চলছিল। রিটায়ার্ড এক স্কুল মাস্টার সভাপতির চেয়ারে বসা। বক্তব্য দিচ্ছে জনৈক তরুণ। ওই সভা শুরু হবার পূর্বে গ্রাম-গাঁয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল, পীর সাহেব ও পীরযাদারা সভাপতিত্বের আসন অলঙ্কৃত করতে তাশরীফ নিচ্ছেন এবং কেন্দ্রীয় কয়েক লিডার রাখবেন বক্তব্য। গ্রামের নিরীহ জনতাদের কেউ ঢোলা জামাধারী নেতা আর কেউ পীরযাদাদের নূরানী চেহারার ফয়েজ নেয়ার বাসনায় শহরের এ সভায় হাজির হল। জনসভার সময় হয়ে এল। এমন সময় আচমকা মাইকে ঘোষণা এল— পীরযাদাদের পথিমধ্যে গাড়ী আটকে দেয়া হয়েছে। কাজেই তাদের পৌঁছুতে পৌঁছুতে আগামীকাল লেগে যাবে। বক্তাগণও জানেন না যে, তাঁরা তাহলে গেল কৈ?

স্থানীয় পুলিশ ইন্সপেক্টর ও ডিসি এ সভার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তহশীলদার সাহেব দিনদুয়েক পূর্বেই শহরের আশেপাশের নির্ভরযোগ্য লোকদের এ মর্মে সতর্কাবস্থায় রেখেছিলেন যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গোলযোগের আশঙ্কা করছেন। সুতরাং শ্রোতা-কর্মীদের যোগদান করতে দেয়া যাবে না। যোগ দিলেও তা হতে হবে শর্তসাপেক্ষ। মাইকবিহীন হতে হবে। ডিসি সাহেব নম্বরী সেপাই নিয়ে গ্রাম-গাঁও চষে ফিরেছেন। ভাড়াটে কিছু মৌলভী এলাকার প্রভাবশালী মহাজনদের মোটর-এ করে সাদাসিধে গ্রামবাসীদের কানে একথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা তাদের জন্য কল্যাণকর নয়। ওই জনপদের কিছু যুবক লাহোর কলেজে পড়াশোনা করত। এ কুলাংগার মৌলভীদের প্রভাবে তাদের বেশ কিছু প্রভাবিত। সুতরাং মৌলভীদের মোটরে চাপল তারাও। বিকেলে চারটায় জনসভা আরম্ভ হবার কথা। গ্রাম্য যুবকেরা দুপুরের

www.amarboi.org

পূর্বেই লোকজন নিয়ে সভাস্থলে এল। ছাত্রদের হাতে সবুজ পতাকা। সকলের সামনে একজনে পেটাচ্ছিল ঢোল। ইউনিয়নিস্টরা ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস দফতরে জানিয়ে রেখেছিল, এখানে এক চৌকস মৌলভীর দরকার।

পীরযাদাদের সংবাদ আসার পর মঞ্চে প্রশ্ন দেখা দিল কে হবেন সভাপতি? বয়োবৃদ্ধ রিটায়ার্ড এক স্কুল মাস্টার ডিসি, দারোগা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সভাপতি চেয়ারে বসতে রাজী হলেন। এক্ষণে লিডারদের অপেক্ষার পালা, ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে তখন বিকাল সাড়ে চারটার ঘরে। শ্রোতাদের মনে হাতুড়ি পেটা শুরু। তারা পাকিস্তানের পক্ষে টগবগে এক যুবকের আনাড়ি বক্তব্য শুনছিল। পীরযাদার স্থলে এক বৃদ্ধ সভাপতি আর নেতাদের স্থলে অনভিজ্ঞ তরুণের বক্তব্য দূরের মানুষের মন জয় করতে পারল না। কাজেই যুবকের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া স্টেজের আশে পাশেই সীমাবদ্ধ থাকল। স্টেজ থেকে যারা অপেক্ষাকৃত দূরে ছিল ওরা গপ্-শপ্ মারতে লাগল বেপরোয়া। আচমকা ওই সভার অনতিদূরে দু'টো মডার্ন কার দেখা গেল। এর ঠিক পেছনে একটি মাইকসেট করা ট্রাক। ইউনিয়নিস্ট গংরা ওই লরী ও কার থেকে নামল। সাথে নামল এক কুলাঙ্গার মৌলভী আর এলাকার তিন প্রভাবশালীও। অপর একটি কার থেকে প্রতিবেশী জেলার ডিসি ও সাদা পোষাকের টিকটিকি নামল। স্থানীয় থানার দারোগা, করিম বখশ হাবিলদার আগে বেড়ে তাদের জানালেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। ইউনিয়নিস্টদের ইশারায় ট্রাকের গ্রামোফোনের সুইচ অন্ করা হোল। মুসলিম লীগের সভার একেবারে পেছনের সারির লোকজন কেটে পড়তে লাগল। কংগ্রেসী মৌলভী ট্রাকের ওপর উঠে দাঁড়াল। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শেষে বক্তব্য শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম লীগের সভার চেহারা পাল্টে গেল।

মুসলিম লীগের মোকাবেলায় ইউনিয়নিস্টরা ছাড়াও আশপাশের পাড়াগাঁয়ের শিখ ও মাস্তান হিন্দুরা জড় হল। মুসলিম লীগের মঞ্চে যে জোয়ান এতক্ষণ বক্তব্য রাখছিল সে এবার বক্তৃতা ছেড়ে নারা লাগাতে লাগল— মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ! পাকিস্তান জিন্দাবাদ! এ নারার জবাবে কংগ্রেসী মৌলভী বলে উঠল— নারায়ে তকবীর। একই সাথে দু'টো পরস্পর বিরোধী শ্লোগান ভেসে এল। উভয় গ্রুপই আল্লাহ্ আকবর বলল। শিখ ও হিন্দুরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে নারার প্রথম অংশ বাদ দিয়ে কেবল 'জিন্দাবাদ' বলল। মুসলমানরা হেসে পড়ল। তারা একে অপরকে বোঝাতে চেষ্টা করল— দেখো ভাই! মৌলভী সাহেব প্রথমে 'আল্লাহ্ আকবর' নারা দিয়ে শিখ-হিন্দুদের বিপদে ফেলেছিল। এবার 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' বলে নারা দিয়ে ওদের সে বিপদ থেকে উদ্ধার করল।

ঠিক ওই মুহূর্তে মুসলিম লীগের পতাকা সম্বলিত একটি দৃষ্টিনন্দন জীপ ওখানে এসে ব্রেক কষল। ড্রাইভারের পাশটিতে সলীম বসা। পিছনে জনাচারেক জোয়ান। সলীমের নির্দেশে মুসলিম লীগের মঞ্চের সামনে গাড়ী থামাল ড্রাইভার। গ্রামের যে সব আশাহত লোক দুঃসহ বোঝা নিয়ে বসেছিল, নবউদ্যমে জীপের চারপাশে ভিড় করল সকলেই। কেউ কেউ বলছিল, নেতা এসেছেন, লিডার এসেছেন। আবার কেউ ও কথার বিরোধিতা করতে গিয়ে বলল— না দোস্ত! নেতা বরং পেছনেই আসছেন।

www.amarboi.org

সলীম ও ওর সাথীরা জীপ থেকে নামল। ওর সাথে আলীগড় ভার্সিটির দু'জলার। ওদের পরিহিত বেঢপ শেরওয়ানী ও পাজামা দেখে জনতা মনে করল বাপরে বাপ! নেতা এরা না হলে তো কারা। ইতোপূর্বের বক্তৃতারত জোয়ান স্টেজ থেকে নেমে সলীম ও ওর সাথীদের সাথে উষ্ণ করমর্দন করল। তার কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর জেনে গোটা পরিস্থিতি আঁচ করতে পারল সলীম। সভার এন্তেজামিয়া কমিটিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ও বলল— আপনারা কোন ফিকির করবেন না। আমাদের কাছেও লাউড স্পীকার আছে। দ্রুত সেটা স্টেজে লাগিয়ে দিন। অতঃপর তাকাল সঙ্গীদের দিকে— নাসির ভাই! এ সেই মৌলভী গত পরশু অমৃতসরে হেস্তনেস্ত করেছিলাম যাকে আমরা।

ঃ আরে সেই কচ্ছপ এখানেও!' কালো ছদরীধারী এক জোয়ান বলল উত্তেজনাভরে, দোস্ত! বেটার শরীরে বোধহয় গণ্ডারের চামড়া।

লাউড স্পীকার প্রস্তুত হলে সলীম বলল— নাসীর! নাত পড়তো একটা!

নাসির স্টেজে উঠে নাত শুরু করল। কংগ্রেসী মৌলভীর বাজখাই গলা হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝড় তোলা এ নাতের সামনে নিস্প্রভ হয়ে এল। যারা ইতোপূর্বে সভাস্থল ভেঙ্গে চলে গিয়েছিল, একে একে সকলেই জড় হতে লাগল। নাত শেষে মাইকের সামনে এসে দাঁড়াল সলীম। ওর বক্তৃতার পূর্বেই দারোগা, হাবিলদার করিম বখ্শ ওখানে এসে বচসা শুরু করল। দারোগা স্টেজের কাছটিতে এসে বলল— শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে যেতে পারে। কাজেই আপনারা মিটিং করতে পারবেন না।

সলীম জবাব দেয়— বাহ্ চমৎকার জবাব! কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে সড়কের ওপরে জুব্বাধারী ওই লোকটা কি করছে?

দারোগা জবাব দেয়— মৌলভী সাহেব তকবীর দিচ্ছেন।

ঃ তাহলে আপনার ধারণা, আমি এখানে পটকা ফোটাতে এসেছি?

জনগণ হো হো করে হেসে উঠল। দারোগা কতকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল— তোমরা কারা?

ঃ আপনি ওই মৌলভী সাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, সে কে?

ঃ তাঁর সাথে আপনাদের সম্পর্ক কি? আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি।

ঃ সর্দারজী! আপনি পাকিস্তান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন বুঝি?

দারোগা কতকটা নরম হয়ে বললেন— দেখুন! আমি একই মুহূর্তে একই স্থানে দু'টি মিটিং-এর অনুমতি দিতে পারি না। আপনাদের মাঝে এতটা দূরত্ব থাকা চাই, যাতে একের আওয়াজ অন্যের কানে না যায়। আমার ডিউটি ও ওপরের নির্দেশ এমনটাই।

ঃ বেশ তাই হবে সর্দারজী! ওরা খামাখাই ট্রাকে মাইক সেট করে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। এমন কি আপনার ডিউটির প্রতি বৃদ্ধাংগুলিও দেখাচ্ছে। ইউনিয়নিস্টরা বড়ই কমিনা। সন্ত্রাসের বীজ বুনছে ওই হতচ্ছাড়াগুলো। আপনারইতো অপমান! আপনি উপস্থিত আর সেখানেই কিনা ঘটতে যাচ্ছে মারাত্মক কিছু। আপনি ওদের ট্রাক সরাতে বলুন। ডিজেল না থাকলে সেপাইদের হুকুম দিন— ঠেলে নেবে।

www.amarboi.org

করিম বখ্শ এই তেতো কথা স্বাদ হজম করতে না পেরে বললেন— দেখুন! আপনারা বক্তৃতা শুরু করলে আমরা এ্যাকশনে যেতে বাধ্য হব।

সলীম শান্ত নদীটির মত জবাব দেয়— কত বড় বেয়াদব আপনারা। বস্-এর কথার মাঝে বাঁ-হাত? কেন আপনার জানা নেই? দারোগা কথা বললে হাবিলদারের মুখে কুলুপ এঁটে দিতে হয়!

দারোগা এমনিতেই কারো ওপর রাগ ঝাড়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সলীমের কথা তাকে যেন কিছু রাগ করার সুযোগ করে দিল। তিনি বললেন— এই! কথার মাঝে বাঁ-হাত দেয়ার তুমি কে? এ্যাকশনে যাবার অনুমতি কে দিয়েছে তোমায়?

খানিক পরে সলীম বক্তৃতা শুরু করল। দারোগা মাঝপথে কেবল অধরে অধর দংশন করে যাচ্ছিলেন।

বিগত তিন সপ্তাহ ধরে অমৃতসর থেকে গুরুদাসপুর সফর করে সলীম উপলব্ধি করেছে, শহরবাসীদের পাকিস্তানের পক্ষপাতী করতে এক্ষণে আর সেমিনারের দরকার নেই। শহরের ব্যবসায়ী, মযদুর ও চাকরীজীবী মুসলমানরা হিন্দু মনোভাবাপন্নদের ভালো করেই চিনেছে। আর কংগ্রেস ইউনিয়নিস্ট মুসলমানদের কাঁধে বন্দুক রেখে প্রতারণা করতে পারবে না। শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ধুতি ও নেংটিওয়ালাদের নাপাক ঐক্যের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে ময়দানে এল। অবশ্য গ্রামে শিক্ষিতের হার খুবই কম ছিল। এদের সিংহভাগই সরকারী অফিসে কাজ করত এবং সেই ছোট-বড় শিক্ষিত জমিদার যাদের কর্মচারী ছিল না, তারা দারোগা, তহশিলদার, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ, অনাররী ম্যাজিস্ট্রেট ও মিথ্যা সাক্ষীদের প্রতাপে থাকত প্রভাবান্বিত। এতদসত্ত্বেও সলীমের যা ধারণা, তন্মধ্যে ৮০% এমনও আছে যারা সুযোগ সন্ধানী ইউনিয়নিস্টদের দলভুক্ত। অবশ্য সময় এলে ওদের থেকে পাকিস্তানের সহমর্মিতা আশা করা যায়। তবে নির্বাচনের পূর্বেই যদি একথা ঘোষণা দেয়া যায় যে, নেংটিওয়ালাদের এ প্রশাসন তাদের পঞ্চ দরিয়ার জমি থেকে বঞ্চিত করবে; তাহলে ওরা প্রকাশ্যভাবেই পাকিস্তানের পক্ষে নারা লাগাবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা গ্রামের এসব অশিক্ষিত আওয়ামের, যাদের ডিউটির পারিশ্রমিক আদায় করত যে জমিদাররা, তারা এর কিছুটা দিত মুসলিম লীগের চাঁদাবাজদের আর বাদবাকীটা দিত কংগ্রেসীদের। গ্রামের নিরীহ বুভুক্ষু যে সব মানুষ ৫ টাকায় মিথ্যা সাক্ষীর বিনিময়ে ৫/১০ মাইল পায়ে হেঁটে যেত— এক্ষণে তারা ইউনিয়নিস্টদের লেটেস্ট মডেলের গাড়ীতে ভাদের শ্লোগান দিতে লাগল।

ওরা গ্রাম্য লোকদের সাথে সাধারণত এ ধরনের মোটা কথা বলত—

"তোমাদের মেটে তেলের দরকার আছে কি?"

"জ্বি হ্যাঁ!"

"মিস্‌রী লাগবে?"

"জ্বি, সেটাওতো পাওয়া দুষ্কর।"

"আর কাপড়?"

www.amarboi.org

"তাতো অবশ্যই। কেননা এক্ষণে মরা মানুষেরও কাফন মিলছে না।"

"ইউনিয়নিস্টদের সাপোর্ট করো। তাহলে মেটে তেল, মিস্রী ও মৃত্যুব্যক্তির কাফনের কাপড়ও ফ্রী পাবে।"

"ফ্রী?' গ্রাম্য মানুষ বড় চোখ করে তাকাত।

"হ্যাঁ! বিলকুল ফ্রী। ইউনিয়নিস্ট পার্টি জমিদার ও কিষাণদের পার্টি। তোমাদের জন্য গ্রামে গ্রামে হাইস্কুল ও হাসপাতাল খোলা হবে। পল্লী বিদ্যুতায়ন আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। খাজনা মওকুফ আমাদের ওয়াদা। কাফনের কাপড় যত লাগে ফ্রী। আমরা এগুলো তোমাদের বাড়ী পৌঁছে দেব।

গ্রাম্য বালকেরা লেটেস্ট মডেলের কার দেখে জড় হত। মুরুব্বীদের সাথে, মোটর আরোহীদের সাথে অকৃত্রিমভাবে আলাপ করত। কেউ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ড্রাইভিং সিটে বসত। হর্ন বাজাত। মাডগার্ডে বসে খুশীতে কেউ আখ চিবাত। গ্রাম্য বয়সী লোকেরা ওদের ধমক দিত। কিন্তু আরোহীরা বলত, ভাই! বাচ্চাদের কিছু বলো না। এ ড্রাইভার! ওদের খানিক ঘুরিয়ে এনো তো। হ্যাঁ, তাই! গাড়ীতে কেবল বসেই থেকো না–দু'এক গাল নারাও লাগাও। অমুক চৌধুরী জিন্দাবাদ। জমিদার-কৃষক ভাই ভাই, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সুবোধ বালকেরা একে মোটরে চাপার পারিশ্রমিক মনে করে মনের আনন্দে নারা লাগাত। সলীম এ সভায় ওই ধরনের শিকার বেশ কিছু মানুষকে দেখতে পেল। সুতরাং ওর বক্তব্যের বিষয় গেল পাল্টে, সাধারণত যা দিয়ে থাকত শহরে।

"ভাইয়েরা আমার! আজ আমার বড় আনন্দ লাগছে যে, আমাদের সামনে জনৈক মৌলভী তকরীর করছেন, আর তার পাশে মুসলমানদের চেয়েও হিন্দু-শিখরা বেশী। এমন কি তারা খুশীতে নারাও লাগাচ্ছে। সত্যি করে বলতে কি, এ দৃশ্য আগে কোনদিন দেখেছ? মৌলভী করছে ওয়াজ, আর শিখ-হিন্দুরা বলছে সোবহানাল্লাহ!

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আওয়াজ এল : "না!"

"আচ্ছা ভাইয়েরা। বলোতো, এর আগে কোনো মৌলভী কুরআন·মজীদ তেলাওয়াত ও হাদীস পাঠ করেছে আর শিখরা তার গলে মালা দিয়েছে— সে দৃশ্যও কি মঞ্চায়িত হয়েছে?

: 'না, না।' শ্রোতাদের মনে উত্তেজনা।

: আচ্ছা বলোতো, ওই দু'টো কার আর ট্রাক যাতে করে মৌলভী খিস্তি-খেউর করেছে— ওগুলোর মালিক কারা?

এক নওজোয়ান দাঁড়িয়ে বলল— ইউনিয়নিস্টরা।

: কিন্তু আমি জেনেছি, ওদের একটা টাঙ্গা ছিল। তাও পথিমধ্যে ভাংচুর হয়েছে। তাহলে ঘটা করে এই লেটেস্ট মডেলের কার ওরা পেল কোত্থেকে?

জনৈক শ্রোতা বলল— ওগুলো শেঠ্ ধনীরামের। আর ট্রাক সর্দার গোপাল সিং-এর।

: তাহলে এর মতলব হচ্ছে মুসলিম লীগের বিরোধিতায় ভোটযুদ্ধে নিজের কার নামিয়ে দিয়েছে ধনীরাম। গোপাল দিয়েছে ট্রাক। লাউড স্পীকারও হয়ত দিয়েছে

www.amarboi.org

তাদের দু'জনার কেউ। আমাদেরকে একথার ওপর খোশ হতে হয় যে, তারা নিজস্ব জরুরতে আমাদের গরীব ভাইদের মদদে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা, যারা আজ দেদারছে করজে হাসানা দিচ্ছে, মেটে তেল, মিস্‌রী দিচ্ছে এবং থানকে থান কাফনের কাপড়ের যোগান দিচ্ছে; ওরা তো তারা যারা এক আনার চক্রবৃদ্ধি সুদে ১ টাকা আদায় করেছে বিগত দিনে। কিন্তু আজ ওদের এ অঢেল পয়সা খরচ করার হেতুটা কি?

এ প্রশ্নের জবাব হয়ত আমাদের জানা নেই। সত্যি করে বলোতো, হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরোধী কি-না?

ঃ বিরোধী।' বলে উঠল শ্রোতাদের কেউ।

ঃ আর ওই চৌধুরী সাহেব, যিনি পয়সা খেয়ে মুসলিম লীগের বিরোধিতায় নেমেছে?

ঃ বিরোধী তিনিও।

ঃ আর শিখরা, যারা ট্রাক দিয়েছে?

ঃ তারাও।'

ঃ আর এ মৌলভী? যার তকরীর শুনে শিখ-হিন্দুরা বাহ্‌বা দিচ্ছে?

ঃ বিরোধী বৈ তো নয়।

ঃ কিন্তু কেন?

শ্রোতারা প্রশ্নবিদ্ধ নযরে এদিক ওদিক তাকাল। সলীম খানিক চিন্তা করে বলল,

ঃ পাকিস্তানের উদ্দেশ্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল মুসলমানরা শাসন করবে। একথায় তোমাদের কোন আপত্তি নেই তো?

ঃ কখনই নয়।

ঃ কিন্তু আপত্তি আছে দাদাদের। ওরা বলে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল যেমন হিন্দুদের শাসনে থাকবে তেমনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলও। পাকিস্তান বিরোধীরা অবুঝ মুসলমানদের মেটে তেল, মিস্‌রী, ট্রাক ও কাফনের কাপড় দিয়ে সাহায্য করলেও এই সওদা খুব একটা যুৎসই হবে না। এ সওদা গোলামীর সওদা। স্বাধীনতা ও ইয্‌যতের সওদা। আদালত ও সংবিধান ওদের মনমত হবে। ওরা আজ এক টাকা খরচা করলে কাল এক লাখ আদায় করবে। আজ পাঁচশ কিংবা হাজার মানুষের কাফনের ব্যবস্থা করে থাকলে কাল কোটি মা-বোনের ইয্‌যত লুটে কবরস্থানের দিকে হাঁকিয়ে দেবে।

কংগ্রেসী এ কুলাংগার মৌলভী ইতোপূর্বেও এই তকরীর শুনেছে সলীমের মুখ থেকে। অমৃতসরে ওর সাথে হাতাহাতি হবার উপক্রম। তিনি জানেন, এ টগবগে তরুণের মুখ ধারালো অস্ত্রের চেয়েও চোখা। এ অদ্ভুত মানুষটি বক্তৃতার মাঝপথে থেমে যেত। আবার শুরু করত পূর্ণোদ্যমে।

সলীম বলে যাচ্ছে— 'কংগ্রেসী হিন্দু কিংবা শিখরা পাকিস্তানের বিরোধিতা এজন্য করছে যে, ওরা গোটা ভারতবর্ষে রামরাজত্ব কায়েম করতে চায়। আর এ ইউনিয়নিস্ট এজন্য কংগ্রেসের দালালী করছে যে, ইংরেজ-এর পর কংগ্রেস হচ্ছে ওদের পড়্‌ফাদার।

www.amarboi.org

কিন্তু তোমরা হতবাক হবে, এ গান্ধী টুপিধারী কুলাংগার মৌলভীকে দেখে, যার মাথায় শিখের মত পাগড়ি, টিকি— সে কেন পাকিস্তান বিরোধিতা করছে।

সলীমের এক সাথী দাঁড়িয়ে বলল— নেমকহালালী করতে আর কি! এবার জনতা মৌলভী সাহেবের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল। সলীম নিজের হাসি সংযত করে বলল— না ভাইয়েরা। হালুয়া-রুটির জন্য কেউই এ ধরনের বদনাম কুড়াতে চায় না। এরা মুরগী-পোলাওয়ের ঢেকুর তুলছে। কিন্তু আমাদের তথাকথিত মৌলানা সাহেবরা জানে না যে, রুটি-পোলাও খাইয়ে হিন্দুরা আমাদের থেকে কি আদায় করছে। তোমরা হয়ত জানো না, বড়শির টোপ মাছের জীবনে কি বিপদ ডেকে আনে। মৎস্যশিকারী বড়শিতে টোপ লাগায়, ছিপিতে বাঁধে সুতো। সময় বিশেষ টোপ পরিবর্তন করে। লাগায় কেঁচো। অতঃপর পানিতে ছুঁড়ে মারে। মাছ মনে করে এটা তার খাদ্য। মুখ হা করে সে ওদিকে দৌড়ায়। পরিণতিতে গলে আটকে যায়। ভাইয়েরা! তোমরা হচ্ছো মাছ, হিন্দুরা শিকারী, ইউনিয়নিস্টরা বড়শী আর এই মৌলানা হচ্ছে কেঁচো। তার নূরানী চেহারা দেখে ধোঁকা খেও না। কংগ্রেসী কুলাঙ্গার মাওলানারা বড়ই খতরনাক। হিন্দুরা মনে করে তাদের হালুয়া-রুটিভোজীরা মুসলমানদের ভালো ধোঁকা দিতে পারছে।'

সলীমের টার্গেটি এবারে কংগ্রেসী মাওলানাকে লক্ষ্য করে। ওর তূনিরের শেষ তীরটি বেরুলো যেন। স্কুল-কলেজের ছেলেরা চিৎকার করে উঠল, মৌলভী কেঁচো, কেঁচো মৌলভী। ভুয়া-ভুয়া, মৌলভী কেঁচো ভুয়া।

কিছু ছাত্র মিটিং থেকেই ছাদে চড়ে নারা দিতে লাগল। গাড়ীর ভেতরের মানুষগুলো তা অনুমান করল। মৌলভী সাহেব একজন সুচতুর সচেতন মৌলভী। তিনি যে কোন তেতো পরিস্থিতি হজম করতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেসের দেয়া নয়া খেতাব হাতছাড়া হওয়াকে বরদাশ্‌ত করতে পারেন না কিছুতেই। এক্ষণে বাচ্চাদের আওয়াজের সাথে গ্রাম্য লোকদের আওয়াজও মিলে গেল। সকলেই হাসতে লাগল। পরিবেশটা অন্য ধরনের হল। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোলাটে হতে লাগল। সর্বোপরি বাচ্চাদের কণ্ঠে 'মৌলভী কেঁচো-কেঁচো মৌলভী।' শ্লোগান শুনে শিখরাও হেসে উঠল। কংগ্রেসীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ওরা কায়েদে আযমের নামে কুৎসা গাইতে লাগল।

ওদের মোটর স্টার্ট দিলে ছেলেরা পিছু নিল। ওদের একজন রাগে ছেলেদের গায়ে চড় মারতে উদ্যত হল। কিন্তু মাঝখানের গ্লাসের কথা তার মনে থাকল না। গ্লাস ভেঙ্গে গেল।

মৌলভী সাহেব আক্রোশে ফেটে পড়ল। গোস্বায় সামনের সিটে থাপ্পড় মারে সে। ওই থাপ্পড় গিয়ে ডিসি সাহেবের চোখে লাগল। তিনি রাগে বলে উঠলেন— মৌলভী আমার চোখে আংগুটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। তওবা তওবা, তার হাতে নখ না ছুরি, বুঝতে পারলাম না।

গাড়ীর বাইরে থেকে 'মৌলভী কেঁচো' শ্লোগান হচ্ছে। কার সাধ্য থামায় তাদের। ওদিকে গাড়ীর ভেতরে চলছে নখের সমালোচনা। তিনি রাগ করে বলেন— দেখুন! নখ বড় কি আমারটা, না জেলার সাহেবেরটা?

www.amarboi.org

জেলার সাহেব পাগড়ীর আঁচল গোল করে চোখে ঠেসে ধরে বললেন— শোকর খোদার! আপনার নখ বড় নয়। নয়তো আমার চোখ ওপড়াতেও কুণ্ঠিত হতেন না। কসম খোদার! আপনি থাপ্পড়টা আরেকটু জোরে দিলেই কিচ্ছা খতম হয়ে যেত।

✪ ✪ ✪

সলীম রাত কাটাল ওই শহরের এক কন্ট্রাক্টরের বাড়ীতে। খানা খাওয়ার পর পরদিনের প্রোগ্রাম তৈরীতে মেতে উঠল। ইতোমধ্যেই শহরের ক'জন অভিজাত মেহমান এলেন। তাঁদের সেই বুড়ো স্কুল মাস্টারও ছিলেন যিনি বিকেলের মিটিং -এর সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি সলীম ও তার সঙ্গীদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর বললেন— ভাই! আপনারা আজ এসেছিলেন নইলে আমাদের কি হত সেটা খোদাই বলতে পারেন। আপনারা অনেক কাজ করছেন। শোকর খোদার, আপনাদের মত জোয়ানদের চোখ খুলেছে। শুনেছি, আলীগড়ের ছেলেরা পাকিস্তান আন্দোলনে নেমেছে।

ঃ জ্বি হ্যাঁ! এ মিস্টার নাসির আলী ও মিস্টার যফর আলীগড় ভার্সিটির ছাত্র। নাসির বিহার প্রদেশের অধিবাসী। আর যফরের বাড়ী উত্তর প্রদেশে। যফর এসেছে লাহোর থেকে।

মাস্টার বললেন— খোদা তোমাদের বেশ হিম্মত দিয়েছেন।

এরপর সকলের দৃষ্টি নাসির আলী ও যফরের ওপর নিপতিত হল। কেউ প্রশ্ন করল— 'আপনাদের প্রদেশে মুসলিম লীগের বিজয় অবধারিত কিনা বলেন?

ঃ জ্বি হ্যাঁ! ওখানে আমরা জিততে চলেছি। ওখানকার মুসলমানরা হিন্দু কর্তৃক নিগৃহীত।

কংগ্রেসের এজেন্টরা কাউকে ধোঁকা দিতে পারবে না। সিন্ধু, পাঞ্জাব ও সীমান্তবর্তী প্রদেশের মানুষের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতি তেমন নযর এজন্য নেই যে, ওখানকার হিন্দুরা তাদের ক্ষতি করছে না। এক পাঞ্জাবী কিংবা পাঠানকে যদি বলা হয়, হিন্দুরা যালেম ও কসাই প্রকৃতির, তো তারা একথা মানতেই চাইবে না। কেননা, পাঠানরা ঢিল ছোঁড়ার অপরাধে পাটকেল মারতে অভ্যস্ত। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের পাঠানদের একথা বললে তারা ঠাট্টা মনে করবে একে। কেননা ওরা কল্পনাই করতে পারে না— হিন্দুদের বুকের পাটা এত বড়। এজন্যই আজতক ওইসব অঞ্চলে পাকিস্তানের পক্ষে জোরদার নারা বুলন্দ হয়নি। ইউপি ও বিহারের কচি শিশুরা পর্যন্ত পাকিস্তানের জন্য জান কোরবান করতে প্রস্তুত। ওখানকার হিন্দুদের অবস্থা এই যে, কুকুর যদি তাদের হালুয়া-হাড়ি চেটেপুটে খায় তাহলে তাদের ধর্মকর্ম বৃথা যায় না ; কিংবা একে অচ্ছুত জ্ঞান করে না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের গাত্রস্পর্শ করলে ওরা আদানুন খেয়ে 'ধর্ম গেল— বাঁচাও' বলে কান্না জুড়ে দেয়। জনৈক জোয়ান বলল— ভালো কথা শোনালেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্বারা পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উপকার হবে নিশ্চয়ই। কেননা, এখানে তাদের শাসন কায়েম হবে। কিন্তু

www.amarboi.org

সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলোর অবস্থা কি হবে? আমার কথার উদ্দেশ্য, আপনাদের আত্মনিবেদনকে খাটো করতে নয়। আমার শঙ্কা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে হিন্দুদের প্রতিশোধ চরম আকার ধারণ করবে। সেক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব আরো প্রকট হয়ে ধরা পড়বে। সেই মুহূর্তে কি করতে পারবেন আপনারা?

উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ এ প্রশ্নের রহস্য জানতে, বুঝতে পারেনি। কেউ এদিকটা ভেবেও দেখিনি কখনও! কিন্তু নাসির স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দেয়— আপনি কি মনে করছেন, পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদের সমর্থন নিছক ভূ-ভাগের কৃষিপণ্যের জন্য, আমরা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত নই— এই তো? আমরা কিন্তু ওই দিকটা চিন্তা করছি অন্যভাবে। আমরা জানি, ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমানের সামনে কেবল দু'টি রাস্তা আছে। এক. অখণ্ড ভারতে তারা হিন্দুদের গোলামী কবুল করবে। দুই. ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করবে।

প্রথম পয়েন্টটিতে আমরা হিন্দুদের করুণার পাত্রে পরিণত হব। খাইবার গিরিপথ থেকে নিয়ে বঙ্গোপসাগর অবধি সুবিশাল রামরাজত্ব কায়েম হবে। আমরা সকলেই চিরন্তন হিন্দুত্ববাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকব। আমাদের ভবিষ্যত হয়ে পড়বে তমসাচ্ছন্ন। দ্বিতীয় পয়েন্টে কমপক্ষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর হিন্দুদের গোলামী থেকে বেঁচে গেল। তখন আমরা একান্তই জোর গলায় বলতে পারব, পাকিস্তান আমাদের স্বাধীন ভাইদের আশ্রয়স্থল। বেশক আমাদের প্রতি হিন্দুদের ব্যবহার খুবই বর্বরতাসুলভ হবে। তখন বড় সাহস থাকবে মনে, আমাদের ভাইদের স্বাধীন দেশ আছে। তারা আমাদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারবে। রাজা দাহিরের কয়েদখানায় জাতির অসহায় এক তরুণীর ফরিয়াদ যদি দিমাস্কের প্রাসাদে কাঁপন ধরাতে পারে তাহলে তিন/চার কোটি মানুষের করুণ হাল আমাদের সচকিত করবে না? জাতির বধূ-মাতারা বন্ধ্যা হয়ে না থাকলে কোন মোহাম্মদ বিন কাসিম বা মাহমুদ গযনবী পয়দা হবেই। পাকিস্তানের কোন মর্দে মুজাহিদ আমাদের করুণ অবস্থা জেনে নব্য দাহিরদের বিরুদ্ধে নেমে পড়বেই। একটি চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি আমরা। কালের অমানিশার শেষে আমাদের ভাগ্যাকাশে সুখের সুরাইয়া-সেতারা ফুটে উঠবেই। বিপর্যয়ের খাদে উবু হয়েই আমরা পাকিস্তান সূর্যের অপেক্ষা করব। বুঝব, পাকিস্তান পেয়ে আমাদের স্বাধীন ভাইয়েরা ভুলে গেলেও একদিন না একদিন সিংহের জাতি ক্ষেপে ওঠবে। মৃত্যুর পরও এ সান্ত্বনা থাকবে আমাদের যে, যে কসাইদের হাত আমাদের গলা টিপে দিয়েছিল, তাদের হাত আমাদের পাকিস্তানী ভাইদের শাহ্‌রগ চিপে ধরতে পারেনি। ইয্‌যত ও আযাদীর শ্লোগানে ওদের সঙ্গ দিতে না পারলে মনে করব সেটা ললাট লিখন। কিন্তু এটা পছন্দ করব না যে, জীবনেও গোলামী আবার মরণেও গোলামী। আমি একথা মানতে রাজী নই যে, আমরা আপনাদের সাথে সাঁতরে কুলে উঠতে না পারলে আপনি মাঝ দরিয়ায় ডুবে মরবেন।'

অনেকগুলো কথা একসাথে বলে নাসির যেন হাঁপিয়ে উঠল। ওর চোখে বড় দু'ফোঁটা তপ্তাশ্রু।

www.amarboi.org

✪ ✪ ✪

সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো ছাড়া মুসলিম লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজয় অর্জন করল। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্টদের নির্বাচনী তরী ডুবে গেল। মুসলিম লীগের মোকাবেলায় তাদের ভরাডুবি হল। লীগের যেখানে ৮০ জন প্রার্থী বিজয়ী হল সেখানে সুযোগ সন্ধানীদের মাত্র ৯ জন। কিন্তু হিন্দু ও শিখরা ইউনিয়নিস্টদের ভগ্ন প্রাসাদকে তুলে ওঠাতে সাহায্য করল। ইংরেজ গভর্নর ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন। মুসলিম লীগ যে প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল সেখানে খিজির হায়াতের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হল। কিছু গাদ্দারের জন্য পাঞ্জাবের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘুদের দ্বারা শাসিত হতে লাগল। মুসলিম লীগ হিন্দু কিংবা শিখের একজনকেও কেবিনেটে টানল না। কেননা পাঞ্জাবের লীগ কেবিনেটকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিশালী মাধ্যম মনে করা হত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কংগ্রেস এক্ষণে এক পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ খচ্চর পেয়ে গেছে। এ সেই খচ্চর (খিজির হায়াত) যে ইংরেজদের আস্তাবলে লালিত পালিত। সীমান্তবর্তী প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠন হল। সিন্ধুর সুযোগ সন্ধানীরাও মন্ত্রীসভা হাসিলের আশায় হিন্দু কংগ্রেসের রথে চেপে বসল। অবশ্য এখানে শেষ পর্যন্ত লীগের মন্ত্রীসভাই গঠন হয়েছে। বাংলায় মুসলিম লীগের মেজরিটির সামনে কংগ্রেস পাত্তাই পেল না। মোটকথা কংগ্রেস তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধিতে অনেক দূর এগুলো। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম হল। ওখানকার হিন্দু জনগণ পাকিস্তান বিরোধী যুদ্ধের জন্য তলোয়ারে শান দিয়ে যেতে লাগল। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ চূড়ান্ত আঘাতের প্রস্তুতি নিল। হিন্দু মহাজন ওদের হাতে অজস্র অর্থ গুঁজে দিল আর হিন্দু প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মদদে ওদের কাছে পৌঁছে গেল অসংখ্য গোলাবারুদ। প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসাবে পাঞ্জাব ও সীমান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কিন্তু এখানকার শিখ গুরুদুয়ারাও বোমা ও গোলা-বারুদের ফ্যাক্টরীতে পরিণত হল। হিন্দু মন্দির আর রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ যেন আঘাত হানার জন্য কামানে আঙ্গুল দেয়া ; কিন্তু শাহপুরের ওই মন্ত্রী যিনি সামান্য মন্ত্রীত্বের জন্য কওমের ইয্যত-আযাদী বিকিয়ে দিয়েছিলেন— এ মুহূর্তে তিনি মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকলেন, পা াবের মোর্চা মজবুত করার জন্য শিখ-হিন্দুরা সীমান্তে অস্ত্র পাঠানো আরম্ভ করল। কিন্তু অহিংস নীতির দেবতা পূজক ওই মুহূর্তেও খামোশ।

হিন্দুস্তানে কংগ্রেসের রাজনৈতিক হম্বিতম্বি সকলের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ছিল। ওরা পর্দার আড়ালে প্রস্তুতিটাও সেরে নিয়েছিল পুরোপুরি। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ওদের ওই দূরভিসন্ধি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু পাঞ্জাবের কিছু গাদ্দারের অপরিণামদর্শী মানুষের কারণে পাঞ্জাবের প্রতিরক্ষা মোর্চা কংগ্রেসের হাতে চলে যায়।

বৃটেনের কেবিনেট মিশন তাদের প্রস্তাবনা নিয়ে আসে। তাদের এ মিশনে না অখণ্ড ভারতের ফয়সালা ছিল যাকে কংগ্রেস চাইত, না ওই পাকিস্তান ছিল, মুসলিম লীগের যা দাবী ছিল। খণ্ডিত ভারতের গন্ধ পেয়ে মুসলিম লীগ তাই মুসলিম অধিকার সংরক্ষণে নিজস্ব দাবী-দাওয়ার কিছুটা ছাড় দিতে রাজী হল ; কিন্তু সঙ্কীর্ণমনা কংগ্রেস তাদের

www.amarboi.org

কেন্দ্রীয় দাবী-দাওয়া থেকে এক চুলও নড়তে নারাজ। তাদের কেন্দ্র ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেন্দ্রের অধিকার যেন অসীম। খণ্ডিত ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা, যা কিনা মুসলমানদের প্রাপ্য ছিল কংগ্রেসের রাজনৈতিক মহাত্মাদের কাছে সেটা খতরনাক মালুম হচ্ছিল। সুতরাং ওই প্রস্তাবনার নির্দেশকদের তারা কূটচালে বোঝাচ্ছিল, "তোমরা যেটাকে যুক্তিনির্ভর ঠাওরাচ্ছ, ব্যাপারটা আসলে ওরকম নয়। বৃটিশ শাসনামলে পাকিস্তান প্রবক্তাদের মত অনেক দাবীই করে আসছে কংগ্রেস। সুতরাং কেন্দ্রীয় কেবিনেট বৃটিশ ভাইসরয় কংগ্রেসের পাঁচ ও মুসলিম লীগের সমান সংখ্যক সদস্য প্রস্তাবনা করলেও পরবর্তীতে ৬/৫-এ নামিয়ে নিয়ে আসে। এজন্যই দীর্ঘকাল কংগ্রেসের মুখ দিয়ে লন্ডনের হুবহু ভাষণ বেরিয়েছে। আর প্রস্তাবকরা যখন বলছিল, আমাদের উদ্দেশ্য ওটাই, যেটা লিপিবদ্ধ তখন গান্ধীর আত্মায় বেশ চোট পায়। এ সময় ওসব প্রস্তাবনা বাতিল করে দেয়া হয়।

ভাইসরয় লর্ড বাওয়াল এলান করেছিলেন, যদি কোন পার্টি সন্তুষ্ট না হয় তখন তা যুক্তফ্রন্টের আকার ধারণ করবে। এলান মোতাবেক এক্ষণে লীগ কেবিনেটের রূপ নেয়া দরকার। কিন্তু মুসলিম লীগ অনুমান করতে পারল, ইংরেজদের ওয়াদার ওপর ভরসা করতে গিয়ে তারা ধোঁকা খেয়েছে।[১]

সত্যি বলতে কি ইংরেজ ও কংগ্রেসের এ হেরফেরের উদ্দেশ্য, পাকিস্তান দাবীর প্রবক্তাদের পা নড়বড়ে করে দেয়া। মুসলিম লীগ এক্ষণে বড় অসহায় হয়ে পড়ল। কেবিনেট মিশন রদ হবার পর তারা মূল গন্তব্যের পথ ধরল।

মুসলমানদের ময়দানে নামতে দেখেই ইংরেজ-কংগ্রেস গলাগলি করল। আর লর্ড বাওয়াল কংগ্রেস কেবিনেটের জন্য উন্মুখ হয়ে বসলেন। মুসলিম লীগের শেষ চেষ্টা ডাইরেক্ট এ্যাকশনও ছিল ইংরেজদের পদলেহী কংগ্রেসের বিরোধিতা। অবশ্য হিন্দুরা ইংরেজদের স্থলাভিষিক্ত মনে করে ময়দানে নামল। বোম্বাই, আহমেদাবাদসহ হিন্দুস্তানের অপরাপর সংখ্যালঘু মুসলিম এলাকায় হিন্দুরা লুট ও দাঙ্গা শুরু করল। পরে এল কোলকাতার পালা। এখানে ডাইরেক্ট এ্যাকশনের দিন মুসলিম লীগের মিটিং-এ ইট ও হাতবোমা বর্ষণ হল।

এ সময় ভাইসরয় আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়ার গুরুত্বানুভব করলেন এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসের মন্ত্রণালয় গড়লেন। যে হিন্দুরা ক্ষমতা লাভের জন্য উন্মুখ ছিল, এবার ওরা ক্ষমতা পেয়ে পশু আকার ধারণ করল। পণ্ডিত নেহেরু ক্ষমতার লাগাম হাতে নিয়ে এলান করে দিলেন যে, আমার মন্ত্রণালয় বিরোধীদের কর্মকাণ্ডে বাধা দিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকবে। প্যাটেল বোম্বাইতে বক্তব্য রেখেছেন। যদ্দরুন ওখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করেছে।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় এখনও কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধেনি। কিন্তু হিন্দুরা কোলকাতায় যে আগুন লাগিয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া শিখা নোয়াখালীতেও এসে পড়ল।

---

১. এই নয়া পরিস্থিতিতে স্যার ক্রিপস্ কংগ্রেসের সমস্যার সমাধান দিলেন এভাবে, কংগ্রেস দীর্ঘ প্রস্তাবনা মেনে নিয়েছে সুতরাং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাবনা প্রত্যাহার করা হল।

www.amarboi.org

এটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। হিন্দুদের কাছে আশ্রয় নেয়া এ অঞ্চলেরই কিছু হিন্দু ওখানে গিয়ে এ কাহিনী শোনাল। সুতরাং দাঙ্গা লেগে গেল পুরোপুরি। লীগের মন্ত্রক পরিস্থিতি সামাল দিতে দুর্গত অঞ্চলে পৌছুলেন। শান্তি ও সন্ধির জন্য এসেম্বলী ডাকা হল। মুসলিম প্রেসের ঘোষণা মোতাবেক নিহতের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে শ'য়ের মাঝামাঝি। অবশ্য অনেক নেতাদের মতে ৬'[১]শয়ের মত। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম-এর হিসাবে বেশ ফারাক ছিল। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আত্মা নেহায়েত সবর ও ধৈর্য সহকারে বোম্বাই, এলাহাবাদ, আহমেদাবাদ, কানপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম হত্যা দেখছিল।

তিনি এতে বড় বে-চাইন হয়ে যান। হিন্দু প্রেস এটাকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে বিবৃতি দিল। মহাত্মা গান্ধী দিল্লীর মেথর কলোনী থেকে মুসলমানদের নৃশংসতার উপলব্ধি নিয়ে নোয়াখালী পৌছুলেন। ওখান থেকে খবর এল, আজ মহাত্মাজী এত মাইল পায়ে হেঁটেছেন। আজ তাঁর চোখে অশ্রুর বন্যা উপচে পড়েছে। ভারতবর্ষের মহাত্মাজীর চেলারা অশ্রু মোছার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ওই আগুনের উপাদান উৎক্ষিপ্ত হল, ভারত মাতার সন্তানদের বুকে যা চাপা ছিল। বিহারের মুসলমানদের জন্য রক্ত ও আগুনের পয়গাম নিয়ে এল মহাত্মাজীর চেলারা। হিন্দু ফ্যাসিস্টরা নৃশংসতা, বর্বরতা ও রক্তলীলার ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা করল।

✪ ✪ ✪

মজীদের গায়ে হলুদ। লায়লপুর থেকে স্বামীসহ ওর বোন আমেনা দুপুরের গাড়ীতেই এসে পৌছেছে। মজীদ স্টেশনে তাদের করে রিসিপশন। আমেনার স্বামী ইন্টারক্লাসের কম্পার্টমেন্ট থেকে অবতরণ করলেন। পাশেই নারী-বগি থেকে আমেনা বোরকার নেকাব উঁচিয়ে জানালা থেকে বাইরে তাকাল। সলীম অগ্রসর হয়ে ওর কোল থেকে ৮/৯ মাসের বাচ্চা কোলে তুলে নিল। মা হবার পর এ প্রথম সলীমের মুখোমুখি আমেনা। মুহূর্তে ওর চেহারায় নেমে এল তাই রাজ্যের লজ্জা। লজ্জানম্র বদনে জড়সড় হয়ে নামল আমেনা। স্টেশনের নিকট দূরের পাইন গাছ দেখিয়ে সলীম বলল— আমেনা এসো! ওখানটায় বসো। ভিড় কমলে তবে আমরা বেরোবো। মজীদ ও ওর ভগ্নিপতি ওখানে এল। মজীদ নওকরকে বলল— তুমি না হয় ততক্ষণে টাঙ্গায় মালপত্র তুলে নাও। এই আসছি আমরা।

টীকা : ১. এখানে সংখ্যা কম দেখানো উদ্দেশ্য নয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় হিন্দুদের কমই ক্ষতি হয়েছিল। হত্যালীলাও হয়েছিল হাতেগোনা। মোটকথা অবস্থা খুবই বেদনাদায়ক রূপ ছিল। এতে যদি লীগ মন্ত্রকের কিংবা কোন রাজনৈতিক নেতাদের হাত থাকে তাহলে সেটা আরো বেদনাদায়ক। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুরা বলেছিল, মুসলিম লীগের নেতারাই নয় বরং মুসলমানদেরই অনেকে হিন্দুদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। সুতরাং এ সত্যতার আলোকে এ কথা বলা ভুল হবে যে, এটা স্থানীয় মুসলমানের যোগসাজশ ছিল না, বরং এটি এমন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যদ্দরুন বোম্বাই ও কোলকাতাসহ অন্যান্য শহরেও দাঙ্গা মারাত্মক রূপ নিয়েছিল।

www.amarboi.org

নওকর চলে গেল। আমেনার স্বামী সলীমের দিকে তাকিয়ে বললেন— সলীম সাহেব! আপনার বোন বড্ড নারাজ হয়ে আছে।

আমেনার দিকে তাকিয়ে সলীম মুচকি হাসল— কিরে মুখপুড়ি! তুই নাকি আমার ওপর নারাজ?

বোরকা খুলে কৃত্রিম গোস্বামুখে আমেনা বলল— ভাইজান! আপনার সাথে কথা বলব না।

ঃ আরে আরে অমন গোস্বা করতে নেই। মজীদ, তুমি না হয় আমাদের মাঝে সন্ধি করে দাও। ভায়ের দিকে তাকিয়ে সহসাই বলে ওঠে আমেনা— ভাইজান! আপনি তো ফৌজে ছিলেন। তাই না হয় আসতে পারেননি। কিন্তু উনি কি লাহোর থেকে লায়লপুরে ফয়সালাবাদ আসতে পারতেন না? আগে পরীক্ষার বাহানা করতেন এক্ষণে কিসের তাড়া ছিল তাঁর?

আমেনার স্বামী বলল— হ্যাঁ গো! উনি এম আই পরীক্ষাটা দিয়ে আমাদের ওখানে ওঠার ওয়াদা করেছিলেন। পরে বলছিলেন, বই লিখছেন। বই ছেপে আমাদের হাতে পৌঁছেছে, কিন্তু পৌঁছাতে পারেন নি উনি। আমেনা বলত, তার শিকারের শখ প্রচুর। প্রত্যহ তার জন্য আমি বন্দুক ছাফ করতাম।

ঃ ভাই! আমি আব্বাজানের কাছে শিয়ালকোট গিয়েছিলাম। ওখানে থেকেই উনি আমাকে কাশ্মীরে যাবার অনুমতি দেন। এক্ষণে আমি পুরো ফ্রী। কোন একদিন আসব অতি অবশ্যই। বোন আমার যতদিন বিরক্ত না হয়, থেকে যাব ঠিক ততদিনই— বলল সলীম।

প্ল্যাটফর্মের ওয়েটিং রুমে স্টেশন মাস্টার জনৈক প্যাসেঞ্জারের সাথে বচসা করছিলেন। বেশ কিছু লোক জমে গেছে তার চতুর্দিকে। মজীদ সলীমকে আমেনা ও ওর স্বামীর কাছে রেখে সেদিকে ছুটল। গেটের কাছে গিয়েই ও হাসিমুখে ফিরল। সলীমকে করল হাতের ইশারা। সলীম বলল— কি হয়েছে ওখানে?

মজীদ হাসি সংযত করে বলল— আরে দেখ না এদিক! চৌধুরী রমজান আলী স্টেশন মাস্টারকে বাঁ-হাত দেখাচ্ছেন।

চৌধুরীজীকে স্টেশন মাস্টারের সাথে বচসা করতে দেখে সলীম ওদিকটায় যেতে চাইল কিন্তু মজীদ ওর বাযু ধরে বলল— আরে দাঁড়াও না! খানিক শুনে নাও না।

স্টেশন মাস্টার বলে চলেছেন— তোমাকে সাড়ে তিন টাকা দিতে হবে। খামাখা কথা বাড়িও না।

ঃ তোমাকে ওই টাকা দিলে টিকেট কাটতে আমার অসুবিধে কোথায়?' বললেন রমজান।

ঃ আরে আমি টিকেটের কথা বলছিনা। তোমার মালের ওজন অনেক। ওগুলোর ভাড়া চাচ্ছি।

ঃ কসম খোদার! এসব হাড়ি-পাতিল অন্যের। বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য স্রেফ খরিদ করেছি।

ঃ তাতে আমার কি! তুমি হাড়ি একটা কিনেছ, না সব কিনেছ এর পুরোটা বহন করেছ তুমি। অতএব সব ভাড়াই দিতে হবে।

www.amarboi.org

ঃ দেখুন মাস্টার সাহেব! আমি পেশোয়ারে আত্মীয় বাড়ী গিয়েছিলাম। বাড়ীর মহিলারা বলেছিল, পেশোয়ারের হাড়ি-পাতিল খুবই মানসম্পন্ন। সকলের জন্য হাড়ি চাই। গ্রামের আরো মহিলারা পয়সা দিতে চেয়েছিল। জনাব! আমার কোন কসুর নেই। আপনিই একটু ভেবে দেখুন! আপনি যদি আমার প্রতিবেশী হতেন। আপনার মা আমাকে এ ধরনের প্রস্তাব দিলে তখন?

ঃ হয়েছে, হয়েছে। ভাড়া বের করুন!

ঃ হায়! আমি কি জানতাম, পাতিলের ভাড়া নির্ধারিত মূল্যের তিনগুণ?

ঃ এখন তো জানলেন! ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল করবেন না।

ঃ সাহেব! খোদা আপনাকে কারো প্রতি রহম করার তৌফিক না দিলে অন্যকে নিষেধ কেন করেন না?

ঃ ঠাট্টা করবেন না। আমি এখন ডিউটিতে খাড়া।

ঃ সেটা জানব কি করে যে, আপনি ডেপুটির ওপর খাড়া। জানলে তো আর পাতিলের ঝামেলায় যেতাম না।

জনগণ হেসে উঠল। ষ্টেশন মাস্টারের রাগ উঠল চরমে। তিনি চিৎকার দেন— 'মুখ বন্ধ কর বেতমিয্। পয়সা বের করো।

রমজান আরো পেরেশান হয়ে বললেন— মাস্টার সাহেব! আপনি খামাখাই নারাজ হচ্ছেন। আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করতে পারলে পাতিল নিয়ে নিন। গ্রাম্য মহিলারা এসেই নিয়ে নেবে। তাদের থেকে দু'আনা করে আদায় করবেন। নয়ত আমার টিকেট আমায় ফেরত দিন। পাতিল গিয়ে পেশোয়ারে রেখে আসি।

ঃ তুমি জংগল থেকে বের হয়েছ কি?

ঃ জনাব! পেশোয়ার শহর, জংগল নয়।

বৃদ্ধ ষ্টেশন মাস্টার নম্রস্বরে তাকে রেলওয়ের কানুন বোঝাতে ব্যাপৃত হলেন। চৌধুরী রমজান ফরিয়াদী কণ্ঠে বললেন— মাস্টার সাহেব! গাড়ীতে ঠাসা ভিড় ছিল। সারা পথ ওগুলোকে কোলে করে রেখেছি। হাড়ির দাম শোধ করছি। পকেটের পয়সায় টিকেট কেটেছি। কষ্টও ভোগ করেছি। এখন বলুন! টিটিকে সাড়ে তিন টাকা দিতে যাব কেন? এতে ফায়দাটা কি?

ঃ ফায়দা হচ্ছে এই যে, তুমি জেলে যাচ্ছ না। ইয্যত যাচ্ছে বেঁচে!

ঃ জনাব। আমি চুরি করেছি কি? যদ্দরুন জেলের ঘানি টানতে হবে? নিন সাড়ে তিন টাকা। হাড়ি-টাড়ির ভাড়া— যত্তোসব।' পকেটে হাত রেখে সাড়ে তিন টাকা বের করে ষ্টেশন মাস্টারের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। থলে থেকে একটা পাতিল খুলে বললেন— এটি অমুকের, ওটি অমুকের। পাতিলের সংখ্যা যতই বের করছিলেন ততই তার রাগ থেমে আসছিল। সলীম ও মজীদ হাসিতে লুটোপুটি খেল। চৌধুরী রমজান শেষ হাড়িটা ওঠালেন। কিন্তু নাম স্মরণে এল না তাঁর। তিনি গোস্বা নযরে ষ্টেশন মাস্টারের দিকে তাকান। 'তেরে ষ্টেশন মাস্টার কি বাচ্চা' বলে যমীনে আছাড় মারেন আরেকটা হাড়ি।

www.amarboi.org

স্টেশন মাস্টার তেড়ে মেরে এলেন। কিন্তু সলীম বিপদ বুঝে দৌড়ে এসে মাস্টারকে বিরত রাখল।

স্টেশন মাস্টার সলীমের পরিচিত। তিনি বললেন— দেখোতো! বেটা গাল দিচ্ছে আমাকে। আমি তাকে পুলিশে দেব।

ঃ স্টেশন মাস্টার সাহেব! কি গাল দিলাম আপনাকে? গালি দিলাম তাদের যারা আনতে বলেছে হাড়ি।' বললেন চৌধুরী রমজান।

সলীম স্টেশন মাস্টারকে একপাশে নিয়ে বলল— উনি বড় গরীব মানুষ। অবশ্য পয়সা দিলে নিতে নারাজ। আমারই প্রতিবেশী উনি। আমার পক্ষ থেকে এ পয়সা আদায় করে নিন।' বলে পাঁচটি টাকার নোট বের করে দিল সলীম।

এবার চৌধুরী রমজান উপস্থিত জনতাকে পুরো কাহিনী শুনিয়ে গেল।

স্টেশন মাস্টার তার কাছটিতে এসে বললেন— ভাই চৌধুরী! নারাজ হয়ে যাবেন না।

এই নিন আমি পাঁচ টাকা দিচ্ছি। পেশোয়ারের টিকেট কেটে ওগুলো ফেরৎ দিয়ে আসুন গিয়ে।

ঃ না, তা হয় না। আপনার টাকা ফিরিয়ে নিন। এ ধরনের কল্যাণের সুযোগ দেই না কাউকে।

ঃ না, ভাই! তোমার হাড়ি-পাতিলের দামও ফেরত দিচ্ছি।

চৌধুরী সাহেব মজীদ ও সলীমের দিকে তাকালেন। তাদের ইশারায় নোট হাতে নেন। অতঃপর খালি টুকরি উঠিয়ে রওয়ানা করেন।

মজীদ বলল— চৌধুরী চলুন! আমাদের সাথে টাঙ্গা করে।

টাঙ্গায় চেপে তিনি বলতে থাকেন— ভাই! দুনিয়াতে আভিজাত্যের কোন মূল্য নেই। স্টেশন মাস্টার আমার সাথে সাপে-নেউলের ব্যবহার করেছেন। বলেছিলেন, তিনি নাকি ডেপুটির ওপর খাড়া। তোমাদের ও সুবেদারকে দেখামাত্রই সে পাঁচ টাকা দিয়ে মুখরক্ষা করে।

মজীদের বরযাত্রী ওয়াপস এল। ঘরে দুলহানের চারপাশে মহিলারা জড় হয়েছে। মজীদের মা, চাচী ও দাদীকে মোবারকবাদ দেয়া হচ্ছিল। জনৈক রসিক মহিলা দাদীকে জিজ্ঞাসা করেন— তহশিলদারের মা! সলীমের বিয়ে হচ্ছে কবে?

ঃ বোন! সাধ্যে কুলালে আজই ওই ঝামেলা চুকাতাম। কিন্তু আলী আকবর বলেছে, চাকরী না পেলে ওকে বছর তিনেক ওকালতি পড়তে হবে। সুতরাং মাঝপথের শাদীটা অনর্থক একটা বোঝা হবে।

ঃ আয় হায়! সারা জীবনই কি সে পড়বে। ওর সাথীরা দিব্যি তিন সন্তানের জনক। এরপর আরো তিন বছর পড়বে। কন্যা তালাশ হচ্ছে কি?

ঃ বোন! খোঁজ-তালাশ হচ্ছে, আসছে। কিন্তু ওর মা এক মেয়েকে পছন্দ করে রেখেছে। কন্যার নাম শুনলেই গরম তেলে কৈ-এর মত জ্বলে ওঠে সে। বছর দুয়েক পূর্বে মেয়ের মা বলে গেছে, ছেলের বিয়ে যেন অন্য কোথাও ঠিক করা না হয়। গতকাল

www.amarboi.org

আলী আকবরের কাছে তাদের পক্ষ থেকে চিঠি এসেছে। সম্ভবত আগামী মাসেই কিছু একটা হয়ে যাবে।

বাইরের হাবেলীর বৃক্ষছায়াতলে পুরুষদের ঠাসা ভিড়। এ ধরনের প্রশ্নে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছেন ওর বাপ-দাদা ওখানে। সলীমের বোন যুবায়দা ওকে ঘরে আসতে দেখে যুবতীদের ডাকল— আমেনা, ছোগরা, হালিমা, আয়েশা! ভাইজান এসে গেছেন।' মুহূর্তে ওর চাচাত, খালাত, ফুফাত ও মামাত বোনেরা ছুটে এল। আমেনা-ই শুরু করল কথা— ভাইজান! ভাবীজানের সাথে কোলাকুলি করতে পার কবে নাগাদ?

ঃ কিসের ভাবী? খামোশ হতচ্ছাড়ি। নয়তো তেরটা বাজাব তোর।

আমেনা হেসে বলল— দেখুন ভাইজান! তেরটা না হয় বাজালেন, কিন্তু ভাবী চাই।

যুবতীরা শোরগোল করতে লাগল। ওদের ঠেলে সলীম বেরিয়ে গেল। উঠানে মা বললেন— সলীম! তোমার নামে দু'টি চিঠি এসেছে। তোমার ড্রয়ারে রেখেছি। সময়মত দিতে ভুলে গেছি।' সলীম দ্রুত অন্দরে গিয়ে ড্রয়ার থেকে পত্র তুলে নিল। সংক্ষিপ্ত চিঠি একটা। লিখেছে আখতার। সে চিঠির ভাষ্য এরূপ— স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে আমি বিহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করছি। তুমি যেতে চাইলে দু'চারদিনের মধ্যে লাহোর এস।

অপরটা নাসিরের। এটি বেশ বড়। পৃষ্ঠা উল্টিয়ে নাম শনাক্ত করে বাইরে এল। বৃক্ষছায়াতলে উৎসুক মানুষের ঠাসা ভিড়। তাই গেল বৈঠকখানায়। নাসিরের চিঠির বর্ণনা এ রকম—

"আমার পাকিস্তানী ভাই!

কলকাতার এক হাসপাতাল থেকে লিখছি এই পত্র। বিহারের রক্তসাগর পেরিয়ে উপনীত হয়েছি এখানে। যা কিছু দেখেছি, তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। বর্ণনা করলেও তোমার মন বিশ্বাস করতে চাইবে না। কি করে বিশ্বাস করবে? সকালে যে বস্তি দু'হাজার মানুষের কোলাহলে মুখরিত ছিল সন্ধ্যায় সেই বস্তিতে দেখা গেল ছাইভস্ম। সকালে যে সূর্যটা দু'হাজার মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা ও হাসি-কোলাহল দেখেছিল সেই সূর্যই অস্তকালে লাশ ও কাফনের স্তূপ দেখতে পেল। সলীম! এটি আমার বস্তি। বিহার প্রদেশের হাজারো লোকালয়ের একটি এটি, যেখানে হাজারো আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শান্তি ও অহিংস নীতির প্রকৃত রূপ দেখতে পেরেছে। মৃত লাশের নাক, কান ও গলা কেটে মসজিদের সিঁড়িতে সাজিয়ে রেখেছে ওরা। নবজাতকদের বর্শার ডগায় ঢুকিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে পুঁতে রাখা হয়েছে। মুসলিম বধূ-মাতাদের সম্ভ্রমহানি করে লজ্জাস্থান কেটে ফেলা হয়েছে। স্তনকে ফুটবল বানিয়ে খেলেছে। স্বামী ও পিতাকে কন্যা ও স্ত্রীর এ ন্যক্কারজনক দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়েছে। তুমি হয়ত আমাদেরকে বুযদিলী বা আত্মসম্ভ্রমবোধহীনতার ধিক্কার দেবে, কিন্তু বিশ্বাস করো— এ সময় এক তুফান যার মোকাবেলায় ন্যূনতম প্রস্তুতিও নেইনি আমরা। আত্মরক্ষার সুযোগ তো দূরের কথা, কংগ্রেসী হুকুমত হাত-পা বেঁধে মেরেছে আমাদের। ঘর তল্লাশির পেটুয়া পুলিশ বাহিনী আমাদের চাকু পর্যন্ত ক্রোক করেছে। ওরাই হিন্দুদেরকে বন্দুক ও পিস্তলে সজ্জিত করেছে। হুকুমত ওদের, সংবিধান ওদের, পুলিশ ওদের, গোলা-বারুদ

www.amarboi.org

এবং অস্ত্রও ওদের; কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কতদিন কত জনের বিরুদ্ধে লড়ব? খালি যে হাতগুলো ওদের প্রতিরোধে উত্থিত হল, কেটে দেয়া হল তা। প্রতিবাদদীপ্ত যে সীনাগুলো সটান হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পশলা পশলা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়া হল সে সীনা। আমার জনপদের চার-পাঁচশ লোক লাঠি-সোটা হাতে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে নেমেছিল। কিন্তু ওরা যে ওদের তুলনায় নগণ্য। পক্ষান্তরে, ওরা বন্দুক-রিভলবার ও পিস্তলে সজ্জিত। আট হাজার হিন্দু আর পুলিশে ওদের সংখ্যা ১০ হাজারে দাঁড়াল। ঠোলা-পুলিশ ওদের দিশারী। বিজয় তো এল— ওদের ; কিন্তু এটা কি পরাজয় আমাদের? চার-পাঁচশ জোয়ানকে যদি পিস্তল-বন্দুকে ঝাঁঝরা করে বস্তির পর বস্তি আগুন জ্বেলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হাত-পা বেঁধে পুড়ে ছাই করা হয়— তো একে কুপোকাত বলা যায় কি? বৃদ্ধ বাবাকে গাছে বেঁধে যুবতী কন্যার সম্ভ্রমহানি ঘটালে একে তুমি পরাজয় বলতে পারবে কি? সলীম! আমি এ বর্বরতার সাক্ষী। ওরা আমায় লাশ ভেবে ফেলে রেখেছিল। আমি তো অবাক, কি করে জীবিত এখনও? কেন জীবিত? সূর্য এখনও কেন উঠছে? তারকা কেন চমকাচ্ছে? তোমার আফসোসের মাত্রা বাড়াতে এ পত্র লিখছি না। আমার মৃত খান্দানের মর্সিয়াও উদ্দেশ্য নয় তোমার দ্বারা। কেবল দু'একটা লাশ কিংবা দু'চারটা বস্তি জ্বলে ছাই হয়নি বরং এ পর্যন্ত ৬০ হাজার মানুষ শাহাদতের শিরীন শরাব পান করেছে। চার লাখের মত হয়েছে চিরপঙ্গু। এতদসত্ত্বেও আমি মনে করি হিন্দুস্তানী মুসলমানদের এখানে দেখার আরো অনেক কিছুই আছে। হিন্দু বর্বররা এখনও তাদের অসুরী চরিত্র নিয়ে ময়দানে নামেনি। তুমি যাকে অগ্নিকুণ্ড মনে করছ আমি তাকে মনে করছি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এখনও সময় আছে সোচ্চার হওয়ার। বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো জেগে উঠলে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশের বাসিন্দারা বেঁচে থাকার আশা করতে পারে। বিহার আমাদের দুর্গম পথের প্রথম হোঁচট মাত্র। এখনও সেই খঞ্জর আস্তিন থেকে বেরোয়নি— অহিংস নীতির দেবতার জামায় লুকোনো যা। আমাদের জন্য না হলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পাবের মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করো। বিহারের ঘটনায় আমাদের চৈতন্যোদয় না হলে বুঝবে আমরা বেঁচে থাকার যোগ্য নই।

আমাদের নেতারা জাতির যখমে এলাজ করার জন্য জ্বালাময়ী বক্তৃতাকেই যথেষ্ট মনে করছেন। তারা দুনিয়াকে কেবল এতটুকু জানিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন যে, 'দেখো! হিন্দুরা করছে কি! এতগুলো জীবনহানি হল, লাশের স্তূপ হল, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কমিটি হল, অতঃপর এসেম্বলী ডাকা হল— অথচ তারা কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি ঝেড়েই নিশ্চুপ। খোদার দিকে চেয়ে জাতির তরুণ প্রজন্মকে জাগিয়ে তোল। অন্যরা অবলীলায় জেগে যাবে।

আমার যখম চাঙ্গা হতে চলেছে। বোধকরি দিনপাঁচেকের মধ্যে কোন এক দলের সাথে বিহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব।

— তোমার একান্ত প্রিয়

নাসির আলী

www.amarboi.org

পত্র পাঠ করে সলীম নিথর হয়ে গেল। বৈঠকখানার বাইরে নারী-পুরুষের কোলাহল ওর কাছে মনে হয় অর্থহীন ও বিরক্তিকর।

ইউসুফ হন্তদন্ত হয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করল— ভাইজান! আমি সেই কখন থেকে আপনাকে তালাশ করছি। আপনার দোস্ত এসেছেন।

ঃ কে?' সলীমের সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

ঃ মহিন্দর সিং।

ঃ বেশ। ডাকো তাকে।

ইউসুফ যেভাবে এসেছিল সেভাবেই বেরিয়ে গেল। মহিন্দর এল বৈঠকখানায়। সলীম ওর সাথে করল হ্যান্ডশেক। বসাল আপনার কাছটিতেই। মহিন্দর বলল— আপনার কাছে মাফ চাইতে এসেছি। গতকাল বলনাথ সিং-এর আসার প্রোগ্রাম ছিল। তাই মজীদের বরযাত্রীতে শরীক হতে পারিনি।

ঃ সে এসেছে কি?

ঃ জ্বি হ্যাঁ!

ঃ তা ওকে নিয়ে এলে না কেন? সেই কবে ওর সাক্ষাত হয়েছিল।

ঃ অতি সকালে শ্বশুরবাড়ী গেছেন। কাল কিংবা পরশু এসে পড়বেন।

ঃ এখনও কি ও কাশ্মীর ফৌজে?

ঃ জ্বি হ্যাঁ! তিনি যা বললেন তাতে বুঝলাম, খুব শীঘ্রই ক্যাপ্টেন হতে যাচ্ছেন। সলীম খানিক ভেবে বলল— মহিন্দর চা-পান করবে?

ঃ না! চা-পান করেই এসেছি। আপনাকে স্রেফ বলতে এসেছি, কাল-পরশু ফুরসত পেলে শিকারে যাব আপনার সাথে।

ঃ পরশু নাগাদ হয়ত আমি এখানে থাকব না।

ঃ যাচ্ছেন কৈ?

ঃ বহুদূর।

ঃ আপনি বড্ড পেরেশান।

ঃ মহিন্দর! নির্বাচনের আগে আলীগড় ভার্সিটির এক ছাত্র আমাদের এখানে এসেছিল। ... সাথে সাক্ষাতও করিয়েছিলাম তোমাকে।

ঃ হ্যাঁ! হ্যাঁ! তার গজল এখন স্মরণ আছে আমার।

ঃ ও বিহারের অধিবাসী।

মহিন্দর খানিক পেরেশান হয়ে বলল— তার সম্পর্কে কোন বেদনাদায়ক খবর...?

ঃ ওর পত্র এসেছে।

ঃ বিহার থেকে খুবই মর্মান্তিক খবর এসেছে আমাদের কাছেও। কি লিখেছে সে?

ঃ 'পড়ে দেখো' বলে সলীম পত্রখানা কম্পিত হাতে এগিয়ে দিল, 'পড়তে পারো তুমি।'

পত্র পাঠ করে মহিন্দর সলীমের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত অশ্রুসজল নয়নে বলল— আপনি তাহলে বিহার যাচ্ছেন?

www.amarboi.org

ঃ হায়! আমি যদি আপনার সাথে যেতে পারতাম। হায়! আমার মত এক মহিন্দরের কোরবানী যদি হাজারো মানুষের জীবন বাঁচাতে যথেষ্ট হত। আমি মনে করি, এ তুফান একদিন এখানে এসেও আছড়ে পড়বে। হিন্দু ফ্যাসিজম মানবতার টুঁটি চিপে ধরতে যে চিতা জ্বালাচ্ছে, পাঞ্জাবে আমার কওমের তাতে হতে হবে ইন্ধন। ভাই সলীম! ওই আগুন এখানে আসতে বাদ সাধো। নয়ত পঞ্চদরিয়া কোনদিন রক্তসাগরে পরিণত হবে। কিন্তু না— তুমি তা রুখতে পারবে না। কেউই পারবে না। কেউ না। আমার কওম তাদের গুরুদুয়ারাগুলো ওই ফ্যাসিস্টদের ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। মুসলমানদের ঘর-বাড়ী জ্বালাতে শিখরা তাদের ঘরে জল্লাদদের আশ্রয় দিয়েছে। হিন্দুরা জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার ভূমিকায় থাকবে।

সলীম বলল— মহিন্দর! তোমার মত লোক যতদিন আমার সঙ্গে আছে ততদিন পাঞ্জাবের ভবিষ্যত নিয়ে আমার ভাবাভাবির দরকার পড়বে না।

ঃ এ সময় আমার কথা কারো কানেই ঝংকার তুলবে না। বিদ্রোহী কণ্ঠগুলো চিরদিনের তরে স্তব্ধ করে দেয়া শুরু হয়ে গেছে এখন। শেষের দিকের কথাগুলো বলতে গিয়ে মহিন্দরের কণ্ঠ ধরে এল।

✪ ✪ ✪

আগুন ছড়িয়ে পড়ল। বোম্বাই ও বিহারে মানবতার টুঁটি চিপে ধরাদের কালো হাত উত্তর প্রদেশ অভিমুখে প্রসারিত হল। হিন্দু অধ্যুষিত সংখ্যাগুরু প্রদেশের মাস্তান ও গুণ্ডাদের প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, কিন্তু পাঞ্জাবের মুসলিম জনগোষ্ঠী এ সময়ও তাদের শক্তি প্রদর্শনে ঐহিক শক্তিকে আপোষ-রফার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

পাঞ্জাবের গাদ্দাররা এ সময় তাদের কংগ্রেসী প্রভুদের খুশী রাখার জন্য মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। বাহ্যত এ ঘোষণা ছিল পাঞ্জাবকে নিরাপদ অঞ্চল সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু নেপথ্যে বিছানো ছিল সূক্ষ্ম কূটজাল। মুসলমানদের অবশিষ্ট শক্তিটুকু নিঃশেষ করতে এ ঘোষণা জারী করা হল। যাতে ভারত মাতার ব্যাঘ্র-সন্তানদের জন্য ময়দান সাফ হয়ে যায়। এ একপেশে সিদ্ধান্তকে ভিন্ন রং-এ রঙিন করার স্বার্থে মহাসভার সিভিলদের ওপর ডিক্রি জারী করা হল। কিন্তু কংগ্রেস -এর স্বেচ্ছাসেবীদের পুরোপুরি দায়মুক্ত রাখা হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে মহাসভার স্বেচ্ছাসেবীদের কর্মকাণ্ডকে গতিশীল রাখতে স্রেফ তাদের সাইনবোর্ড বদল করার জরুরত হল। কাজেই ওই সিদ্ধান্তের জোয়াল কেবল মুসলমানদের ঘাড়েই চেপে থাকল।

পাঞ্জাবের মুসলমানদের এ একপেশে মন্ত্রিসভার তখ্ত উল্টানোর বাধ্য-বাধকতা দেখা দিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও যেখানে সংখ্যালঘুর কানুন মানতে হয় সেখানে এছাড়া আর কিইবা করার আছে। মুসলিম লীগের নথিপত্রের তল্লাশীর নিরীক্ষক মোতায়েন করা হল। বেশ কিছু নেতার হাতে উঠে এল হাতকড়া। আবার এদের অনেকে দাদাদের চোখে প্রিয়পাত্র হবার আশে তাদের অনুকরণ করল। সুতরাং পান থেকে চুন খসলেই যে নেতারা হম্বিতম্বি করে মঞ্চ-ময়দানে গরম বক্তৃতা ঝাড়তেন— তারা অন্যের দেখাদেখি

www.amarboi.org

স্বেচ্ছা কারাবরণ শুরু করলেন। তাদের অনেকে এমনও ছিলেন যারা এ খেয়াল করতেন যে, যদি একদিন দেরীতে জেলে যান তাহলে তাদেরকে নেতৃত্বের শেষ কাতারে ঠেলে দেয়া হবে।

মোটকথা এ আন্দোলনের শীর্ষবিন্দু থেকে অভিজ্ঞ পোড়খাওয়া নেতাদের হারাতে হল। ফলে নেতৃত্বে তরুণরাই আসল। এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আওয়ামী আন্দোলনে রূপ নিল। খিজির হায়াত খানের কওম ও তার পৃষ্ঠপোষকদের চ্যালেঞ্জ গৃহীত হল। কওমের সন্তান, বধূ-মাতা ও বাচ্চারা পর্যন্ত ময়দানে এসে গেল। অসীম সাহসে বলীয়ান সত্য সুন্দর, তারুণ্য গাদ্দারদের বিরুদ্ধে সীসাঢালা প্রাচীরের ভূমিকায় নামল। জেলের অভ্যন্তর ভরে গেল। পুলিশের রোলার ভেঙ্গে গেল। কাঁদানে গ্যাসের সেল-এর ছড়াছড়ি হল। মুসলিম পত্রিকাগুলো ব্যান্ড, কিন্তু পাঞ্জাবের এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে পুলিশদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম ঘরে গোপন এ আন্দোলনের খবর পৌছল না। খিজির খচ্চরের কালা-কানুন মোতাবেক চারজন মুসলমানকে একস্থানে জড়ো হওয়া মহাঅপরাধ সাব্যস্ত হল। কিন্তু এমন কোন লোকালয় বাকী থাকল না যেখানে হাজারো মুসলমানের মিটিং হল না।

পাঞ্জাবের গাদ্দাররা উপলব্ধি করল, নিজের কওমকে মুর্দা ভেবে হিন্দুদের কাছে ইয্যত-আযাদী বিক্রী করে ভুলই হয়েছে।

সীমান্ত প্রদেশেও এই একই হালত হল। খাইবার গিরিপথ থেকে আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত কংগ্রেস যে রামরাজ্য কায়েম করতে চেয়েছিল তা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম। ইতোমধ্যে পাঠানদেরও চক্ষু খুলে গেল।

✪ ✪ ✪

গুরুদাসপুরের দিকে ছুটন্ত একটি ট্রাক অমৃতসর স্টপেজে থামল। সলীম ও এক নওজোয়ান দ্রুত নেমে লাচ্ছি পান করল। আচমকা কেউ ওর কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল চৌধুরীজী। আস্‌সালামু আলাইকুম।

মাথা কাত করে সলীম সালামের জবাব দিল। কিন্তু আগন্তুককে চিনতে পারল না।

ঃ তা আজ কোথায় যাওয়া হচ্ছে চৌধুরী সাহেব?

সলীম চিন্তার জাল বুনছে। কে এ লোক? কোথাও দেখেছে কি-না। জবাব দেয়—ও "লাহোর যাচ্ছি।"

ঃ আর মিয়া সিদ্দীকও কি একই পথের পথিক?' সলীমের সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে আগন্তুক।

ঃ না, জনাব! আমি যাচ্ছি শিয়ালকোট।' সলীমের সঙ্গী জবাব দেয়।

ঃ বলুন! আপনার কি খেদমত করতে পারি?'

ঃ না! বেয়াদবি মাফ করবেন।' বলল সলীমের সঙ্গী।

ঠিক ওই মুহূর্তে বাসের হর্ন শোনা গেল। চলো ভাই লাহোরের গাড়ী এসে গেছে। সলীম ও সিদ্দীক ভদ্রলোকের সাথে বিদায়ী মোসাফাহা করে বাসে চাপল।

www.amarboi.org

বাস স্টার্ট দিলে সলীম ওর সঙ্গীকে বলল— সিদ্দীক! কে এ লোক?

ঃ করিম বখশ্ হাবিলদার। আপনি ভুলে গেছেন। নির্বাচনের কালে আপনার সাথে তার মৃদু বচসা হয়েছিল।

ঃ আরে দোস্ত! তাকে যে একেবারেই চিনতে পারলাম না। আসলে লোকটা ইউনিফর্ম ছাড়া তো— তাই চিনতে কষ্ট হল।

ঃ অমৃতসরে বদলী হয়েছে সে। আমার মতে, সে সিআইডির লোক।

ঃ দোস্ত! খিজিরের টিকটিকিরা আজকাল সাদা পোশাকেই ডিউটি পালনে সুবিধে পাচ্ছে। ওরা আমাদের ওপর সন্দিহান দৃষ্টি ফেলছে।

লাহোর পৌছে সলীম সিদ্দীককে বলল— তুমি এ স্টপেজে থাক। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব আমি।

সলীম শহরের সরুগলি উতরে এক সময় এক পান বিক্রেতার দোকানে এসে দাঁড়াল। দোকানদারকে গভীর নযরে নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করল— জনাব! নার্গিস ফুল পাব কোথায়?

দোকানদারও ওর আপাদমস্তকে ভ্রু-কুঁচকে তাকাল। উঠে বলল— আসুন! আমার সাথে!

সলীম তাকে অনুসরণ করল। সরু গলির কোণে বন্ধ দরজার এক ইমারত দেখিয়ে দোকানদার চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে সলীম বারপাঁচেক দরোজার কড়া নাড়ল। নেপথ্যে কেউ আওয়াজ দিল— কে?

সলীম বলল— এটা কি একুশ নম্বর বাড়ী?

জনৈক নওজোয়ান দরোজা খুলে তাকাল এবং প্রশ্ন ছুঁড়ল— আপনি কাকে চান?

ঃ আখতার সাহেব এখানে কি?

ঃ না। তিনি অন্য কোথাও চলে গেছেন। আপনার নাম সলীম?

ঃ জ্বি হ্যাঁ! দশটার পূর্বেই এখানে পৌছার কথা আমার। কিন্তু গাড়ী পাইনি বলে...।

ঃ ভেতরে আসুন!'

সলীম ভেতরে ঢুকলে নওজোয়ান দরোজা বন্ধ করে বলল— আপনার জিনিস আমাদের কাছে মজুদ। আসুন!

দেউড়ি অতিক্রম করার পর একটা কামরায় দাখেল হল সলীম। কামরার মধ্যে গোলটেবিলে জনাপাঁচেক যুবক বসা। পকেট থেকে কিছু কাগজ বের করে সলীম টেবিলে রেখে বলল— হ্যান্ডবিলে এ কথাগুলো লিখে এনেছি আমি। আখতার সাহেব ফিরবেন কখন?

নেতাগোছের এক যুবক বলল— তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না।

আপনার হ্যান্ডবিল সম্পর্কে তিনি আমাদের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। যাবার কালে এও বলে গেছেন যে, আপনাকে যেন একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন দেয়া হয়। আমি ভেবে হয়রান হই যে, স্থানীয় লীগের কাছে একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিনও নেই?

www.amarboi.org

ঃ ভাই! আমাদের লীগ অফিসে একটা ভাঙ্গা হুক্কা ছিল। সম্ভবত পুলিশ সেটাও ক্রোক করে নিয়ে গেছে।

ঃ আচ্ছা, সলীম সাহেব! আপনি কি আমাদের সাথে কিছু কাজ করবেন-নাকি চলে যাবেন?

ঃ আপনারা আমাকে হুকুম করতে পারেন। অবশ্য আজ রাতেই চলে যেতে পারলে ভালো হতো আমার। আমাদের এলাকায় প্রোপাগাণ্ডার কোন এন্তেযাম নেই।

১০/১১ সালের এক বালিকা কামরায় প্রবেশ করল। সে বললো-আমরা হাজার বিশেক ইশতেহার ছেপে দিয়েছি। বড় আপা বলছেন, হ্যান্ডবিলের বিষয় লিখে দিন এবং কাগজেরও ব্যবস্থা করুন।

বালিকা ওপাশের কামরায় চলে গেল। নওজোয়ান সলীমের দিকে তাকিয়ে বললো- 'ভাই! আমাদের বোনেরাও যথেষ্ট কাজ করছে। ওরা এক মুহূর্তও আমাদের বেকার থাকতে দেয় না। ভালই হলো, আপনার হ্যান্ডবিল লেখা শেষ। আমরা ওদেরকে কর্মব্যস্ত রাখতে পারব। আচ্ছা, এখন যেতে পারেন। আসগর ওই স্যুটকেসটা সলীম সাহেবকে দিয়ে দিল। কিন্তু ওটি খুব সতর্কভাবে হেফাজত করবেন। আজকাল পুলিশ একে বোমের চেয়েও খতরনাক মনে করে। ধরা খেয়ে গেলে এই স্থানের নাম ফাঁস করো না। প্রয়োজনে তোমার সাথে অমৃতসর পর্যন্ত কাউকে সাথে দেবো।

ঃ আমার সাথে এক লোক আছে। বাস স্টপেজে সে অপেক্ষমাণ।

✪ ✪ ✪

সন্ধ্যার দিকে সলীম ও ওর সাথী বাসে করে অমৃতসর পৌছে দেখল করিম বখ্শ মিষ্টির দোকানের সামনে বসে সিগ্রেট পান করছে। বাস থেকে নামতে গিয়ে সিদ্দীকের নযর পড়ল তার ওপর সহসাই। বললো সলীমকে-আরে দোস্ত! বদমাশটা এখনও দেখছি ঘাপটি মেরে বসা।

ঃ কে?

ঃ করিম বখশ। সে আমাকে দেখে ফেলেছে।

সলীম বললো-দেখ সিদ্দীক! অবস্থা বেগতিক দেখলে তার সাথে হবে বোঝাপড়া। স্যুটকেস নিয়ে পালানোর মওকা পেলে আমার পরোয়া করো না যেন। অমৃতসরের কাউকে চেন?

ঃ আত্মীয় আছে আমার।

ইতোমধ্যে করিম বখশ এসে ওদের গা ঘেষে দাঁড়াল— "চৌধুরীজী! খুব ত্বরা করেই যে লাহোর থেকে ফিরলেন?'

ঃ জ্বি হ্যাঁ! জরুরী কোন কাজ ছিল না তাই।

ঃ আজ রাতটা আমার এখানে থেকে যান না।

ঃ ধন্যবাদ! কিন্তু বাড়ীতে জরুরী কাজ আছে যে।

www.amarboi.org

ঃ মিটিং-টিটিং আছে বুঝি?

ঃ মিটিং এ যুগে তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আচ্ছা, খোদা হাফেয। দেরী হয়ে যাচ্ছে। গুরুদাসপুরের বাস ফেল করে বসতে পারি।

ঃ আজকাল বাসের প্রাচুর্য সর্বত্রই। সে চিন্তা না করলেও চলবে। মিয়া সিদ্দীক। আপনার তো শিয়ালকোট যাবার কথা— তাই না?

এ প্রথম অনুধাবন করতে পারে সিদ্দীক যে, তার ভুল হয়ে গেছে। ঘাবড়ে জবাব দেয় ও— কথা ছিল ঠিকই। তাও চলে এলাম ওনার সাথে।

হাবিলদার বলল— সকাল বেলা সম্ভবত এ স্যুটকেস আপনাদের সাথে ছিল না।

সলীম জবাব দিল— না। তা নয়। আমার মালপত্র লাহোর পড়েছিল। চলো সিদ্দীক।

দেরী হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, হাবিলদার সাহেব। খোদা হাফেয!

ঃ এ স্টপেজে তো কোন ট্রাক নেই। অন্য স্টপেজে হয়ত পেতে পারেন। চলুন না। আপনাদের পৌছে দেই। নিয়ে আসুন! বহন করে নেই।

ঃ ধন্যবাদ! এটা তেমন একটা ভারী নয়।

সিদ্দীক বলল— না। আমিই বহন করব।

সিদ্দীকের হাতে স্যুটকেস দেয় সলীম। সড়কে জনৈক পুলিশ ডাণ্ডা হাতে খাড়া। করিম বখ্‌শ চলন্ত অবস্থায়ই তার দিকে ইশারা করল। পুলিশ সে ইশারার প্রতি সাড়া দিয়ে ওদের পিছু নিল। সলীমের চোখে হাবিলদারের চালাকী ধরে পড়ে যায়। আচমকা সলীম রাস্তার মোড়ে একজনের দিকে ইশারা করে বলল— আরে সিদ্দীক। মুনাওয়ার যে। ডাকো না গাধাটাকে!' সিদ্দীক 'মুনাওয়ার, মুনাওয়ার! এই মুনাওয়ারের বাচ্চা!' ডেকে সামনে এগিয়ে গেল দ্রুত। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও ২০/৩০ কদম এগিয়ে গেল।

হাবিলদার পেরেশান হয়ে সলীমের কাছটিতে দাঁড়াল। আচমকা সে সলীমের বাযু ধরে চিৎকার দিল— গেন্ডা সিং! যাও! ওই স্যুটকেসধারীর পিছু নাও। দেখছ না, সে পালাচ্ছে? সিটি বাজাও!

গেন্ডা সিং লাঠি উঁচিয়ে সিটি বাজাতে বাজাতে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু সিদ্দীকের গতি তার দৌড়ের সামনে শ্লথই মনে হল। সাধারণ জনতার মন পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত। এক অপরিচিত জোয়ান গেন্ডা সিং-কে ল্যাং মারলে সে 'তোর মায়রে বাপ' বলে চিৎপটাং হয়ে পড়ল। কৌতূহলী জনতা তার করুণ দৃশ্য দেখতে ভিড় জমাল। সকলের মুখেই কৌতুক, উত্তেজক হাসি। সে রাগত মনে উঠে দাঁড়াল। স্যুটকেসধারীর চেয়ে এক্ষণে তার দৃষ্টি 'ল্যাং মারল কে' তার প্রতি।

"কি হল পুলিশ বাবুজী?' বৃদ্ধ এক লোক তার কাছে প্রশ্ন করল। গেন্ডা সিং রাগে-গোস্বায় তার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল। ততক্ষণে সলীমের বাযু ধরে হাবিলদারও ওখানে পৌছে যায় বলে চিৎকার দিয়ে বলে গেন্ডা সিং! স্যুটকেসধারীকে খুঁজে বের কর। যাও!

www.amarboi.org

গেন্ডা সিং আবার ছুটল ; কিন্তু এ ছোটাছুটির গন্তব্য জানা নেই তার। সিদ্দীক ইতোমধ্যে জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

আরো দু'পুলিশ কনস্টেবল হাবিলদারের সাথে এসে মিশল। সে নেহায়েত রাগতস্বরে বলল— বাবুজী! বলো না কি ছিল ওই স্যুটকেসে? আর ওগুলোর গন্তব্যই বা কোথায়?

সলীম বেপরোয়া জবাব দেয়— তোমরা আমার সময় অপচয় করছ কিন্তু।

তোমাদের তো চিনলাম না? কারা তোমরা?

জনৈক সেপাই বলল— হাবিলদার সাহেবের সাথে সাবধানে কথা বলো!

ঃ ও হো! ইনি তাহলে হাবিলদার?

হাবিলদার চিৎকার দিয়ে বলল— তাকে নিয়ে চলো। বোমা ছিল বেটার স্যুটকেসে।

✪ ✪ ✪

পুলিশী হেফাযতে মারপিটের পর হাজতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল সলীম। দারোগা গোটা এলাকা চষে ফেরার পর রাত ৮টার পর ফিরে এলেন। দু'সেপাই হাজত থেকে সলীমকে তার সামনে নিয়ে এল।

দাঁড় করিয়ে দেয়া হল দারোগার টেবিলের সামনে। ওর দাঁত ও নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছিল। মাথাটা কাত হয়ে আছে। দারোগা সাহেব টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে সলীমের দিকে তাকান। প্রথম নযরে একে অপরকে চিনতে পারেন। সাব ইন্সপেক্টর মনসুর আলী ওর কলেজের সাথী। লজ্জা, পেরেশান ও অস্বস্তিভরে তিনি সলীমের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সলীমের ঠোঁটে বিলীয়মান চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। ক'টা ঝাঁকুনি খেয়ে সলীম যেন আচমকা কার্পেটে পতিত হয়ে বেঁহুশ হয়ে যায়। দারোগা উঠে দাঁড়ান।

ঃ বেটা ধোঁকার আশ্রয় নিচ্ছে স্যার!' জনৈক সেপাই সলীমকে খোঁচা মেরে বলে।

দারোগা সেপাইকে ধাক্কা দেন। সেপাই দেয়ালে গিয়ে আঘাত খায়। তিনি সেপাইর দিকে নযর করে বলেন— গেন্ডা সিং! তার জামা খুলে ফেল। পানি আনো।

খানিক বাদে সলীমের হুঁশ এল। সাব-ইন্সপেক্টরের নির্দেশে ওকে খাটে শুইয়ে দেয়া হল। গেন্ডা সিংকে চাবুকে পিঠের ছাল ওঠানোর হুকুম দেয়ায় যে সেপাহী সলীমকে খোঁচা মেরেছিল সে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

সাব-ইন্সপেক্টর আবারো তার চেয়ারে বসলেন। বললেন— ওকে কে মেরেছে?

সেপাই গেন্ডা সিং মিরা বখ্শের দিকে তাকাতে লাগল।

গেন্ডা বলল— তার কাছে বোমাভর্তি স্যুটকেস পাওয়া গেছে। হাবিলদার সাহেবের হুকুমেই তাকে মেরেছি আমরা।

ঃ কোথায় সেই বোমাভর্তি সুটকেস?

www.amarboi.org

ঃ জ্বি-মানে এক লোক ওটা নিয়ে লাপাত্তা হয়েছে।

ঃ স্যুটকেসধারী পালিয়ে গেছে, আর খালি হাতওয়ালাকে পাকড়াও করে এনেছ— ঘটনা তাহলে এই?

ঃ জ্বি হ্যাঁ।'

ঃ সাবাশ! তোমরা বড্ড সমঝদার আদমী। কিন্তু আসল লোককে গ্রেফতার করলে না কেন? কোথায় সে?

ঃ তাঁর সম্পর্কেই তো একে জিজ্ঞেস করছিলাম। তিনবার বেটাকে ধোলাই দিয়ে বেহুঁশ করেছি। কিন্তু তার সন্ধান দেয়নি।

সাব-ইন্সপেক্টর চিৎকার দিয়ে বললেন— তোমরা তাকে গ্রেফতার করোনি কেন? তোমাদের বাবাকে কেন হাতকড়া পরালে না?

ঃ আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। এ ফাঁকে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঃ তুমি ওই স্যুটকেস দেখেছিলে?

ঃ তবে কি বলছি।

ঃ কি রং সেটির?

ঃ সবুজ।

ঃ বোমা দেখেছিলে?

ঃ জ্বি না। হাবিলদার সাহেব হয়ত দেখেছিলেন।

ঃ সাব-ইন্সপেক্টর চিৎকার করে বললেন— কোথায় হাবিলদার?

ঃ তিনি এখন হাঁপিয়ে উঠেছেন।

ঃ কেন?

ঃ আসামীকে পিটিয়ে। বলেছেন, তিনি নাকি হাঁপিয়ে উঠেছেন। খানা খেয়ে তবেই আসবেন।

হাবিলদার প্রবেশ করল। বলল— আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার?

ঃ হ্যাঁ! তুমি কোতোয়ালীতে ফোন করেছিলে যে, বোমার সন্ধান পেয়েছ কিন্তু কৈ তা?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ! দুষ্কৃতকারী তা নিয়ে পালিয়েছে। এ ওর সাথী, ও আমার পরিচিত।

ঃ স্যুটকেসের ভেতরে বোমা দেখেছিলে?

ঃ তা অবশ্য দেখিনি। তবে ওতে যে বোমা ছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওরা সকালে লাহোর গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে।

সাব-ইন্সপেক্টর হাবিলদারের কথা কেটে বলেন— কি গেন্ডা সিং! লাহোর— অমৃতসর রুটে সকাল-সন্ধ্যা অজস্র মানুষ সফর করে— নয় কি?

ঃ হ্যাঁ। হাজারো মানুষ।

ঃ আচ্ছা বলো, তারা সকলেই কি বোমার কারবার করে?

ঃ আজ্ঞে না।

www.amarboi.org

হাবিলদার বলল— জ্বি-মানে ওদের কাছে স্যুটকেস ছিল। ওরা সকালে যখন যায় তখন...।'

সাব-ইন্সপেক্টর কথা কেটে মাঝপথে বলেন— তাই নাকি! আচ্ছা গেন্ডা সিং! অমৃতসর-লাহোরের কোন যাত্রীর হাতে স্যুটকেস দেখলে তোমরা তাদের গুলি করো বুঝি?

গেন্ডা সিং ঘাবড়ে বলল— না। তা কেন?

ঃ কেননা তোমাদের হাবিলদার সাহেবের মতে, স্যুটকেসে বোমা ছাড়া কিছু থাকে না।

ঃ হাবিলদার সাহেব গুলির হুকুম দিলে আমরা বাধ্য। নয়তো স্যুটকেস মাত্রই বোমাভর্তি হতে পারে না।

হাবিলদার বলল— আজ্ঞে! আমি আপনাকে পুরো কাহিনী শোনাই।

ঃ কিছুই শুনব না আমি। তুমি বোমাভর্তি এক দুষ্কৃতকারীকে অস্ত্রসহ পালাতে সুযোগ দিয়েছ। তোমার কথা সত্যি হলে ঘটনার মূল নায়ককে ছেড়ে নিরপরাধ এক লোককে ধরে এনে তুমি নিজকে নেহাৎ বেকুফই প্রমাণ করেছ। পক্ষান্তরে তোমার কথা মিথ্যে হলে, মাসুম এক লোককে মেরেছ তুমি। তোমার নামে রিপোর্ট করব। এসপি সাহেব নিশ্চয়ই একথা বরদাশত করবেন না যে, অমৃতসর কেউ বোমা নিয়ে এসেছে আর তাকে পাকড়া করা সম্ভবপর হয়নি।

যাও! গেন্ডা সিংকে সাথে করে তাকে ধরে নিয়ে এসো। আমি এসপি সাহেবকে ফোনে তোমার এনামের ব্যবস্থাদি করি।

করিম বখ্‌শ অনুনয়ের সুরে বলল— খান সাহেব! হতে পারে আমি ভুল করেছি। কিন্তু একে আমি চিনি। এ এবং এর সাথী দু'জনই লীগকর্মী। ইলেকশনের প্রাক্কালে...।

সাব ইন্সপেক্টর বলেন— কি গেন্ডা! আজ শহরে মুসলিম লীগের ক'টা মিছিল বেরিয়েছে?

ঃ তা ওদের সংখ্যা হাজার পঞ্চাশেকের কম নয়।

ঃ হাবিলদারকে বলো, বোমা রাখার অপরাধে সকলকে হাইকোর্টের পথ দেখাতে।

ঃ হ্যাঁ, করিম বখ্‌শ। স্যুটকেসের রংটা যেন কি?

ঃ আজ্ঞে কালো।

ঃ গেন্ডা সিং! রংটা যেন কি?

গেন্ডা সিং ইন্সপেক্টরের গোস্বা লাল চেহারা দেখে নিয়েছে। সে বলল— আমি যে স্যুটকেস দেখেছিলাম সম্ভবত সবুজ সেটা।

ঃ কসম খোদার। কালো সেটা।' বলল করিম বখ্‌শ।

ইন্সপেক্টর স্বর পরিবর্তন করে বললেন— করিম বখ্‌শ। সত্যি করে বলছ না কেন যে, তুমি ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নিচ্ছ? তুমি বাড়াবাড়ি করেছ অনেক। আমি সিভিল সার্জনকে ফোন করছি।

www.amarboi.org

ঃ স্যার! ভুলতো মানুষেরই হয়।

ঃ কিন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল আর বরদাশত করা হবে না। আসামীকে অভিজাত বংশেরই মনে হচ্ছে। এক্ষণে তোমার পক্ষ হয়েই তার কাছে মাফ চাইতে হবে আমাকে।

ঃ জ্বি! একথা আপনি ঠিকই বলেছেন। হাবিলদার সাহেব তার পিঠে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। কিন্তু গালি দেয়া তো দূরে থাক, উহু পর্যন্ত করেননি তিনি।

সাব-ইন্সপেক্টর অশ্রুসজল নয়নে বললেন— মিরু বখ্শ। তাকে ফুল বিছানায় শুইয়ে দাও।

✪ ✪ ✪

রাত দশটা।

পুলিশের একদল শহরের সরু গলির সামনে এসে দাঁড়াল।

সাব-ইন্সপেক্টর মনসুর আলী টর্চের আলো ফেলে নেমপ্লেটের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'এ সেই বাড়ী'।

অতঃপর সলীমকে আপনার বাযুতে ভর করিয়ে ভ্যান থেকে নামিয়ে বললেন— চলো! তোমাকে পৌছে দেই।

ঃ না, না! আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

মনসুর ইংরেজীতে বললেন— আমি তোমার সঙ্গে আছি। গত পরশু থেকে এ থানার চার্জে জয়েন্ট করেছি। তুমি এখানে জানলে কাল বা পরশু ডেকে পাঠাতাম।

সলীম যখন মোসাফাহা করছিল তখন ওর পা ঠকঠক করে কাঁপছিল।

মনসুর ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন— হিম্মত করো! গাদ্দারদের কূটজাল ক্রমশই গুটিয়ে আসছে। আচ্ছা, খোদা হাফেয। ড্রাইভার! চলো।

পুলিশী ভ্যান চলে গেল। সলীম ইতস্তত দাঁড়িয়ে। কম্পিত পায়ে ও দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল— ডাক্তার সাহেব! ডাক্তার সাহেব!!' আওয়াজ দিয়ে যাচ্ছে ও। কিন্তু সে আওয়াজে সাড়া দিচ্ছে না কেউ। ওর ভাবনা, ক্ষীণ এ আওয়াজ হেরেমে সুপ্ত মানুষের কানে যাওয়ার মত বলিষ্ঠ নয়। আবারো এক বুক আশা নিয়ে ছিটকিনিতে হাত লাগায় ও। পরক্ষণে মনে হয়, হয়ত কেউ বাড়ী নেই। গ্রামের বাড়ী গেছে হয়তবা। ওর দেহমন নিস্তেজ হয়ে আসছে। দু'হাতে মাথা চেপে দহ্লিজে বসে গেল। খানিক পর আরাম বোধ করলে আবারো দরজায় থাবড়ায়।

গলির অপর প্রান্ত থেকে কে যেন মাথা বের করে বলে— কে?

সলীমের কানে এই আওয়াজ বড় মিষ্টি মধুর। আওয়াজকারীর জিজ্ঞাসার তোয়াক্কা না করে ও বলে ওঠে— ডাঃ সাহেব?

প্রতিবেশী বলল— ডাক্তার সাহেব গ্রেফতার হয়েছেন।' সলীমের পাথর হওয়ার মত অবস্থা।

www.amarboi.org

প্রতিবেশী আবারো বলল— ভাই! বাড়ীর অন্য কারো কাছে জরুরত থাকলে কলিং বেল বাজাও! সলীমের মনে এতক্ষণ কলিং বেল-এর কথা স্মরণ আসেনি। মুহূর্তেই সুইচবোর্ডে হাত চলে যায়। পরক্ষণে দাঁড়ায় দরোজায় পিঠ করে। মিনিট খানেক পরে ভেতরে পরিচিত আওয়াজ হয়। আবারো বোতাম টিপ দেয়। লাইট জ্বালানোর পরে কারো আওয়াজ ওর মনকে আনন্দিত করে তোলে— কে?

সলীম ক্ষীণকণ্ঠে ডেকে বলে— আমি সলীম।

দরোজা খুলে রাহাত প্রশ্ন করে— ভাইজান! আপনি এ সময়?

জবাব না দিয়ে টলতে টলতে সলীম ভেতরে ঢোকে। দেউড়ির অপর প্রান্তে মা ও তাঁর পেছনে ইসমত দাঁড়িয়ে। আচমকা সলীমের ছদ্রীতে দাগ, পাজামায় রক্ত ও চেহারায় মারপিটের স্পট রাহাতের চোখে ধরা পড়ে। দ্রুত দরোজা বন্ধ করে ও। বলে— 'মা! উনি যখমী।

মা এসে ওর বাযু ধরে বলেন— বেটা! কি হয়েছে তোমার?

নির্মিলিত আঁখি মেলে সলীম বলল— পুলিশের খপ্পরে পড়েছিলাম।

ঃ চলো বেটা! অন্দরে চলো।

ঃ 'চলুন! আমি বিলকুল সুস্থ। এমনিই চক্কর দিয়েছিল মাথা।' সে সঙ্গে সলীম কপালে হাত রেখে গর্দান ঝুঁকাল। ইসমত যে এতক্ষণ নিথর দাঁড়িয়েছিল আচমকা সামনে এগুলো— আম্মি! উনি বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছেন।' বলে দ্রুত সলীমের বাযু মজবুতভাবে ধরল। সলীম যেন স্বপ্নঘোরে বলতে লাগল— আমি সুস্থ। আপনারা পেরেশান হবেন না। এমনিতেই চক্কর এসে গেছে। ওরা মাথায় লাঠিপেটা করেছে। ইসমত ও মা ওকে ভর করিয়ে অন্দরে নিয়ে যান। ও আগের মতই বলে যাচ্ছে— আপনারা ছেড়ে দিন। কষ্ট করতে হবে না। আমি বিলকুল সুস্থ।

ঃ 'বেটা! শুয়ে যাও এখানে!' মমতাময়ীর মমতাপূর্ণ স্নেহ ও আদেশ।

গর্দান উঁচিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে মুখ থুবড়ে বিছানায় পড়ে গেল সলীম। কম্পিত হাতে সলীমের ক্ষতে ওষুধ লাগাতে লাগল ইসমত। বলল— আম্মি! পুলিশরা ওকে নির্দয়ভাবে মেরেছে। ওরা বড় কসাই প্রকৃতির। দেখুন! বেতের দাগ। রাহাত! জলদি পানি গরম করো। মাথার ক্ষতে রক্ত জমে গেছে।

ইসমত ওর মাথায় গরম পানি ঢাললে সে মুহূর্তে চোখ খুলে তাকায় ও। মা অস্ফুটচিত্তে বলেন— কেমন লাগছে বেটা?

ঃ জ্বি। বিলকুল ভালো লাগছে।

ইসমত বলল— আম্মি! ওর কথা বলতে বড্ড তক্লীফ হচ্ছে।

মা মুচকি হেসে বললেন— বহুত আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব!

ইসমত পট্টি বেঁধে টেবিল থেকে গ্লাস উঠিয়ে বলল— নিন! এটুকু পান করুন।

সলীম গ্লাস হাতে নিল। ইতস্তত করে ওর দিকে তাকাতে লাগল। মা বললেন— উহু বেটা!

www.amarboi.org

ঃ 'সবটাই?' পেরেশান হয়ে বলে সলীম।

রাহাত বলল— এ ওষুধ নয়। গ্লুকোজ মিশ্রিত পানি।

মিঠা পানি পান করে সলীম আবারো ঠেস্ দিয়ে বসে বলল— ডাক্তার সাহেব কবে গ্রেফতার হয়েছেন?

মা বললেন— পুলিশ তাকে গত সন্ধ্যায় ধরে নিয়ে গেছে। তিনি পাড়ার ৫০০ লোককে নিয়ে মিছিলে বেরিয়েছিলেন। গ্রেফতার হয়েছে আমাদের নওকরও।

ঃ আমি আপনাকে বেশ তক্লীফ দিয়েছি। আপনি আরাম করুন।

ঃ খোদার শোকর বেটা, তুমি এ পর্যন্ত পৌছুতে পেরেছ। সব কথা তোমার থেকে সকালে শুনব। এখন তুমি আরাম করো।

ওপাশের কামরা থেকে ঘুম ঢুলুঢুলু নয়নে আমজাদ এল। বিছানায় সলীম ও মা-বোনকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল— কি হয়েছে ভাইজানের?

ঃ কিছু না! চলো আম্মাদের সঙ্গে। এখানে ওর ডিস্টার্ব করো না।

ঃ না, আম্মি। আগে বলুন! কি হয়েছে ভাইজানের?

ঃ 'এসো, বলছি।' মা ওর বাযু ধরে ওপাশের কামরায় নিয়ে যান।

রাহাত বলল— ভাইজান! এক্ষণে আপনার মাথায় ব্যথা নেই তো?

ঃ না। তুমি আরাম করো।

ইসমত রাহাতকে চোখ ইশারায় কি যেন বোঝাল। সে বলল— ভাইজান! আপনাকে জানিয়ে রাখি, আপত্তি না থাকলে তিনি আপনাকে একটা ইনজেকশন করবেন। ও পাশের কামরা থেকে মা বললেন— হ্যাঁ বেটি! অবশ্যই ইনজেকশন পুশ করো।

ঃ মেডিকেল বোর্ডের রায় মান্য করা ছাড়া আমার কোন গতি আছে কি?

বাবার ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ বের করে ইনজেকশনের সরঞ্জামাদি তৈরী করল। গরম পানি দিয়ে সিরিঞ্জ ধুলো। ওষুধ ভরল। সলীমের জামা উঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থান ম্যাসেজ করল। মা বললেন— বেটি! সাবধানতা অবলম্বন করো।

ইসমত ইতস্তত ও দ্বিধাজড়িত হয়ে অগ্রসর হল। ঠিক ওই বালিকার মত যে স্কুলে পরীক্ষার জন্য যায়। হৃদয়ে ওর কম্পন। ঠোঁটে ঠোঁট চিপে সুঁই ঢোকাল। রাহাত চোখ বন্ধ রাখল। ইনজেকশন লাগানোর পর রাহাত চোখ খুলল। ওর চোখ খুশীতে টলমল। দরোজার কাছে এসে মা বললেন— কি বেটি! ইনজেকশন পুশ করেছ কি?

ওর মুখ লজ্জায় টইটম্বুর। লজ্জামিশ্রিত কণ্ঠে বলল— জ্বি হ্যাঁ।

আমজাদ খাট থেকে উঠে চুপিচুপি অগ্রসর হল। ঠিক রাহাতের কাছে।

'আপা! কি হয়েছে তাঁর?

মা বললেন— দুষ্টু কোথাকার। আমি ভাবছি ও শুয়ে গেছে। চলো বেটি! যতক্ষণ এখানে থাকবে তুমি ততক্ষণ ও ঘুমাবে না।

www.amarboi.org

ও পাশের কামরায় গিয়ে ওরা কিছুক্ষণ কথা বলে ঘুমিয়ে গেল।

সলীম দীর্ঘক্ষণ জেগে রইল। কুদরত ওকে আশাতীতভাবে এখানে নিয়ে এসেছেন। এক্ষণে পুলিশের ডাণ্ডার কোন আফসোস নেই ওর। ইসমত ওর নিষ্পাপ হাতে ইনজেকশন দিয়েছে। এ যখম বড় অমূল্য। কানে আসছে মিষ্টিমধুর আওয়াজ। কম্পিত খুবছুরত হস্ত দু'খানি কল্পনায় ভাসছে। ওই দু'টি চোখ ভেসে ওঠে যা প্রেমে টালমাটাল। চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে গোলাপ, পাপড়িমাখা ঈষৎ মৃদুমন্দ লাজুক মুখখানি। দুধ-মধুমিশ্রিত গণ্ডের সুঘ্রাণ যেন মৌ মৌ করছে এখনও।

সকালে রাহাত টিপয়ে চা-নাশ্‌তা রেখে বলল— ভাইজান! চা-পান করুন! ডাক্তার সাহেবা এই আসছেন।

সলীম বলল— রাহাত! তোমার আপা ডাক্তারী শিখলেন কবে?

রাহাত ভেজানো দরজা ঠেলে বাইরে ঝুঁকে দেখল। তারপর মুচকি হেসে বলল— ভাইজান! আপনি জানেন না আপা এ শহরের নামকরা ডাক্তার। তিনি কাশি ও অর্শরোগ বিশেষজ্ঞ। কাশির বড়ি ফ্রী বিতরণ করেন। বস্তির গরীব ছেলে-মেয়েদের চোখে ওষুধও দেন।

আমজাদ অন্দরে দাখেল হয়ে বলল— ভাইজান! আপাজানের আইড্রপ আপনার চোখে লাগাবেন। তার থেকে কানের ঔষধ নিয়ে লাগিয়ে ভালো হইনি।

ইসমত লজ্জা ও দ্বিধামিশ্রিত হয়ে কামরায় প্রবেশ করল। আমজাদ ওকে দেখে বহিঃআঙ্গিনায় ছুটে পালাল। রাহাত ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি এনে বলল— ডাক্তার সাহেবা! মোবারক হোক, আপনার চিকিৎসা সফল।

ইসমতের চেহারা লাল হয়ে যায়। সলীমের দিকে তাকিয়ে বলল— কেমন লাগছে এখন?

ঃ বিলকুল ঠিক!' সলীম জবাব দেয়।

রাহাত বলল— আপনি এমন একজন স্পেশালিস্ট ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন অথচ ভাল হবেন না— এটা হয় কি?

ইসমত ঘুরে রাহাতের দিকে তাকাল। বলল— বড় মুখরা হয়ে গেছ দেখছি।

ঃ ডাক্তার হওয়া তো খারাপ কথা নয়।' সলীম বলল।

ঃ জ্বি না। ও কেবল ঠাট্টা করছে। ম্যাট্রিক-এর পরে ফার্স্ট এইড শিখেছি। অথচ ও আমাকে ডাক্তার বলা শুরু করেছে।

ঃ যা হোক। আমি শোকর আদায় করছি। একজন স্পেশালিষ্ট ডাক্তারের কাছেও হয়ত এমন চিকিৎসা আশা করতে পারি না আমি।

ঃ আব্বাজান, আমাকে কিছু ওষুধ-জ্ঞান শিখিয়েছেন।

ইসমতের মা কামরায় দাখেল হয়ে সলীমের পাশে বসে বললেন— এখন কেমন লাগছে বেটা?

www.amarboi.org

ঃ খুউব ভাল।

ঃ তুমি পুলিশের খপ্পরে পড়লে কি করে?

ইসমত ওর নিজের কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু মায়ের প্রশ্ন শুনে দরোজার ওপাশে কান পেতে দাঁড়াল। মা বললেন— বেটি! আমার পাশে বসো। সলীম সংক্ষেপে পুরো কাহিনী শুনিয়ে গেল।

ঃ বেটা! এ প্রশাসনের কার্যকাল কতদিন?

ঃ এটা আমাদের আন্দোলনের ওপর নির্ভরশীল। আমার ধারণামতে, যে স্পিরিট দেখাচ্ছে বর্তমানে অমৃতসরের জনগণ, তাতে এ প্রশাসন হয়ত দু'সপ্তাও টিকবে না।

ঃ আরশাদের আব্বারও এ মত ছিল।

তৃতীয় দিন সলীম ওখান থেকে এ অনুভূতি নিয়ে বিদায় হচ্ছিল যে, ইসমত ওর হৃদয়-মন জুড়ে রয়েছে। ওর সাথে কথা হয়েছে খুব কমই। তবে কথা কম হলেও মনের কথা যেন জানাজানি হয়ে গেছে। সলীম উপলব্ধি করেছে ইসমতের শব্দমালার আকুতি। চুপি চুপি দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখেছে ইসমত। ওর দৃষ্টি যেন বলেছিল, আমি তোমার। সেই অনাদিকাল ধরেই তুমি আমার। অনন্তকালের জন্য থাকবে।

ইসমতের মা একটা লেফাফা সলীমের হাতে দিয়ে বলেন, মাকে ছাড়া কাউকে দিও না। চিঠিটা পেয়ে সলীম মনে করল, এ চিঠিতেই ওর জীবনের রোমাঞ্চকর অনুভূতি গ্রথিত।

✪ ✪ ✪

ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রকের হিন্দু পৃষ্ঠপোষকদের ধারণা, পাঞ্জাবের মুসলমানরা আন্দোলন মুখর এবং এদেরকে পুলিশী ডাণ্ডার জোরে ঠাণ্ডা করে উত্তর-পশ্চিমে হিন্দু ফ্যাসিজমের আক্রমণ-পথ সহজসাধ্য করা যাবে অনায়াসেই। ওদের ধারণা, মুসলিম লীগ কোন ক্যাডারভিত্তিক সুশৃঙ্খল প্রোগ্রাম ছাড়াই আন্দোলন শুরু করেছে। সুতরাং যেভাবে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের জেলে পুরে ইংরেজরা কংগ্রেসী আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে সেভাবে খিজির হায়াতের পুতুল মন্ত্রক খাড়া করে লীগ নেতাদের জেলে পুরতে পারলে কিচ্ছা খতম। কিন্তু পরিস্থিতিকালে আঙ্গুল দিয়ে বলেছিল, রাজনৈতিক দল কিংবা নেতার মেলার নাম নয় এ মুসলিম লীগ।

খিজির হায়াত হিন্দুস্বার্থের বন্দুক কাঁধে তুলে মুসলিম আওয়ামের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিল। কিন্তু অচিরেই তিনি টের পেলেন, তাঁর চ্যালেঞ্জ বনাম লীগ ও পাঞ্জাবের ৯৯% মুসলমান একই মুদ্রা এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। সম্মিলিত আশঙ্কা ও সম্মিলিত প্রতিরোধ শক্তি সজাগ হয়েছিল আর গাদ্দার খচ্চর হায়াত যে কিনা হিন্দুস্বার্থে মন্ত্রী হয়েছিল— বুঝতে পারল, জাতির বিপক্ষে গিয়ে সে বোকার স্বর্গেই বাস করছে। পাকিস্তান-এর নারা যা বছরের পর বছর ধরে উচ্চকিত হয়নি, ওই ৩৪ দিনের চেষ্টা-কোশেশে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। আচমকা সবাইকে হতবাক করে কংগ্রেসের রথে

www.amarboi.org

চড়া খিজির হায়াত খান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিল। গভর্নর বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু হীনমন্য আগ্রাসী কংগ্রেস এ প্রস্তাবনাকে সহ্য করতে পারল না। যে প্রতারণা বুকের কোণে আগলে রেখে অতি সন্তর্পণে এগুচ্ছিল কংগ্রেস, শিকার হাতছাড়া হতে দেখে সেই প্রতারণাজাল ছিন্ন করে দিল।

হিন্দুস্তানের অনেক প্রদেশেই হিন্দু প্রশাসন এজন্য ছিল যে, হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুরা মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশেও এজন্য সরকার কায়েম করতে চেয়েছিল যে, ওই প্রদেশের কিছু হতভাগ্য মা জাতীয় গাদ্দার জন্ম দিয়েছিল। পাঞ্জাবে তাদের সরকার হাতছাড়া হতে দেখে চোট পেল। কেননা কংগ্রেসের কাছে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের সরকার হওয়া আর শস্য-শ্যামল পাঞ্জাব পাকিস্তান হওয়া সমান। পাঞ্জাবে তাই কংগ্রেস কূটচাল চালতে উদ্যোগ নিল। মুসলমানরা এখানেও অহিংস নীতির ধ্বজাধারীদের প্রকৃত রূপ দেখতে লাগল। সুচতুর কংগ্রেস তাদের প্রাচীন হাতিয়ার অকেজো দেখে নয়া চাল নিয়ে ময়দানে নামল। গান্ধীর আত্মা তারা সিং-এর সাথে কথা বলছিল— "হিন্দু ও শিখ ভায়েরা! তোমাদের অগ্নিপরীক্ষা আসন্ন। জাপানী ও নাৎসীদের মত নিপাত যেতে তৈরী হও। তোমাদের মাতৃভূমি খুনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা খুন সহকারে পিপাসা মেটাব। আমরা মোগল সাম্রাজ্যের যবনিকাপাত ঘটিয়েছি। পাকিস্তানকে দু'পায়ে দলব। আমরা বেঁচে থাকি কিংবা মরে যাই; পাঞ্জাবে মুসলিম সরকার মেনে নেব না কিছুতেই।'

ডাক্তার গোপিচাঁদ বলছিলেন— আমরা ওই সময় দলছুট হয়ে মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতায় আসতে পারিনি।

হিন্দু ও শিখ সংবাদমাধ্যমও যৌথ কণ্ঠে চিৎকার করছিল— আমরা এমন অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাই, যাতে পাঞ্জাবে মুসলিম সরকার কায়েম হতে না পারে। বাস্তবে সে পরিস্থিতি ওরা সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেস, শিখ ও সিংরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পাকিস্তান বিরোধিতার চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিল। মাস্টার তারা সিংকে পাকিস্তানের মোকাবেলায় এ ঐকমত্যের নেতা বানানো হল। তিনি পাঞ্জাব সংসদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিজের তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। গান্ধীর কথিত শান্তিকামী চেলা-চামুণ্ডারা বিহারের পট পুনঃস্থাপনে আশাবাদী ছিল। কিন্তু এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। কেননা মাস্টার তারা সিং এই ওয়াদা পুরা করতে পারলেন না যে, শিখরা মুসলমানদেরকে পাঞ্জাব ছাড়া করে দম নেবে। মাস্টার তারা সিং সুরমা তীর পর্যন্ত অগ্রসর না হয়ে দম নেবেন না বলে ওয়াদা করে ময়দানে নেমেছিলেন। কিন্তু ভারত মাতার সন্তানরা তো ভেবে অবাক যে, পাঞ্জাব ও অমৃতসরের হিন্দুদের তলোয়ার মুসলমানরা ছিনিয়ে নিচ্ছে। রাওয়ালপিণ্ডি ও মুলতানের মত প্রদেশেও এদের ফল ভালো হল না।

শিখদের বড় অভিযানক্ষেত্র অমৃতসর। অমৃতসরের গুরুদুয়ারা এবং মন্দিরগুলো ফৌজের অস্ত্রগুদাম ছিল, যা পাঞ্জাবের পাকিস্তান আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কালী ও দুর্গার পূজার স্থলে মন্দিরে মন্দিরে বারুদের স্তূপ বানিয়ে

www.amarboi.org

হতভাগ্য জাতির দোকান, বাড়ীঘর ও বধূ-মাতাদের কতল করার প্লান চলল। অমৃতসরের মুসলমানরা আচমকা এ সরকারী মুসলিম নিধনে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। শিখরা বালুর বস্তায় গুলির মহড়া চালাল। বাচ্চা ও নারীদের প্রতি তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করল। কিন্তু দুঃসাহসিক মুসলিম যুবকরা ময়দানে নামলে লাহোর ও অন্যান্য শহরের মত এখানে এ বাস্তবতাটি চোখে পড়ল যে, বর্বরতা ও কাপুরুষতা একই কুকর্মের দু'টি ভিন্ন নাম।

পাঞ্জাবের মুসলমানগণ খামোশ থেকে মুসলিম ঘরদোর জ্বালানোর সুযোগ দিল না ওদের। তারা ওই কৃপাণগুলো ছিনিয়ে নেয়ার কোশেশ করল যেগুলো রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশায় কোষমুক্ত করা হয়েছিল। এ জন্যই কংগ্রেসের দৃষ্টিতে তারা সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত হল। এরাই আকালী, সেবাদল ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের হাত থেকে জাতির বধূ-মাতাদের রক্ষা করল। এটাই হোল তাদের সাম্প্রদায়িকতার দলীল। তাদের প্রতিরোধ শক্তি কংগ্রেসের এ ভুল ধরে দিল যে, তারা শিখদের শক্তির ভিত্তিতে পাঞ্জাবকে অখণ্ড ভারতের পতাকাতলে শামিল করতে চায়। যে কংগ্রেস ভারত বিভক্তিকে নিজেদের শরীর কেটে দু'টুকরো করার মত মনে করত, তারাই এক্ষণে পাঞ্জাব বিভক্তির প্রস্তাব দিল। শুধু কি তাই, ওরা আসাম ও বাংলা বিভক্তিরও প্রস্তাব রাখল। এ বিভক্তির জন্য তারা যুক্তি দেখিয়ে বলল, পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলমান বা হিন্দুরাও পাকিস্তানের সঙ্গে মিশতে চাইছে না। কাজেই হিন্দু ও অপরাপর সংখ্যালঘু মানুষের জান-মাল-ইয্যত রক্ষার্থে বিভক্তি ছাড়া গতি নেই।

হিন্দুস্তানের নয়া ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন-এর কাছে কংগ্রেসের এ প্রস্তাব মনঃপূত হল। সুতরাং ৩রা জুনের ঘোষণা মোতাবেক ওই প্রদেশগুলো ভাগ করে দেয়া হল। আসামের সিলেট জেলা, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জন্য রেফারেন্ডাম প্রস্তাবনা আনা হল।

✪ ✪ ✪

একথা বলা ভুল হবে যে, পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্তি সন্ত্রাস ও দাঙ্গার ফসল। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও হিন্দুস্তানের অপরাপর প্রদেশেও দাঙ্গা হয়েছিল। আর ওই সব প্রদেশে এমন এলাকা ছিল যেটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দুদের সংখ্যাগুরু মুসলিমের থেকে ভয় থাকলে ; বিহার, ইউ,পি ও অন্যান্য এলাকার মুসলমানদেরও হিন্দুদের থেকে ভয় কোন অংশেই আশংকা কম ছিল না। যদি পাঞ্জাব ও বাংলার দু'কোটি অমুসলিমকে পাকিস্তানের বিশাল এলাকায় খণ্ড করে দেয়া যায়, তো গোটা হিন্দুস্তানের চারকোটি মুসলমানও কিছু অংশের দাবী করতে পারে।

জনবসতির দৃষ্টিকোণে হিন্দুস্তান ভাগ হলে ১০ কোটি মুসলমান এক-চতুর্থাংশের মালিক। পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের প্রশ্নই আসে না। বরং ইউপি, আসাম ও বিহারের কিছু এলাকা পাকিস্তানে শামিল হওয়ার কথা। দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের একটা প্রদেশ হতে পারত। কিন্তু সেটা হল না। ইংরেজ ও কংগ্রেসের দ্বৈত ষড়যন্ত্রে এমনটা

www.amarboi.org

সূর্যের মুখ দেখল না। পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্তি মুসলমানদের প্রতি চরম বে-ইনসাফী। এই বে-ইনসাফীর তারা মোকাবেলা করতে পারত না। কুদরত তাদেরকে এ শিক্ষা দিতে চাচ্ছিলেন যে, যে কওম বেইনসাফী ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে সাহস করে লড়তে জানে না কিংবা হিম্মত রাখে না, তারা সৎ ও ন্যায় ব্যবহার পাওয়ার অযোগ্য। মুসলমান স্বাধীনতার শ্লোগানে উদগ্রীব। তারা বাঁচলে বাঁচার মত সংগ্রামের শপথ নিয়েছিল। তাদের নেতারা পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরছিলেন, নারা লাগাচ্ছিলেন, বক্তব্য রাখছিলেন। তাঁরা অনুধাবন করছিলেন, পাকিস্তান ইংরেজ, কংগ্রেস ও তাদের মাঝে এক মানতেকী মারপ্যাঁচ। এ প্যাঁচ ঘুচে গেলে পাকিস্তানের পথের তামাম বাধা অপসারিত হবে। কিন্তু একথা বোঝবার মানুষ ওই সময় খুবই কম ছিল যে, মানতেকী মারপ্যাঁচ ঘোচাতে অনেক সময় কলম ও মুখের চেয়ে তরবারীর অগ্রভাগ কাজে লাগে অধিক।

মুসলিম লীগ পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্তি মানতে বাধ্য হল। কিন্তু এর কারণ স্রেফ এই ছিল যে, এ অমানবিক ফয়সালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপসর্গ। মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা দুর্ভাগ্যবশত তখনও কাঠের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসেছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিকরা দেড়শ বছর পূর্বে হিন্দুস্তানের রাজা-নবাবদের থেকে ব্যবসার বদৌলতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। এক্ষণে গাট্টি-বোচকা বাঁধা এ ক্ষয়িষ্ণু শাসনকে করায়ত্তের সওদা করছিল হিন্দু মাড়োয়ারীরা। ফিরিঙ্গি ডাক্তার কোন রাজা কিংবা নবাবের এলাজ করার পর তার রাজ্যে ইংরেজদের ব্যবসায়িক স্বার্থ জিইয়ে রাখার কোশেশ চালাত। মাউন্টব্যাটেন সে সার্জন যিনি ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং হিন্দু মহাজনের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করার জন্য মুসলমানের শাহ্‌রগে ছুরি চালিয়েছিলেন। মুসলিম লীগের চোখও বন্ধ ছিল না। তারা ওই ছোরা দেখছিলেন কিন্তু তাদের কাছে সে হাত ছিল না, যা মাউন্টব্যাটেনের হাতের ছুরি ছুঁড়ে মারতে পারে। মুসলিম লীগের বাধ্য-বাধকতা ছিল ওই ছুরির ধকল সইতে— কিন্তু সে ধকলের গভীরতা যে এতটা মারাত্মক হবে, তা মাউন্টব্যাটেন ও হিন্দু মহাজন ছাড়া আর কেউই জানত না। আর মাউন্ট ব্যাটেনের বেইনসাফীর পর র‍্যাডক্লিফের নিষ্ঠুরতা মানবেতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

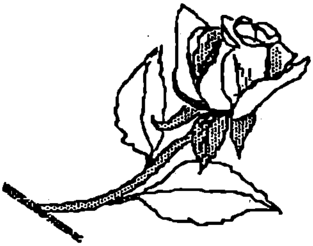

www.amarboi.org

তৃতীয় খণ্ড

লাল রেখা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

৩

কাঠফাটা রোদ্দুর।

কামরায় বসে বইয়ের পৃষ্ঠায় চোখ বুলাচ্ছিল সলীম।

ইউসুফ হন্তদন্ত হয়ে অন্দরে প্রবেশ করে বলল— ভাইজান! ভাইজান! আম্মিজান এসে গেছেন।' সলীমকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ইউসুফ যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেল।

উঠানে দাঁড়িয়ে শোরগোল করে বলল— আপা ছোগরা! যুবায়দা! চাচীজান! আম্মিজান এসে গেছেন।

সলীমের মনে শিহরণের দোলা লাগল। আম্মিজানই এ ঘরে ওর কাছে সবচেয়ে আপনজন। অপেক্ষার পাত্র। যুবায়দা ও চাচাত বোনেরাও শোরগোল করতে লাগল এবং অবশেষে বৈঠকখানায় প্রবেশ করল।

যুবায়দা বলল— ভাইজান! আম্মিজান আসছেন।

ছোগরা বলল— ভাইজান! মোবারকবাদ।

অন্যান্য যুবতীরাও শোরগোল করে বললেন— ভাইজান মোবারকবাদ!

আফজালের বিবি ভেতরে ঢুকে বললেন— কি হে! তোমরা চেঁচামেচি করছ কেন?

ঃ চাচীজান! আম্মা আসছেন।

জনৈকা যুবতী দেউড়িতে ঝুঁকে বলল— চাচী! ওইতো উনি আসছেন। সালাম চাচীজান।

বাড়ীর মহিলারা দেউড়িতে সলীমের মাকে ঘিরে নিল।

সলীম আবারো বইয়ের পাতায় ডুবে গেল। অবশ্য দিলমন দেউড়িতে নিবদ্ধ। মহিলারা সলীমের মাকে মোবারকবাদ দিতে লাগল। আফজালের বিবি বললেন— 'বোন! ভেতরে চল। এখানে বেশ গরম। এ তোমরা রাস্তা ছেড়ে দাও। ছোগরা! চাচীর জন্য শরবত বানাও!

সলীমকে বৈঠকখানায় দেখে মা সেখানে ঢুকলেন। সলীম উঠে দাঁড়াল। তিনি মুচকি হাসি লুকানোর কোশেশ করলেন। তার গাল ও কান রক্তিম। এবার মা-ছেলেকে মোবারকবাদ দেয়া হল। চেয়ারে উপবেশন করলেন মা। সলীম ইতস্তত দাঁড়িয়ে। মা'র চেহারায় খুশীর ঝিলিক। সে খুশী এক সময় হাসিতে রূপ নিল। সলীম লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। বাইরে বেরোনের আশায় সলীম দরোজায় দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু মা বললেন— দাঁড়াও বেটা!' চাচী ওকে জোর করে চেয়ারে বসালেন।

যুবায়দা বলল— আম্মিজান! আব্বা ও দাদীজান আসেননি?

ইউসুফ বলল— দাদীজান পথিমধ্যে চাচা নুর মোহাম্মদের বাড়ী রয়ে গেছেন। আর দাদাজান মসজিদে।

www.amarboi.org

আফজালের বিবি বললেন— বোন! আগে বলো, সলীমের দাদীর মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি-না?

ঃ সলীমের দাদীকে কিছু জিজ্ঞেস করো না বোন। তিনিতো মেয়ে দেখেই বলা শুরু করলেন, মেয়েকে আমি এ সপ্তাহেই উঠিয়ে নিয়ে যাব। ওই দিন তিনি মেয়েকে এক মিনিটের জন্যও চোখের আড়ালে যেতে দেননি। তিনি যে কামরায় ছিলেন মেয়েকেও সেখানে রাখতেন। তিনি ঘুমাতেন তো মেয়ে তাঁকে পাখার বাতাস দিত। মেয়ে খানা খেলে তিনি পাশে বসে বলতেন— বেটি! তুমি দেখছি খানা কেবল নড়াচড়াই করছ!

কখনও বা ওর মাকে বলতেন— ওকে বেশী করে দুধ খাওয়াও। একবার তিনি ইসমতকে বলতে লাগেন— বেটি! খানিক বই পড়িয়ে শোনাও। তোমার আওয়াজ বেজায় মিষ্টি। গত রাতে ওর বোন দুষ্টুমি করে তাঁর কানে কানে বলে— ইসমতের মাথা ব্যথা করছে। এরপর সলীমের চাচী লংকা কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন। মেয়েটা বলছিল— আমি বিলকুল সুস্থ। মাথায় এতটুকু ব্যথা নেই। বাড়ীর মানুষও হাসছিল। যতক্ষণ ওর মাথায় বাদাম তেলের মালিশ না করেন ততক্ষণ ক্ষান্ত হন না।

ঃ ওর মা বড় আনন্দিত হয়েছেন— তাই নয় কি?' বলল চাচী।

ঃ তিনি যেমন আনন্দিত তেমনি পেরেশানও। তিনি বলছিলেন, দু'সপ্তাহের মধ্যেই মেয়ের বিয়ে। এত তাড়াতাড়ি বিয়ের তারিখ শুনে মেয়ে পক্ষের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা।

আফজালের বৌ বললেন— তা এখন কি সিদ্ধান্ত?

ঃ পাকিস্তান-এর ফয়সালা হওয়া মাত্রই মেয়ের বাবা সলীমের বাবার সাথে সাক্ষাত করে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলবেন। চাচীজান মুচকি হেসে সলীমের দিকে তাকিয়ে বললেন— বোন! সলীম বলত, ছেলে-মেয়ের পছন্দ-অপছন্দের কথা না জেনে বিয়ে ঠিক করা অনৈতিক। কাজেই ওকে একটু জিজ্ঞেস করে...!

মা বললেন— পথিমধ্যে ওর দাদীকে সে কথা বলছিলাম! কিন্তু গরম তেলে বেগুন পড়ার মত তেঁতে উঠলেন তিনি। আমার চুল ছিঁড়ে নিতে উদ্যোগী হন তিনি।

বললাম— আম্মা! আমার ভয় করে, সলীম না আবার এই বিয়েতে অমত করে বসে। শুনলাম লাহোরস্থ এক মেমকে সে পসন্দ করেছে। তিনি বললেন— জুতিয়ে ওর পিঠের ছাল তুলে নেব। আবারো বললাম— আমেনারও খায়েশ, মেম -এর সাথেই বিয়ে হোক ওর। তিনি পূর্বাপেক্ষা আরো ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন— হতভাগীকে বাড়ী গিয়েই চিঠিতে জানিয়ে দেব, এখানে যেন না আসে আর।

গোলাম হায়দারের বিবি বললেন— তিনি আসা মাত্রই বলব— সলীম বৌ পছন্দ করেনি। দেখবেন কাণ্ডটাই না কি দাঁড়ায়। কিন্তু এক শর্তে, তোমরা কেউ হাসতে পারবে না। সলীম! তুমিও খানিক খামোশ থেকো। এসো বোন! আমরা দালানে গিয়ে বসি।

দাদী বাড়ীতে প্রবেশ করলে নারী মহলে কানাকানি শুরু হল। তিনি বাড়ীতে পা রেখেই বললেন— বেটি! ময়রাকে খবর দাও! গ্রামের বাড়ী বাড়ী মিষ্টি পাঠানোর ব্যবস্থা করো। সাঈদা! বেটি তুমি ওঠো! ও বড় দুর্বল।

www.amarboi.org

ঃ বাগদান করে আসলেন কি আম্মা?' প্রশ্ন সাঈদার (গোলাম হায়দারের বিবির)।

এ প্রশ্নের জবাবে সলীমের মার দিকে হতবাক হয়ে তাকান দাদী। সলীমের মা মুখ কালো করলেন। অন্যান্য মহিলাদের অবস্থাও তথৈবচ। দাদী বলেন আশাহত কণ্ঠে- সলীমের মা! তুমি কিছু বলোনি?

আফজালের বৌ শরবতের গ্লাস পেশ করে বলেন— আম্মা! সলীম এ বিয়েতে নারাজী যাহির করেছে। শরবতের গ্লাস ফেলে দিলেন তিনি। চিৎকার দিয়ে বললেন— হায় হায়! একি শুনতে হচ্ছে! তোর যবানে কিড়া পড়ুক।

ছোগরা হাসতে হাসতে বলল— দাদীজান! সলীম লাহোরস্থ জনৈকা তন্বী স্মার্ট মেম সাহেবকে পছন্দ করেছেন।

এক মুহূর্ত খামোশ থাকলেন দাদী। ফের আচমকা দাঁড়িয়ে বললেন— 'বেঈমানটা কৈ?

আফজালের বৌ বললেন— আম্মা! শান্ত হয়ে তাকে বোঝান। সবখানেই রাগ করা চলে না।

ঃ উহু! গোস্বা ঠিক নয়। জুতিয়ে ওর গায়ের চামড়া ছিলে নেব। মেট্রিকের সময় বলেছিলাম, বেঈমানটার গলায় মেয়ে একটা ঝুলাও। কিন্তু কে শোনে আমার কথা। সকলেই তখন বলেছিল, ওকে বিলেতে পড়তে হবে। ওর দাদা বলেছিল, আলী আকবর বি, আই করে নষ্ট হয়নি তো সলীম হবে কেন! শেষ পর্যন্ত ওকে লাহোর পাঠানো হয়। পাজিটা কৈ?

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে দাদী সকলকেই নিন্দা-মন্দ বলতে লাগল এবং সলীমকে তালাশ করতে লাগল।

ছোগরা বলল— দাদীজান! ভাইজান বৈঠকখানায়।

খানিক পর।

মহিলারা বৈঠকখানার বাইরে হো হো করে হাসতে লাগল। দাদী বলছিলেন— কি বলেছ বেঈমান! কি শুনলাম হতচ্ছাড়া! মেম আনবে আমার ঘরে? মুখে এতটুকু আটকালো না!

সলীম হাসছে দাদীজান...!

ঃ না, না! আমি কারো দাদী না।

ঃ দাদীজান! কোন্ মেমের কথা বলছেন আপনি?

ঃ তোমার যাবতীয় প্লান আমার নখদর্পণে। এ জন্যই বুঝি নিত্য-নতুন স্যুটকেস কেনা?

আফজাল বৈঠকখানায় প্রবেশ করে বললেন— কি হয়েছে?'

ঃ ভাতিজার কাছেই জিজ্ঞেস করে দেখো। বলল দাদী।

ঃ দাদীজান! আপনার সাথে ঠাট্টার মহড়া চলছে।

ঃ মিথ্যে কথা! কেন তুমি বলোনি, এ বিয়েতে মত নেই তোমার?

ঃ কসম খোদার! দাদীজান, ওরা আপনাকে টালিয়ে নিচ্ছে।

আফজাল পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

www.amarboi.org

ঃ কি হল ভাবী?' তিনি সলীমের মাকে প্রশ্ন করেন।

ঃ কিছু না। সলীমের দাদী মাইল তিনেক পথ পায়ে হেঁটে এসেছেন। বহুত পেরেশান তাই।

সলীমের দাদী ঝড়ের বেগে প্রবেশ করে বললেন— দাঁড়া বদমাশগুলো। দেখাচ্ছি মজা! ছোগরা হাসিতে লুটোপুটি খায়। দাদী ওর বেনীবদ্ধ চুল ধরে পেটানো শুরু করেন। সলীম তাকে সমর্থন দিতে গিয়ে বলে— আরেক পিস লাগান দাদী। বড্ড দুষ্টু ও। এক সময় দাদীর হাত অবশ হয়ে এল, কিন্তু ছোগরার হাসিতে কোন ছেদ পড়ল না।

✪ ✪ ✪

মহিন্দর সিং-এর জনপদে শান্তি কমিটির মিটিং। আম বাগানের তলে বসেছিল হিন্দু শিখদের বৈঠক। শেঠ রামলাল নিজের বক্তব্যকে শ্রোতার মনে ঝংকার তোলার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে সাজাল। বলল— ভগবানকে ধন্যবাদ। বিগত চার-পাঁচ মাস ধরে পাঞ্জাবের যত্রতত্র হিন্দু, মুসলিম, শিখদের রক্ত নিয়ে হোলিখেলা হলেও আমাদের অঞ্চলে কোন রক্তপাত ঘটেনি। আমরা পরস্পরে ছিলাম ভাই। অত্র এলাকার প্রভাবশালীদের মধ্যে চৌধুরী রহমত আলী ও বাবু অন্দর সিংয়ের প্রশংসা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ দু'নেতা এলাকায় ঘোরাফেরা করে শান্তির বাণী প্রচার করেন। আফজাল ভাই ও শের সিং যে মহান কাজ করেছেন তাও কারো কাছে অজানা নেই। লোকেরা এ এলাকায় এসে ফিতনা-ফাসাদ করার চেষ্টা করে, কিন্তু একমাত্র ওদের কর্মতৎপরতায় কেউই মাথা তুলে তাকানোর সাহস পায়নি। আজ হিন্দু-শিখ ও মুসলিম বোনেরা পর্যন্ত আযাদীর শ্লোগানে মুখরিত, কিন্তু ওদের দিকে কেউ চোখ তুলেও তাকাতে সাহস করে না। এটা ভাই আফজাল ও শের সিংয়ের কর্মতৎপরতার অপার কারিশমা মাত্র।

ভায়েরা আমার! বুড়োদের তুলনায় জোয়ানদের জোশ জোরালো। কিন্তু শোকর ভগবানের, আমাদের এলাকায় সলীম ও মহিন্দরের মত শিক্ষিত জোয়ান রয়েছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওরা শান্তি কমিটি উপহার দিয়েছে গ্রামবাসীকে। নিছক ওদের মেহনতের বদৌলতে আমরা ভাই ভাই হয়ে থাকতে পারছি। আমাদের জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সীমা নির্ধারণের প্রকাশ্য ঘোষণা আসেনি এখনও। কিন্তু এ অঙ্গীকার করেছি ইতোমধ্যে যে, সীমা নির্ধারণী কমিশন যাই করুক না কেন, অত্র এলাকার কোন প্রকার সন্ত্রাস হতে দেব না। চৌধুরী রহমত আলী ও তার ছেলে-নাতিরা শিখদের জান-মাল হেফাযতের যিম্মা নিয়েছে। আমরা এতে খুশী। তারা কোরান ছুঁয়ে শপথ করে বলেছে যে, ওরা আমাদের ওপর কোন প্রকার যুলুম ও বে-ইনসাফী করবে না। আমরাও মুসলমান ভাইদের অঙ্গীকারের প্রতি যথাসাধ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব। আপনারা জানেন, গুরুদাসপুর জেলায় হিন্দুদের কোনই শক্তি নেই। এতদসত্ত্বেও গো-মাতার গতর ছুঁয়ে শপথ করে বলছি, আমাদের থেকে কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাবে না।

শিখদের পক্ষ থেকে চরণ সিং ও অন্দর সিং শপথ করে বলল— আমরা গৌরগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ করা জন্য প্রস্তুত।

www.amarboi.org

অতঃপর শেঠ রামলালের ঘর থেকে একটা খুবছুরত গাভী ও একখানা গ্রন্থ আনা হল। বলতে গেলে জনপদের টিকিধারী গোটা শিখরা ওটা ছুঁয়ে শপথ করল।

শেষ পর্যন্ত চৌধুরী রহমত আলী— যার ভ্রু পর্যন্ত সাদা হয়েছে উঠে দাঁড়ালেন। বলল–ভাইয়েরা! কণ্ঠ তাঁর খুবই ক্ষীণ। 'যেদিন ভাইসরয় গুরুদাসপুর জেলাকে পাকিস্তানের মধ্যে ফেলেছেন সেদিনই বলেছিলাম, শিখ, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ইয্যত-আবরুর দায়িত্ব মুসলমানদের। এরপর পীর আব্দুল গফুর এবং মৌলভী মুহসেন আলীর সাথে বাড়ী বাড়ী গিয়েছি, মুসলমানদের বুঝিয়েছি। ইসলামে অত্যাচারের কোনই স্বীকৃতি নেই। উগ্র ভাইদের থেকে শিখ হিন্দুদের প্রতি হামলার আশংকা ছিল। ওরা পর্যন্ত মসজিদে দাঁড়িয়ে সংযম প্রদর্শনের হলফ করেছে। এটা আমাদের দায়িত্ব। ভায়েরা! পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা বাঘ-বকরীতে রূপান্তরিত। শতাব্দীকাল ধরে আমরা একে অপরের প্রতিবেশী। অপরের দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি। শৈশবে ওই বৃক্ষে আমরা দোল খেয়েছি, আমাদের বাপ-দাদারা লাগিয়েছিলেন যা।

আমাদের মাঝে গৃহযুদ্ধ লাগতে যাবে কেন? সেই ঘরে কেন আগুন লাগাতে যাব, এক একটা ইট যাতে গেঁথেছি আমরা? যে জমিতে কঠোর পরিশ্রম করে আমরা গম লাগিয়েছি— আজ যেমনি করে তা আমাদের রুটি দেবে তেমনি দেবে কালও। আমাদের মহান উত্তরসূরীরা যে বিরান যমীনকে শস্য-শ্যামল ও লকলকিয়ে ওঠা ক্ষেতে রূপান্তরিত করেছেন— বড়ই পবিত্র সে যমীন। এর ঘামে পাই মেশকের সুঘ্রাণ। এ জমিতেই কোদাল কোপালে তাদের হাড্ডি পাবে। এ দেশ শতাব্দীকাল ধরে আমাদেরকে ফল মূল ও ফসল দিয়েছে। এখানে মাসুম লোকের রক্ত ঝরতে দেব না আমরা কিছুতেই।

ভায়েরা আমার! তোমাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, কোন মুসলমান যদি শিখ-হিন্দুদের ঘরদোর জ্বলার হাত থেকে রক্ষা করতে না পারে, তাহলে আমার বুকের তাজা খুনের ফোঁটায় নেভাব সে আগুন। হিন্দু-শিখ ভাইদের মনোতুষ্টির জন্য একথা বলছি না, বরং মুসলিম চরিত্রের উদার দিকটা তুলে ধরছি মাত্র। এ জেলা পাকিস্তানে পড়েছে, কাজেই অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জানমাল হেফাযত আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।

✪ ✪ ✪

সলীম ও মহিন্দর ওই মিটিং-এ উপস্থিত ছিল। জনপদের আরো কিছু সুশিক্ষিত যুবক ওখানে উপস্থিত ছিল। মিটিং শেষ হলে কন্দন লাল সলীমকে বলল— ভাই! রেডিও'র খবরের সময় আসন্ন। শুনতে চাইলে হল।

মহিন্দর বলল— হল সলীম! বলনাথ সিং-ও আসবে।

ঃ হল।

সলীম, মহিন্দর ও শিক্ষিত চার যুবক কন্দন লালের বৈঠক খানার উদ্দেশে বেরোল।

খবর শোনার পর মহিন্দর সিং-এর সাথে সলীম বলনাথ সিং-এর সাক্ষাত করতে চাচ্ছিল। কিন্তু কন্দন লাল বলল— না, না, বসুন! বলনাথকে না হয় এখানেই ডেকে পাঠাচ্ছি। নওকরকে আম আনতে পাঠিয়েছি।

www.amarboi.org

ঃ না! বাড়ীতে আমার তাড়া আছে, বলে উঠে দাঁড়ায় সলীম। পরে আবার দোস্তদের অনুরোধে বসে পড়ে। কন্দন লাল এক বালককে ডেকে বলে— স্বরূপ! যাও ক্যাপ্টেন সাহেবকে ডেকে আনো। জনৈক জোয়ান সলীমকে প্রশ্ন করে— সীমা নির্ধারণী কমিশনের ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ঃ ফয়সালা দেয়ার পূর্বে কি রায় দেব?

ঃ আন্দাজ করেও তো অনেক কথা বলা যায়। অনেকের ধারণা, কমিশন ৩ জুনের রায়ের কোন পরিবর্তন আনবে না।' বলেন কন্দন লাল।

ঃ আমার মনে হয় সেটা সম্ভব নয়। সাময়িক বিভক্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক এলাকাই ভারতের ভাগে ফেলা হয়েছে। আমার মতে চূড়ান্ত বিভক্তির পূর্বে আরো এমন অসম বিভক্তি চলতেই থাকবে। যেমন— অমৃতসরের আজনালা জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। এখানে হিন্দু-মুসলিম বসতির হার যথাক্রমে ৮ ও ১৪। অমুসলিম এলাকায় অচ্ছুত ও খ্রিস্টানও রয়েছে। এরপর বসওয়াহা, জলন্ধর, হুঁশিয়ারপুর, নেকুদর, ফিরোজপুর ও বেজিরায়ও মুসলিম বেশী। এসব এলাকা পাকিস্তান সংলগ্ন।

বলনাথ সিং শরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে বৈঠকে প্রবেশ করলো। সলীমও ওর সঙ্গীদের সাথে মোসাফাহা করে চেয়ার পেতে বসল। মহিন্দরের অনুভূতি, মদের উৎকট গন্ধ সলীমকে তকলীফ দিচ্ছে।

কিছুক্ষণের জন্য আলোচনার পট পরিবর্তন হল। বলনাথ সিং বলল, কাশ্মীরের রাজা পোলো খেলার জন্য তাকে একটি ভালো জাতের ঘোড়া উপহার দিয়েছে। বলনাথ এজন্য খুব চটে আছে যে, সলীম গত বছর শ্রীনগর এসেও ওর সাথে সাক্ষাত করেনি। সলীম অপারগতা প্রকাশপূর্বক বলল— ভাই! আমি দিন-তিনেক শ্রীনগর ও গুলমার্গ ছিলাম, ওখান থেকে পরে পলগাম চলে যাই। হ্যাঁ ভাই! ক্যাপ্টেন হওয়ার জন্য তোমাকে মোবারকবাদ জানাই।

ঃ আরে কি আর আহামরি কাজ এটা! আমার সহকর্মীদের যারা ইন্ডিয়ান আর্মীতে ভর্তি হয়েছিল, তারা মেজর কিংবা কর্নেল হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। কাশ্মীর আর্মিতে যে সব অফিসার ডাকা হয়েছিল, সকলেরই পদোন্নতি হয়েছে। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, কাশ্মীর নিয়ে কিছু হলে আমাদের ভাগ্য বদলাবে। কিন্তু ওখানে কেউ মাথা তুলে তাকানোর সাহস পায় না, আমরাও কোন বাহাদুরী দেখাতে পারি না। কিন্তু ওখানকার আওয়াম ও পরিবেশে আন্দোলনের দোলা লেগেছে। মনে হচ্ছে, কাশ্মীর নিয়ে কিছু একটা হবে। আমার আশংকা, আমাদের রেজিমেন্ট ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য ওই আশংকার ঘোর কাটছে ক্রমশ। মহারাজা ফৌজ বৃদ্ধির স্থলে শিখদের তলব করেছেন।

কন্দন লাল প্রশ্ন করল— আপনার ধারণায় তাহলে কাশ্মীরে বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে?

ঃ ওখানে বিদ্রোহের কি আছে! তবে পাকিস্তানের নাম শুনে কিছু লোক বে-চাইন হয়ে গেছে। ওদের স্পৃহা-উৎসাহ আমরা দু'ঘন্টার ব্যবধানেই ঠাণ্ডা করে দিতে পারব। মোটকথা, পাকিস্তান হবার পর মহারাজা ফৌজের গুরুত্ব অনুধাবন করছেন।

www.amarboi.org

মহিন্দর সিং সলীমের মুখের রং-পরিবর্তন দেখে আলোচনার মোড় ঘোরানোর প্রয়োজন বোধ করল। বলল— দাদা! আমরা বাউন্ডারী কমিশনের বিষয়ে আলাপ করছিলাম।

বলনাথ সিং অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল— বাউণ্ডারী কমিশনের সিদ্ধান্ত আমাদের জানা আছে।

ঃ হ্যাঁ, ভাই সলীম! আপনি বলছিলেন, আজনালা, হুশিয়ারপুর, দেশওয়াহা, জলন্ধর, নেকুদর, যেরা ও ফিরোজপুর সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে পাকিস্তানের অংশে পড়বে। সে হিসাবে আমাদের পাঠানকোট জেলা হিন্দু আবাদী হওয়ায় ভারতে পড়া দরকার।

ঃ আমার মতে লুধিয়ানার মত মুসলিম আবাদী যা ভারতে পড়েছে তাকে পাঠানকোটের বিনিময় বদল করা যায়। এমনটা না হলেও পাকিস্তানের ৮/১০টা শস্য শ্যামল জেলার বিনিময়ে বিরান একটা অঞ্চল ছেড়ে দিতে তেমন একটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না।' বলল সলীম।

ঃ নক্‌শা থাকলে আমি মন্তব্য করতে পারতাম।' বলল বলনাথ সিং।

ঃ নক্‌শা আপনার পেছনে দেয়ালে লটকানো।' বলল কন্দন লাল।

বলনাথ সিং বললেন— ভাই সলীম! হাতে পেন্সিল নাও। নিশানা করে বলো! অতঃপর আমিও তোমাকে বলব।

কন্দন লাল ড্রয়ার থেকে চোখা কাঠ পেন্সিল বের করে সলীমের হাতে দিল। নক্‌শার পাশে দাঁড়িয়ে ও বলল— আমার মতে, পাক-ভারতের প্রাকৃতিক সীমা হচ্ছে শীতলক্ষ্যা তথা গঙ্গা। ওই হিসাবে হুশিয়ারপুরের মত হিন্দু সংখ্যাগুরু দু'পরগনা পাকিস্তানের অংশে পড়ে। কিন্তু এর বিনিময়ে শীতলক্ষ্যা পাড়ের মুসলিম আবাদীগুলো ভারতের অংশে ফেলা যেতে পারে। রয়ে গেল অমৃতসরের কথা। ওখানকার আজনালা সম্পর্কে আমার মত, ওটা মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা। আর অন্যান্য জেলা শিখ সংখ্যাগুরু। গুরুনানকের এলাকা হিসাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এজন্য আজনালা ছাড়া বাদ বাকীটা ফিরোজপুরের সাথে মিলে যেতে পারে। ওই অবস্থার বাউণ্ডারী এমনটা হতে পারে।' সলীম পেন্সিল দিয়ে নক্‌শার ওপর একটা রেখা টেনে বলল।

বলনাথ সিং বলল— তোমার বুঝ তাহলে এটা?

ঃ আমার মতে, ইংরেজ হিন্দু-মুসলিমের মাঝে ষড়যন্ত্রে আগুন না জ্বালাতে চাইলে সীমারেখা এমনটাই দাঁড়ানোর কথা।

বলনাথ সিং সলীমের হাত থেকে পেন্সিল নিয়ে বলল— র‍্যাডক্লিফের ফয়সালা শোনার পর মানচিত্রের প্রতি নযর বুলিও। এ হাত বলনাথ সিং-এর নয়–র‍্যাডক্লিফ ও মাউন্টব্যাটেনের হাত মনে কর। সলীম তুমি ক'মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে নাও। আমি সেভাবেই সীমারেখা টানছি, যেভাবে র‍্যাডক্লিফ ও মাউন্টব্যাটেন টেনেছেন।

মুচকি হেসে সলীম জবাব দেয়— আমি উষ্মা প্রকাশ করব না। এ ভরসা রাখতে পার!

www.amarboi.org

বলনাথ সিং হাসল। বলল— উষ্মা! দোস্ত আমার যেদিন র‍্যাডক্লিফের ঘোষণা আসবে সেদিন বড় বড় লোকেরাও উষ্মা প্রকাশ না করে পারবেন না— দেখে নিও।

বলনাথ সিং নক্‌শার ওপর আরেকটা রেখা টানল। লাল এ রেখা সলীমের অস্পষ্ট রেখার চেয়েও চক চক করছে। হয়রান ও হতবাক হয়ে ওই লাল রেখায় আটকে থাকে সলীমের চেহারা। বলনাথের এ রেখায় স্রেফ শীতলক্ষ্যা, বিয়াসের মধ্যবর্তী মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা নয় বরং শোকরগড় ছাড়া গুরুদাসপুরের বাকী পরগনা, অমৃতসরের পুরো এলাকা এবং লাহোরের কিছু এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত।

নক্‌শা থেকে চোখ ফিরিয়ে সলীম বলনাথের দিকে তাকাল। আচমকা অট্টহাসি দিয়ে ও বলল— দোস্ত! আজ তুমি মাত্রাতিরিক্ত বোতল খেয়েছ। আমি ১১ লাখ মুসলমানকে বাঁচানোর চিন্তায় ছিলাম আর তুমি ১৫ লাখকে আরেক হিঁন্দুস্তানে ঢোকানোর খেয়াল করছ।

ঃ হাসলে সলীম? এখনও তোমাকে সব বলা হয়নি। দেখো!' বলে বলনাথ সিং নক্‌শার উপরে আরেকটা রেখা টানল। ওই রেখাটি প্রথম রেখাটির সাথে মেলাল। কেবল ১৫ লাখ-ই নয় আরো ৩০/৩৫ লাখ মুসলমানকে ভারতের অংশে ফেলছি। কাশ্মীর হিন্দু ভারতে শামিল হচ্ছে, দেখে নাও এ নক্‌শা।

ঃ ভাই! তুমি কাশ্মীরের করিডোরের জন্য গুরুদাসপুর জেলাকে না হয় ভারতের অন্তর্ভুক্ত করলে, কিন্তু ভাইসরয় যে গুরুদাসপুরকে পাকিস্তানের ভাগে ফেলেছেন! এক্ষণে অবশ্য সিদ্ধান্ত পাল্টালে সে অন্য কথা।

বলনাথ সিং কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বললে— গুরুদাসপুর কাশ্মীরের পথের করিডোর। ওটা তাই ভারতে শামিল হতেই হবে। প্রয়োজনে মাউন্টব্যাটেন তার ফয়সালা পাল্টাবেন। যেখানে ৩৫ লাখ মুসলিমের কর্ণধার মহারাজা ভারতে শামিল হতে চাইছেন সেখানে ৫ লাখ গুরুদাসপুরবাসীর বিরোধিতায় কান না লাগানোই স্বাভাবিক।

সলীম বলল— পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালে আন্দামান, ভূপাল, জুনাগড়ের পথ ধরতে হবে।

ঃ আন্দামান, ভূপাল ও জুনাগড় আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা কেবল কাশ্মীর নিয়ে ভাবছি।

কন্দন লালের নওকর গোলাকার রেকাবীতে পাকা আম এনে রাখল। মহিন্দর ও কন্দর লালের অনুরোধে সলীম একটা আম তুলে নিল। কিন্তু খেতে গিয়ে মনে হল, আজকের আমে স্বাদ নেই।

কন্দন লাল বলনাথ সিংকে বলল— তুমি খাবে না ভাই?

ঃ না, ভাই! আম রাখার মত খালি নেই পেট!

ঃ সত্যি করে বলতো, কতটা বোতল খালি করেছ আজ? বলল সলীম।

ঃ দোস্ত! মনে করছ তোমার মনে ব্যথা দেয়ার জন্য এ কথা বলেছি। কিন্তু এ নক্‌শাটা সংগ্রহে রেখ। একদিন দেখবে নক্‌শাটা কোন উন্মাদ নয় এঁকেছিল এক রক্তমাংসের সুস্থ মানুষ।

www.amarboi.org

মহিন্দর সিং ভাইয়ের কথায় বড্ড পেরেশান। আলোচনার মোড় ঘোরানোর প্রয়োজন মনে করে সে বলল— দাদা! সলীমের বাগদান হয়েছে। আপনি তাকে মোবারকবাদ দেননি কিন্তু।

ঃ মোবারক হোক। কবে হল বাগদান? প্রশ্ন বলনাথের।

সলীমের স্থলে মহিন্দর জবাব দিল— হপ্তা দু'য়েক পূর্বে।

ঃ মিষ্টি খাওয়াচ্ছ কবে?

ঃ ১৫ আগস্টের পর সকলকে।' বলল সলীম।

ঃ ও পর্যন্ত হয়ত থেকেও যেতে পারি।' বলল— বলনাথ সিং।

মজলিস খতম হলে মহিন্দর সিং কিছুদূর সলীমের সঙ্গে এল। জনপদের বাইরে এসে বলল— বলনাথের কথায় আপনি তকলীফ পেতে পারেন। আমি তাঁর পক্ষ হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বুঝিনি এ সময় তিনি মদ গিলে বুঁদ।

মহিন্দরের কাঁধে হাত রেখে সলীম মুচকি হাসি দিয়ে বলল— মহিন্দর! আমাকে নিয়ে তুমি অতটা ভেবো না। ওকে দেখামাত্রই মনে করছিলাম আজ আলোচনায় কষ্টই পাব আমি।'

সলীম মহিন্দরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলনাথের কথাকে নিছক পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু মনে করেনি বললেও একাকী বাড়ীর পথ ধরলে আজকের কথাগুলো কানে গু রিত হতে লাগল। কল্পনায় বিভক্তির ওই কালোরেখা ভাসছিল, যা কি-না বলনাথ নতুন করে এঁকেছিল। আচমকা নিজকে প্রশ্ন করল— যদি এটা ঠিক হয় তাহলে?' পর মুহূর্তে ওর শিরার খুন জমাট হয়ে গেল। এ রেখা ফুলে- ফেঁপে উঠতে লাগল। এমন কি পাঁচ দরিয়ার জমি এক নয়া দরিয়া হয়ে ওর নযরে ভাসল। সে নয়া দরিয়া রক্তের দরিয়া। এ দরিয়ার সয়লাব বস্তি- নগর জ্বালিয়ে দিচ্ছে যেন।

এ লাল রেখা ফনা তোলা হিংস্র বিষধর এক সাপের আকৃতিতে যেন ওকে বলছিল— এখন আমি মুক্ত। রক্ত-আগুন নিয়ে খেলার আযাদী পেয়ে গেছি আমি।'

র‍্যাডক্লিফের নির্মম কলমের খোঁচা না হয় আমাকে গুরুদাসপুর থেকে রাবীর কিনারায় পৌঁছে দিল। কিন্তু অসহায় ৩৫ লাখ মুসলমানের ভাগ্য কি হবে?

সলীমের মনে আচমকা একটা সজাগ অনুভূতি আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠল— অসম্ভব! না, না এটা হতেই পারে না। এট নিছক এক উন্মাদের প্রলাপ। কেমন করে হবে এটা? ইংরেজ জাতি কুত্তা বটে, কিন্তু নেউলে কুত্তা নয়। সভ্য কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এ লাল রেখা ক্রমশ ওর চোখের সামনে থেকে বিলীন হতে লাগল।

✪ ✪ ✪

প্রাচীন কালের হিন্দুরা হত্যা ও লুটতরাজের জন্য বের হলে কালীমূর্তির পূজা মানত করা হত। হিন্দু বিশ্বাস মতে, এ মূর্তি এমন সব অমানবিক কাজ করার অনুমতি দেয়, যা মানবতার সহ্যের বাইরে। বিংশ শতাব্দীর সৌর রশ্মিতে থেকে অধুনা হিন্দুরা সেই

www.amarboi.org

সনাতন হিন্দুদের অন্ধকার পুরী থেকে মুক্তি পায়নি। সনাতন হিন্দু সমাজের বুনিয়াদ ঘৃণা-ধিক্কারের এমন প্রেরণার ওপর স্থিত, যার প্রমাণ অচ্ছুত-অস্পৃশ্য জাতি। প্রাচীন হিন্দুদের হিন্দুত্ব নিহিত ছিল শূদ্রের পদদলনের মধ্যেই।

অধুনা হিন্দুদের হিন্দুত্ব মুসলিম দলনে নিহিত। ওরা দাদাগিরি অর্জনে মুসলিম জাতির ওপর প্রাধান্য বিস্তারকে অবধারিত মনে করল। আবহমানকাল ধরেই যুলুম ও নিপীড়নের ধ্বজা ওড়ানো হয়েছিল অচ্ছুত জাতির খুন নিংড়ানোর মাধ্যমে। হিন্দু শাসনের সম্মুখে ওরা নিছক রাখালের লাঠির পাঠা বনেছিল। কিন্তু মুসলমানের ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুদীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে তারা ভারতবর্ষ শাসন করেছে। সোমনাথের পাষাণ মূর্তির সামনে মাথানত না করে তারা একে ভেঙ্গে শতখণ্ড করেছে। মুসলিম শাসনের বায়ু ঢিল হয়ে এলেও হিন্দুরা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে নিজেদেরকে অসহায়-ই মনে করত— যে যুদ্ধ তারা করত অচ্ছুতদের বিরুদ্ধে। হিন্দুরা তাই সনাতন দেবতাদের থেকে বিমুখ হয়ে এক নয়া দেবতার অন্বেষণে মেতে উঠল। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বর্বরতা ও কাপালিকতার নয়া অধ্যায় রচনা করতে কালী মূর্তির স্থানে এক কালো দেবতার মদদের জরুরত অনুমিত হল। যে দেবতা ওদের হয়েই মুসলমানদের হাত-পা বেঁধে সামনে আছড়ে ফেলবে।

প্রাচীনকালে কোন শূদ্রের মুণ্ডচ্ছেদনের সময় এলে ধরিত্রী মাতার বুক চিরে অসংখ্য হাতের অধিকারী, অগণিত মাথাধারী ভয়াবহ কালো দেবতারা বেরিয়ে আসত। এদের কারো নাক ছিল হাতির শুঁড়ের মত, কারো মাথায় চুলের স্থলে সাপ ফনা তুলে থাকত। আবার কারো লেজ এত দীর্ঘ হত যে, ব্রাহ্মণ ও উঁচু জাতের বিরুদ্ধবাদী 'রাক্ষস' কিংবা 'শূদ্র' ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাত। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটলে ধরিত্রী মাতা এ ধরনের দেবতা জন্ম দেয়া বন্ধ করল।

১৯৪৭ সালে এক বিদেশী দেবতা লন্ডন থেকে উড়ে দিল্লী নামলেন। এ দেবতার রং সাদা, চেহারা-সুরতও হিন্দু দেবতাদের চেয়ে ভিন্ন। একে দেখে অহিংস নীতির মহান দেবতা আনন্দে নিতম্ব চাপড়ে বলল, এই সে অবতার, ভারতমাতা যার অপেক্ষা করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এ অবতারের বাহ্যিক দেহবল্লভ শ্বেত-শুভ্র হলেও ভেতরটা কালী দেবীর চেয়েও জমকালো। কালী পূজারীদের এ শ্বেত দেবতার নাম লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন।

✪ ✪ ✪

দাড়িপাল্লায় এক পাশে যদি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কর্মকাণ্ড আর অপরপাশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোটা কর্মকাণ্ড রাখা হয় তাহলে মাউন্ট ব্যাটেনের পাল্লাই ভারী হবে। যদি ইনসানিয়াতের হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে সর্বপ্রথম যার সিরিয়াল তিনি হচ্ছেন এ মাউন্টব্যাটেন। চেঙ্গিস ও হালাকুখান যেখানে যেতেন, আগুন ও রক্তের পয়গাম নিয়ে যেতেন। কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন উপমহাদেশে স্বাধীনতার পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন।

www.amarboi.org

চেঙ্গিস্ ও হালাকু সেই কওমের দিশারী যারা আস্তিনের ভেতরে ছোরা লুকাতে জানত না। ওরা রাবারের দস্তানা পেঁচিয়ে মানবতার গলা টিপত না। ওরা হত্যা করে নিহতের মাথার খুলি দিয়ে মীনার বানাত। যাতে ঐতিহাসিকদের তাদের শনাক্ত করতে দ্বিধায় পড়তে না হয়। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন বিশ শতকের এক শিক্ষিত ভদ্র হন্তা আর তিনি এমন আততায়ীদের পৃষ্ঠপোষক যারা আবহমান কাল ধরেই নিজেদের অমানবিক কর্মকাণ্ডকে গোয়েবলসীয় শব্দে বিধৃত করতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। হিন্দুজাতির ঘাঘু আততায়ীরা নিহতের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে এমন কথা বলারও প্র্যাকটিস সেরে নিয়েছিল যে, আমরা তোমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম নিয়ে এসেছি।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন মূলত দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তার মিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, পাইকারী হারে মুসলিম নরমেধ যজ্ঞকারীদের হাতকে মজবুত করা। আর এজন্য দরকার ছিল বেশি বেশি মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলো ভারতে এবং হিন্দু সংখ্যালঘু অতি সামান্য এলাকা পোকায় খাওয়া খণ্ডিত পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি দান। সুতরাং মাউন্টব্যাটেন উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগের মৌলিক নিয়ম স্রেফ পাঞ্জাব ও বাংলাকে খণ্ডিত করার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এই বে-ইনসাফী, বর্বর বিভক্তি কেবল পাকিস্তানকে তার উত্তম এলাকা থেকেই বঞ্চিত করেনি বরং ভারতীয় মুসলিম ও পাকিস্তানী অমুসলিম সংখ্যালঘুত্বের ভারসাম্যকেও বিনষ্ট করেছে— যদ্বারা উভয় দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করা যেত। র‍্যাডক্লিফের পয়লা পরিকল্পনা মোতাবেক পাকিস্তানের মোট দেড় কোটি আবাদী এবং প্রায় দু'কোটি শিখ আবাদী হিন্দুস্তানে শামিল করা হয়। মাউন্টব্যাটেনের কালো হাত স্রেফ দু'কোটি আবাদী দিয়ে পাকিস্তানকে বুঝ দিয়েছে।

মুসলিম জাতিকে এ তেতো বিভক্তি মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে; কিন্তু এতো তার বর্বরতার পয়লা অধ্যায়। পরে আসছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা। মুসলমানদেরকে সেই সালতানাত দেয়া হল, যার সীমা তখনও নির্ধারিত হয়নি। তাঁদের এমন এক হুকুমত হস্তগত হল, যাদের ফৌজ তখন ভারতের হাতে। পাকিস্তানের ভাগের অস্ত্র-গোলাবারুদও ভারতে। এসব কিছু এজন্য করা হয়েছে, যাতে হিন্দু ফ্যাসিজমের দরোজা খোলার পূর্বেই পাকিস্তানকে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ না দেয়া হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় তার স্কীমের তাড়াহুড়ো বোধহয় এজন্যেই। পাঞ্জাব ও বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতেই বুঝি ব্যাটেন সাহেবের ঝটিকা কর্ম।

১৫ আগস্টের পূর্বে দিল্লীর নওহা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত আগুন ও খুনের নয়া দরিয়া বয়ে যায়। এ সেই ১৫ আগস্ট যার পূর্বে পাটিয়ালা, নাভ, কাপূরথালা, ভরতপুর ও ইন্দোরের ফৌজ পূর্ব পাঞ্জাবে পৌঁছে যায়। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের দল হিন্দু প্রশাসন থেকে অস্ত্র ও গোলা বারুদ পেয়ে পাঞ্জাবের পথ ধরে। অপরদিকে পূর্ব পাঞ্জাবের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মুসলমানদের নিরস্ত্র করছিল। পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলিম কনস্টেবলদের নিরস্ত্র করে পশ্‌লা পশ্‌লা গুলি দিয়ে তাদের বুক ঝাঁঝরা করে প্রশাসন বোঝাতে চেয়েছিল, তারা কি ধরনের শান্তি কায়েম করতে চায়।

www.amarboi.org

এ সেই পনের আগস্ট যার বহু পূর্বেই শিখ, মহাসভা গং ও কংগ্রেসীদের ঐকমত্য পাঞ্জাবে আগুন লাগাতে মদদ করেছিল আর মাউন্টব্যাটেনেরও এ কথা জানা ছিল যে, মুসলিম জাতিকে হাত-পা বেঁধে ফ্যাসিস্ট হিন্দুদের সামনে আছড়ে ফেললে এর পরিণামটা কি দাঁড়াবে। এ সেই পনের আগস্ট যার পূর্বে পাকিস্তানী মুসলমানরা অস্ত্রভাণ্ডার পেলে পাঞ্জাবী ডোগরা ও শিখ-গুর্খাদের সামনে এত অসহায় প্রমাণিত হত না। পারত না পূর্ব পাঞ্জাবের রক্ত নিয়ে হোলি খেলতে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ। ফেলত না নিরস্ত্র জাতি অবলা নারীর মত আঁসু। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন বর্বরতা ও নৃশংসতার দারোন্মোচন করতে চাচ্ছিলেন। তার এ মিশন পথের তামাম অন্তরায়কে বিদূরিত করাকে জরুরী মনে করছিলেন। অনেকে হয়ত বলবে, মাউন্টব্যাটেন এতটা মুসলিম বিদ্বেষী হলে সে মুসলমানদের ল্যাংড়া-লুলা পাকিস্তান দিতে রাজী হল কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমরা বৃটেনের লেবার মন্ত্রকের কর্মকাণ্ড দ্বারা পেতে পারি। লেবার মন্ত্রক হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক যুদ্ধে কোন পক্ষের না হয়ে তৃতীয় পক্ষাবলম্বন করেছিল। আর তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সে অধিকহারে হিন্দুদের মনোরঞ্জনে খেয়াল নিবদ্ধ করেছিল। হিন্দুরা গোটা ভারতবর্ষ চেয়েছিল। ইংরেজ জাতি দশ কোটি মুসলমানকে আকুল পাথারে ঠেলে দিতে নারাজ। এ সময় তাদের দু'পক্ষের কোন পক্ষ অবলম্বন না করে তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। লর্ড মাউন্টব্যাটেন মুসলমানদেরকে এমন এক পাকিস্তানের নক্শা দেখালেন, যা তাদের ধারণায়ও ছিল না। পাশাপাশি হিন্দুদের ধনধান্যে, অস্ত্র-বারুদে দু'হাতে ভরে তিনি এতটাই শক্তিশালী করলেন যাতে শিশু পাকিস্তান অঙ্কুরেই বিনাশ হতে বাধ্য।[১]

১৫ আগস্ট দিল্লীতে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হল। সেই সাথে দিল্লীতে আযাদীর আগ্নেয়গিরিতেও উত্তপ্ত লাভা উৎক্ষিপ্ত হল।

উৎক্ষিপ্ত লাভা ক্রমান্বয়ে নীচু জমির দিকে বিদ্যুত গতিতে এগিয়ে চলল। বিশেষ করে যে সব প্রদেশকে মুসলিম জনতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুর্গ বানিয়েছিল। এ সেই ১৫ আগস্ট যেদিন ইংরেজ পশুরা বর্বর পাথরের যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর রাজকীয় মেশিনে সওয়ার হোল।

এরপর যেটুকু যা বাকী রইল সেটুকু পূরণ করলেন মানবেতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বেঈমান র‍্যাডক্লিফ। এখানেও মুসলমানরা এক খ্রিস্টান জানোয়ারের ওপর অগাধ আশা রাখার সাজা পেল। এ নিষ্ঠুর ব্যক্তির কলম শীতলক্ষ্যা কিংবা বিয়াসের কিনারায় থামার স্থলে রাবীর কিনারে গিয়ে থামল। তার সীমা নির্ধারণী কলম চলেছিল মহাসভার হিন্দুদের অঙ্গুলী নির্দেশে। শীতলক্ষ্যা, বিয়াস ও রাবী উপকূলবর্তী মুসলিম জনপদগুলো নিয়ে পন্ডিত নামের নেহেরুর এলার্জী ছিল। যেহেতু অমৃতসরের দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু ও শিখ অধ্যুষিত, এজন্য পুরো জেলাগুলোর ভারতে শামিলের দরকার মনে করলেন তিনি। বিয়াসের উপকূল হিন্দুস্তানে শামিল করা হল।

টীকা ঃ ১. কায়েদে আযম ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে অস্ত্র ভাগাভাগির বিরোধী ছিলেন। এর মারাত্মক পরিণাম তিনি মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আগে ভাগেই। কিন্তু সে আওয়াজে মাউন্টব্যাটেন মোটেই প্রভাবিত হল না।

www.amarboi.org

মুসলিম অধ্যুষিত গুরুদাসপুর জেলা ৩রা জুনের ঘোষণা মোতাবেক যা পাকিস্তানের ভাগে ফেলা হয়েছিল, শোকরগড় এলাকা ছাড়া এর পুরোটাই ভারত মাতার খাই খাই উদরে ঢোকানো হল। মধুপুর থেকে বেরোনো ওই নদীগুলোও ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন দেখা দিল— যা অমৃতসরের দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষেত-খামারকে সঞ্চিত করত। আজনালা জেলায় শিখদের চেয়ে দ্বিগুণ ছিল মুসলিম। এটি যেহেতু শিখ-হিন্দু মিশ্রিত এলাকা, তাই একেও ভারত মাতার ঝুলিতে পুরে দেয়া হল। লাহোরে মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তহশীলও মুসলিম আবাদীর। এতদসত্ত্বেও লাহোরের কিছু এলাকা র‍্যাডক্লিফ ভারতকে দিতে চাইলেন। ফিরোজপুরে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও বেঈমান র‍্যাডক্লিফ বুঝতে অক্ষম ছিলেন যে, এ জেলায় মুসলমানদের ফায়দাটা কি?

আবহমানকালের ইতিহাসের কলঙ্কিত এ স্যার র‍্যাডক্লিফ চোখ বুজে পাঞ্জাবের ম্যাপের ওপর একটা রেখা টানলেন কিংবা মাউন্টব্যাটেন তার হাত ধরেছিলেন আর র‍্যাডক্লিফ খোদ্ নিজেই কিংবা মাউন্টব্যাটেন এ ফয়সালা রদবদল করেছিলেন। এ ব্যাপারে এত গভীর পর্যালোচনা না করে আমাদের এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, বজ্জাতি, বে-ইনসাফী ও বেঈমানী করা হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায় সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে।

পূর্ব পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্তির পর লর্ড মাউন্টব্যাটেন হিন্দুস্তানী পূজারীদের আরেকটি তোহ্‌ফা দিতে চাচ্ছিলেন। এ নতুন তোহ্‌ফার নাম কাশ্মীর। যদি শীতলক্ষ্যা সীমান্ত হত তাহলে ভারতের পথে শীতলক্ষ্যা বিয়াসের মধ্যবর্তী এক বিশাল এলাকা এবং এরপর গুরুদাসপুর জেলা অবাধে চলার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত। মাউন্টব্যাটেন ৩ জুনের ঘোষণায় শীতলক্ষ্যা ও বিয়াসের মধ্যবর্তী গোটা মুসলিম এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। এক্ষণে হিন্দুস্তানের পথের একমাত্র বাধা রইল গুরুদাসপুর জেলা। যাকে একান্ত বাধ্য হয়েই তিনি পাকিস্তানে শামিল করেছিলেন। ভারতের পথের এই অন্তরায়কে স্যার র‍্যাডক্লিফ তার কলমের এক খোচায় পাকিস্তান থেকে কেটে ভারতকে দিয়ে দেন।

গুরুদাসপুর জেলা, আজনালা তফসীল, ও বিয়াস উপকূলীয় জেলা ফিরোজপুরকে ভারতে শামিল না করা হলে তাতে মোটামুটি চারটা পরিণাম হত। প্রথমত শিখদের বিরাট একটা জনপদ পাকিস্তানে চলে যেত এবং তাদের আক্রমণাত্মক দুঃসাহস দেখানোর খায়েশ জন্মাত না। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে বিয়াস ও শীতলক্ষ্যা উপকূলীয় সংখ্যালঘু মুসলিমরা দ্রুত-ই সংখ্যাগুরু এলাকায় আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পেত। অমৃতসরের দুই-তৃতীয়াংশের শিখ সম্প্রদায় যদি বাড়াবাড়ি করার এরাদা করত তাহলে এর পাশাপাশি তাদের ভাবতে হত, গুরুদাসপুরের শিখদের পরিণতির কথা। এ ধরনের বিভক্তির দ্বিতীয় যে পরিণতি দাঁড়াত তা হচ্ছে এই–হিন্দু ফ্যাসিস্টরা পূর্ব পাঞ্জাবে রক্ত-আগুনের পয়গাম দেখার পর কাশ্মীর উপত্যকায় রোখ করত না। তৃতীয়ত পাকিস্তানের অবস্থান, প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে আরো সুদৃঢ় হত। চতুর্থত পাঞ্জাবের যমীন লাখো মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যেত। আর পাকিস্তানের বুনিয়াদকে দোদুল্যমান করার জন্য হিন্দুস্তান নাঙ্গা, ভুখা, যখমী ও মুহাজির কাফেলা তৈরীর পরীক্ষা নেয়ার সুযোগ পেত না।

www.amarboi.org

১৪ ও ১৫ আগস্টের মাঝামাঝি মুসলিম ঘরে ঘরে আযাদীর নারা ও খুশীর বন্যা বয়ে গেল। রাত বারটা এক মিনিটে পাক-ভারত স্বাধীন হল।

গ্রাম্য মুসলিমদের বাড়ী বাড়ী চেরাগ জ্বালানো হল। নানা রঙের লাইটের লুকোচুরি হল শহরের প্রাসাদোপম বাড়ীগুলোয়। দামাল ছেলেরা তারাবাজি ও পটকায় ভারতবর্ষ কাঁপিয়ে তুলল। বড় মসজিদে উপস্থিত হয়ে সকলে নফল নামায আদায় করল।

সলীম ঠিক রাত ১২টা ১ মিনিটে নিজেদের বাড়ীর ছাদে পাকিস্তানী পতাকা ওড়াল। মজীদ ওর পাশটিতে গ্যাস বাতি নিয়ে দণ্ডায়মান। হাবেলীর বাইরে জনতা খুশীতে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' নারা লাগাচ্ছে। কার সাধ্য থামায় ওদের। চৌধুরী রহমত আলী নফল নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বেরোলে অন্দর সিং'কে দরোজায় দণ্ডায়মান দেখলেন— মোবারক হোক ভাই!' বলল তিনি। চৌধুরী সাহেব অগ্রসর হয়ে তাকে বুকে তুলে নিলেন। বললেন— ভাই! মোবারক হোক। পাকিস্তান আমাদের সকলের। আমরাও পাকিস্তানের। গ্রামের অন্যান্য শিখরাও মুসলমানদেরকে মোবারকবাদ দিল।

ঃ এসো ভাইয়া! বৈঠকখানায় বসবে!' বললেন— চৌধুরী সাহেব। লোকেরা চৌধুরী সাহেবের হাবেলীর বাইরে জমায়েত। সকলেই বেঞ্চে উপবিষ্ট। এক সময় বেঞ্চ ভরে গেল। চাটাই বিছানো হল। দু'একজন শিখকেও দেখা গেল ওখানে। কিন্তু ইসমাঈলের অট্টহাসি সকলকে জানিয়ে দিল, এ মাহফিলে হাসি-ই মূল উদ্দেশ্য।

একজনে বললেন— আরে ভাই চৌধুরী রমজান কৈ?

অন্দর সিং বললেন— লছমন সিং! তুমি নিয়ে এসো তাকে। তিনি ছাড়া মজমা জমছে কৈ।

ঃ আজ আসবেন না তিনি। বেশ করে বলেছি তাকে।' বলল লছমন।

ঃ চিন্তা করবেন না চৌধুরী। আমাদের কবর খুব একটা দূরে হবে না।

শের সিং আলোচনার পট পরিবর্তন করা জরুরত মনে করে সলীমকে বললেন— সলীম! আমি মনে করি এ এলাকার মুসলমানরা বড় হিম্মত দেখিয়েছে। অবশ্য এমনও মানুষ এখানে আছে, যারা কেবল ১৫ তারিখের এন্তেযার করছে। পাকিস্তান ঘোষিত হওয়া মাত্রই তারা শিখদের ওপর হামলা করে বসবে।

সলীম জবাব দেয়— চাচা! আজ রাত ১২টা পর্যন্ত শান্তি বিধানের দায়িত্ব ছিল ইংরেজদের ওপর। এরপর শিখদের দেখভালের দায়িত্ব পাক-প্রশাসনের ওপর। আর

টীকা ঃ ১. গুরুদাসপুর সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেনের নিয়ত একথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ৩ জুনের পর তিনি প্রেস ব্রিফিং-এ বলেনঃ এটা কোন ধরাবাধা মৌলিক নিয়ম নয় যে, সামান্য সংখ্যাগুরু এলাকা হলেই সেটা ভারত কিংবা পাকিস্তানে শামিল করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি গুরুদাসপুরের নামোল্লেখ করে। কিন্তু এসব কথা হিন্দু পূজারী ও তাদের ইংরেজ দেবতার খায়েশের সম্পূর্ণ বিপরীত। বলেন- ওখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অপ্রতুল। প্রশ্ন হয়, মাউন্টব্যাটেনের দৃষ্টি কেবল গুরুদাসপুরের উপর পড়ল কেন? অমৃতসর, হুশিয়ারপুর, জলন্ধর ও ফিরোজপুরের উপর পড়ল না কেন? ব্যাটেন সাহেবের পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক স্রেফ পাঠানকোট হিন্দুস্তানে পড়ার কথা। এতে আরো ১০টি পরগনা পাকিস্তান পেত। কিন্তু এখানে ঘোষণার কোন প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন ছিল, যে কোন মূল্যে কাশ্মীর সীমান্তের সাথে ভারতকে সরাসরি জুড়ে দেয়া।

www.amarboi.org

মুসলমানরা একথা জানে, দাঙ্গা বাঁধলে পাকিস্তানের বদনাম হবে। সুতরাং মুসলমানদের পক্ষ থেকে হামলার আশংকা করবেন না। এ জেলার মুসলমানদের থেকে খারাপ কিছু ঘটার আশংকা থাকলে শিখদের দরোজায় তাদের পাহারা কেন? আমার যদ্দুর বিশ্বাস রাত বারোটার পর হিন্দুস্তানী প্রশাসন অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু করে না বসলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তেমন কিছু ঘটবে না এবং অমৃতসর শান্ত থাকবে।

ঃ ভাইপো! তুমি যে সান্ত্বনা দিচ্ছ— তা জানি আমি। আমার এই ভাইদেরও তো শান্ত করাতে হবে। আমার সম্পর্ক আফজালের সাথে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আফজাল খুশী হলে আমিও খুশী। আজ তোমরা বাড়ীতে চেরাগ জ্বালাচ্ছ। আমাদের বাড়ী দেখে আসো। আমি দু'টাকার মোমবাতি জ্বেলেছি।

✪ ✪ ✪

১৬ আগস্ট সলীম ও মজীদ শহরে গিয়েছিল। ওদের অনুপস্থিতিতে দারোগা ক'জন সেপাইসহকারে গ্রামে এলেন। সলীমের দাদাকে বলল— আপনার সম্পর্কে থানায় অভিযোগ আছে। পরিস্থিতি যতদিন ঠিক না হচ্ছে ততদিন আপনার বন্দুক আমাদের হেফাযতে থাকবে।

সলীমের দাদা হতবাক। দারোগা বললেন— আপনি আনন্দচিত্তে বন্দুক জমা দিলে হিন্দু ও শিখরা আপনার প্রতি আরো আস্থাশীল হবে। নয়ত পুলিশ অ্যাকশন নিতে বাধ্য। শিখরা হবে সন্দিহান।

চৌধুরী রহমত আলী খানিক আগপাছ ভেবে আফজাল ও গোলাম হায়দারকে বলল, দারোগা সাহেবকে বন্দুক দিয়ে দাও।' তার ভাই নূর মোহাম্মদের ঘরেও একটা বন্দুক ছিল সেটাও নিয়ে নিলেন দারোগা।

পুলিশরা শহরের দিকে চলতে থাকলে পথিমধ্যে সলীম ও মজীদের সাথে দেখা। সাব ইন্সপেক্টরের ইশারায় ওরা ঘোড়া থামাল। এক নজরেই ওরা বন্দুক চিনে ফেলল। মজীদের কোমরে পিস্তল দেখে দারোগা বললেন— সুবেদার সাহেব! আপনাদের গ্রাম থেকে বন্দুক ক্রোক করেছি। যতদিন ছুটিতে কাটাচ্ছেন ততদিন পিস্তলটা থানায় জমা রাখলেই ভাল।

মজীদ ঝাঁঝালো সুরে বলল— পিস্তলটা হেফাযতের শক্তি আছে আমার।

ঃ কিন্তু ছুটিতে ওটা দিয়ে হবে কি?

ঃ আমি পাক-ফৌজ। আর এই জেলা পাকিস্তানেরই অঙ্গ দারোগা সাহেব! আপনার চলার পথে আরেকটা জনপদ ছিল। আপনি আমাদেরটা ক্রোক করবেন অথচ ওই জনপদে পাও রাখলেন না যে? আপনি না জানলে বলব, শেঠ রামের ঘরে দু'টি বন্দুক আছে। আর ক্যাপ্টেন বলনাথ সিংও আমার মত ছুটি কাটাচ্ছে। তার কাছে একটা রাইফেল, একটা শর্টগান ও একটা রিভলবার আছে। তল্লাশির হিম্মত করলে আরো কিছু পেতে পারেন।' বলল মজীদ।

www.amarboi.org

দারোগা বললেন— আমাদের কর্মকাণ্ডে আপনার ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ থাকলে আমরা ওদেরও কোনই ছাড় দিতাম না। কিন্তু নির্দেশটা এমন যে, মুসলিম স্বেচ্ছাসেবীদের অস্ত্রমুক্ত করা হবে, কিন্তু হিন্দু ও শিখদের পেরেশান করা যাবে না। এমনটি করলে ওরা মনে করবে, সংখ্যালঘু সম্পর্কে পাকিস্তানের অবস্থান ঠিক নেই। আপনি আর্মি বিধায় ওটি সাথে রাখতে পারেন, অবশ্য জমা দিলে ভালো হত। জমা দেয়ার জরুরত পড়লে আমি নিজকেও পুলিশের কাছে সোপর্দ করতে পিছপা হবো না।

ঃ সে যাকগে। এক্ষণে আপনার মর্জি।

মজীদ প্রশ্ন করল— এ বন্দুক কবে নাগাদ ফেরত পাব?

সাব ইন্সপেক্টর বললেন— উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুম হলে।

পথিমধ্যে সলীম বলছিল মজীদকে— মজীদ আমি বড্ড পেরেশান। আমাদের এলাকার মুসলিম সাব-ইন্সপেক্টরদের বদলী করে দেয়া হয়েছে। শিখদের দেয়া হয়েছে সে জায়গায়। শুনেছি এ দারোগা আকালী দলভুক্ত। কাল কিংবা পরশু বাউন্ডারী কমিশনের ঘোষণা আসবে। সকলেই বন্দুক জমা দিয়ে বোধ হয় ভুল করছে।

ঠিক এর দু'দিন পর।

১৫ আগস্টের পর দিন মুসলমানদের যে সব বাড়ীতে পাকিস্তানের ফ্লাগ শোভা পাচ্ছিল তারা বড় অসহায় হয়ে একে অপরের মুখপানে তাকিয়ে রইল।

সকলেরই প্রশ্ন— কি হবে এখন?

✪ ✪ ✪

বাউন্ডারী কমিশনের ঘোষণা শোনাল রেডিও। ইথার তরঙ্গে ভেসে এল, গুরুদাসপুরকে জবরদস্তিমূলক পাকিস্তান থেকে ভারত মাতার ঝুলিতে পুরে দেয়া হয়েছে। এ ঘোষণার ক'ঘণ্টার ব্যবধানে মুসলিম সেপাইদেরও অস্ত্র কেড়ে নেয়া হল।

বাউন্ডারী কমিশনের নিষ্ঠুর ঘোষণা মুসলিম জাতির মনে প্রচণ্ড আঘাত হানল। বিশেষ করে গুরুদাসপুরবাসী যারা সরাসরি ওই ঘোষণা শুনল, তারা স্ব-স্ব কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না। দূর-দূরান্তের গ্রামের লোকজন একে উন্মাদের প্রলাপ মনে করল। তারা বলাবলি করতে লাগল— এটা হতে পারে না। কি করে এমন হয়। অসম্ভব। তারা শিখদের বুঝাচ্ছিল— ভাইয়েরা! এটা উড়ো কথা। রেডিও মিথ্যো সংবাদ দিয়েছে। রেডিও'র ঘোষণার আগের দিন সলীম ঘরে বসে ছিল। পেরেশান ও হতাশায় ঘুম আসেনি ওর। মা ওর কক্ষে এসে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন— বেটা! খেয়ে নাও কিছু। সেই রাত অবধি কিছু খাওনি।

ঃ আম্মি! ক্ষুধা নেই।

মুখে দুঃখের হাসি টেনে মা বললেন— বেটা! তুমি বলেছিলে আজনালা তহশীল ও আমাদের জেলা গুরুদাসপুর পাকিস্তানেই থাকবে। একথা বলতেন তোমার আব্বাজানও

www.amarboi.org

ডাক্তার শওকতের খেয়ালও ছিল এমনটা। সীমা নির্ধারণের পর স্থিতিশীলতা এসে যাবে। এবং আগামী মাসে ফুরসতমত এসে তোমার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে যাবেন। কিন্তু মজীদ বলল, শিখরা দাঙ্গা বাধিয়ে বসবে। এখন কি হবে বেটা? ওরা আমাদের বন্দুক ক্রোক করেছে। কাল তোমার আব্বাজান আসছেন। ট্রেন চলে এখন?

ঃ না আম্মি! ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে।

ঃ বেটা। উনি না এলে অবশ্যই টেলিগ্রাম দিতেন।

ঃ আম্মা! টেলিগ্রামও আসার সম্ভাবনা নেই।

মজীদ হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করে বলল— সলীম এসো!' ওর কণ্ঠে হতাশার সুর।

সলীম উঠে দাঁড়াল। মা হতাশ হয়ে বলেন— বেটা! কি খবর?

ঃ কিছু না চাচীজান! সলীমকে এক লোক ডেকে পাঠিয়েছে।

মজীদের সাথে বাইরে বেরুল সলীম। মা ফের বললেন— দাঁড়াও বেটা! আমাকে বলে যাও।'

সলীম থামল। কিন্তু মজীদ ওর বাযু ধরে টেনে নিয়ে গেল।

বাইরের হাবেলীতে আফজাল ঘোড়ায় জিন লাগাচ্ছিলেন। সলীমের চেহারায় পেরেশানি দেখে তিনি বললেন— মজীদ! খোদার দিকে চেয়ে সবকিছু খুলে বলো আমায়। মজীদ এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল— সলীম! খবর খুবই খারাপ। চাচাজান রেল থেকে নেমে বাড়ী আসছিলেন। শিখরা তাকে হামলা করে। জানে বেঁচে গেলেও মারাত্মক যখমী হয়ে তিনি হাসপাতালের বেডে কাতরাচ্ছেন।'

ঃ কে বলল?'

মজীদ জবাব দেয়— বলেছে, ফাজ্জু পালোয়ান।

সলীম দ্রুত একটা ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। মজীদ অপর এক ঘোড়ার লাগাম ধরে বলল— চাচা! খোদার দিকে চেয়ে আপনি এখানে থাকুন। আমি, সলীম ও ফাজ্জু ওখানে যাব। খবর যা কিছু তা ওকে বলে দেব। আমাদের গাঁয়ে যে কোন সময় হামলা হতে পারে। কাজেই আপনার এখানে থাকা জরুরী। এই নিন আমার পিস্তল। আমার আলমারীতে গোটা পঞ্চাশেক গুলি আছে। জরুরত পড়লে আম্মিজান ওগুলো বের করে দেবেন। আপনি গ্রামের সকল লোককে জমায়েত করুন।

আফজাল মুখ কালো করে বললেন— আচ্ছা! আমি যাব না। তবে ফাজ্জুকে অতি তাড়াতাড়ি পাঠাবে।

মসজিদের কাছে রহমত আলী ও ইসমাঈল ফাজ্জুর সাথে কথা বলছিলেন। আফজাল বললেন— ফাজ্জু ভাই! তুমি ওদের সাথে যাও! দ্রুত এসে খবর দিও।

রহমত আলী ভারাক্রান্ত হয়ে বলল— আমাকেও যেতে দাও!

ঃ না, আপনার যেতে হবে না। ঘরে চলুন! আমরা কেবল আপনার দোয়া চাই। শেঠ রামের জনপদে শিখরা জমায়েত হচ্ছে। আমাদের এখানকার শিখরাও গেছে। শের

www.amarboi.org

সিং ওয়াদা করেছে, অসম পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দিলে সে আমাকে জরুরী ভিত্তিতে খবর দেবে। অবশ্য সে এখনও এলো না।'

✪ ✪ ✪

মহিন্দর সিং-এর আম বাগানে বিগত ক'সপ্তাহ পূর্বে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যেখানে সবাই মত বিনিময়ের জন্য মিলিত হয়েছিল— শিখরা জমায়েত হচ্ছে সেখানেই। তলোয়ার ও বর্শা সজ্জিত হাজার খানেক লোক ওখানে গাছের নিচে বসে শেঠ রামের বক্তব্য শুনছিল। ৮/১০ জনের হাতে আছে রাইফেল ও বন্দুক। মহিন্দর সিং এক কোণে দণ্ডায়মান। শেঠ রাম বক্তব্য রাখছেন—

আমরা শিখ ভায়েরা! পাঞ্জাবের বাঘ তোমরা! গোবিন্দ সিং-এর নামের প্রতি অবিচার করো না। পাঞ্জাবের ক'টি জেলা পেয়ে মাতোয়ারা হয়ে যেও না। ভায়েরা আমার! মুসলমানদের পাকিস্তান হয়ে গেছে, কিন্তু তোমাদের খালিস্তান হয়নি এখনও। কংগ্রেস এ প্রদেশের কয়েকটি জেলা তোমাদের দিয়ে দিয়েছে। এক্ষণে একে খালিস্তান বানানো তোমাদের দায়িত্ব। যে সময়ের অপেক্ষা করেছিলে, এসে গেছে সে সময়। তোমাদের ফটক পর্যন্ত পৌছতে হবে। ফটক পর্যন্ত পৌছার পূর্বে পাঞ্জাবের ওই সমস্ত লোকদের খতম করতে হবে, যারা বিপদের সময় তোমাদের পিঠে ছোরা ঢুকাতে পারে। মুসলমান তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের দুশমন। এই জাতি অটক-এ উপনীত হতে পারলে জেনো, গোটা পাঞ্জাবতো দূরের কথা সদ্যমুক্ত এলাকায়ও তোমরা খালিস্তানের পতাকা ওড়াতে পারবে না। তোমাদের লিডার মাস্টার তারা সিং বলেছেন, খাইবার গিরিপথে পতাকা উড়িয়ে তবেই শিখরা দম নেবে। যে কওমের লিডার বাহাদুর সে কওম বুযদিল হতে পারে না।

মুসলমানরা পাকিস্তান দাবী করেছিল। ওদের স্বার্থ ও দাবী পূরণ হয়েছে। সুতরাং ওদেরকে ওখানেই চালান করে দাও। পাঞ্জাব থেকে ৬০/৭০ লাখ মুসলমান ওখানে উপনীত হলে ওদের হুঁশ আসবে। বাহাদুর সন্তানরা! হিম্মত করো। এক্ষণে পুলিশ তোমাদের, ফৌজ তোমাদের। হুকুমতও তোমাদের। অবশ্য যে কাজ তোমাদের, তা সমাধা করতেই হবে। যদি তোমরা হামলা না করো তাহলে তোমাদেরই কিছু লোক তার ঘরে পাল্কী নিয়ে যাবে। তোমরা তখন মস্তক অবনত করা ছাড়া কিছু করতে পারবে না।

হরি সিং কর্মকার দাঁড়িয়ে বলল— আমাদের গ্রামের জনাবিশেক শিখ এখানে উপস্থিত। আপনারা হামলা করলে বাদবাকীরাও শামিল হবে। আমাদের যত ভয় অন্দর সিং ও তার লোকজনকে নিয়ে। অবশ্য আমরা তাদের বাঁ-হাত দেখিয়ে দিয়েছি। অন্দর সিং-এর দু-পুত্র আমাদের সাথে আছে। শের সিংকে আমরা দু'বোতল মদপান করিয়ে দিয়েছি। সে এক্ষণে রামচাঁদের বাগানে অসাড় পড়ে আছে। অন্দর সিং এখন লাঠি ছাড়া চলতে পারেন না। বাকী রইল কেবল শের সিং-এর পুত্র। প্রথমত সে জ্যাঠাদের বিরুদ্ধে যাবে না। সে এ পথ থেকে ফিরে না এলে বলব, তুমি জাতির দুশমন। তবে আমার যদ্দুর বিশ্বাস, সময়মত ওর চৈতন্যোদয় হবে। আমাদের জনপদের মুসলিমদের ধাওয়া করার মোক্ষম সময় এটাই। গতকালই ওরা শুনেছে, গুরুদাসপুর ভারতে অন্তর্ভুক্ত

www.amarboi.org

হয়েছে। অদ্যাবধি ওরা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না, কাল নাগাদ অন্যান্য জনপদের মুসলমানরা জড় হবে। তোমরা হয়তো জেনেছ, আলী আকবর মারাত্মক যখমী হয়েছে।

রামচাঁদ বললেন— সর্দারগণ! যা করার জলদি করুন! নইলে বাকী লোকজন এসে যাবে। তারা জমি-জমা দাবী করে বসবে। রহমত আলীর বাড়ী কেবল সম্পদে সমৃদ্ধ নয় বরং আরো কিছু আছে। আমাদের এলাকার সম্পদ আমাদের হাতেই থাকা দরকার।

মহিন্দর সিং আচমকা মজমার মাঝে দৌড়ে এসে চিৎকার দিয়ে বলল— ভায়েরা আমার! আজ তোমরা বড় একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলে। আমি একথা বলবো না যে, তোমরা এটা করো কিংবা ওটা। তোমরা হামলা করতে চাইলে বাধা দেব না। তবে আমারও কিছু কথা আছে।

রামচাঁদ চরণ সিংকে চোখের ইশারায় কাছে ডেকে বলল— না, না! এখন কথা শোনার ফুরসত নেই। বড্ড দেরী হয়ে গেছে আমাদের। কাজ থেকে ফিরেই তবে তোমার কথা শুনব। বলো— সত্যাশ্রয়ী আকাল!'

মুহূর্তে মজমায় শ্লোগান শোনা গেল– 'সত্যাশ্রয়ী আকাল' 'সত্যাশ্রয়ী আকাল' মহিন্দর সিং হাঁত উঁচু করে বলল— তোমাদের গৌর গ্রন্থের কসম। আমার কথা শুনে যাও। আমার কথা ভুল হলে সাজা দিও। আমি দীর্ঘ তিন মাস মুসলমান দিয়ে তোমাদের ঘরে পাহারা দিয়েছি। তোমাদের দুশমন নই আমি। আমি তোমাদের দুশমন হলে শেঠ রাম তোমাদের দোস্ত না। ভায়েরা! আমার কথা শোন। এরপর তোমাদের মন চাইলে মুসলমানদের ওপর হামলা করো; আমি থাকব সবার সঙ্গে।

যারা উঠে দাঁড়িয়েছিলে বসে গেল। যারা শোরগোল করছিল খামোশ হয়ে গেল। মহিন্দর সিং বক্তব্য দিতে লাগল ঃ

"গুরুর শিখরা! আজতক তোমরা ভেবে দেখনি, মুসলমানরা পেয়েছে পাকিস্তান আর হিন্দুরা ভারত; কিন্তু তোমরা পেয়েছ কি? তোমরা আমার কথা শোননি কোন দিনও। কিন্তু সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আমার মত ভাববে তোমরাও। হিন্দুরা আমাদের সাথে ওয়াদা করেছিল, ভারতকে তারা ভাগ হতে দেবে না। কিন্তু বিভক্তিকে তারা মঞ্জুর করে নিল। ভারতই শুধু খণ্ডিত হয়নি খণ্ডিত হয়েছে তোমাদের নয়নমণি পাঞ্জাবও। এরও একটা অংশ পেয়েছে মুসলমানরা অন্যটা হিন্দুরা। বলো আমাকে— তোমাদের প্রাপ্তি কি এতে? হিন্দুস্থান অখণ্ড থাকলে তাতেও লাভ হিন্দুদের। সে অবস্থায় মুসলমান ও আমরা হিন্দুদের গোলাম হয়ে থাকতাম। মুসলিম জাতি দূরদর্শী। ওরা ওদের অংশ বুঝে নিয়েছে।

তোমরা গুরুর দিকে চেয়ে একটু ভেবে দেখ। পাঞ্জাবের যে অংশ মুসলমানদের ছিল সে অংশ তারা বুঝে নিয়েছে, কিন্তু তোমাদের যে অংশ প্রাপ্য— তা গেল কৈ? জবাব দাও। খামোশ হয়ে গেলে কেন তোমরা? এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই তোমাদের কাছে। শেঠ রামের কাছে পাবে এর জবাব। অবশ্য তিনি তোমাদের উত্তর দেবেন না। কোন হিন্দুও তোমাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেবে না। কেননা, পাঞ্জাবের তোমাদের হিস্যা হিন্দুরা নিয়ে গেছে। এক্ষণে ওরা চাচ্ছে না, তোমরা তোমাদের হিস্যা তলব করো। শেঠ

www.amarboi.org

রাম তোমাদেরকে ওই দাবী থেকে বিমুখ করতে বিষয়টাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চাইছেন। তিনি তোমাদের বলছেন, পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের কতল করো, অতঃপর পাকিস্তানের ওপর হামলাকল্পে অটক-এ মার্চ করো। এতে তোমাদের স্বাধীন খালিস্তান হাসিল হবে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, পাঞ্জাব বিভক্তির পর যে জেলাগুলো পাকিস্তান থেকে আলাদা হল— সেটা কি আমাদের না হিন্দুদের?

ঃ আমাদের'। ক'জন শিখ সমস্বরে বলে উঠল।

ঃ ভায়েরা আমার! তোমরা ঠিকই বলেছ। এটা আমাদের জেলা। আমাদের স্বপ্নের খালিস্তান। এ জেলায় যারা বাস করছে, তারা আমাদেরই প্রজা। প্রজাদের সাথে যে ব্যবহার করার তাদের সাথে তা করব। কিন্তু হিন্দুরা আমাদের দিয়ে মুসলিম হত্যা করাতে চাইছে কেন? এর একমাত্র কারণ, আমরা এই কাজে লাগি— যাতে ওরা নিশ্চিন্তে পূর্ব পাঞ্জাবকে গ্রাস করে নিতে পারে। ভাইয়েরা আমার! তোমরা মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে চাইলে বাধা দেব না আমি। তবে এর পূর্বে তোমরা হিন্দুদের থেকে লিখিত ডকুমেন্ট নাও যে, মুসলিম হত্যার পর এ পাঞ্জাব-ই শিখ সম্প্রদায়ের খালিস্তান। হিন্দুরা এখানে মাথা ঘামাবে না, শাসনও করবে না। কংগ্রেস লিডারদের বলো, একে আগেভাগেই খালিস্তান ঘোষণা করতে— অতঃপর মুসলিমদের সাথে করো বোঝাপড়া। মুসলমানরা শিখদেরকে পাকিস্তান- তাড়া করলে আমরাও পূর্ব পাঞ্জাব থেকে তাদের মেরে তাড়া করব। ওরা পাকিস্তানে আমাদের সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে এখানেও আমরা ওদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখব।

চরণ সিং বললেন— ভায়েরা! এ মুসলিম জাতির দালাল। ওর কথায় কান দিও না।

মহিন্দর বলল— সর্দারজী! আমি মুসলিম-দালাল হতে যাব কেন? আমি কিছুতেই হিন্দুদের খেলার পুতুল হতে চাই না। হিন্দুরা গোড়ার দিকে ধারণা করত, আমরা না আবার স্বাধীন খালিস্তানের দাবী করে বসি। এজন্য ওরা চতুরতার সাথে আমাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে এবং স্বাধীনতার দাবী থেকে করেছে বিমুখ। আমাদের নেতারা খালিস্তানের নারা লাগিয়েছিলেন, কিন্তু সময় যখন এল তখন তারা অখণ্ড ভারতের দালালদের সাথে সঙ্গ দিলেন এবং খালিস্তান দাবীর স্থলে এমন লোকদের পিছু নিলেন যারা গোটা হিন্দুস্তানকে নিজেদের জায়গীর মনে করে।

ভায়েরা! আজ হিন্দুরা পূর্ব পাঞ্জাবে তোমাদের হাতকে মুসলিম খুনে রঙিন করতে চাইছে। এরাই কালে কালে তোমাদের পিঠে ছোরা ঢুকিয়ে বলবে— আগে বাড়ো এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ময়দানে নামো! আমরা পাঞ্জাবের হিন্দু এলাকা দখল করে নিলেও সেটা পূর্ব পাঞ্জাবের মত হিন্দুদের খাই খাই উদরে ঢুকে যাবে। পক্ষান্তরে, সম্ভাব্য ওই যুদ্ধে আমরা মারা গেলে হিন্দুরা উল্লাস ধ্বনি করবে। কেননা, তখন খালিস্তান স্বাধীনতার কণ্ঠ তিরোহিত।

ওরা চায়, পাকিস্তান ফের হিন্দুস্তানে শামিল হোক। কিন্তু নিজেরা ময়দানে না নেমে তোমাদেরকেই বলির পাঠা করার মনস্থ করেছে। আজো মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্যান্য লিডাররা দুনিয়ার কাছে নিজেদেরকে মুসলিমদের প্রতি পরমতসহিষ্ণু প্রমাণ

www.amarboi.org

করছে আর শিখদের পর্দার আড়ালে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। একেই বলে ব্রাহ্মণের চাণক্য কূটকৌশল।

তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের তোমরা বের করে দেবে। তোমরা ওই প্রতিবেশীর ঘরে আগুন দিতে যাচ্ছ, গ্রন্থ ও গাভীর গাত্রস্পর্শ করে দোস্তির পয়গাম দিয়েছিলে যাদের। যে বন্দুক হিন্দুদের চালানোর কথা সেটা চালানো হচ্ছে তোমাদের দিয়ে। তোমরা ওই শিখদের কথা চিন্তা করে দেখেছ, যারা পাকিস্তানে রয়েছে? যে মুসলমানদেরকে তোমরা এখান থেকে বের করে দিচ্ছ, পাকিস্তানে গিয়ে তারা কি ওখানকার শিখদের বের করে দেবে না?

জনৈক শিখ দাঁড়িয়ে বলল— আমরা কোন মুসলমানকেই যিন্দা ফেরত দেব না। পাকিস্তানের শিখদের বাঁচানোর দরকার হলে আমরা ওখানে মার্চ করব!

শিখেরা শোরগোল করতে লাগল— আমরা ওখানে যাব— অবশ্যই যাব— সত্যাশ্রয়ী আকালী— গুরু নানক কি জয়।

মহিন্দর চিৎকার করে বলল— ভায়েরা! আমি তোমাদের পথ আগলাব না। আমার কথা তো শুনবে তোমরা। আমরাই তো এখানে। এখানে কোন মুসলমান নেই। যখন মাস্টার তারা সিং অমৃতসরে দাঙ্গা বাধিয়েছিল, পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আমরা মুসলমানদের ওপর। আমাদের প্রস্তুতিও ছিল অসাধারণ। মাস্টারজী ভাবছিলেন, একদিনেই বিজয় হাসিল করে লাহোরে উপনীত হবেন। কিন্তু এর পরিণতি কি হয়েছিল? পাঞ্জাবে আমাদের যে দাপট তাও ভেস্তে গেল। এক্ষণে হিন্দুরা সান্ত্বনা দিচ্ছে, ফৌজ, পুলিশ ও রাজ্য আমাদের মদদ করবে। কিন্তু এ বুঝ এখনও আমাদের হয়নি যে, পুলিশের সহায়তা ছাড়া পূর্ব পাঞ্জাবের নেড়েদের ওপর যেখানে আমরা হামলা করতে পারছি না সেখানে পাকিস্তানের ওপর হামলা করব কিভাবে? আর সেক্ষেত্রে ফৌজ আমাদের সঙ্গ দিলে সেতো এক মারাত্মক যুদ্ধ। পাক-ভারত যুদ্ধ। হিন্দুরা জয়ী হলে তাতো হবে অখণ্ড ভারত। কিন্তু এতে শিখ-শক্তির যবনিকাপাত ঘটলে তোমরা স্বাধীন খালিস্তানের নামোচ্চারণও করতে পারবে না। অখণ্ড ভারতের পথের কাঁটা মনে করে তোমাদের স্বপ্নের সেই খালিস্তানকে ওরা পদদলিত করবে। পক্ষান্তরে, হিন্দুরা যুদ্ধ করে ভুল করছে বুঝলেই সন্ধির হাত বাড়াবে পাকিস্তানের প্রতি। সে অবস্থায় যুদ্ধের যাবতীয় দায়ভার চাপবে শিখদের ওপর।

ভায়েরা আমার! আমার কথা হয়তো একদিন তোমাদের মনে পড়বে। বিজয় মুসলমানদের পদচুম্বন করলেও আমরা মারা যাব। ওরা পূর্ব পাঞ্জাবের এক একটা বাচ্চার ওপরও প্রতিশোধ নেবে। হিন্দুরা বিজয়ী হলে তোমাদের খালিস্তান কোনদিনও সূর্যের মুখ দেখবে না। ওদের ফৌজ আজ মুসলিম হত্যাকল্পে তাদের বন্দুকগুলো তোমাদের দিচ্ছে, কাল যখনই তোমরা 'খালিস্তান-জিন্দাবাদ' নারা লাগাবে তখন এই ফৌজ-ই তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। মতলব হাসিল করতে হিন্দুরা আজ মাস্টার তারা সিং-এর গলে ফুলের মালা দিচ্ছে, কাল দেখবে ওই হিন্দুরাই তাকে জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে ঢুকাচ্ছে। ওই সময় তোমরা বিদ্রোহও করতে পারবে না।

www.amarboi.org

তোমরা কেবল মুসলমানদের সাথে হাত মিলিয়ে খালিস্তান পেতে পার। কিন্তু এখানে হিন্দুদের জিত এভাবে যে, একদিকে তারা তোমাদের খালিস্তান কব্জা করছে অপরদিকে যাদের দ্বারা তোমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা— তাদের কচুকাটায় অস্ত্র দিয়ে মদদ করছে।

ভায়েরা আমার! বাহাদুর কোন প্রতিদান এভাবে শোধ করে না। আজ তোমরা যাদের ঘরে হামলা করছ কাল তারা তোমাদের ঘর পাহারা দিয়েছিল। ওরাই তো আমাদের মা-বোনকে ওদের মা-বোনের সমতুল্যে ভেবে নিয়েছিল। চৌধুরী রহমত আলীর খান্দান কোন মুসলমানকে এ এলাকায় সন্ত্রাস হতে দেবে না। যেদিন ঘোষণা এসেছিল যে, গুরুদাসপুর পাকিস্তানে পড়েছে সেদিন আমরা মুসলমানদের ওয়াদা ভঙ্গের আশঙ্কা করেছিলাম; কিন্তু ওরা ওদের অঙ্গীকার পূরণ করেছে। আজ এই জেলা আমরা পেয়ে গেছি। আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, শিখ জাতি সৎ কাজের বদলা অসৎ কাজের মাধ্যমে দেয় না। ওদেরকে এখানে থাকার অনুমতি না দাও তো ওদের হিজরতের মওকা দাও।

এ সেই আম্রকানন যেখানে শান্তি কমিটির মিটিং হয়েছিল। যেখানে সর্দার চরণ সিং গ্রন্থ আর শেঠ রামজী গো-মাতার গা ছুঁয়ে হলফ করেছিলেন। নিজেদের ওয়াদার স্মৃতিচারণ করো। মুসলমানদের ওপর হামলা করতে চাইলে ক'দিন ভেবে-চিন্তে নাও। চিন্তা করে নাও, পূর্ব পাঞ্জাবের নিগৃহীত মুসলিমের প্রতিশোধ-ঝাল পশ্চিম পাঞ্জাবের শিখদের ওপর কি হারে হবে!

চরণ সিং বলল— এক লোকের কথায় আমরা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত রদ করতে পারি না। এখন গোটা পাঞ্জাবে হামলা শুরু হয়ে গেছে। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে পঞ্চায়েতের সামনে মুখ দেখাব কি করে? দুশমনকে সুযোগ দিলে কাড়ি কাড়ি টাকা নিয়ে পালানোর সুযোগ পাবে। আজ পর্যন্ত রহমত আলী কোন মদ্যপকে তার ভূ-সম্পত্তি থেকে অতিবাহিত হতে দেয়নি, কিন্তু তার বধূ-মাতাদের হাতেই শরাব পান করব আজ।

মহিন্দর চিৎকার দিয়ে বলল— তাঁর বধূ-বেটিদের নাম মুখে এনো না। উনি আমাদের বধূ-মাতাদের সর্বদাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে আসছেন। আগুন এক ঘরে জ্বললে তা অন্য ঘরেও লাগে। অপরের বধূ-মাতাদের ওপর কেবল সেই লোকই চোখ ফেলতে পারে, নিজের বধূ-মাতাদের ইয্যত নেই যার কাছে।

চরণ সিং গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে পিস্তল বের করে মহিন্দরের দিকে এগিয়ে এল— এ জনপদের বেইয্যত হতে দেব না আমরা। এ জনপদের কোন শিখ মুসলমান হয়ে থাকলে তার মদদের দরকার নেই আমাদের। তারাই আমাদের সঙ্গী, যাদের হিম্মত আছে। শিখ ভায়েরা! তোমরা কি মুসলমানদের পক্ষে, না পঞ্চায়েতের পক্ষে?

মহিন্দরের গ্রামের একজন শিখ দাঁড়িয়ে বলল— সর্দার চরণ সিং! চেয়ে চেয়ে কি দেখছেন, মারুন গুলি! আমরা আপনার সঙ্গে আছি। এ জনপদের কোন শিখই পঞ্চায়েতের নয়।

www.amarboi.org

ঃ হ্যাঁ, আমাকে গুলি করো। আমি কেবল তোমাদের পতন দেখতে পারি।' বলে মহিন্দর অগ্রসর হল, 'যে গর্ত তোমরা খুদছ তাতে পতিত হবে খোদ্ তোমরাই। সেদিনটির অপেক্ষায় বেঁচে থাকতে চাইনে আমি।

চরণ সিং-এর পিস্তলের নল মহিন্দরের বুক ছুঁতেছিল। দর্শকরা দিচ্ছিল চিৎকার— সর্দারজী! গুলি করো। ও গাদ্দার। পঞ্চায়েতের দুশমন।

মহিন্দর বলল— হ্যাঁ, জলদি গুলি চালাও! কাঁপছে কেন তোমার হাত?

সেই সঙ্গে ঘোড়ার খুর ধ্বনি শোনা গেল। লোকেরা উঠে শহরের দিকে সরু পথটির দিকে তাকাল। বন্দুক, রাইফেল ও পিস্তল সজ্জিত ৮ জন সওয়ার আম্রকাননে এসে দাঁড়াল। চরণ সিং, বলনাথ সিং ও সাব-ইন্সপেক্টরকে দেখে মহিন্দরের বুক থেকে পিস্তল নামাল।

সাব-ইন্সপেক্টর অত্র এলাকার শিখদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি ঘোড়া আগে বাড়িয়ে বললেন— তোমরা এখানে কি করছ? আমরা দু'টো গ্রাম ধ্বংস করে এসেছি। বসে তামাক টানা হচ্ছে বুঝি?

চরণ সিং বলল— স্যার! ক্যাপ্টেন বলনাথ সিং-এর ভাই আমাদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও বলছে, আমরা যদি রহমত আলীর বাড়ীতে হামলা করি তাহলে সে মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করবে।

দারোগা বলনাথ সিং-এর দিকে তাকালেন। বলনাথ ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে বলল— ওর শিরায় আমার বাবার রক্ত নেই। এ ধরনের আত্মসম্ভ্রমবোধহীন আমার ভাই হতে পারে না। শুরু থেকেই ও মুসলমানদের পক্ষপাতী।'

মহিন্দর জবাব দেয়— তোমাদের চিন্তায়-ই আমি মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছি।

ঃ বদমাশ! আমার মুখের ওপর এত বড় কথা। বাবার নামের প্রতি তুমি অবিচার করছ। পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কথা বলছ তুমি।' বলল বলনাথ।

ঃ পঞ্চায়েত বে-গোনাহকে কতলের এজাযত দিলে সেই পঞ্চায়েতের বিরোধী আমি।

ঃ খামোশ!' বলনাথ অগ্রসর হয়ে পূর্ণশক্তিতে ওর গালে চড় বসিয়ে দেয়। মহিন্দর পড়তে পড়তে বেঁচে যায়।

চরণ সিং-এর পুত্র মোহন সিং অগ্রসর হয়ে বলে— মাস্টার তারা সিং-এর বেইয্যতি করছে সে। ও আমার ভাই হলে যিন্দা থাকত না এতক্ষণে।

মহিন্দর অগ্রসর হয়ে ভাইয়ের হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বলল— ভাই! আমাকে মেরে ফেলো। তবুও ওই পাপে হিস্যা নিতে যেও না।

সাব-ইন্সপেক্টর অগ্নিশর্মা হয়ে বলল— মুসলমানদের মারলে পাপ হলে আমাদের গুরুও (নানক) পাপী। শিখ ভায়েরা! কি শুনছ তোমরা? বলনাথ সিং! তুমি বলেছিলে অত্র এলাকার শিখরা পুরো তৈরী, কিন্তু তোমাদের পরিবারের মধ্যেই এ হাঙ্গামা!

ঃ 'আমি এ হাঙ্গামাকে এখনই শেষ করছি' বলে বলনাথ সিং এলোপাতাড়ি মহিন্দরকে মারতে লাগল। মহিন্দর মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু লাথি যেন বলনাথের

www.amarboi.org

থামতেই চায় না। আচমকা এক যুবতী চিৎকার দিতে দিতে বলনাথকে জড়িয়ে ধরল। যুবতী ওর বোন বাসন্তী। 'ভাই! তোমার হল কি, কি দোষ মহিন্দরের? কেন মারছ ওকে?'

ঃ হারামাযাদী! তুই এখানে এস্ছিস কেন? ভাগ এখান থেকে' বলে বোনের গলা ধাক্কা দিল। ক'কদম দূরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাসন্তী।

মহিন্দর উঠতে কোশেশ করল। বলনাথ ওর কোমরে লাথি মারল। আবারো মুখ থুবড়ে পড়ল মহিন্দর। বাসন্তী ফের ভাইকে জড়িয়ে ধরল। বলল— চিৎকার দিয়ে— তোমরা মহিন্দরকে বাঁচাও। আমার ভাই আজ অতিরিক্ত মদ গিলেছে। ওর হুঁশ নেই। জানা নেই ও করছে কি। শরাবের নেশায় বুঁদ ও। বলনাথ সিং বোনের চুলের মুঠি ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। 'হারামযাদী! আমি জানি আমার মেশিনগান তুমিই লুকিয়েছ। তোমার চামড়া ছিলে লবণ দেব। বল্ আমার মেশিনগান কোথায়? জানে মেরে ফেলব তোকে।

বাড়ীর সামনে এসে বলনাথ ওকে এলোপাতাড়ি মারতে লাগল। মা চিৎকার দিয়ে বোরোলেন। তিনিও বলনাথের হাত ধরে মিনতি জানালেন। মা-ও ওর থেকে বাসন্তীর ব্যবহার পেল।

বলনাথ আবারো বোনের চুল মুঠে নিয়ে বলল— বল্ কোথায় আমার টমীগান?

✪ ✪ ✪

শহরের অনেক লোক আলী আকবরের যখম হওয়ার খবর শুনে হাসপাতলে জড় হল। ফাজ্জু সলীম ও মজীদের ঘোড়ার কাছে দাঁড়ানো। মজীদ হাসপাতালের এক কামরা থেকে বেরোল। লোকেরা ওর পাশে জমায়েত হয়ে আলী আকবরের খবর জানতে চাইল। মজীদ এসব প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে ফাজ্জুর কাছে গিয়ে বলল— ফাজ্জু তুমি যাও! ওদেরকে আসতে নিষেধ করো। আমরা তাঁকে নিয়ে আসছি। চাচা আফজালকে বুঝিয়ে দিও— ডাক্তার অপারগতা প্রকাশ করেছে; রোগী ক'মিনিট বাঁচবেন আর।

চাচা আফজালকে হুঁশিয়ার থাকতে বলবে। পথিমধ্যে আমরা শেঠ রামের কাছারীতে হামলার পূর্ব প্রস্তুতির কথা জেনেছি। সকাল থেকে এ জনপদের অনেক বাড়ীতেই শিখদের হামলা হয়েছে। বাড়ীর কাউকেই এখানে আসতে দেবে না। এখানে কারো অপেক্ষার দরকার হলে সলীমকে রেখে যাবে। এখন তুমি যেতে পার।

হাসপাতালের বেডের সামনে সলীম দাঁড়ানো। ডাক্তার দ্বিতীয় ইনজেকশন দিয়ে সলীমকে বলল— মিঃ সলীম! ওনার কিছুক্ষণের জন্য হুঁশ আসলেও আসতে পারে। আপনি ইচ্ছে করলে কথাও বলতে পারবেন। আমি অন্য পেশেন্ট দেখে আসি। আমি একথা বলব না যে, কোন আশা নেই। কুদরত কখনও মোজেযা দেখান। আপনি দোয়া করুন। আমি চেষ্টায় কোন ত্রুটি করিনি।

ডাক্তার চলে গেল। খানিক বাদে মজীদ কামরায় দাখেল হল। চুপচাপ সলীমের পাশে এসে দাঁড়াল।

মিনিট দশেক পর হুঁশ ফিরে পেয়ে আলী আকবর চোখ খবলল।

www.amarboi.org

সলীম ও মজীদকে দেখে তার দুর্বল ঠোঁট বিড়বিড় করে উঠল— বেটা! বাড়ী যাও— ওরা হামলা করবে— অতি অবশ্যই বাড়ী আক্রান্ত হবে— সলীম বেটা! তোমার মা তোমার বিয়ের জন্য আংটি আনতে বলেছিলেন— আমার ব্যাগে আছে তা— ডাক্তার শওকতের বাড়ীও হিন্দুস্তানে পড়েছে। এক্ষণে তিনি তোমাকে এখানে থাকতে দেবেন না; কিন্তু ভারত ছাড়ার পূর্বে তোমরা শিখদের বুঝিয়ে দিও, তোমরা মুসলমানদের সন্তান। মজীদ! খান্দানের ইয্যত রক্ষা করো। এখন তোমরা যাও! যাও খোদার দিকে চেয়ে। আমার চিন্তা করো না। তুফান আসার পূর্বে বাড়ী ফিরে যাও। শিখ-হিন্দুদের বন্ধুত্বের ওপর ভরসা করো না। ওরা ততক্ষণ তোমাদের বন্ধু ছিল, যতক্ষণ তোমাদের ভয় ছিল ওদের মনে। এক্ষণে পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানদের কোনই আশ্রয়স্থল নেই। জান, সর্বপ্রথম কে আমার বুকে গুলি চালিয়েছিল? সে আর কেউ নয়, আমার সহপাঠী। সে এক শিখ। শিখরা এভাবেই বন্ধুত্বের প্রাপ্তি বুঝিয়ে দেয়; কিন্তু আমাদের পাকিস্তান আমরা পেয়ে গেছি। এক্ষণে কেউই আমাদের দুনিয়া থেকে বিলীন করতে পারবে না।'

দীর্ঘ ১৫ মিনিট মজীদ ও সলীমের সাথে কথা বলল। সলীম মনে করল, কুদরত তাঁর মোজেযা দেখিয়ে ফেলেছেন। নার্সকে দেখে ও বলল— নার্স! ডাক্তারকে ডাকো। এক্ষণে স্বাস্থ্য উন্নতির দিকে। তিনি অপারেশন করে গুলি বের করতে পারেন।

নার্স জানত, এই ভালো ভালো না। এ হচ্ছে শেষ ভালো হওয়া। এতদসত্ত্বেও সলীমের পীড়াপীড়িতে সে ডাক্তার ডাকতে গেল। ডাক্তার এলে সলীম মিনতি করে বলল— ডাক্তার সাহেব। আব্বাজান এইমাত্র আমাদের সাথে কথা বলেছেন। তাঁর স্বাস্থ্য বিলকুল সুস্থ। কিন্তু আচমকা তিনি কেমন যেন খামোশ হয়ে যান। সলীমের কথায় ডাক্তার রোগির চোখ খুলে দেখলেন। পরে মুখ ভার করে বললেন— তার কথা বলা নিছক মোজেযা বৈকি! ইনজেকশন দেয়ার পর তাঁর হুঁশ আসবে বলে মনে করিনি। সরি মিঃ সলীম। হি ইজ ডেথ্।

স্থানুর মত বাপের লাশের দিকে তাকিয়ে সলীম। এই খানিক পূর্বেও ও ভাবেনি যে, কথা বলতে বলতে তিনি নিস্তব্ধ হয়ে যাবেন। তাও আবার চিরদিনের তরে। মজীদ ওর কাঁধে হাত রাখল। সলীম ওর দিকে তাকাল। ওর ঠোঁট দুটো ফুলে-ফেঁপে ওঠল। সাথে সাথে ওর চোখ দিয়ে বেরোল গরম দু'ফোটা অশ্রু। মজীদের চোখেও অশ্রুর প্লাবন। সলীমের চোখের অশ্রু শেষ। শহরের কিছু লোক খাটিয়ায় করে আলী আকবরের লাশ গ্রামের বাড়ী প্রেরণের প্রস্তুতি নিল। ওরা তখনও হাসপাতালের চৌহদ্দীতে, এমন সময় এক জোয়ান দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে এল। কিছুদূরে ঘোড়া থামিয়ে চিৎকার দিয়ে বলল— শিখরা গ্রামের বাড়ী হামলা করেছে।

লাশের খাটিয়া গাছের নীচে নামিয়ে জনৈক নওজোয়ান থেকে ঘোড়ার লাগাম নিয়ে মজীদ বলল— সলীম! তুমি এখানে থেকো। আমি যাচ্ছি।

সলীম অপর এক লোকের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে বলল— তোমার সাথে যাব আমিও।

ঃ কিন্তু তুমি যে রিক্তহস্ত!'

www.amarboi.org

ঃ আমরা দু'জনই রিক্তহস্ত, নিরস্ত্র।' ঘোড়ার রেকাবিতে পা রেখে বলল সলীম।

মজীদ বৃদ্ধ এক হাজী সাহেবকে লক্ষ্য করে বলল— হাজী সাহেব! এ লাশ আপনার কাছে আমানত। সন্ধ্যার আগে আমাদের কোন খবর না পেলে দাফন করে দেবেন।

বৃদ্ধ হাজী অশ্রুসজল নয়নে বললেন— বেশ তাই হবে। আপনারা যান।

মজীদ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলে জনৈক নওজোয়ান লাগাম ধরে বলল— আপনার কাছে কোন অস্ত্র নেই। এটা নিন।

মজীদ ওর হাত থেকে ছোট একটা ছোরা নিল। আরেক এক নওজোয়ান আগে বেড়ে সলীমকে বলল— মিয়া সলীম দাঁড়ান। আমার কাছেও একটা জিনিষ আছে।

নওজোয়ান পাজামার তা থেকে রুমালে পেঁচানো একটা বস্তু বের করল। ওতে একটা রিভলবার পেঁচানো। এ সেই জোয়ান সলীম ক'মাস পূর্বে লাহোরে সাইক্লোস্টাইল মেশিন আনতে গিয়েছিল যার কাছে।

"এটি ভরা। আপনাকে আরো কিছু গুলি দিচ্ছি। পাজামার গিঁট খুলে গুলির ম্যাগজিন বের করল যুবক। বলল— গোটা চল্লিশেক পাবেন এতে। আমার চিন্তা করবেন না। আমার কাছে নিম্নমানের রিভলবার আছে একটা।

সলীম সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে যুবকের দিকে তাকালো। ঘোড়ায় করল পদাঘাত। খানিকদূর গিয়ে বলল— মজীদ! রিভলবারটা তুমি নাও। ছোরারা দাও আমাকে—!'

ঃ এখন হল। সামনে গিয়ে ওটা না হয় নিয়ে নেব।'

মজীদ, সলীম ও ফাজ্জু দ্রুত ঘোড়া হাঁকাল।

✪ ✪ ✪

জনপদের যেসব মুসলমান শিখদের ওপর ভুল ধারণাবশত অনর্থক ভরসা করে বসেছিল তারা ছাড়া অন্যান্য মুসলমানরা রহমত আলীর হাবেলীতে জমায়েত হল। হামলাবাজ কুলাঙ্গার শিখরা ওই হাবেলীর ১০০ গজ দূরে 'সত্যাশ্রয়ী আকালী' বলে থমকে দাঁড়াল।

পৃষ্ঠপোষক দারোগা বলনাথ সিংকে বলল— এক্ষণে এই ফৌজের সর্দার তুমি। সন্ধ্যা পর্যন্ত গোটা এলাকা চষে ফিরতে হবে আমাকে। বেশী একটা কার্তুজ খরচা করা যাবে না এখানে। বলনাথ সিং বলল— সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি ভাল খবরই পেয়ে যাবেন।

ঃ হ্যাঁ, ভাই! এই ঘরের মালের বড় একটা অংশ আমার চাই।

ঃ সে চিন্তা আপনাকে না করলেও চলবে। সব মালমাত্তা আপনার চরণে ফেলব। আপনি যেভাবেই চান ভাগ হবে সেভাবেই।

ঃ আমার মতলব, খুবছুরত মাল।

ঃ সর্দারজী! আমার সে মাল একটা হলেই চলবে। বাকী সব আপনার।

সাব ইন্সপেক্টর সশস্ত্র চারজন সাথে নিয়ে ঘোড়া হাঁকাল।

www.amarboi.org

বলনাথ সিং শিখ স্বেচ্ছাসেবীদের ক'অংশে ভাগ হয়ে হামলা চালানোর নির্দেশ দিল। অন্দর মহলের দেয়াল সুউচ্চ থাকায় ওদিক দিয়ে হামলা যুৎসই নয়। বাসগৃহের বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে উঁচু দুটো দালান। এর পেছনে বাইরের হাবেলীর পশুশালা। এর মাঝখান দিয়ে সরু একটা গলি ফটক পর্যন্ত। বলনাথ সিং ওই সরু গলি দিয়ে শিখদের বাড়ীর ছাদ থেকে হামলা চালানোর নির্দেশ দেয়।

একদল বালাখানার উপর উঠতে যাবে ঠিক ওই মুহূর্তে গোলাপ সিং বর্শা হাতে মাঝপথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন— আমি তোমাদের সামনে অগ্রসর হতে দেব না।' তার আওয়াজ খুবই জোরালো।

ঃ সরে যাও!' জনৈক শিখ রাইফেল তাক করে বলল।'

ঃ আমার লাশের ওপর দিয়েই তোমরা যেতে পারবে!

ঃ কে এই লোক?' বলনাথ সিং অগ্রসর হয়ে বলল— 'গোলাপ সিং বুঝি! শেষ পর্যন্ত এভাবেই নিজকে বাপের বেটা বলে প্রমাণ করছ।

গোলাপ সিং এই তেতো কথার জবাবে তার বর্শা তাক করলেন। জনপদের ক'জন শিখ বলনাথ সিংকে বোঝাল, অন্দর সিং-এর পৌত্রের ওপর হাত ওঠালে অন্যান্য শিখরা ক্ষেপে যাবে। এ বচসা যখন চলছিল তখন অন্দর সিং লাঠি ভর দিয়ে হেঁটে আসলেন। তাঁর পেছনে গোলাপ সিং-এর চাচা ও জনপদের জনাকয়েক শিখ। সকলেই বর্শা ও নানান অস্ত্রে সজ্জিত। অন্দর শিং এদের নিকটে এসে বললেন— গোলাপ সিং সরে যাও। তাদেরকে রুখো না।

গোলাপ সিং তো অবাক। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্যান্য শিখরাও পেরেশান হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

ঠাকুরদা'র দিকে তাকিয়ে গোলাপ বলল— ঠাকুর দা! ওরা আমাদের গাঁয়ে হামলা করতে এসেছে।

ঃ এটা শিখ-মুসলিম লড়াই। এ পর্যন্ত একটা ধিক্কারই পেয়ে এসেছি স্বজাতির থেকে। রহমত আলীকে আমি নাকি ডরাই। কিন্তু সে ধিক্কার এরপর আর কেউই দিতে পারবে না আমাকে।

ঃ ঠাকুরদা, আমরা না গ্রন্থের ওপর হাত রেখে কসম খেয়েছি? আপনিই তো রহমত আলীকে ভাই ডেকেছেন!

ঃ সে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের যবনিকাপাত ঘটেছে। আজ আমি কেবল একজন শিখ।' বলে তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে বুলন্দ আওয়াজে বলেন— রহমত আলী! তোমার বাড়ীতে বরযাত্রী এসেছে। ছাদে লুকিয়ে কেন? বের হও! তাদের খোশ আমদেদ জানাও।

রহমত আলী কিছু লোকজনসহ বুরুজে আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি ফওরান উঠে দাঁড়িয়ে কিনারে আসেন। বালাখানার ছাদ থেকে আফজাল চিৎকার দিয়ে বলেন– আব্বাজান! বসে পড়ুন। পিছে যান। ওদের হাতে বন্দুক।

www.amarboi.org

তিনি বেপরোয়া বলেন— কেউ আমাকে মারবে না। কারো ক্ষতি তো করিনি। আমাকে কথা বলতে দাও। রহমত আলী হাত ঝুঁকিয়ে নীচের শিখদের লক্ষ্য করে বললেন— কি চাও তোমরা? আমরা তোমাদের কোন উস্কানি দিয়েছি কি? তোমাদের ঘরে পাহারা সেতো আমরাই দিয়েছিলাম। গ্রন্থের ওপর হাত রেখে কসম খেয়েছিলে সেতো তোমরাই। সে কসম ও অঙ্গীকারের প্রতি এতটুকু প্রতারণা পেয়েছ কি আমাদের থেকে? তোমাদের বধূ-মাতা...'

রহমত আলী তার কথা শেষ করতে পারেননি ইতোমধ্যে জনৈক শিখ বন্দুক চালায়। গুলি লাগে তাঁর মাথায়। তিনি পড়েন মুখ থুবড়ে। তাঁর বক্ষ বুরুজ আর বাযু পড়ে বাইরে ঝুলে। তাঁর ভাই তাকে ওঠানোর কোশেশ করেন। বলনাথ সিং এরপর দু'দুটো ফায়ারিং করে। তিনি আরো আহত হন। এদিকে গোলাপ সিং বর্শা দিয়ে বলনাথের ওপর আক্রমণ শানায়। কিন্তু মোহন সিং তার ওপর পিস্তল চালায়। সেও ভূতলশায়ী হয়। অন্দর সিং-এর হাত থেকে লাঠি পড়ে যায়। তিনি চিৎকার দিয়ে নাতির লাশের ওপর আছড়ে পড়েন। বালাখানার ওপর দিয়ে আফজাল পরপর ফায়ারিং করেন। তিনজন শিখ লুটিয়ে পড়ে। শিখরা হতাশ হয়ে পিছপা হয়। আফজাল নারা লাগান। পেছনের হাবেলীতে সমবেত মুসলমানরা দেন 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি।

পিস্তলের গুলি খেয়ে দূরত্ব বজায় রেখে শিখরা পাল্টা এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। রহমত আলীর আধা দেহ তখনও ঝুলন্ত। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান তিনি। সিঁড়ি টপকে তার বিবি স্বামীর এ দশা অবলোকন করে বেপরোয়া সামনে অগ্রসর হন। স্বামীর নিকটে আসতেই সীনা ও মাথায় দুটো গুলি লাগে তার। পড়তে পড়তে স্বামীর লাশের কাছে তিনি পৌছান। অবশ্য অনেক পরে তার আগমন টের পায় ছয় রক্ষীরা।

সলীমের বোন যুবায়দা মহলের ছাদে উঠলে আফজাল দেখামাত্রই চিৎকার দিয়ে বলেন— যুবায়দা! আগে যেও না। পেছনে সরো।' যুবায়দা ইতস্তত করছিল, মা এসে ওকে পেছনে নিয়ে যান। আফজাল আবারো বলেন— ভাবী! কাউকেই ওপরে আসতে দেবেন না। নারী-শিশুদের মহলের দরোজা বন্ধ করে বসিয়ে দিন।

জনৈক নওজোয়ান হামাগুড়ি দিয়ে রহমত আলী ও তার বিবির লাশ দেয়াল থেকে নামিয়ে নিচে শুইয়ে দেন।

বলনাথ সিং-এর নির্দেশ মোতাবেক শিখেরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে সামনে অগ্রসর হল। যে দলটি সতর্কতার সাথে আখ ক্ষেত দিয়ে এগোচ্ছিল তারা সহসাই ফটকে গিয়ে পৌছুল। অপর দলটি গলিপথে ইটবৃষ্টির সম্মুখীন হল। সেই সাথে আফজাল গুলি চালালেন। চারজন পিস্তলের গুলিতে আর জনাপনেরো ইটের-আঘাতে যখমী হল। অন্যরা পালাল উর্ধ্বশ্বাসে।

বলনাথ সিং বিপদ বুঝে সকলকে ইক্ষুক্ষেত দিয়ে ঝিলের কিনারে আত্মগোপন করতে নির্দেশ দেয়।

✪ ✪ ✪

www.amarboi.org

বসতীর দক্ষিণ দিকস্থ ইক্ষুক্ষেতে ৮/১০ জন লোক জড় হয়েছিল। মজীদ সোজা বাড়ী না গিয়ে ক্ষেতের ঠিক মাঝখানে ঘোড়া থামাল। দ্রুত ক্ষেতে লুকাল। সলীম ও ফাজ্জু ওর অনুসরণ করল। মুহূর্তে ওরা বড়ই গাছের তলে উপনীত হল। ঘোড়াগুলো ওই গাছে বেঁধে এলাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। জনপদে 'নারায়ে তাকবীর— আল্লাহু আকবরের' পাশাপাশি 'সত্যাশ্রয়ী আকালী' ধ্বনি শোনা গেল। শোনা গেল বন্দুক-রাইফেলের দ্রিম দ্রিম আওয়াজ। ক্ষেতের অপরপ্রান্তের সরুপথ ধরে ওরা এগুচ্ছে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে ওরা ওই পথ ছেড়ে ক্ষেতের আইল ধরে চলল। কদম চল্লিশেক চলার পর মজীদ ঘাড় কাত করে সাথীদের উপস্থিতি অনুমান করতে চাইল এবং লঘুপায়ে চলতে লাগল। ১০/১৫ কদম চলার পর থমকে দাঁড়াল। থমকে দাঁড়াল ওর দু'সঙ্গীও। এখানে দাঁড়িয়ে পাইন গাছের সারি ও কাঁকড়ী ক্ষেত দেখা যায়। মজীদ অনুচ্চস্বরে বলল— তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো।

পাঁচ-ছ' কদম এগুতেই মজীদ শুনতে পেল কে যেন বলছে— শেঠ রামচাঁদ! আমার বারুদ বলনাথ সিং নিয়ে নিছেন।

ঃ বলনাথ সিংয়ের গোলাবারুদ কি শেষ?

ঃ কিছু লোক ওগুলো নিয়ে মসজিদের ওপর চড়েছে। ওখান থেকে শিকার টার্গেট সুবিধেজনক। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ফায়সালা হয়ে যাবে। আরে কন্দন লাল তুমি এখানে কেন দাঁড়িয়ে। দেখো না কে আসছে এদিকে?

ঃ কেন, কোন ভয় আছে কি?

ঃ কে আসছে, সে ভাবনা আমারও? ঠিক আছে, হল না তামাশা দেখি!

শেঠ রামচাঁদ বলল— না সর্দারজী। ওদিকে যাওয়াটা আপনাকেই মানায়। আমরা এখানে বসেই ফায়ারিং করব। নিশানা ঠিক হোক না হোক, এলোপাতাড়ি গুলির দরুন কিছু মানুষ এদিকে খেয়াল রেখে বিব্রতবোধ করবেই। বলনাথ সিং এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। ভগবানের কৃপায় ২০/২৫ জন সশস্ত্র লোকের মোকাবেলায় আপনার পুত্র একাই যথেষ্ট।

মজীদ হাতের ইশরায় সাথীদেরকে ওর কাছে আসতে বলল এবং হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। ওদের কিছু দূরে শেঠরাম, কন্দন লাল ও চরণ সিং দাঁড়ানো। সকলের হাতেই রাইফেল। রামচাঁদ থলে থেকে গুলি বের করে চরণ সিংকে দিচ্ছিল। মসজিদ থেকে ৮/১০ রাউন্ড গুলি হল। চরণ সিং বলল— দেখলে, বলনাথ সিং ফায়ারিং শুরু করেছেন।

রামচাঁদ বলল— দোস্ত! ওর ভাই বড় বেয়ারা।

ঃ দোস্ত! এটা কেমন ধরনের বাহাদুরি। সত্যি বলতে কি, ওর দৃষ্টি রহমত আলীর পৌত্রির ওপর।

রামচাঁদ সহসাই বলল— কার ওপর। সলীমের বোনের ওপর? ওকে তো পাওয়া দরকার তোমার মোহন সিং-এর। আমার কৌসুলী ওর প্রশংসা করে।

www.amarboi.org

চরণ সিং বলল— দেখা যাক। আমি যাচ্ছি। কিন্তু তোমার কাছে দু'টো রাইফেল ও একটা পিস্তল বেকার পড়ে আছে। একটা আমায় দিয়ে দাও না। আমারটা অন্য কাউকে দিয়ে দেব।

ঃ দেখুন সর্দারজী। আপনাকে ইতোপূর্বে তিনটি রাইফেল এনে দিয়েছি। দয়া করে এটি নেবেন না। নিশানার কোন মওকা এসেও যেতে পারে।

মজীদ ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত পিস্তল বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল— হাতিয়ার ফেলে দাও! সোজা হয়ে দাঁড়াও! এক চুলও নড়বে না!' পর মুহূর্তে চরণ সিং-এর ওপর ফায়ারিং করল। চরণের মাথায় গুলি লাগল। মুখ থুবড়ে পড়ল সে। কথা বেরুল না একটাও। রামচাঁদ ও কন্দন লালের হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল। সলীম ও ফাজ্জু রাইফেল তিনটা কুড়িয়ে নিল।

মজীদ পিছে ফিরে বলল— তোমরা দু'জন এদিকে এসো।

রামচাঁদ ও তাঁর পুত্র মজীদের পিস্তলের পাহারায় ক্ষেতে উপনীত হল। সলীম ও ফাজ্জু রামচাঁদের পিস্তল ও গুলি কেড়ে নিল।

রামচাঁদ হাতজোড় করে বলল— সুবেদারজী। ভগবানের দোহাই, আমরা ওদের নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু কে শোনে আমাদের কথা।

মজীদ বলল— আগে বাড়ো। খামাখা বকবক করো না!

ঃ দয়া করুন মহারাজ! আমরা নির্দোষ।

ঃ একটা শর্তে তোমাদের মুক্তি দিতে পারি।

রামচাঁদ কাচুমাচু হয়ে বলল— মহারাজ! যা বলবেন সবই মানব।

ঃ আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমার তিনটা রাইফেল দরকার। রাইফেল প্রতি চাই কমপক্ষে ৫০০ গুলি। তোমার ছেলে আমাদের কাছে থাকবে। আধা ঘণ্টার মধ্যে শর্ত না পাওয়া গেলে তোমার ছেলের লাশের দেখা পাবে।

ঃ মহারাজ! আমার দু'টো রাইফেল আছে। তাও বাড়ীতে। কার্তুজ আপনাকে চাহিদার চেয়েও বেশী দিতে পারব। কিন্তু এর নিশ্চয়তা কি যে, আপনি আমার পুত্রকে গুলি করবেন না?

ঃ তোমার মন চাইলে আমাদের শর্ত মেনে নিতে পার। নইলে তোমার সামনেই ওকে গুলি করি।' বলে মজীদ ট্রিগারে আঙ্গুল রাখল।

ঃ মহারাজ! আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলাম। চৌধুরী রহমত আলীর নাতি ক্ষুদ্র ওয়াদারও বরখেলাফ করতে পারে না। আমাকে অধিক সময় দিন। ঘোড়ায় চড়েই ফিরে আসব। কিন্তু যেতেই সময় খরচা হবে আধঘণ্টা!

ঃ বহুত আচ্ছা! তোমাকে ৪৫ মিনিট দিলাম। ঘোড়ায় সামান উঠিয়ে ওই ক্ষেতের বাইরে গিয়ে আমাদের লোকের কাছে ঘোড়া হাওলা করে দেবে। কোন প্রকার ছলনার আশ্রয় নিলে তোমার পুত্রকে জীবিত পাবে না!

www.amarboi.org

ঃ মহারাজ! আপনার ওয়াদামত সামান দিলে কন্দন লালকে জীবিত ফেরত পাব তো?

মজীদ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল— বদমাশ! আমার সময় নষ্ট করো না। ওকে আমরা তখনই ছাড়ব যখন জানব তুমি কোন প্রকার ছলনার আশ্রয় নাওনি। এখন যাও। আর একটা কথা বললে তোমার কানে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে গুলি করব।

রামচাঁদ দ্রুত ভাগল। ক্ষেতের বাইরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আবারো বলল— মহারাজ! আপনার ঘড়ির দিকে নজর রাখবেন।

ঃ বেঈমান! ভাগ্ জলদি।

জীবনে এই প্রথম পূর্ণশক্তিতে দৌড়াচ্ছে রামচাঁদ। প্রতিটি কদমে তার মুখ থেকে এই আওয়াজ বেরুচ্ছে— হায় ভগবান! একি হল। আমার অখণ্ড ভারতের দরকার নেই। রামরাজ্যও চাই না আমি। আমার পুত্রকে জীবিত ফেরৎ চাই। ৪৫ মিনিট। ২৭০০ সেকেন্ড। গুনে গুনে দৌড়াচ্ছিল সে।

ফাজ্জু পালোয়ানের পাগড়ী দিয়ে পিঠমোড়া করে কন্দন লালকে কষে বাঁধল সলীম। ওকে এক পাশে নিয়ে মজীদ বলল- চাচা ফাজ্জু! একে বরই গাছের নীচে নিয়ে যাও। কোন প্রকার উল্টো সিধা করলে সহজেই মুণ্ডুচ্ছেদ করতে পার। গাছে বাঁধবে। জামা ছিঁড়ে ওর গালে ঢুকাবে যাতে শোরগোল না করতে পারে।

ঃ তুমি অত চিন্তা করো না। এমনভাবে বেটাকে বাঁধব যাতে নানীর কথা মনে পড়ে।

ঃ বেশ তাই হোক। পৌনে এক ঘন্টা তুমি ক্ষেতের আড়ালে ওর বাপের অপেক্ষা করো। দেখে নাও, ওর বাপে কোন গিরিঙ্গি বাঁধায় কি-না। ঘোড়া থেকে কদম পাঁচেক দূরে থাকবে। এরপর রামচাঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখো। ঘোড়াকে তার ইচ্ছের ওপর ছাড়বে।

সলীম বলল— মজীদ সময় নেই হাতে খুব একটা।

ঃ এটি লড়াই নয়— বরং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। খোদাই ভালো জানেন, ফয়সালা কবে হবে? এতো কেবল শুরু। জোশের চেয়ে হুঁশ দরকার এক্ষণে বেশি।

ঃ রাইফেল নিয়ে অতি অবশ্যই আমাদেরকে অন্দরে ঢুকতে হবে।

ঃ সেটা আমি দেখব। ছাদে কেউ উঠলেই ন্যূনপক্ষে গুলিতো করতে হবে।' বলে মজীদ পাইন গাছের ওপর চাপল। আচমকা ও এই বলে দ্রুত গাছ থেকে নামল যে, সলীম! ওরা বাইরের হাবেলীতে প্রবেশ করছে। ওই দিকটায় আমাদের কেউ নেই।

রাইফেল ও বন্দুকের টর টর আওয়াজের পাশাপাশি শিখ-মুসলমানদের শ্লোগানসহ শিশু-নারীদের চিৎকার শোনা গেল।

সলীম একটা রাইফেল ও কার্তুজের থলে ওঠাতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে মজীদ দাঁড়াও! দাঁড়াও' বলে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল। ওর বাযু ধরে বলল— এক হাজার লোকের মোকাবেলায় নিজকে যথেষ্ট মনে করলে ভুল করবে। আমাদের উপায় একটাই। এসো আমার সাথে।

রাইফেল কার্তুজ উঠিয়ে সলীম ও মজীদ গাছের আড়াল দিয়ে এগুতে লাগল। ঘন ঝোপের আড়ালে দু'টো রাইফেল লুকিয়ে মজীদ বলল–সলীম! তুমি আম গাছে চড়ো।

www.amarboi.org

আমি মসজিদের ছাদে পৌছুচ্ছি। মসজিদের পেছনে সিঁড়ি লাগানো। আমাকে দেখে কেউ সিঁড়িতে চাপতে গেলে ফায়ার করো। নতুবা ফায়ার করবে না। আমি ইশারা করলেই তবে গুলি করবে।

✪ ✪ ✪

মসজিদ থেকে ফায়ারিং হওয়ার আগ পর্যন্ত হাবেলীর মুষ্টিমেয় মুসলিমগণ লাঠি ও বর্শা দিয়ে শিখ সয়লাব প্রতিরোধ করছিল। ফটকের ওপর হামলাকারীরা থাপড়াচ্ছিল। একদল বিকল্প সিঁড়ি লাগিয়ে মহলের দেয়ালে ওঠার কোশেশ করছিল। কিন্তু বালাখানা থেকে ফায়ারিং করে আফজাল ওদের পিছু হটতে বাধ্য করল।

শিখরা এ প্রথম পূর্ণোদ্যমে ফটক ভাঙ্গার কোশেশ করলে ভেতরে থেকে ইটবৃষ্টি শুরু হোল। দেয়ালে চড়তে গেলে বর্শা ও লাঠির গুঁতো। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ওরা গুলি চালালো ফটকের ওপর। ভেতর থেকে যারা ফটক বন্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল তাদের অনেকেই যখম হল। হামলাকারীরা ফটকে প্রচণ্ড আঘাত হানলে মজবুত লোহার ছিটকিনি ভেঙ্গে ফটক খুলে গেল। এবার শুরু হোল হাতাহাতি।

পিস্তলের শেষ গুলিটা খরচ করে আফজাল তলোয়ার বের করে বাইরের হাবেলীতে এলেন। আশে পাশের ছাদে অবস্থানরত জোয়ানরাও নীচে নেমে হামলা চালাল। ছুরি, লাঠি, বর্শা ও বল্লমের সামনে শিখরা তেমন একটা টিকতে পারল না। দশ মিনিটের লড়াইতে ওদের ৩০টা লাশ পড়ল। বাধ্য হোল রণভঙ্গ দিতে। এ প্রাণহানির পর ফটক কিংবা দেয়ালে চড়াও হতে কেউই সাহস করল না। মুসলমানরা আবারো ফটক বন্ধ করল। আফজালের নির্দেশে শহীদ মুসলমানের লাশগুলো টেনে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। দেয়ালের গা ঘেঁষে মুসলমানরা পরবর্তী হামলা প্রতিরোধের আশায় থাকল দাঁড়িয়ে। অবশ্য কুলাঙ্গার শিখরা তখন দূরে দাঁড়িয়ে কেবল গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল।

কিছু নওজোয়ান যখমীদেরকে টেনে নারী মহলে পৌছে দিল। বন্দুক ও রাইফেলের দ্রিম দ্রিম আওয়াজ বন্ধ হয়েছে। দূরে শোনা যাচ্ছে শিখদের আওয়াজ। আফজাল বলল— ইসমাঈল! তুমি বালাখানার ছাদে যাও। কোন হামলার সম্মুখীন হলে খবর দিও তৎক্ষণাৎ।

ইসমাঈল ছুটলেন। ভেতর আঙ্গিনা মাড়িয়ে নীচু মহলের সিঁড়ি বেয়ে বালাখানার ছাদে চড়লেন। তিনি তখনও সিঁড়ির মাঝপথে ইত্যবসরে তিন-চারটা ফায়ারিং হল। একটা গুলি তার কোমরে, একটা বাহুতে আরেকটা লাগল গোড়ালিতে। টলতে টলতে তিনি সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে মুখ থুবড়ে পড়েন। খানিকবাদে গড়িয়ে গড়িয়ে ছাদে পৌছান। ছাদের এক কোণে তখনও সেই পাকিস্তানী পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে, ১৪ আগস্ট যা উত্তোলন করা হয়েছিল।

বালাখানার ছাদে গুলিবৃষ্টি হচ্ছে। কিছু গুলি পতাকার বাঁশে লাগল। এক সময় মাঝখান থেকে ভেঙ্গে তা ইসমাঈলের পিঠে পড়ল। ভাঙ্গা বাঁশ বুকে আগলে ইসমাঈল গড়িয়ে ছাদের অপর প্রান্তে যান। বুরুজের কিনারে এসে এক হাতে পাগলা ঘন্টা বাজান

www.amarboi.org

অপর হাতে বাঁশের ভগ্নাংশ উঁচিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' নারা লাগান। 'পাকি...' বলা হল 'স্তান' বলতে পারলেন না, ঘাতকের একটা বুলেট তার বুকে বিঁধল। ঝাণ্ডাসহ তিনি লুটিয়ে পড়লেন। সবুজ পতাকার বুকের সাদা চাঁদ-তারার নিশান তাঁর বুকের খুনে লাল হয়ে গেল।

✪ ✪ ✪

রাইফেল ও বন্দুকসজ্জিত বাহিনী মসজিদের ছাদে পৌঁছায় পশুশালা ও হাবেলী তাদের যুৎসই টার্গেটে পরিণত। ইসমাঈল পড়ে যাওয়ায় বলনাথ সিং আঙ্গিনায় জড় হওয়া লোকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ১৫ জন আহত হয়ে পড়ে গেল। ক'জন হতাশ হয়ে পশুশালায় গিয়ে আত্মগোপন করল, বাদ বাকীরা দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। নীচে জমায়েত লোকদের ইশারা করল বলনাথ। পুনরায় হামলা করল তারা। এবারের হামলা পূর্বাপর হামলার চেয়ে আরো সুশৃঙ্খল ও মারাত্মক। ২০/২৫ জন লোক একত্রে ফটক ধাক্কাল। ওদের ধাক্কাধাক্কিতে লাশের স্তূপ নড়ে গেল। ফটক খুলে গেল। হামলাবাজদের একদল নারা লাগিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। অপরদল সিঁড়ি লাগিয়ে ছাদে উঠল। এদের হাতে গুলি ভরা বন্দুক। মুসলমানরা এক্ষণে মৃত্যুর মুখোমুখি। একদিকে লাঠি-বর্শাধারীদের আক্রমণ অপরদিকে মসজিদ ও ছাদের থেকে গুলির সম্মুখীন। গুলিতে মুসলমানদের পাশাপাশি ক'জন শিখও আহত হল। এ সময় ছাদের গুলি বন্ধ হল, কিন্তু মসজিদ থেকে গুলি চলছে পুরোদমে তখনও।

বলনাথ সিং মসজিদের ছাদে দাঁড়িয়ে নারা দিচ্ছিল— সাবাশ বাহাদুর। এবার কেল্লার ফতেহ। কাউকে ছেড়ো না। মহিলাদের ঘর থেকে বের করে মহলে আগুন লাগিয়ে দাও। সাবাশ!' আচমকা তার পিঠে গুলি লাগল। বীভৎস এক চিৎকার দিয়ে ১৫ ফুট নীচে গড়িয়ে পড়ল। তার যে সঙ্গীরা বসে গুলি করছিল উঠে দাঁড়াল। এবং নীচে তাকাতে লাগল। তারা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ওদের কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই আরো দু'জন গুলিবিদ্ধ হল। পরপর তিনজন গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। মোহন সিং সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল— এ গুলি এল কোত্থেকে?

মীনার থেকে মাথা উঁচিয়ে মজীদ আচমকা ছাদে লাফিয়ে পড়ল। ওর দু'হাতে উদ্যত দু'টো রিভলবার। সময় অপচয় না করে মজীদ ট্রিগার চাপল। ছাদে শুয়ে থাকা একজনও রেহাই পেল না। অতঃপর তুলে নিল রাইফেল। মহলে হামলা করা লোকদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালাল।

ওর প্রথম হামলায় দু'শিখ লুটিয়ে পড়ল। একটা রাইফেলের ম্যাগজিন খালি হলে ওপরটা তুলে নিল। ইতোমধ্যে আহত এক শিখ আড়মোড়া দিয়ে জাগছিল, মজীদের একটা গুলি তার বক্ষভেদ করল। পাশেই আরেক শিখ নড়াচড়া করছিল, রাইফেলের বাট দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত করে তাকে ঠাণ্ডা করল মজীদ।

মেশিনগানের গুলি আরম্ভ করল শিখরা। অবশ্য ততক্ষণে সলীম ওর কাছে এসে পৌঁছেছে। মসজিদের বিকল্প সিঁড়ি ফেলে মজীদের পাশে বসল। ওদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো একসাথে গর্জে ওঠে। বারুদের কমতি নেই। কন্দন লাল ও রাঁমচাদ থেকে এগুলো

www.amarboi.org

পাওয়া। তাছাড়া ৬'জন শিখের গোলা-বারুদও হাসিল হয়েছিল ওদের। শিখদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল।

মজীদ বলল সলীমকে— সলীম! দরোজা থেকে বাইরে বেরোয় যারা স্রেফ তাদের ওপর ফায়ার করো। হাবেলীর ভেতরের আপন লোকদের ওপর তোমার গুলি না লাগে— খেয়াল রেখো। কিছুক্ষণের মধ্যে ভেতরে-বাইরে ১৫০ জন শিখের লাশ স্তূপীকৃত হল। অন্যান্য শিখরা লেজ গুটিয়ে আত্মরক্ষা করল।

শিখদের যে দলটা ছাদে গিয়েছিল আঙ্গিনায় নেমে তারা মূল হাবেলীর দরোজা ভাঙ্গার কোশেশ করতে লাগল। ওই মহলেই নারী-শিশুদের বাস।

পশুশালার শিখরাও ওদের সঙ্গ দিল। আফজাল বিপদ বুঝে দরোজা একটু ফাঁক করে দড়াম করে ধাক্কা দিল। বেশ ক'গজ গিয়ে এক শিখ ভুলুণ্ঠিত হল। আফজাল দেউড়ি থেকে বেরিয়ে তেমন কোন সুযোগ পাবার পূর্বেই শিখরা তাকে ঘিরে নিল। একটা বর্শা তার রানে আরেকটা পেটে বিধল। আরেকটা মেরুদণ্ডে গেঁথে গেল। তিনি বাঁ'হাতে বর্শা ধরে ডান হাত দ্বারা বর্শা চালালেন। এক শিখের এতে জীবনাবসান হল। আফজাল দেয়ালের পাশে মুখ থুবড়ে পড়লেন।

শিখরা 'ঘিরে নাও, ধরো ওকে' বলে চারপাশে জমায়েত হল। তিনি একহাতে ওদের হাঁকাচ্ছিলেন অপর হাতে পেটে বিদ্ধ বর্শায় ভর করছিলেন। ততক্ষণে বাকী মুসলমানরা পৌঁছে গেল ওখানে। গোলাম হায়দার পর পর তলোয়ার দ্বারা দু'শিখকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছিলেন। বশির এক জনকে কুড়ালাঘাতে চিৎপটাং করল। ভীরু শিখরা ভয়ে দে-ছুট।

শিখদের সংখ্যা এখানেও মুসলমানদের তুলনায় তিনগুণ। যে উঠানে শিখরা এক্ষণে জমায়েত, সলীম-মজীদের টার্গেটমুক্ত তা। লড়াকু মুসলমানদের কমবেশী সকলেই যখমী তখন। এতদসত্ত্বেও নারী-শিশুদের বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। আফজাল শেষ কামড় দিতে একখানা তলোয়ার উঁচিয়ে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। দাঁড়ালেন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। দু'শিখ এগিয়ে এল, দু'জনকেই জাহান্নামের পথ দেখালেন তিনি। কিন্তু কত কুলোয়। শক্তি শেষ তার। বসে পড়েন যমীনে।

শের সিং-এর ভাই অগ্রসর হয়ে তরবারীর আঘাত করে চিৎকার দেন— আমি আফজালকে খতম করে দিয়েছি। আমি আফজালকে....' বশির কুড়াল দিয়ে ওর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে আফজালের কাতারে শামিল করল। আফজাল হত্যার আনন্দ তার ওখানেই শেষ।

আফজালের শাহাদাতে শিখদের প্রেরণা পূর্বাপেক্ষা বেড়ে গেল। পা চালিয়ে লড়াই করতে লাগল ওরা। দু'হাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে মজীদ সহসাই দেউড়ির আঙ্গিনায় অবির্ভূত হল। পরপর ওর পিস্তল থেকে বেরুল গুলি বহর। হরি সিং হাবেলীর দরোজায় পেট্রোল ঢালছিল। একটা গুলি তার পিঠে বিধল। বৃন্তচ্যুত পাকা আমের মত টুস করে সে লুটিয়ে পড়ল।

www.amarboi.org

অন্যান্য শিখরা 'সুবেদার এসে গেছে' রবে উর্ধ্বশ্বাসে পালাল। মজীদ আঙ্গিনা পেরিয়ে সিঁড়ির মাঝপথে দাঁড়াল। শিখদের আচ্ছামত টার্গেট করতে পেরে খুশীই হল ওর প্রিয় পিস্তল দু'খানি।

শিখরা নেহায়েত হতাশা, পেরেশানিতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে পাগলের মত পশুশালার উঠানে গিয়ে উপনীত হল। ওখান থেকে ফটক অতিক্রম করতে গিয়ে সলীমের গুলিতে কিছু ধরাশায়ী হল আর কিছু শিখ বস্তিতে পালিয়ে বাঁচল। প্রায় ৪০০-এর কাছাকাছি শিখ সলীম ও মজীদের মসজিদ দখল করার পর শিখদের বাড়ীর ছাদে অন্যান্য সাথীদের অপেক্ষা করতে লাগল। গাঁয়ের শিখ মহিলারা দু'হাতে বুক চাপড়ে হায় হায় করতে করতে অশ্রাব্য ভাষায় গাল-মন্দ করছিল মুসলমানদের।

ওই সময় গ্রামের অপরাপর মহল্লায়ও নানা লোমহর্ষক ঘটনার জন্ম হয়েছিল। বেশ কিছু মুসলিম হামলার সময় শিখ বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছিল। হামলাবাজরা পশ্চাদপসারিত হয়ে জমায়েত হলে শিখদের কিছু তাদের বলল আমরা কিছু শিকার ঘরে আটকে রেখেছি। অবরুদ্ধ এ শিকার খতম করা খুব একটা মুশকিল নয়। পিরানদত্ত চৌকিদার তার প্রতিবেশী আতর সিং-এর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। তার তিন পুত্রকে হত্যা করা হল। স্রেফ তাকে ততক্ষণ জীবিত রাখা হল যতক্ষণ তার মেয়ের ফোপানো কাঁদা বন্ধ না হোল। বরইগাছে বাঁধা অবস্থায় সে চিৎকার দিচ্ছিল— আমাকে মেরে ফেল। খোদার দিকে চেয়ে আমাকে হত্যা করো। আমি এ দৃশ্য দেখতে পারছি না। আমার চোখ উপড়ে নাও। ওকে ছাড়। দেখোনা, ও মরে গেছে।

মোহর উদ্দীন শহরের কম মাইনের চাকুরে। হামলার একদিন পূর্বে মামার মৃত্যুর খবর আসে তার কাছে। ফাতেহাখানির জন্য গিয়েছিল সে। তার অনুপস্থিতিতে বেলা সিং-এর বৌ তার বউ-বাচ্চাদের নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়।

দুপুরের দিকে পরাজিত শিখ জনপদের পূর্বকোণে অবস্থিত আমতলায় উপস্থিত হল। মোহর উদ্দীন ফিরে এল। তার বাড়ী আসতে ওই আমবাগান হয়েই আসতে হয়, কিন্তু সমবেত শিখদের দেখে সে অন্য পথ ধরল। তার মামার লাশ আমগাছে ঝুলছে। হতভাগ্য মামা যে গাছে ঝুলছেন ওটা তার হাতেই লাগানো। তার কুঠরির দরোজায়ও দুজন অচেনা লোকের লাশ ঝুলছে। চলার পথে একটা মুসলিম বস্তি জ্বলতে দেখছিলেন মোহর উদ্দীন। আম বাগানে শিখদের সম্মিলন আর গাছে গাছে লাশের মিছিল দেখে তার বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে, এখানকার পরিস্থিতি কি। 'আমার বিবি–আমার বাল-বাচ্চা– আমার মা' তিনি চিৎকার দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু আওয়াজ মাঝ গলায়ই আটকে থাকল। তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন, 'আমি গরীব, আমি মজদুর, আমার কোন দুশমন নেই।' কাউকে আমি নারাজ করেছি বলে মনে হয় না। দাদা বেলা সিং হয়ত বলেছিল, এটা মোহরের ঘর। ওর বাল-বাচ্চাদের কিছু বলো না। জগৎ সিংকে সে অতীতে বিশ টাকা ধার দিয়েছিল। এখন পর্যন্ত সে টাকা ফেরৎ চায়নি। চৌধুরী রহমত আলীর বংশ থাকতে এ জনপদে হামলা হতে পারে না। তারা দীর্ঘদিন শিখদের হেফাযত করেছে। কিন্তু নিয়তির একি নির্মম পরিহাস! এ মুসাফিরদ্বয়কেও শেষ পর্যন্ত রেহাই দেয়া হল না? মানুষ শরাবের নেশায় এমনও ভুল করে?

www.amarboi.org

শিখদের কুঠিতে নারীরা চিৎকার করছিল। মোহর উদ্দীন ভাবলেন, শিখদের বোধহয় বললে হত, মুসলিম নারীরা তাদের বোন সমতুল্য। তোমরা এখানে এসেছ কেন? আবার ভাবলেন, ওদের আচ্ছামত গালি-গালাজ করলে কেমন হয়। মানুষ সাধারণত রাগ-গোস্বা একটু আধটু করেই থাকে। ওই দু'মুসাফির নিশ্চয় ওদের গালি-গালাজ করেছিল। বাবা রহমত আলী মুসলিম শিখদের মজমায় কতোবার বক্তৃতা করেছেন। তার কথায় যাদু। এভাবে নানান কথার জাল বুনতে বুনতে অগ্রসর হতে থাকেন। চলতে চলতে মাঝে মধ্যে থমকে দাঁড়ান। তার মনের ধুকধুকানি যেন বলতে থাকে— মোহর উদ্দীন! পালাও! কিন্তু তিনি বাল-বাচ্চা ও দারা-পরিবারকে একটা সালাম দিতে চান। তার অবস্থা ওই ব্যক্তির চেয়ে কোন অংশে কম নয়, যে অজগরের সামনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে যায়। তার অনুভূতি উন্মাদনায় পরিণত যেখানে বুযদিলী ও বাহাদুরির কোন সুযোগ নেই।

জনৈক সওয়ারকে বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেখে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। সওয়ার ঘোড়া থামিয়ে বুলন্দ আওয়াজে বলে— সূর্য ডোবার পূর্বেই এখানে জমায়েত হও। ওরা সেপাইদের দু'টুলি নিয়ে জীপে আসছে। ওরা বলে দিয়েছে, চলার পথে কোন গর্ত থাকলে মাটি দিয়ে ভরাট করতে, যাতে জীপ চলতে কোন অসুবিধা না হয়।

জনৈক সিপাই প্রশ্ন করল— কত সিপাই আসছে?

সওয়ার জবাব দেয়— জানিনা। তবে মহাজন বলেছেন, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মুসলমানদের ঘরদোর জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়া যাবে।

ঃ শেঠ রামচাঁদের খবর কি?

ঃ যাওয়ার পথে তার বাড়ী হয়েই যাই। দুটো নয়া রাইফেল ও বারুদ নিয়ে তিনি এদিকে এসেছেন। কেন, এখনও পৌছেননি তিনি?

শিখরা হয়রান হয়ে একে অপরের দিকে তাকায়।

ঃ আশ্চর্য কথা, এখান থেকে তিনি খালি হাতে বাড়ী যান। তারপর ঘর থেকে রাইফেল ও বারুদ নিয়ে ফিরে আসেন।

ঃ তার ছেলেও লাপাত্তা। দু'জন যেন হাওয়া হয়ে গেছে।

গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মোহর উদ্দীন মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন— লড়াই তাহলে এখনও শুরু হয়নি। লড়াই এখনও থামানো যেতে পারে। জনপদে আগুন লাগলে নেভানো যাবে না। এখনও শিখরা উগ্র হয়ে ওঠেনি। এখনও বোধহয় শরাব পান করেনি। রামচাঁদ হয়ত রাইফেল ও বারুদ নিয়ে আসেনি। এখন মিনতি ও সমঝোতার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যেতে পারে। আচমকা সে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে কম্পিত ক্ষীণ কণ্ঠে বলল— গুরুজী! দোহাই সর্দারজীর -------- না গো ------- আকালীজীর বিজয় ------ জি ------ মানে ------ অ্যা --------- সর্দারজীকে প্রণাম!'

এর জওয়াবে শিখরা বলে উঠল— ধরো, পাকড়াও করো।' মোহর উদ্দীন ভয়ে ক'কদম পিছু হটলেন। ও চিৎকার দিয়ে চলছে— আমি বে-কসুর। কাউকে গালমন্দ

www.amarboi.org

করিনি। আমি নিরীহ এক মজদুর। ক্ষ্যাপাইনি কাউকে। দয়া করো। তোমাদের প্রণাম করতে আমার আসা।'

শিখদের তলোয়ার ও বর্শাগুলো উথিত দেখে মোহর উদ্দীন ঝিলে লাফ মারলেন। কিনারায় দাঁড়িয়ে ওরা মোহরকে গালি দিতে লাগল যাচ্ছেতাই। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে তিনি মিনতিভরে ডেকে বলতে লাগলেন— কর্তা সিং, মনি সিং, হরি সিং, আমি মোহর উদ্দীন তোমাদের মতই এক মজদুর, গরীব। কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট হলে তোমাদের সাথী ছিলাম। আমার মামা মারা যান। সোজা ওখানেই যাই। তোমাদের দেখে প্রণাম করতে আসি। দেখো দোস্ত! গালি দিও না! ভাইবোন সকলেরই সম আদরের।'

ঃ আরে এ মোহর উদ্দীন।' বেলা সিং অগ্রসর হয়ে বলল।

মোহর উদ্দীনকে অন্ধকারে এক ঝলক দেখে বলল সে। মোহর বললেন— হ্যাঁ, সর্দারজী! ওদেরকে বোঝাও। আমি কাউকেই ক্ষ্যাপাইনি। তোমাদেরই পড়শী আমি!' বেলা সিং বলল— কূলে আয় শুয়োরের বাচ্চা!' বেলা সিং ঢিল নিক্ষেপ করল। মোহর উদ্দীন আরো গভীর পানিতে নামলেন। ক'জন শিখ জুতো খুলে পানিতে ঝাঁপ দিল। সীনা বরাবর পানিতে নেমে মোহর উদ্দীন চিৎকার করে বললেন— বেলা সিং, জগজিৎ সিং। তোমরা আমার পড়শী। ছুটির দিনে তোমাদের হাল চালাতাম।

বাঁচাও আমাকে। থামাও ওদের। ঘরে বৃদ্ধ মা আমার। সাত-সাতটা সন্তান আমার কামাইয়ে বাঁচে। ওরা না খেয়ে মারা যাবে। যুবতী মেয়েটা আমার বিবাহযোগ্য। ওদের মা অসুস্থ।' জগজিৎ সিং বলল— তোমার মা তোমার বাপের কাছে চলে গেছে। তোমার স্ত্রীকে চালান দিয়েছি অন্য জগতে। এখন থেকে আর কাউকেই কামাই করে খাওয়াতে হবে না তোমার। তোমার যুবতী মেয়ের পাত্রও জোগাড় করেছি আমরা। সুতরাং এক্ষণে তাফালিং ছেড়ে তীরে এসো।

ভগৎরাম ও তার পুত্রও তীরে ছিল। রামলাল বলছিল— বদমাশ তীরে আয়! এ ঝিলের পানি আমরা পান করি। কে তোর লাশ পানি থেকে তুলবে?

মোহর উদ্দীনের মুখে এবার মোহর পড়ে। এ কি সম্ভব? আমার বুড়ো মাকে ওরা মেরে ফেলেছে? আমার বিবি, যুবতী মেয়ে ও বাচ্চাদের সাথে....?' ঝিলে ঝাঁপ দেয়া জনাপাঁচেক শিখ তার নিকটে পৌঁছে যায়। তন্মধ্যকার জনাদুয়েক ওর সহকর্মী। ওদের তলোয়ারগুলো তার তামাম প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল একে একে। ভুল ভাংল মোহরের উচ্চাশার। জীবন থেকে উদাসীন তিনি এক্ষণে। প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে বলেন— এসো। মারো আমাকে। মৃত্যুকে ভয় পাই না আমি। জনৈক শিখ চরম এক আঘাত হেনে তীরবর্তী শিখদের নারা লাগাতে বলল— বলো, সত্যাশ্রয়ী আকালী।' এরপর কখনো ডোবা আবার কখনো তড়পানো লাশের ওপর শিখদের তরবারীর পরীক্ষা চলল।

✪ ✪ ✪

লছমন সিং অপেক্ষা কারো প্রতি তেমন একটা আস্থা ছিল না চৌধুরী রমজান আলীর। হামলা হবার পূর্বে ইসমাঈল তার ঘরে এসে বলেছিলেন, তুমি ফওরান

www.amarboi.org

আমাদের হাবেলীতে যাও। তিনি লছমন সিং থেকে পরামর্শ করলে তিনি বললেন— কার এত বড় বুকের পাটা যে, আমাদের গ্রামমুখো হয়। এতদসত্ত্বেও তোমাদের ভয় হলে বউ-বাচ্চাদের আমার ঘরে পাঠাও। এদিকে কেউ এলে আমার লাশের ওপর দিয়েই কেবল আসতে পারে।

রমজানের বেটা জালাল জনপদের অনতিদূরের চারণ ক্ষেতে গিয়েছিল। বউ-বাচ্চাদের লছমন সিং-এর বাড়ীতে রেখে জালালের তালাশে বের হল রমজান। দূর থেকে দেখেন শিখদের একদল জনপদের দিকে ধেয়ে আসছে। তিনি দ্রুত লছমনের বাড়ী এসে চিৎকার দিয়ে বললেন— লছমন সিং! ওরা ধেয়ে আসছে। তুমি জানো কি, জালাল চারণক্ষেত থেকে কোথায় গেছে? তোমার ছেলেও ছিল ওর সাথে। বলো লছমন বলো। তোমার খোঁজ থাকার কথা।

লছমন সিং-এর খামোশীতে রমজান বললেন— 'লছমন আমি খালের তীরে যাচ্ছি। তুমি যাও অন্য কোথাও। বৌদিকে বলো, মেয়েদের অন্দরে রাখতে। দ্রুত।'

লছমন সিং হাবেলীর দরোজা বন্ধ করে বললেন— 'এ দল অন্য কোথাও যাচ্ছে। এসো ভেতরে এসো!'

গুলির আওয়াজ এল। রমজান চিৎকার করে বললেন— 'দেখলে ওরা ঠিকই হামলা করে বসেছে।' তিনি অগ্রসর হয়ে দরোজায় ছিটকিনি খুলতে চাইলে লছমন বাধা দানপূর্বক অন্দরে নিয়ে যান।

রমজান বলছিলেন— আমায় ছেড়ে দাও। আমার জালাল বাইরে। ওকে নিয়ে আসব। গুলিবৃষ্টি হচ্ছে। আমার ও মারা গেলে কিসের জন্য এ জীবন। আমার জীবনের প্রতি তোমার এত মায়া থাকলে খোদ নিজে গিয়ে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে এসো।

লছমন সিং দালানের একেবারে কাছে এসে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। রমজানের পা টক্কর খেল। মুখ থুবড়ে পড়েন তিনি। ভেতরে জনা পাঁচেক শিখ মদ গিলে বুঁদ। রমজানের বিবি ও যুবতী মেয়ে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। বিবির কোলে এক বছরের শিশু। এতদসত্ত্বেও রমজান কেমন যেন আস্থাশীল এদের প্রতি। তিনি বলেন— সিং! তোমার মন বড্ড শক্ত। জালালের মত তোমার ছেলে বাইরে থাকা অবস্থায় কেউ তোমায় রুখলে সম্ভবত তার সাথে লড়াই করতে। খোদার দিকে চেয়ে- আমায় যেতে দাও।

জনপদের জনৈক বলল— চৌধুরী! হারামীর বাচ্চা, এদিকে আয়! তোর এখানে দরকার।

: তোমরা সবাই এখানে করছো কি। মহল্লায় হামলা হয়েছে। শোন, রহমত আলীর হাবেলীতে গোলাগুলি হচ্ছে। যাও, ওদের বারণ করো। আজ পর্যন্ত কোন বদমাশই এ বসতীর দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পায়নি। কিন্তু এখন তোমাদের বধূ-মাতারা গালি শুনছে আর তোমরা এখানে সুরা পান করছ? এসময়ে পুরুষদের ঘরে বসে থাকা বেমানান। এটা গাঁয়ের ইয্যত। লছমন ওদের যেতে বলো! জনৈক শিখ অগ্রসর হয়ে তার দাড়ি ধরল। অন্যরা লুটোপুটি খেল হাসিতে।

www.amarboi.org

লছমন সিং বলল— ভাই! যা করার জলদি করো! জনৈক শিখ বলল— কি হে ভায়া! তোমার অঙ্গছেদন করব, না যবেহ্ করব? রমজানের বিবি চিৎকার করে বলেন— তাকে ছেড়ে দাও। ছাড় তাঁকে। লছমন তুমি না তাকে ভাই ডেকেছিলে। অপর এক শিখ বলল— বুড়ির মুখে বসিয়ে দাও না দু'ঘা।

দেখো ভাই! বয়সী লোকদের সাথে এ ধরনের হাসি-তামাশা বেমানান! জনৈক শিখ তলোয়ার উঁচিয়ে বলল— আরে রাখো তোর ঠাট্টা, তামাশা!' লছমন সিং ওই শিখের হাত ধরে বলল— ভাই! যা করার বাইরে গিয়ে করো, এখানে নয়।

রমজানের বিবি চিৎকার দিতে দিতে অগ্রসর হলে লছমন তার চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা মারলে তিনি খানিক দূরে ছিটকে পড়েন। জনাতিনেক শিখ রমজানকে নিয়ে হাবেলীর ভেতর আঙিনায় গেল। তার মেয়ে লছমনের বউকে বললেন- চাচী! তুমি আমায় মেয়ে ডেকেছিলে। আমার আব্বাজনকে বাঁচাও।' বিবি বলেন— মাসী! আমাদের কোন অন্যায় হলে ক্ষমা করবেন। তুমি বলতে, আলীমুদ্দীন তোমার পোতা। ও পয়দা হলে তুমি মিঠাই বিলি করেছিলে। আমাদের বাঁচাও মাসী!

আর যাই হোক লছমনের বৌ একজন মহিলা তো। তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন— আমার অশ্রু তোমাদের কোন কাজে আসল না। কে শুনবে আমার ফরিয়াদ। তোমরা দু'জনে অমৃতের স্বাদ নাও। ভাবী, তুমিও তাই করো! রমজানের যুবতী দু'মেয়ে দেয়ালে মিশে গেল যেন।

জনৈক শিখ বলল— চিন্তা করো না। অমৃতের স্বাদ ওদের পাইয়ে দেব!

ওদিকে বাইরের হাবেলীতে রমজানের ফরিয়াদ শোনা যাচ্ছে— 'লছমন সিং! কি অপরাধের শাস্তি দিচ্ছ আমায়। তোমার চোখ এত তাড়াতাড়ি বদলাল কি করে। আমি সেই রমজান, যার প্রতিটি কথায় তুমি হাসতে। মনে নেই, একবার আমি অসুখে পড়লে তুমি বলেছিলে, রমজান মারা গেলে গ্রাম শ্মশান ভূমিতে পরিণত হবে। কিন্তু সেই লছমন আর আজকের লছমনের মধ্য বিস্তর ফারাক। আজ তুমি নিজেই আমার শাহরগে ছুরি চালাতে এখানে ডেকে এনেছ। খোদার দিকে চেয়ে বলো, কি অপরাধ আমার। এ বসতীতে আমাকে থাকতে দিতে না চাইলে বলো, অন্যত্র চলে যাব।

আমার বলদ নিয়ে নাও। নিয়ে নাও আমার মহিষও। শাওন। সুবা সিং! আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করেছি কি? কাউকেই তো আমি নখের আঁচড় পর্যন্ত দেইনি। বিগত দিনে আমার প্রতিটি কথায় তোমাদের হাসি আসত। আজ কেন হাসছ না তোমরা? আজ তোমাদের হল কি? আমার বাল-বাচ্চাদের ছেড়ে দাও। আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাব। লছমন সিং! ভাই লছমন! না! না!! না না!!! খোদার দিকে চেয়ে....."। তার আর বলা হল না, জনৈক শিখের নিষ্ঠুর তলোয়ার তার মুন্ডুপাত করল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির এক বৃদ্ধের ধড় থেকে। রমজানের মেয়ে আর্তনাদ করে বাইরে এল। জনৈক শিখ তার বাযু পাকড়ে ধরল। তার বিবি ও পুত্রবধূ বেরোতে চাইলে শিখরা তাদেরকেও ধরে ফেলল। বাইরে থেকে কেউ চিৎকার দিয়ে বলল— বাপু! দরোজা খোল।

www.amarboi.org

লছমন সিং অগ্রসর হয়ে ছিটকিনি খুলে দিল। তার পুত্র হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করল। সে বলল— বাপু! জালাল আমার হাত থেকে ছুটে গেছে। এমন কি আমার তলোয়ারও ছিনিয়ে নিয়েছে।'

শিখরা হো হো করে হেসে ওঠল। লছমন সিং গম্ভীর কণ্ঠে বলল— 'জালাল তোমার তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়েছে। বেহায়া কোথাকার। যাও কচুর লতিতে ফাঁস লাগিয়ে মরো গিয়ে!

ঃ বাবা! ওকে ধাওয়া করলে খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি ওর পিছু নিলে কেডস খুলে যায়, তলোয়ার নিয়ে ও পালায়!

ঃ এক্ষণে হয়ত ও পাকিস্তান সীমান্তে পা রেখেছে।' বলল জনৈক শিখ।

ঃ না! সে এদিকেই এসেছে। হয়ত ওদের বাড়ী আত্মগোপন করে আছে। আমি ওকে দেখছি!'

ঃ ভগৎ সিং! তুমি যাও ওর সাথে!'

ঃ আমিও যাই।' বলল অপর এক শিখ।

লছমন সিং-এর সাথে দু'শিখ রমজানের ঘরে প্রবেশ করে ফিরে এল। লছমন সিং বলল— আমার যদ্দুর বিশ্বাস, ও এদিকে আসবে না। এক্ষণে তোমরা আমার সাথে বসে ফয়সালা করো।

জনৈক শিখ বলল— আমাদের ফয়সালা হয়ে গেছে। জালালের বউ বাবদ আমরা তোমাকে দু'শো, বোনের বাবদ তিনশো' এবং ওর মার বিনিময় শাওন সিং পনের/বিশ রূপিয়া দেবেন। লছমন সিং ও নিজেদের ঘরের সীমা নির্ধারণী দেয়ালের পার্শ্বস্থ গাছে লুকিয়েছিল জালাল। লছমনের পুত্র থেকে ছিনতাইকৃত তলোয়ার ওর হাতে। চোখের সামনে পিতার লাশ ও পরে শিখদের নাপাক বিনিময়ের কথা শুনে গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে বেটাদের সাধ মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রতিবার কল্পনার সাথেই ওর হিম্মতবায়ু ঢিল হয়ে যায়।

লছমন সিং তার প্রতিবেশীর ইয্যতের মূল্য পেয়ে নিশ্চিন্তে নোট গুনতে থাকে। উঠান থেকে জনৈক শিখ হেঁকে বলল— ভাই! তোমরা ভেতরে করছ কি। নিয়ে এসো ওদের দ্রুত।

অন্দর থেকে বেরিয়েই রমজানের বিবি স্বামীর লাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। জনৈক শিখ জালালের বৌ'র কোল থেকে এক বছরের শিশুকে ছিনিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে মারল। অপর একজনে দুধের বাচ্চা নীচে পড়ার পূর্বে নিষ্ঠুর তলোয়ার দ্বারা দু'পা কেটে ফেলল। বাচ্চার মা গগন বিদারী চিৎকার দিলে এক শিখ তার চুল ধরে ফেলে। আবারো বাচ্চাকে শূন্যে ছুঁড়ে মারলে জনৈক শিখ তলোয়ারের ডগা ঢুকানোর প্র্যাকটিস করছিল।

জালাল ক্ষুধার্ত সিংহের মত গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে শিখদের ওপর পড়ল। তার প্রথম টার্গেট ওই শিখ, যে তার স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরেছিল। দ্বিতীয় টার্গেট ওই নরপশুর ওপর, যে তার মায়ের বাযু ধরেছিল। দু'জনই মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেল। তার বিবি কোনক্রমে একটা তলোয়ার ওঠাল। মুহূর্তে লছমনের ওপর হামলা চালাল। লছমন সিং ভয়ে পিছু হটল। একটি খুঁটিতে হোঁচট খেয়ে সে ভূতলশায়ী হলে জালালের বিবি তার পায়ে আঘাত হানল। দ্বিতীয় আঘাত করতে উদ্যোগ নিতেই জনৈক শিখ পেছন দিক

www.amarboi.org

থেকে তার মাথায় তলোয়ারের আঘাত করলে মাথার খুলি উড়ে গেল। ইতোমধ্যে জালাল ওই শিখকে জাহান্নামে পাঠায়। অপরাপর শিখদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। লছমন সিং-এর পুত্র লঘুপায়ে সামনে অগ্রসর হয়ে জালালের পিছে এসে পূর্ণ শক্তিতে তলোয়ার মারে। তলোয়ার জালালের ঘাড়ে দু'ইঞ্চির মত ঢুকে যায়। জালাল ভূতলশায়ী হলে শিখরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কসাই গরু যেভাবে কেটে কেটে টুকরো করে সেভাবেই জালালের দেহটাকে টুকরো করল শিখ কসাইরা। জালালের এক বোন তখন দেয়ালের কাছে কাঁপছে। আচমকা জনৈক শিখ তলোয়ার উঁচিয়ে জালালের লাশের ওপর ঝাল মেটাচ্ছিল। লছমনের পুত্র আত্মরক্ষা করার পূর্বেই জালালের বোন তার এক হাত কেটে ফেলে। মেয়েটা পরবর্তী আঘাত করার পূর্বে জনৈক শিখ তার বাযু ধরে ভূতলশায়ী করে এবং কামিজ ছিঁড়তে থাকে। শিখ পশুটা দাঁত দ্বারা জামা ছিঁড়ছিল। মা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মেয়েকে বাঁচাতে। লছমন সিং খুঁড়িয়ে অগ্রসর হোল। অতি সহজেই সে জালালের মা'র শিরোচ্ছেদ করে ফেলল।

ঃ হল তারা সিং! মেয়েটাকে নিয়ে যাই। ওকে হাসিল করতে আমাদের যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হয়েছে।

✪ ✪ ✪

হামলাবাজদের পশ্চাদপসরণের পর সলীমদের হাবেলীতে রাজ্যের নিস্তব্ধতা নেমে এল। দাঙ্গা আরো ভয়াবহ ও হৃদয় বিদারক হতে পারত। নারী-শিশুরা হাবেলীর উঠানে এসে নিশ্চল পাথরের মত শহীদদের লাশ অবলোকন করছিল। হতভাগ্য শহীদদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। অবশ্য তাদের বলার মুখ তখন হয়েছে মূক। কারো বাকশক্তি নেই। কোথাও কোন সাড়া নেই। তাদের চেহারায় এমন এক ফরিয়াদ যা কেবল দেখা যায়, শোনা যায় না। কম্পিত হাতগুলো যখমীদের ক্ষতে এলাজ করছিল। পুরুষদেরকে কেউ প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছিল না যে, এখন কি হবে? সকলের ধারণা, পরবর্তী হত্যাযজ্ঞের গতি পূর্বেকার চেয়ে আরো ভয়াবহ হবে। ওদের জীবনের চেয়ে মৃত্যুই যেন নিকটবর্তী।

দুশমন থেকে ছিনিয়ে নেয়া মাল মজীদ ক'জনের মাঝে ভাগ করে দিল। সলীম বশীরকে সাথে করে ক্ষেতের দিকে গেল। ওখান থেকে লুকানো গোলা-বারুদ নিয়ে এল ফাজ্জু পালোয়ানের যিম্মাদারিতে। রামচাঁদেরও রাইফেল দু'টো পাওয়া গেল।

সলীম ও মজীদ ছাড়া এমন তিনজন পুরুষ জীবিত আছে যারা রাইফেল চালাতে পারে। অন্যান্য লোকজন অনাগত দাঙ্গার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সলীম এক জোয়ানকে বোঝাচ্ছিল— দেখ, বন্দুক এভাবে রাখো। বেল্ট এভাবে খেঁচো। গুলি ঢুকাও এভাবে। ঘোড়া এভাবে রাখো। দেখো, তোমার হাত কাঁপছে। বন্দুক কাঁধে চেপেই তবে গুলি করো। সলীমের মা অগ্রসর ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন— সলীম! ইউসুফের কোন খবর নেই।'

মায়ের চেহারার হতাশা ও পেরেশানি সলীমের সহ্যের বাইরে। ও বলল— ইউসুফ বাড়িতে নেই?

www.amarboi.org

ঃ হামলার কিছু পূর্বে ও বাইরে বেরোয়। ফিরে আসেনি এখনও।

ঃ আম্মিজান! খোদার দিকে চেয়ে দোয়া করুন।' বলে সলীম সঙ্গীটির দিকে তাকাল— তুমি হা করে কি দেখছ। ম্যাগজিনে গুলি ভরে দেখাও তো।

মা সলীমের চেহারায় হারিয়ে যান। কিন্তু সলীম তার দিকে তাকানোর ফুরসৎ পেল না। পিপাসা কাতর ওর দু'টো ঠোঁট ফেটে গেছে। গোপনে চোখের অশ্রু আঁচলে মুছে মা অগোচরে সরে পড়েন। খানিক বাদে পানিভর্তি জগ নিয়ে আসেন। হাতে গ্লাসও একটা— নাও বেটা! তোমার তেষ্টা পেয়েছে। সলীম গ্লাসে মুখ রাখে। মা এরপর মজীদকে পান করান। ওরা আবারো কাজে লেগে যায়। মা কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু বলার সাহস খুঁজে পান না তিনি। সলীমের চেহারা বলছে, ভায়ের জন্য চিন্তা কম নয় তার। আচমকা মায়ের দিকে তাকিয়ে ও বলে— আম্মি! আপনি যান! খোদা চাহেত কেউ স্পর্শ করতে পারবে না ওর কেশাগ্রও!'

মা ভগ্ন হৃদয়ে দেউড়ির দিকে চলে গেলে মজীদ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল— চাচীজান! ইউসুফ এসে গেছে।'

মা প্রফুল্লচিত্তে ফিরে তাকান। ইউসুফ দেয়াল টপকে আবির্ভূত হয়। সাথে কাকু ঈসায়ী। মা অপেক্ষা করছেন ওর। কিন্তু গতি পরিবর্তন করে ইউসুফ ভায়ের দিকে এগিয়ে যায়। শ্বাস ফুলে-ফেঁপে উঠছে ওর। জামা ঘর্মসিক্ত। মা অগ্রসর হল বাৎসল্যের টানে। ইউসুফ যমীনে পতিত রাইফেল তুলে নেয়।

ঃ কোথায় ছিলি?' প্রশ্ন সলীমের।

ইউসুফ জবাব না দিয়ে ঘুরে কাকুর দিকে তাকায়। তিনি অগ্রসর হয়ে বলেন— আপনাদের হাবেলীতে হামলা হলে ইউসুফ বাবা নূর মোহাম্মদের বাগানে বসে কিতাব পড়ছিল। আমি ওখানে কাটছিলাম ঘাস। বন্দুকের আওয়াজ কানে আসতেই ও বসতীর দিকে ছুটতে কোশেশ করলে বাধা দেই। লুকিয়ে ক্ষেতের কাছে আসলে পুরোদস্তুর লড়াই দেখতে পাই। হাবেলীতে ঢোকার তামাম রাস্তা অবরুদ্ধ। এতদসত্ত্বেও হাবেলীতে ঢুকতে চাচ্ছিল ও। আমি বললাম, হল পুলিশে খবর দেই। শহরে গিয়ে দেখি পুলিশ ও আর্মিরা মুসলমানদের সমানে গুলি করে প্রাণবধ করছে। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে ফেরত আসি। পথিমধ্যে শিখদের সশস্ত্র দল দেখে ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে পালিয়ে আসতে হল। বেলা সিং-এর বাগানের পার্শ্বস্থ আখ ক্ষেতে লুকিয়ে আমরা তার কথা শুনেছি। সন্ধ্যার দিকে ওদের সাহায্যার্থে আরো টুলি পৌঁছে যেতেই ওরা হামলা করবে।'

মজীদের দিকে তাকিয়ে সলীম বলল— মজীদ! আমরা ওদের ওইখানেই হামলা করে বসলে আরো কিছু হয়তো পেয়ে যেতে পারি।

ঠোঁট কামড়ে মজীদ খানিক ভেবে বলল— জনাপাঁচেক লোকসহ তুমি থাক। আমি অন্যদের নিয়ে যাচ্ছি। বেশ কিছু খুঁটি দরোজার সামনে গেড়ে দাও।'

www.amarboi.org

✪ ✪ ✪

বিকেল ৫টা।

বসতীর সীমান্তবর্তী বাগানে শিখরা শহর থেকে আগত কমান্ডোদের অপেক্ষায়। ছ'টা বাজলে শিখরা পরস্পরে বলতে লাগল— এখন?

জনৈক উপনেতা বললো- আমাদের এখন শহরমুখো হতে হবে। নেতাকে পথিমধ্যে পেলে ফিরে আসব। মনে হচ্ছে বাউন্ডারী ফোর্সের মুসলিম সেপাই অত্র এলাকায় পৌছে গেছে। জমাদ্দার হয়ত আজ রাতে হামলা করতে পারবেন না।'

অন্য এক দলের নেতা বলল— 'এ পরিস্থিতিতে আমাদের শহরমুখো হওয়া বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমার মতে, বসতী অবরোধ করা দরকার, রাতের বেলা যাতে ওরা পলায়ন করতে না পারে। জমাদ্দারের কাছে অবশ্য একজনকে পাঠানো যেতে পারে।

জনৈক শিখ বলল— ওরা আমাদের কিছু বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছে। ওগুলো নিয়ে বের হলে আমরা ওদের পথ আগলাতে পারব না। আমরা এখানে বসে থাকলে মুসলমানরা আমাদের গাঁয়ে হামলা করে বসতে পারে। আমরা গেলাম। জমাদ্দার আসলে খবর দেবেন। এসে যাব।

সলীমদের বসতীর জনৈক শিখ বলল— সর্দারজী! মুসলমানদের এ সাহস কোথায় যে, ওরা আপনার জনপদে চড়াও হবে। আপনারা চলে গেলে মুসলমানরা জড়ো হবার সাহস পেয়ে যাবে।

অপর বসতীর নেতা জবাব দেয়— 'ভাই! আমি আপনার ভয়ে ভীত। আমরা এখানে বসে তোমার ঘর পাহারা দেই— এই চাও তো। তুমি না বলেছিলে, জনা পঞ্চাশেক লোক আর মাত্র চারটা বন্দুক হস্তগত হলে ওদেরকে দশ মিনিটে খতম করে দিতে পারবে। তোমার কথায় আমরা গোটা শিখ সম্প্রদায়কে জমায়েত করেছি। লড়াইয়ের মুহূর্তে তোমরা আমাদেরকে সামনে ঠেলে দিলে, নিজেরা হটলে পিছু। বাইরের লোকজন মরবে আর তোমাদের দেহে নখের আঁচড়ও লাগবে না— কি অদ্ভুত চাণক্য কূটকৌশল। নেতার কথায় সলীমদের বসতীর শিখদের গায়ে আগুন লেগে গেল। একজন বলল— আচ্ছা সর্দারজী? কথা তাহলে এই? এক্ষণে আপনি আমাদেরকে কাপুরুষতার ধিক্কার দিচ্ছেন! আমরা তো শুরুতেই হাতজোড় করে বলেছিলাম, এ এলাকাকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দিন। গোলাপ সিংও আপনাকে বুঝিয়ে ছিলেন; কিন্তু আপনি তাকে মেরে ফেললেন। এখন আমরা কাপুরুষ হয়ে গেলাম! কাপুরুষ তো আপনারাই। পলায়নকালে বন্দুক ফেলেই পালিয়েছেন!'

শিখদের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হল, পরিস্থিতি হাতাহাতিতে রূপ নিল।

জনৈক শিখ ঘোড়া হাঁকিয়ে আসল। শিখদের জোশে ভাটা পড়ল। সে বলল— জমাদ্দার সাহেব পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে সকাল নাগাদ এসে পৌছুবেন। আজ রাতে তিনি অন্য এক গ্রামে চড়াও হবেন।

www.amarboi.org

জনৈক শিখ বলল— তিনি বন্দুক পাঠালেন না কেন?

ঃ আমি রাইফেলের দরখাস্ত করলে তিনি তেড়েমেড়ে আসেন। বললেন, বন্দুক ওদের, আবার সেপাইও দেব? তা হয় না। ওরা হাতবোমা দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা বেনিয়াদের পুত্র না হলে মুসলিম ঘরগুলোকে কবর বানাতে এগুলোই যথেষ্ট। রাতে তোমরা মুসলিম বসতীতে ওগুলো নিক্ষেপ করতে পার। তোমরা সাহস না করলে খ্রিস্টানদের বাধ্য করো। ওরা অতি সহজেই হাবেলীর কাছ দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করতে পারবে।' বলল সওয়ার।

ঃ তা অবশ্য ঠিক।' বলল এক শিখ।

ঃ ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বে না।' আরেক শিখের মন্তব্য।

ঃ ওদের বাধ্য করা হলে তখন।

ঃ কিন্তু ওদের বোমা চালানোর কৌশল জানা নেই।

ঃ তা না হয় আমরা শিখিয়ে দিলাম।' ফৌজি এক শিখ বলল, 'দাও না, বোমা আমাকে।'

সওয়ার গলায় পেঁচানো বোমের থলে নামাতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে ও পাশের ক্ষেত থেকে গুলি শুরু হল। শিখরা হতাশ ও পেরেশান হয়ে এদিক সেদিক পলায়ন করল। পয়লা গুলিটা জমাদ্দারের দূতের গায়ে লাগল। তার ঘোড়া ভয়ে লাফ মারল। দূত আছড়ে পড়ল। মুহূর্তেই ময়দান খালি হয়ে গেল। মজীদ দ্রুত ক্ষেত থেকে বেরিয়ে বোমের থলে তুলে নিল এবং পলায়নপর শিখদের ওপর গুলি চালাতে লাগল।

ময়দান বিলকুল খালি হয়ে গেলে বশির বলল— মজীদ! কসম খোদার, আমার নিশানাও ব্যর্থ হয়নি!'

ইউসুফ বলল— ভাইজান! আপনি না বলেছিলেন, আমি রাইফেল চালাতে জানব না। ওই মোটা শিখটাকে আমিই তো ঘায়েল করলাম।

মজীদের বাপের ৮০ বছর বয়স্ক চাচা— আলী মোহাম্মদ বললেন— হায়! এ বন্দুকগুলো হামলার পূর্বেই যদি আমাদের হস্তগত হত!'

ঃ দাদা! কুদরত আমাদের ভাগ্যে হয় জয় রেখেছেন, না হয় ইয্যতের মওত। এবার আমরা ইঁদুরের মত অসহায় হয়ে মরব না। এই দেখুন, বোমা ভর্তি থলে। কুদরতের এনাম এগুলো।

জমাদ্দারের এ দোদুল্যমান অবস্থা দেখে শিখ-হিন্দুরা বাল-বাচ্চাসহ পালাতে লাগলে মুসলমানরা তাদের ঘেরাও করতে চাইলে মজীদ তাদের ধমক দিয়ে বারণ করল।

✪ ✪ ✪

মজীদ ও ওর সঙ্গীরা 'আল্লাহু আকবর' নারা দিয়ে হাবেলীমুখো হলে হাবেলীতে জমায়েত মুসলমান ওই নারার জবাব দিল। আচমকা পাশের ক্ষেত থেকেও নারার জওয়াব আসতে লাগল।

www.amarboi.org

মজীদ সাথীদের লক্ষ্য করে বলল— তোমরা হাবেলীর ভেতরে ঢোক। শিখরা ধোঁকা দিয়ে হামলা করতে চাইছে হয়তবা!

মুহূর্তে হাবেলীতে জমায়েত মুসলমানরা ছাদে চড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে রইল। নারার আওয়াজ ক্রমশ নিকটে আসছে। ক্ষেত থেকে কারো এগিয়ে আসার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। একটা ছায়ামূর্তিকে ক্ষেত থেকে বেরোতে দেখে মজীদ জোরে বলে ওঠে— কে?

ঃ মজীদ আমি।' আগন্তুকের জবাব।

ঃ কে দাউদ?

ঃ হ্যাঁ, আমি!' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দেয় সে।

দাউদের পেছনে ১০/১৫ জনের মত লোক। মজীদ বলে— এক্ষণে ফটক খোলা খুবই মুশকিল। তোমরা দেয়াল টপকে ভেতরে এসো। তোমাদের সঙ্গে আরো মুসলমান আছে কি?'

ঃ হ্যাঁ! অনেক!' দাউদ আগে বেড়ে জবাব দেয়, 'খানিক সময়ের মধ্যে তোমাদের হাবেলীতে তিল বরাবর ফাঁক থাকবে না। দূর-দরাজের বহু লোক ক্ষেতে লুকানো।

ঃ সকলকে ডেকে পাঠাও। বাইরের দেয়ালের সাথে সিঁড়ি লাগিয়ে দিচ্ছি।

দাউদের সাথীরা ক্ষেতে লুকানো মুসলমানদের ডাক দেয়। মুসলমানরা ক্ষেত থেকে বেরোয়।

আধ ঘন্টার ব্যবধানে শ'তিনেক নারী-পুরুষ জমায়েত হয়। তন্মধ্যে কেউ বলল— আমার গোটা খান্দান মারা গেছে। আরেক জন বলল— এক বৃদ্ধ ও শিশু ছাড়া আমার বংশে বাতি জ্বালানোর মত কেউ নেই!

ঃ শিখরা আমাদের গ্রামের এত এত মহিলাকে ধরে নিয়ে গেছে।

ঃ আমাদের গ্রামের এতজন মহিলা কূপে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঃ আমার দুধের বাচ্চাকে মেরে বর্শার ডগায় উঁচু করে ধরা হয়েছিল।

ঃ অমুক গ্রামের গোটা মানুষকেই মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দেয়া হয়েছে। মহিলাদের সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে।

ঃ এখন উপায় কি! কি করণীয় আমাদের! কোথায় যাব?

ঃ পাকিস্তান! সেতো অনেক দূরে।

ঃ শোনা যায়, বেলুচ রেজিমেন্ট অমৃতসরের হাজারো মুসলমানদের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে। তারা এদিকে এলো না কেন?

ঃ মিয়া সলীম! ওরা আমার বিবিকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মাথায় আঘাত পেয়ে আমি বেহুঁশ হয়ে যাই। মৃত ভেবে আমায় ফেলে রেখে যায় ওরা। ওরা আমার মায়ের সাথে...!'

মোদ্দাকথা, প্রতিটি নারী, পুরুষ ও শিশুদের এক করুণ কাহিনী। তন্মধ্যে এমনও কিছু ছিল, যাদের মুখে না ছিল ভাষা, চোখে না ছিল অশ্রু। ওরা এদিক ওদিক তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে খামোশ হয়ে যেত।

www.amarboi.org

এক লোক হাবেলীতে প্রবেশ করেই চিৎকার দিয়ে বলল— দুনিয়াতে এক্ষণে আমার কেউ নেই। পাঁচ পুত্রের পিতা আমি। মেয়ে তিনটা। নাতিও তিনটা। এখন আমি একা। শুধুই একা!'

এই লোক খাইরুদ্দীন।

গোলাম হায়দার (মজীদের বাবা) অগ্রসর হয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'সবর করো খায়ের!'

খাইরুদ্দীন গোলাম হায়দারের বুকে মিশে যান। শিশুর মত ডুকরে কেঁদে ওঠেন। তার দেখাদেখি ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির বধূ-মাতারা তাদের শেষ সম্বল চোখের বড় দু'ফোটা অশ্রু করে বিসর্জন।

✪ ✪ ✪

রাতে মজীদ ও দাউদ হাবেলীর ছাদে ইট-পাথরের স্তূপ জমা করে মোর্চা তৈরী করল। হাবেলীর এক কোণে শহীদানকে দাফন করছিল সলীম। কবর খননের জন্য কাকু তাঁর গাঁয়ের ক'জন ঈসায়ীকে নিয়ে এলেন। অবশ্য ৪০টা লাশের কবর তৈরি করা কি চাট্টিখানি কথা? বাইরের প্রায় অর্ধেক লোকই যখম হয়েছিল। অন্যরা ক্ষুধা ও শ্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল। এজন্য যথাশীঘ্র খানার ইন্তেযাম দরকার। সলীমের চাচা গোলাম হায়দারের পরামর্শে লম্বা একটা গর্ত খনন করে সব লাশ সারিবদ্ধভাবে শুইয়ে দাফন করা হোল।

আফজাল ও ইসমাঈলকে সবশেষে দাফন করা হোল। ইসমাঈলের লাশে মাটি ফেলা শুরু হলে কাকু বললেন— আজ আমাদের জনপদ নিঝুম। আগামীতে এ জনপদে আর কেউ হাসবে না। মিয়া সলীম! চৌধুরী রমজানের লাশ লছমন সিং-এর বাড়ীতে এখনও পড়ে আছে। দেখে এসেছি আমি। ইসমাঈল বলতেন, আমাদের কবরও একই স্থানে হবে। আমরা তার লাশ নিয়ে আসছি। এখানেই কবর হবে।

সলীমের চোখ দিয়ে অশ্রু দরদর করে বেরিয়ে পড়ল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ও বলল— যাও! সকলের লাশই নিয়ে এসো!'

রমজানকে ইসমাঈলের পাশে দাফন করা হল। ছাদের কোণ থেকে সেই তারা খচিত পতাকা উদ্ধার করল সলীম, যা ইসমাঈলের রক্তে লাল হয়েছিল। ওটি এনে তার কবরে গেড়ে দেয়া হল।

মহিলারা ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খানা তৈরি করলেন। মোর্চা বানিয়ে মজীদ নামল নিচে। উপস্থিত মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলল—দেখুন ভাইয়েরা! জানি এহেন মুহূর্তে মুখে লোকমা উঠতে চাইছে না আপনাদের। খোদা মালুম, সকালে আমরা খানা খাওয়ার সুযোগ পাব কি-না। ক্ষুধার্ত দেহে আমরা সে সময় জমে লড়তে পারব না!'

মজীদের নির্দেশে ক'জনে যমীনে চাটাই বিছিয়ে দিল। আধসিদ্ধ কিছু ভাত সেখানে পরিবেশন হল। ক'জনে গোগ্রাসে গেলা শুরু করল। দেখাদেখি সকলে তাতে অংশগ্রহণ করল।

বাইরে থেকে ফটকে ধাক্কা দিয়ে কেউ বলল— 'ফটক খোলো!'

মজীদ এগিয়ে বলল— কে?

www.amarboi.org

বাইরের থেকে আওয়াজ এল— আমি ফাজ্জু!'

ঃ ফাজ্জু! ওদের ছেড়ে এসো না। আমি তোমার কাছে যাওয়ার ইচ্ছে করেছি মাত্র।

ঃ সুবেদার! আমি ওদের নিয়ে এসেছি। পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ!

ঃ ওদের খেয়াল রেখো! ভেগে না যায়!'

ঃ চিন্তা করো না। পালাবে কোথায় বেটারা। মজবুত করে বেঁধেছি ওদের।

ঃ এক্ষণে দরোজা খোলা যাবে না। দাঁড়াও! আসছি আমি।' বলে মজীদ দেয়াল টপকে বাইরে বেরুল।

রামচাঁদ ও কন্দন লালের মেদবহুল শরীর। এতদসত্ত্বেও মজীদ ও ফাজ্জু কোনক্রমে ওদেরকে দেয়ালের ওপর থেকে হাবেলীর ভেতরে ফেলল।

সলীম ওদের ওপর টর্চ মারল। লোকেরা ওদেরকে চিনতে পেরে আশেপাশে জমায়েত হল। সলীম ও মজীদ এতক্ষণে ওদের কথা গোপন রেখেছিল। জনতা তাই ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঃ 'এই যে, রামচাঁদ। এ বেটা রামচাঁদ' জনৈক নওজোয়ান চিৎকার দিতে দিতে সামনে অগ্রসর হল। পর মুহূর্তে রামচাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর এক ঘুষিতেই রামচাঁদ মুখ থুবড়ে পড়ল। ওই জোয়ানেরই এক সাথী কন্দন লালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সলীম ও মজীদ ওদেরকে কোনক্রমে বাঁচাল। কন্দন লালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া জোয়ানটির শক্তি-সামর্থ্য ও জোশ বেশী বিধায় ওকে বারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সে চিৎকার দিয়ে বলল— সুবেদার সাহেব। আপনি ওকে জানেন না। আমাদের নিকৃষ্ট দুশমন। এই বসতীতে হামলা করতে শিখদের জমায়েত করেছে এ বেটা। ও-ই ওদেরকে বন্দুক দিয়েছে। দলপতির সামনে ও-ই ভাষণ দিয়েছিল। ও-ই বলেছিল, একটা মুসলমানকেও যিন্দা থাকতে দেয়া হবে না। এই বদমাশটা বদমাশী না করলে মহিন্দর শিখদের বারণ করতে পারত! ওকে এক্ষণে যিন্দা ছেড়ে দেয়া কবীরা গোনাহ।

জনৈক বয়োবৃদ্ধ লোক গোলাম হায়দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন— চৌধুরীজী! ওর বক্তব্য শুনেছি আমিও। বলেছিল, রহমত আলীর হাবেলী থেকে পাল্কী নিয়ে এস। কিন্তু খোদা বড় ইনসাফগার। শিখরাই এক্ষণে ওর ঘরে পাল্কী নিয়ে গেছে।' অতঃপর তিনি রামচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন— শেঠজি! আজ তোমার ঘরে আমরা খালিস্তান দেখেছি। তোমার কুশলিয়া ও শীলাকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার বিবিকে গণধর্ষণ করে আধমরা করে রেখে গেছে। রামচাঁদ! তুমিই না ওদেরকে বলেছিলে, মুসলমানদের আস্ত ছাড়বে না। জানি, আমরা এখানে থাকতে পারব না; কিন্তু তুমিও থাকতে পারবে বলে মনে করছ? যে কুত্তার জাতিকে পেছনে ফেলে এসেছ, তোমাকে কেটে দংশন করে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছাবে ওরাই।

রামচাঁদের ভয় এক্ষণে পেরেশানিতে রূপ নিল। সে চিৎকার দিচ্ছিল, তোমরা মিথ্যে বলছ। আমি তোমাদের কব্জায় বিধায় আমাকে ছাড়বে না জানি। কিন্তু শিখরা ওই কাজ করার দুঃসাহস পাবে না।

www.amarboi.org

বুড়ো লোকটা রাগতস্বরে বলল— বদমাশ! যে আগুন প্রতিবেশীর ঘরে লাগানো হয়, তা জ্বালিয়ে দেয় আপনার ঘরকেও। বিশ্বাস না হলে মহল্লার দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে দেখ।'

অপর এক লোক বলল— চৌধুরীজী! ওরা আমাদের মালমাত্তা ও মা-বোনদের সম্ভ্রমহানিতে লিপ্ত না হলে হয়ত বেঁচে আসতে পারতাম না। আমাদের মাল-সম্পদ পাল্কীতে করে নিয়ে গেছে বেটা।

রামচাঁদ খানিক খামোশ থেকে বলল— আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পেয়েছি। মিয়া সলীম! যা করেছি তাতে আমার ওপর তোমাদের আস্থাবান হওয়ার কথা নয়, কিন্তু তোমরা আমাকে ছেড়ে দিলে শিখদের অপকর্মের বদলা নিতে পারব। হিন্দুস্থানে এক্ষণে কংগ্রেসের হুকুমত। তারা শিখদের এ কুকর্মকে প্রশ্রয় দেবে না। আমি বলব, তোমরা সাপ পুষছ। নেহেরু ও প্যাটেলের কাছে যাব। দেখবে, ওই কুত্তাগুলোকে লাঠিপেটা করার স্থলে খাদ্যে বিষমিশ্রণ করে মেরে ফেলবে তারা।

সলীম নিশ্চিন্ত শান্ত নদীটির মত জবাব দেয়— শেঠ রামচাঁদ! কি এমন কথা বললে তুমি। মাংসাশী কুত্তা কখনও কখনও মালিকের হাতেই কামড় বসিয়ে দেয়। তোমাদের উজীর, তোমাদের গভর্নর, তোমাদের নেহেরু ও প্যাটেল পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করতে চাইছে। আর এ কাজের দায়িত্ব চেপে দেয়া হয়েছে শিখদের ওপর। যতদিন ওরা এ কাজ সমাধা না করছে ততদিন ওদের এ অপকর্ম তারা হজম করে যাবে। তোমার কন্যা কুশলিয়া ও শীলাকে তারা তোমারই খেদমতের এনাম হিসাবে নিয়ে গেছে।

মজীদ বলল— সময় নষ্ট করো না সলীম। ইউসুফ তুমি ওদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করো। আমরা ওয়াদা করেছিলাম, ওদেরকে কতল করব না; কিন্তু মুসলমানকে তাই বলে এক গর্তে দু'বার পা দেবার কোশেশ করানো বৃথা। আমি বিশ্বাস করি না, ছেড়ে দিলে ওরা পুনরায় ওই দুষ্কর্ম করবে না। ওদের পায়ে ঘোড়ার শেকল বেঁধে দাও। নিয়ে যাও সাথীহীন বাতিহীন অন্ধকার কুঠরিতে।

✪ ✪ ✪

বহিরাগত লোকদের মধ্যে জনাসাতেক সাবেক ফৌজিলোক ছিল। মজীদের বলার পর অনভিজ্ঞ লোকেরা এদের হাতে তাদের বন্দুক তুলে দিল। বৃদ্ধ এক লোক অগ্রসর হয়ে বলল— আমাকেও একটা রাইফেল দাও।

মজীদের গড়িমসিতে তিনি আবারো বললেন— আমি রিটায়ার্ড জমাদ্দার।'

মজীদ হয়রান হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আরেক লোক বলল— তিনি আমাদেরই বসতীর। হামলাকালীন সময়ে নহরে গোসল করছিলেন।' ফাজ্জু পালোয়ান অগ্রসর হয়ে তাকে দেখে বলল— এতো দেখছি জমাদ্দার এনায়েত আলী।'

সলীম ও মজীদ ছাদে মোর্চা বানিয়েছিল। বাড়ীর অন্য জোয়ানরা হাবেলীতে বসাল পাহারা। দাউদ ক'জন সঙ্গীসহ হাবেলীর বাইরে দিচ্ছিল টহল। বশির জনপদ চষে ফিরে

www.amarboi.org

বলল— শিখদের ঘরদোর খালি। অন্দর সিং-এর ঘরে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসছে। দরোজা বন্ধ ভেতর থেকে। হয়তো অন্দর সিং-এর পুত্র ভেতরে। আজ সে শিখদের দলে ছিল। আফজালের বন্ধু শের সিংকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

দাউদ সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল— তোমরা এখানেই থাক। এই আসছি আমি। বশির তুমি এসো।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা অন্দর সিংয়ের হাবেলীর বাইরে এসে দাঁড়াল। উঠান থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। দাউদ মুহূর্তেই দেয়ালের ওপর চড়ল। অন্ধকারে ভেতরটা ঠাহর করতে চাচ্ছিল। আঙ্গিনায় কে যেন চৌকিতে শোয়া। ক্রন্দনরতা নারী মাটিতে বসা।

দাউদ বশিরের দিকে ঘুরে বলল— রাইফেল ও টর্চ দাও। যতক্ষণ না ডাকছি— এসো না ততক্ষণ'। বশির ওর কথার অনুসরণ করে রাইফেল ও টর্চ এগিয়ে দিল। টর্চের বোতাম টিপে আঙ্গিনার পরিবেশ আঁচ করল। এক যুবতী ও বৃদ্ধলোক ছাড়া কেউ নেই। যুবতী গর্দান উঁচিয়ে ভয়ে বলল— কে?

এর জবাবে দাউদ তার মুখে টর্চ মারল। যুবতী উঠে দাঁড়াল কিন্তু বৃদ্ধ কাত হয়ে থাকল তথৈবচ।

দাউদ ছাদে বারকয়েক টর্চ ঘুরিয়ে বশিরের দিকে তাকিয়ে নেমে পড়ল।

ঃ তুমি?' যুবতীর কণ্ঠে বিস্ময় ও পেরেশানি। পেছনে সরে যায় সে।

ঃ চিল্লাচিল্লি করো না। তোমার আর্তনাদের জবাব দেয়ার মত নেই কেউ।' বলে দাউদ চৌকিতে শোয়া বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। যুবতী দেয়ালে মিশে বললো-তাকে কিছু বলো না। মরার আগেই মৃত সে। সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দেয়াল টপকাতে গিয়ে বশির বলল— এর নাম অন্দর সিং। তিনি আজ বাবা রহমত আলীর বন্ধুত্বের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন।

দাউদ কোন বাক্যব্যয় না করে বশিরের হাতে বন্দুক দিয়ে যুবতীর দিকে এগিয়ে গেল। যুবতী দৌড়ে পশুশালার খোড়লিতে লুকোয়। ওখান থেকে উঠে দেয়াল টপকাতে চেষ্টা করে। দাউদ ওর হাত ধরে নীচে নামায়। দাউদের লৌহথাবার সামনে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে যুবতী চিৎকার দিতে থাকে। দাউদ প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে বৃদ্ধের খাটের কাছে নিয়ে এসে বলে— অন্দর সিং! তুই কেবল অন্যের ঘরে আগুন লাগাতে শিখেছিস্। নিজের ঘর জ্বলতে দেখিস্‌নি কভু!

যুবতী বলছিল— আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের দুশমন নই। গোলাপ সিংয়ের বোন আমি। শের সিং-এর কন্যা। আমার বাবা মুসলমানদের দোস্ত।

ঃ আমরা তোমাদের দোস্তি দেখেছি।' বলে দাউদ যুবতীকে মাটিতে আছড়ে ফেলল। বের করল পকেট থেকে ধারাল চাকু।

বশির রাইফেল যমীনে রেখে দাউদকে জাপটে ধরল। দাউদ চিৎকার দিল— আমাকে ছেড়ে দাও বশীর। তুমি জানো না, ওরা আমার মা, বোন ও বাবার সাথে কি ব্যবহার করেছে। তারাই আমার ঘরে আগুন দিয়েছে, যাদের ঘর আমি দেড় মাস পাহারা

www.amarboi.org

দিয়ে রেখেছি। একমাত্র ওদের স্বার্থেই আমার ছুটির পুরোটা বিনিদ্র কাটিয়েছি। আমার বাবা মৃত্যুপথযাত্রী দেখে শহরে ঔষধ আনতে যাই আর ওরা শহর থেকে নিয়ে আসে শিখ যোদ্ধা। আমার অসুস্থ বাবা ওদের হাতে মরেছে। মা ও আমার তিন ভাই-বোনকে কামরায় তালাবদ্ধ করে আগুন জ্বেলে পুড়িয়েছে। আমার বিবাহযোগ্য বোনেরা কূয়ায় ঝাঁপ দিয়ে ইয্যত বাঁচিয়েছে। আমার স্ত্রীকে ধরে মসজিদে নিয়ে গেছে। এবং ওখানেই...। ছেড়ে দাও আমাকে। ছেড়ে দাও।' উত্তেজনাভরে দাউদ বশিরের কব্জিতে মোচড় দেয়। ততক্ষণে যুবতী দরোজার ছিটকিনি খুলতে থাকে। তার কম্পিত হাত ছিটকিনি খুলতে অপারগতা প্রকাশ করে। দাউদ তাকে আবারো ধরে ফেলে। এবার সে পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার দেয়। ও দেয়ালে পিঠ করে দাঁড় করাল। যুবতী বলল— আমাকে সলীমদের বাড়ী নিয়ে হল। আমি তাকে ভাই ডেকেছি। সে আমাকে বোন ডাকত। চাচা আফজাল আমাকে মেয়ের আদর দিতেন।'

দাউদ এক হাতে যুবতীর গর্দান চেপে অন্য হাতে চাকু উঁচিয়ে ধরলে সে বলল— আমার রক্তে তোমার কলজে ঠাণ্ডা হলে মেরে ফেল জলদি। দেখছ কি, চালাও তোমার চাকু।'

দাউদ যুবতীর কথায় প্রভাবিত হয়ে বলল— আমি তোমার সাথে ওই ব্যবহার করব না, ওরা যা করেছে আমার বিবির সাথে। কাজেই মরার সময় তোমার ওই ধরনের তকলীফ হবে না।'

যুবতী খামোশ নযরে তাকায় দাউদের ছোরায়। চাকুর ডগা যুবতীর বুকে রাখে দাউদ। কিন্তু কম্পিত ওর হাত। চেহারায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

যুবতী বলল— তোমার কোন বোন থাকলে এমনটা করতে কি?'

দাউদের গোটা শরীর ঝটকা মেরে উঠল। পর মুহূর্তে চাকু মাটিতে ফেলে দিল। বশির টর্চ মেরে দেখল ওর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে শ্রাবণ মেঘের দিনের মত।

দরোজা ধাক্কা দিয়ে কে যেন বলল— দাউদ! বশির!'

ঃ কে? সলীম? প্রশ্ন বশিরের।

ঃ হ্যাঁ। তোমরা এখানে করছ কি?

বশির দরোজা খুলল। কিছু লোকসহ সলীম ভেতরে ঢুকল। যুবতী সলীমের হাত ধরল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল— দাদা! অপরকে না পাঠিয়ে খোদ্ তুমি নিজে এসে আমার গলা টিপে দিলে না কেন?

ঃ কে? রূপা? তাহলে ওই আর্তনাদ তোমার?

যুবতীর খামোশ ভাব লক্ষ্য করে দাউদ বলল— হ্যাঁ! আর্তনাদ ওরই। আমি ওকে হত্যা করতে এসেছিলাম। এসেছিলাম বাবা, মা, ভাই-বোন ও স্ত্রী হত্যার প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু আমি হেরে গেছি সলীম। কসম করেছিলাম, রহম করব না কাউকে। চেয়েছিলাম বুড়োটার গলা টিপে দিতে, কিন্তু উত্থিত হয়নি আমার হাত। যুবতীর ওপর বধূ-মাতাদের সম্ভ্রম হানির প্রতিশোধ খেয়াল করলে কে যেন আমার কানে বলল— দাউদ! করছ কি, ও-ওতো কারো বোন। সলীম আমি বড্ড বুযদিল!

www.amarboi.org

সলীম ওর কাঁধে হাত রেখে বলল— তুমি বুযদিল নও দাউদ। চিৎকার শুনে বাইরে বেরুলে খবর পেলাম, তুমি এদিকটায় এসেছ— বিশ্বাস করিনি, কোন নারীর গায়ে হাত তুলতে পার তুমি। এটা মুসলমানিত্বের পরিচয় নয়। অতঃপর সলীম জালালী মেযাজে বলল— আমরা ইনসানিয়াতের ওই দুশমনদের ক্ষমা করব না, যারা কৃতজ্ঞতার বদলা রক্ত নিয়ে দেয়। আমাদের তলোয়ার পুরুষদের সাথে লড়বে, অসহায় বধূ-মাতাদের ওপর নয়। পূর্ব পাঞ্জাবের প্রতিশোধ আমরা কোন পানিপথে নেব। খুব সম্ভব সেই সময় আসেনি এখনও।

টর্চের বোতাম টিপে অন্দর সিং-এর প্রতি তাকাল সলীম। চোখ নির্মিলিত তার।

কাঁপছিল তার ঠোঁট। কিন্তু আওয়াজ নেই নিরস ওষ্ঠপ্রান্তে।

বশির বলল— পক্ষাঘাতে ধরেছে তাকে!

সলীম যুবতীকে বলল— রূপা! গ্রামের সমস্ত শিখ চলে গেছে বুঝি। সকাল নাগাদ তোমার যিম্মা নিতে পারব। কিন্তু এরপর কি হবে বলতে পারব না। দূর-দরাজ থেকে মুসলমানরা আমাদের হাবেলীতে জমায়েত হচ্ছে। তোমার এখানে অবস্থান ঠিক হচ্ছে না!'

ঃ ভাইয়া! বাপ-চাচা ঠাকুরদা'কে এভাবে রেখেই পালিয়েছে। কিন্তু তাদের সাথে যেতে পারলাম না আমি। তারা আমায় টেনেছিল কিন্তু ভাইয়ার লাশ এখানে পতিত ছিল, ঠাকুরদা'র হালত এই। বাপুর কোন খবর নেই। মদ খেয়ে তিনি হয়ত কোথায় পড়ে আছেন। চাচা আফজালের সাথে থাকলে তিনি মদ গিলতেন না। চাচাদের সাথে বাইরে বেরিয়েই ইক্ষুক্ষেতে আত্মগোপন করেছিলাম— তারা চলে গেলে এখানে চলে আসি।

ঃ তোমার মা?

ঃ তিনি তো সর্বাগ্রে পাড়ি জমিয়েছেন।

ঃ রূপা! তোমার ভাই আমাদের জন্য জীবন দান করেছে। তার লাশ এখানে পৌঁছে দিচ্ছি।

ঃ না, না! আমি তার লাশ দেখতে পারব না। আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে হল!'

ঃ কিন্তু তোমার দাদা?

যুবতী নিরুত্তর। সলীম বলল— দেখো রূপা! গোলাপ সিং-এর বোনের জন্য আমার ঘরের দরোজা বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু এক মিনিটের জন্যও তুমি ওখানে থাকতে পারবে না। বিধবাদের করুণ ফরিয়াদ সহ্য করতে পারবে না তুমি। আর আমাদের বাড়ীও সংরক্ষিত নয়। আমরা সকালের সূর্য দেখলেও রাতের তারকা হয়ত দেখতে পাব না। তুমি এখানে থাক। আমার লোক তোমাদের গলিতে পাহারা দেবে।

রূপা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল— এখানে বসে ভাবছিলাম, চাচা আফজাল এসে বলবেন, রূপা! বেটি! এখানে একা একা তোমার ভয় লাগে না? হল আমাদের বাড়ী! তুমি একাকী চলে গেলে না কেন!

সলীম চোখের অশ্রু মুছে বলল— রূপা! চাচা আফজাল এখন তোমাকে আর ডাকতে আসবে না।' রূপা অবাক দৃষ্টিতে সলীমের দিকে তাকায়। সলীম সাথীদের দিকে তাকিয়ে বলে— হল দাউদ!

www.amarboi.org

সলীম বাইরে বেরুতে গেলে রূপা ওর বাযু ধরে বলে— সলীম! চাচা আফজালের কি হল? কেন তিনি আসতে পারবেন না?

ঃ তিনি শাহাদত বরণ করেছেন।

সলীমের হাত ছেড়ে রূপা এক কদম পিছু হটল। ওরা বাইরে গিয়ে বলল— রূপা! ভেতরে থেকে দরোজার ছিটকিনি লাগিয়ে দাও!

✪ ✪ ✪

সন্ধ্যার দিকে সলীমদের হাবেলীতে নতুন আরো তিনটি কাফেলা এসে জড় হল। এদের সংখ্যা সাতশ'। শেষ কাফেলায় এমন কিছু লোক ছিল যারা বিয়াস নদী পাড়ি দিয়ে ক্রমাগত সাত রাত সফর করে পৌঁছেছে। তারা খবর দেয়, আরো হাজার দুয়েক লোক আসছে। দুপুরের দিকে এসে পৌঁছাবে তারা।'

৮টার দিকে শিখরা হামলা করল। আকালী সেনাদলে বাউন্ডারী ফোর্সের ওইসব শিখ, গুর্খা, ডোগরা ও মারাঠা সেপাই ছিল, মুসলিম খুনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় রচনা করার দাবি যাদের হাতে-দেয়া হয়েছিল। ওদের সঙ্গে রাইফেলধারী পুলিশ। শুধু স্টেনগানধারীই ৪০ জন। মোট সংখ্যা ২ হাজারের উর্ধ্বে। সকলেই পিস্তল কিংবা বর্শা-নেযায় সজ্জিত। উপকূলীয় জনা পঞ্চাশেক ঘোড়সওয়ার। সেপাই ভর্তি দু'টি সাঁজোয়া যান কাঁচা রাস্তার মোড়ে রাখা হোল। রাখা হল গোটা তিনেক পুলিশী ভ্যান রাস্তা থেকে নেমে জনপদের তিন ফার্লং দূরে।

পূর্ব পাঞ্জাবের আকালী সেনাদের হামলার ধরন ছিল এরকম, প্রথমে ফৌজ ও পুলিশ মুসলমানদের খানা তল্লাশি করত। বলত, খুব জলদি ঘরবাড়ী খালি করে দাও। মুসলমানরা ঘর ছেড়ে বেরোলে শিখরা তাদের ওপর সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কোথাও সংঘর্ষ বাধলে ফৌজ ও পুলিশ অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করত না।

জনবহুল বিশাল শহরগুলোতে কারফিউ ঘোষণা করা হল। সেনাবাহিনী গলি ও বাজারে টহল দিয়ে লক্ষ্য করত, কোন মুসলমান জানালা পথে উঁকি ঝুঁকি মারছে কি-না। অতঃপর শিখরা ঘরদোরে আগুন লাগাত। পাইকারী হত্যা করত। পলায়নপর লোকদের ওপর নেমে আসত পশ্‌লা পশ্‌লা গুলি। ভয়ে ভেতরে যারা লুকাতো আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হত তারা।

ছোট ছোট লোকালয় যেখানে পাল্টা আক্রমণের ভয় ছিল না সেখানে সৈন্য সাহায্য ছাড়াই শিখরা চড়াও হত। রাতের বেলা মেটে তেল কিংবা পেট্রোল ছিটিয়ে মুসলিম বসতিতে আগুন লাগাত ওরা। মুসলমানরা চিৎকার দিয়ে ঘর ছাড়া হলে ওঁৎ পেতে থাকা শিখ বহর এদের কচুকাটা করত।

সলীমদের বসতীতে হামলাকারী আকালী সেনারা উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার করে দিত। কিন্তু এ জনপদে ওরা ইতোপূর্বে তিক্ত বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে। তারা সিং ও প্যাটেলের এ ভাবশিষ্যরা পাইকারী হত্যার এরাদা করেছিল; কিন্তু এ এমন এক জনপদ যেখানে গুলির জবাব দেয়া হয় গুলি দিয়েই।

www.amarboi.org

হামলার আগক্ষণে জনৈক সওয়ার ঘোড়া হাঁকিয়ে হাবেলীর পেছনে এলো। দু'শো গজ দূরে ঘোড়া থামাল। এক মুহূর্ত ভেবে পরক্ষণেই হাত বুলন্দ করে সামনে অগ্রসর হল।

অপেক্ষাকৃত নীচু ছাদের মোর্চায় বসা পাহারাদাররা রাইফেল তাক করে মজীদের আদেশের অপেক্ষা করছিল। সওয়ার সেই দলপতি র‍্যাডক্লিফের ঘোষণার পর অত্র এলাকার আকালীদের জড় করেছিল যে। হাবেলীর কাছে এসে সে চিৎকার দিয়ে বলল— আমি সুবেদার মজীদের সাথে কথা বলতে চাই।

মজীদ বুরুজ থেকে মাথা বের করে বলল— সামনে এগিও না। ওখানেই দাঁড়িয়ে কথা বল!

ঃ আমার হাত খালি। দেখতে পাচ্ছ না।

ঃ বল, কি বলতে চাও!'

ঃ আমি তোমাকে সযত্নে পাকিস্তান পৌঁছানোর জন্য ফৌজ নিয়ে এসেছি। ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে তোমার জান বাঁচাতে পার। নয়ত দেখতেই পাচ্ছ, দু'হাজার আকালী সেনা মুহূর্তেই তোমাদের হাবেলী উড়িয়ে দিতে সক্ষম।

মজীদ এতমিনানের সাথে বলল— ফৌজ নিয়ে চলে যাও। আকালীদের সাথে আমরা বুঝব।

দলপতি বলল— জানি, তুমি বড্ড জেদী, আকালীদের হামলা করলে ফৌজ চুপ মেরে বসে থাকবে বলে মনে করছ? তোমার অজানা নয়, ফৌজের মোকাবেলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না।

ঃ এ কথাও আমার সেই সঙ্গে অজানা নয় যে, তুমিই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ।

ঃ ভুল, সুবেদার ভুল। ফৌজ আমি এনেছি এ জন্যে যে, অত্র এলাকায় তোমাদের খান্দান শিখদের হেফাযত করেছে। তোমাদের সে কল্যাণধর্মী কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর আমাদের হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে প্রদর্শন করেছিলে। আফসোস, কাল বেশ দেরীতে আমি খবর পাই। নয়ত শিখরা তোমাদের ওপর হামলা করার সাহস পেত না।

ঃ গতকাল রামচাঁদের গ্রামে ওদের রুখতেই গিয়েছিলে বুঝি?

দলপতি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মজীদের দিকে তাকায়। নিজকে সামলে নিয়ে বলে— কতক্ষণ তোমরা মোকাবেলা করবে? বাউন্ডারী ফোর্সের কোন লোক নেই এ এলাকায়।

ঃ আমরা ওদের অপেক্ষায় থাকব।

ঃ সুবেদার! তুমি এক নীতিজ্ঞানহীন সেপাই। আর তোমার মত লোক মিছেমিছি প্রিয়জনের লাশ দেখতে অভ্যস্ত নয়। তোমাদের দর্প কিছুক্ষণের মধ্যে চূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর বধূ-মাতাদের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখতো! ফৌজি কাপ্তান তোমাকে 'ওয়ারেন্ট অব অনার' দিতে প্রস্তুত। তুমি বললে গ্রন্থের ওপর হাত রেখে তোমার যিম্মা নিতে প্রস্তুত।

মজীদ বাজখাই গলায় বলল— হয় তুমি নিজে আহাম্মক, নয়ত আমাকে আহাম্মক মনে করছ। কাপ্তানকে গিয়ে বল— পিঠে গুলি না খেয়ে সীনা টান করে ওদের প্রতিহত করতে চাই আমরা। ভাঙ্গা তলোয়ারই প্রাধান্য পাবে আমার কাছে তথাকথিত ওই 'ওয়ারেন্ট অব অনার'-এর চেয়ে।

দলপতি আস্তে আস্তে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। দাউদ রাইফেলের ট্রিগারে হাত রাখলে মজীদ ওকে বারণ করে বলল— দাউদ! সে দূত হয়ে এসেছিল।

www.amarboi.org

দলপতি চলে যাবার ৮/১০ মিনিট পর হামলার পরিবেশ অনুমিত হল। শুরু হল গুলিবৃষ্টি। গুলির স্বল্পতাহেতু মজীদ সঙ্গীদের বলল, ওরা এখনো আমাদের নাগালে আসেনি। তাই নাগালে আসার আগ পর্যন্ত ফায়ার করো না। সুতরাং প্রায় ঘণ্টাখানেক গুলির জবাব দিল না মজীদের লোকজন।

কিছু সঙ্গীসহ সলীম মসজিদের মোর্চা পাহারা দিচ্ছিল। আচমকা পাশের ক্ষেতের পাতা নড়ে ওঠার শব্দ কানে এল ওদের। সাথীদের ওদিকে মনোনিবেশ করিয়ে সলীম পশুশালাস্থ ছাদের ওপর ক্ষুদ্র একটা পাথর নিক্ষেপ করল। ওখান থেকে কিছু লোক ওর দিকে মনোনিবেশ করলে ও হাতের ইশারায় ক্ষেত দেখাল। ওরা উঁচু ছাদে এ খবর পৌছে দিল। মজীদ অনুমান করে নিল, হামলাবাজদের বিরাট একটা দল ইক্ষুক্ষেতকে আড়াল করে এগিয়ে আসছে। দাউদকে কিছু কমান্ড করে ও নীচু ছাদে এল। গুলিবৃষ্টির মধ্যেও হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষেতের নিকটবর্তী ছাদের কোলে গিয়ে উপনীত হল। সলীম মসজিদে বসে তা দেখছে। মজীদ থলে থেকে হাতবোমা বের করে ওকে দেখাল। এর জবাবে সলীমও হাতবোমা দেখাল। আখ ক্ষেত এক্ষণে পাতা নড়ার পাশাপাশি খস্‌খস্ আওয়াজও হতে থাকল। আচমকা ক্ষেত থেকে ১০/১৫ জন লোক 'সত্যাশ্রয়ী আকালী' নারা বুলন্দ করে এগিয়ে এল।

ঃ 'ফায়ার!' মজীদ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল।

মুহূর্তে দশজন লোক ঝাঁঝরা হয়ে গেল। জনাতিনেক অগ্রসর হয়ে হাতবোমা নিক্ষেপ করার কোশেশ করল, কিন্তু ওরাও গুলিতে লুটিয়ে পড়ল। এক লোক বোমা নিক্ষেপ করতে করতে বুকে গুলি খেয়ে পড়ে গেল। তার হাত থেকে ছুটে দু'টো বোমা বিস্ফোরিত হল। এর পাশাপাশি উত্তর কোণ থেকে শ'তিনেক লোক আবির্ভূত হল। মজীদ পর পর দু'টো বোমা মারল। ১৫/২০টা লাশ ফেলে ওরা ক্ষেতে লুকাল। মজীদের নির্দেশে ছাদের লোকেরা ক্ষেতে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল। ওখান থেকে যখমীদের চিৎকার ভেসে আসতে লাগল। আখ ক্ষেতের মুহুর্মুহু শন্‌শনানি আওয়াজ এ কথার সংবাদ দিল, বাঘের তাড়া খেয়ে ভেড়ার দল পালাচ্ছে।

মসজিদের কোণ থেকে সলীম দশ গজ দূরে কিছু লোককে জমায়েত হতে দেখল। ছাদ থেকে ফায়ার শুরু হলে একদল এদিকে আসতে লাগল। বুকে হেঁটে জনাপাঁচেক বের হল ক্ষেত থেকে। উদ্দেশ্য হাবেলীতে প্রবেশ। সলীমদের রাইফেলগুলো গর্জে উঠল। দু'জন পড়ে গেল। কিন্তু তৃতীয় একজন পড়তে পড়তে হাবেলীর মাঝে হাতবোমা নিক্ষেপ করল। অপর দু'জন দেয়ালের নিকটে এসে বোমা নিক্ষেপ করল। তন্মধ্যে একটা পশুশালার ছাদে অপরটা ভেতর আঙ্গিনায় পড়ল। মসজিদ থেকে পরপর দু'টো ফায়ার হল। এ দু'জন পড়ল মুখ থুবড়ে।

ক্ষেতে লুকানো লোকজন এদের পরিণতি দেখে বের হবার সাহস করল না। মসজিদের দিকে ক্ষেত থেকে একটা বোমা ছুটে এল। কিন্তু মসজিদ থেকে অল্প দূরে সেটা বিস্ফোরিত হল। সলীম পরপর দু'টো বোমা নিক্ষেপ করল ও দু'টি বিস্ফোরিত হতেই ক্ষেতে শুরু হল আহতদের চিৎকার।

www.amarboi.org

হামলাবাজদের মদদদাতা ফৌজ পশ্চিম দিকের দু'ফার্লং দূরে মোর্চা বানিয়ে এলোপাতাড়ি ফায়ার করছিল। এতে উপকার যা হল তা হচ্ছে এই— যে সব জোয়ান হাবেলী থেকে বেরিয়ে ক্ষেতে লুকানো শিখদের পশ্চাদ্ধাবন করতে চেয়েছিল, তারা মারা পড়ল।

মজীদ ও তার সাথীরা ফৌজি গুলির চেয়ে ক্ষেতের দিকে নজর রাখছিল প্রতি মুহূর্ত। ক্ষেতের কোথায় পাতা নড়ে উঠতেই ওরা ফায়ারিং করত। জনৈক শিখ চিৎকার দিয়ে বলল— তোমরা পালাও। এ জনপদে কোন লোক নেই। এই হাবেলীতে বেলুচ রেজিমেন্ট লুকিয়ে আছে। আমাদের পুলিশ ও ফৌজ পেছনে। ওরা আমাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

তার এ কথায় "বেলুচ রেজিমেন্ট" রটনাটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। পর মুহূর্তে গোটা এলাকায় বেলুচ রেজিমেন্টের' কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। 'বেলুচ[১] রেজিমেন্ট' কথাটা গুলি ও বোমের চেয়ে কার্যকরি হল।

কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা ক্ষেতের মধ্যে কেবল আহতদেরই চিৎকার শোনা যেতে লাগল।

আচমকা কাকু ঈসায়ী ফটকের নিকটে এসে বুলন্দ আওয়াজে বলল— শিখ মহল্লা থেকে বিশাল এক বাহিনী এগিয়ে আসছে।

হাবেলীর জনতা একথা মজীদের কানে পৌছে দিল মুহূর্তেই। ওরা জনা-পাঁচেক লোক নিয়ে বাইরে বেরুল। গলিপথের কোণে শিখদের এক খালি মাকানের ছাদে চড়ল ওরা। দু'লোক আগেভাগেই ওখানে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। মজীদ দু'টি বোমের একটা সাথীদের দিয়ে বলল— গলির ওই বুরুজে তোমরা ওঁত পেতে থাকো। আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বোমা ফেলবে না। আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে, ওরা প্রকাশ্যে আসুক। এজন্য যেখানে রাইফেল দিয়ে কাজ চলে সেখানে বোমা ব্যবহার করতে যেও না।' বলে মজীদ সকালে যে দু'জনকে পাহারায় বসিয়ে রেখেছিল তাদের বলল— তোমাদের কেউ দেখে ফেলেনি তো?

টীকা : ১. বেলুচ রেজিমেন্ট : পাকিস্তান অংশের সেনা যখন ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তখন বাউন্ডারী ফোর্সের চেয়েও বেলুচ রেজিমেন্ট মুসলমানদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছিল বেশি। পূর্ব পাঞ্জাবে পৈশাচিকতা ও বর্বরতার তুফান সীমা ছাড়িয়ে গেলে কুদরত কওমের তামাম দরদ বুঝি মুষ্টিমেয় সেপাইদের মনে ঢেলে দিয়েছিলেন। এ সেপাইরা রাস্তায় পতিত যখমীদের ওঠাত। শহর ও গ্রাম থেকে আকালী, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ও হিন্দুস্তানী পুলিশ-আর্মিদের অবরোধ থেকে উদ্ধার করত। শরণার্থীদের গাড়ী ও কাফেলা হেফাযত করত। নিজেদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রার কথা মনে থাকত না এদের। সংখ্যায় অতি নগণ্য হয়েও এরা দমবার পাত্র ছিল না। শিখ সন্ত্রাসীরা এদের দেখলে শেয়ালের মত পালাত। যেখানে বেলুচ রেজিমেন্টের ৫ জন সৈন্য থাকত, সেখানে মাস্টার তারা সিং ও প্যাটেলের ভাবশিষ্যদের পাজামা ভিজে যেত। অবশ্য এদিকটা লক্ষ্য করে ভারতের শিখ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুসলিম সেনাদেরও হত্যার পরিকল্পনা করছিল। কুলাঙ্গার মাউন্টব্যাটেন ও র‍্যাডক্লিফ এ দায়িত্ব দেয় মাস্টার তারা সিং ও প্যাটেলের ওপর। বেলুচ রেজিমেন্ট দুর্দিনে যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তাতে বলা হয় যে, যদি পাকিস্তানী ফৌজ বাইরে না থাকত তাহলে শিখ-হিন্দু সর্বসম্মতিক্রম ঐকমত্য করেও মুসলমানদের এভাবে কতল করতে পারত না। মাউন্ট ব্যাটেনের ক্ষমতা হস্তান্তরে তড়িঘড়ি করার অর্থ ছিল, পাকিস্তানীরা তাদের হিস্যার অস্ত্র পাওয়ার পূর্বেই যেন পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের রক্তবন্যা বইয়ে দেয়া যায়।

www.amarboi.org

এক লোক জবাব দেয়— খানিক পূর্বে বেলা সিং-এর হাবেলীতে দাঁড়িয়ে এক লোক বলেছিল, এখানে কেউ নেই। আমরা তখন ছাদে মিশেছিলাম।'

ঃ ওরা তোমাদের না দেখলে গলিপথে আসবে অতি অবশ্যই।

মিনিট পাঁচেক পর মজীদ গলিপথে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। ছাদ থেকে মাথা উঁচিয়ে গলিমোড়ে ওঁত পেতে থাকা সাথীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। একজন হাত ওঠাল। ওদেরকে কমান্ড করে মজীদ মাথা নীচু করল। নিকটে বসা লোকদের বলল— হুঁশিয়ার! আমরা ওদের জাহান্নামে পাঠাতে পারব। আমার যা ধারণা, ওদের সাথে ফৌজ নেই। নয়ত ছাদ দখল না করে ওরা অগ্রসর হত না।'

পদধ্বনি ক্রমশ নিকটে আসছে। শ'দুয়েক শিখ দু'মোড় থেকে বেরিয়ে এল। আচমকা পেছন থেকে কেউ বলে ওঠে— আগে যেও না। বেলুচ রেজিমেন্ট ওখানে।

ঃ 'বেলুচ রেজিমেন্ট', 'বেলুচ রেজিমেন্ট' রব মুহূর্তেই গলিপথে উচ্চারিত হল।

মজীদ এক সাথীকে কমান্ড করতেই সে বোমা ফেলল। অন্যদের করতে বলল ফায়ার। যে লোকটা বেলুচ রেজিমেন্টের হুঁশিয়ারী দিচ্ছিল সে চিৎকার দিতে দিতে পিছু হটল। মজীদের সাথীদের রাইফেলগুলো ফায়ার করে যাচ্ছিল।

শিখরা বরই গাছের নীচে বসে হাঁফ ছাড়লে সলীম মসজিদের ছাদ থেকে বোমা মারল। সাথীরা করল ফায়ার। এর পাশাপাশি দেউড়ির বাইরে ওঁত পেতে থাকা বর্শা ও তলোয়ারধারীরা এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিখ-লাশের স্তূপে পরিণত হল ময়দান। হতাশাগ্রস্ত শিখরা উত্তর গলিপথে প্রাণ বাঁচাতে চাইলে দাউদের এক বোমা তাদের অভ্যর্থনা জানাল। অন্যরা মারতে লাগল ইট-পাটকেল। ৫০ জন শিখ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে জলাশয়ে ঝাঁপ দিল। এদের খুব কমই গুলির হাত থেকে বেঁচে ওপারে পৌঁছল।

অপর দিকে পুলিশ ও ফৌজ বিক্ষিপ্ত শিখদের জড় করতে দৌড়ঝাঁপ করছিল। দলপতি তাদেরকে পন্থের ইয্যতের দোহাই পাড়ছিল। ফৌজরা দিচ্ছিল কাপুরুষতার ধিক্কার। অনেক ঘাম ঝরার পর মাইলখানেক দূরে এরা জমায়েত হল। শিখ কাপ্তান ও দলপতি গ্রন্থে হাত রেখে দোহাই পাড়তে রাজী ছিল যে, এলাকায় একজন বেলুচ রেজিমেন্টের ফৌজ ও নেই; কিন্তু সাধারণ শিখরা একথা মানতে আদৌ রাজী নয়। এক নেতা উত্তেজনাভরে বলে উঠল— ফৌজের কাপুরুষতার কারণে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে আমাদের। এ সময় হামলাবাজ আরো কিছু শিখ ওখানে এসে দলভারী করল।

তন্মধ্যে দু'ভাই হারানো এক শিখ বলল— কাপ্তান সাহেব! তুমি বলছ, হাবেলীতে বেলুচ রেজিমেন্টের কোন সেপাই নেই। কিন্তু আমরা গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, ওরা গোটা শিখ বসতি কব্জা করে নিয়েছে। শ'খানেক লাশ ফেলে পালিয়ে এসেছি আমরা। তার সঙ্গীরা এ কথার জোর সমর্থন জানাল। শিখ কাপ্তান ও আকালী দলপতি খামোশ হয়ে গেল।

জনৈক জ্ঞানী লোক বলল— তোমরা আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় মারার পরিকল্পনা করছ। বেলুচ রেজিমেন্ট এলাকায় না থাকলে তোমরা আগে বাড়ছ না কেন? হাজার লোক হারিয়েছি ইতোমধ্যে আমরা, আর দূর থেকে তোমরা নিছক গুলি করেই ক্ষান্ত দিচ্ছ!

www.amarboi.org

কাপ্তান রেগে বলল— আমি গুরুগ্রন্থের কসম খেয়ে বলছি, স্রেফ দু'ঘণ্টার মধ্যেই পুরো বসতীকে কবরে পরিণত করব। আমার লোকদের মর্টার ও মেশিনগান আনতে পাঠিয়েছি।

তাতানো রোদ্দুর।

শিখরা গুলির তোপ থেকে বেঁচে গাছ-গাছালি ও ঝোপের আড়ালে জমায়েত হল। ফৌজ ও পুলিশের লোক এক্কা-দোক্কা ফায়ার করে যাচ্ছিল। মজীদ বালাখানার ছাদে দাঁড়িয়ে একটি জীপকে ফিরে যেতে দেখে পেরেশান হল। ওর সঙ্গীরা শিখদের পরিত্যক্ত তিনটা স্টেনগান, চারটা রাইফেল ও আটটা হাতবোমা উদ্ধার করল। বিকেল পাঁচটার দিকে সলীম মসজিদের ছাদ থেকে নেমে মজীদের কাছে এসে বলল— মজীদ! জীপ তো চলে গেছে।'

ঃ হ্যাঁ, দেখেছি। এবার ওরা অনেক কিছু নিয়ে আসবে। এবার আমাদের যুদ্ধ শিখদের সাথে নয়, হিন্দুস্তানী ফৌজের সাথে হবে। ওরা এই হাবেলীকে স্টালিন-গ্রাদ মনে করে ট্যাঙ্ক ও জঙ্গী বিমান নিয়ে ময়দানে নামবে।

সলীম বলল— সম্ভবত মুসলিম কোন সেপাই এদিকে আসছে।

দাউদ বলে— সম্ভাবনা থাকলে ওখানে বসে ওরা ফায়ার করত না। এখন আমরা কতটা লড়তে পারব?

ঃ যতক্ষণ বিজয় অর্জিত না হয়।' বলল— চোয়াল দুটো শক্ত করে মজীদ।

দাউদ এ কথার উত্তরে শুষ্ক হাসি দিয়ে মজীদের দিকে তাকাল।

মজীদ ফের বলল— সত্য বলছি দাউদ। চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি আমাদের। জানি না, বিজয় হবে কবে নাগাদ এবং কোথায় তবে আমার বিশ্বাস চাচা ইসমাঈলের কবরে গাঁথা পতাকার অবমাননা হতে দেব না আমরা। দাউদ! তোমার মনে আছে কি, স্কুলে একবার তোমার সাথে আমার লড়াই হয়েছিল। তোমার চেয়ে কমযোর ছিলাম আমি। কিন্তু মার খেয়েও পিছু হটিনি আমি। শেষ পর্যন্ত আমার জেদ তোমাকে পেরেশান করেছিল।

দাউদ বলল— হায়! আমার কওম যদি এমন জেদী হত!

ঃ অস্তিত্ব রক্ষার্থে কওমকে জেদী হতেই হবে। — বলল সলীম।

ঃ সলীম! আমাদের লোকজন খুব পেরেশান তো নয়?' প্রশ্ন মজীদের।

ঃ তা অবশ্য নয়। তবে 'এখন কি হবে' জিজ্ঞাসা সকলের এটাই?

ঃ লড়াই! বলে দাও সকলকে!'

ঃ অনেকের ধারণা, বাটালায় মুসলিম সেনা থাকার সম্ভাবনা। ওখানে খবর দেয়া দরকার।

ঃ বাটালার আশেপাশে হাজারো মুসলিম জনপদ। যে তুফান মোকাবেলা করছি এখানে, সেটা ওখানেও। সেপাই ওখানে থাকলেও অসহায় মুসলিম জাতিকে ছেড়ে তারা এদিকে রোখ করবে না। তুমি ঘাবড়ে হতোদ্যম হওনি তো সলীম?

সলীমের চেহারা ধক্ করে ওঠল। ললাটের নীল শিরাতন্ত্রী ফুলে ফেঁপে উঠল। খানিক থেমে ও বললো— না মজীদ! তা ঘাবড়াব কেন। সেই দাদার রক্ত আমাদের দেহতন্ত্রীতে প্রবাহিত যার নাতি হয়ে তুমি বলেছ— দুশমনকে ধ্বংস করার স্বার্থে আমরা

www.amarboi.org

হামলা করছি না কেন। এতে জনতার দুঃসাহসে প্রবৃদ্ধি আনবে। হামলা করে হিন্দুস্তানী ফৌজকে আমরা রামধোলাই দিলে শিখ গং এদিকে তাকানোরও সাহস করবে না। অনুমতি দাও, শিখদের ক্ষেতে লুকিয়ে উত্তরে অবস্থিত ফৌজ ছাউনিতে আক্রমণ শানাই। তুমি ফায়ার করে ওদের মনোনিবেশ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করবে।

মুচকি হেসে গর্বভরে অভিমানী চাচাত ভাইটির কাঁধে হাত রেখে মজীদ বলল— 'সলীম! অনেক সময় আত্মরক্ষামূলক অভিযান বাইরে নেমে হামলা করার চেয়ে কার্যকরি ও পরীক্ষামূলক হয়। জানি, আমার ভাইটি বুকে গুলি বরণ করতে পারে কিন্তু সেই বীরত্বের চেয়ে তোমার ধৈর্য পরীক্ষা আজ অতীব জরুরী। জোশের চেয়ে ঠাণ্ডা দেমাগে কাজ করার সময় এখন। মনে কর, কাল আমরা এখানে পৌছেই যদি দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম তাহলে ফলটা কি দাঁড়াত? বন্দুক চালানো লোক খুবই নগণ্য। বারুদও তথৈবচ। আমাদের একটা গুলি অযথা খরচা করতে চাইনে। আমাদের প্রথম ও শেষ প্রচেষ্টা থাকবে মোর্চাকে হেফাযত করা।

দাউদ বলল— হিন্দুস্তানী ফৌজ সত্যি সত্যিই 'মর্টার ও 'আর্মড কার' নিয়ে এলে কি করতে পারব আমরা?

মজীদ জবাব দেয়— লড়ব আমরা। ভঙ্গ দেয়ালকে অবলম্বন করে অ্যাটাক করব। ভঙ্গুর ছাদের ভীম আঁকড়ে দুশমনকে প্রতিহত করব!

ঃ 'কিন্তু এর পরিণাম?' অনুচ্চ কণ্ঠে দাউদের জিজ্ঞাসা।

ঃ এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি এর পরিণাম? দেখো, আমাদের কারণেই দু'হাজার শিখ ৪০/৫০ জন ফৌজ এখানে পড়ে আছে। ওদের রুখতে না পারলে এ সকালে আরো কত মুসলিম বস্তি ওরা জ্বালিয়ে দিত। যে গুলিবহর আমাদের হাবেলীর দেয়ালে টক্কর খাচ্ছে, তা হাজারো আবাল-বৃদ্ধ বনিতার বুককে ঝাঁঝরা করে ফেলত। এ ফুঁসে ওঠা তুফানকে রুখে আমরা হাজারো মানুষকে পাকিস্তানমুখো করার মওকা দিয়েছি। তুমি শুনেছ, বিয়াসের তীর বেয়ে আরো কাফেলা এদিকে আসছে। এদেরকে আমরা আরো কিছুক্ষণ প্রতিহত করে রাখতে পারলে ওরা রাবীর উপকূলে পৌছতে পারবে।' বলল মজীদ।

ঃ 'মজীদ! রাতে ফুরসত পেলে শিখদের বস্তিতে হামলা করলে কেমন হয়?' প্রশ্ন করে সলীম।

মজীদ মুচকি হেসে বলে— এবার তুমি পাক্কা সেপাইসুলভ কথাই বলেছ। অতি অবশ্যই আমরা হামলা করব। বৃষ্টি আসছে। খোদা যেন রাতে আকাশ মেঘমুক্ত না করেন।

নীচু ছাদ থেকে বশির বলে ওঠে— মজীদ, সড়কে দু'টো জীপ দেখা যাচ্ছে।

মজীদ, সলীম ও দাউদ শুয়ে পড়ে ওদিক দেখতে লাগে। জীপ দুটো রাস্তা ছেড়ে গ্রামের দিক রোখ করে এগুতে থাকে। মজীদ বলে— সলীম! তোমরা যার যার মোর্চায় চলে যাও।

সর্ষে ক্ষেতে এসে জীপ দুটো থামল। সিপাইরা জীপ থেকে নেমেই মর্টারের গুলিবর্ষণ করতে লাগল। শিখদের যে দল দূরে বিক্ষিপ্ত বসেছিল তারা উঠে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। মোর্চায় বসা সেপাইদের ১০/১৫ জন শিখদের মিছিলে শামিল হল।

www.amarboi.org

ক্রমাগত গুলির মুখে হাবেলীর দুটো কামরা ধসে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। বেশ কিছু দেয়াল ও ছাদে ফাটল এবং ফুটো দেখা দিল। নারী ও শিশুদের কামরার ছাদ উড়ে গেল। পুরুষরা যখমী হয়ে তড়পাতে লাগল।

মজীদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল— দাউদ! ছ'টা বাজে। সন্ধ্যার আঁধারে হামলা করে ওদের মর্টার ছিনিয়ে নিতে পারব। সর্ষে ক্ষেত আলাদা আলাদা না হলে তখনই কোশেশ করতাম।

দাউদ বলল— সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা দেয়ালও বোধহয় সুরক্ষিত থাকবে না!'

আঙিনায় পরপর ক'টি বোমা পড়ায় জনতার মাঝে ভীতির ভাব ও হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। 'পালাও এখান থেকে' নারী-শিশুদের লক্ষ্য করে বললো ক'জন। দেয়ালের একপাশে গভীর খাদ দেখা গেল। একদল সেখান থেকে বেরোল। মসজিদের ছাদ থেকে সলীম চিৎকার দিয়ে বলল— এদিকে এসো না।' লোকেরা ওর আওয়াজ শুনল না। কিন্তু শিখদের সাঁড়াশী আক্রমণের সম্মুখে এরা পিছপা হতে বাধ্য হল।

মজীদ উপর ছাদ থেকে অপেক্ষাকৃত নীচু ছাদে এসে বলন্দ আওয়াজে বলল— 'শুয়ে যাও! খোদার দিকে চেয়ে যমীনে উপুড় হও।'

দক্ষিণ দিকের দেয়াল ধসে পড়লে আখ ক্ষেতে যাওয়া-আসার পরিষ্কার রাস্তা বেরিয়ে এল। হাবেলীতে আরো ক'টি বোমা পড়লে লোকজন হতাশ ও পেরেশান হয়ে ওই পথে বেরোতে লাগল। হিন্দুস্তানী ফৌজের গুলিতে লাশের স্তূপ হয়ে গেল।

সলীম চিৎকার দিয়ে বলল— পিছনে সরে যাও। যাও পেছনে!

মজীদ নীচে নেমে অন্দরে প্রবেশ করল। ওর জামার বাম আস্তিন রক্তে ভেজা। চিৎকাররত নারী, ভীতসন্ত্রস্ত শিশু ও আহত পুরুষেরা ওর পাশে জমায়েত হল।

মজীদ উভয় হাত বুলন্দ করে বলল— দেখো, তোমরা মিছামিছি প্রাণ দিতে যাচ্ছ। খোদার দিকে চেয়ে আশেপাশের দেয়ালের পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়।

লোকেরা ওর কমান্ড মানল। অবোধ এক বালিকা ওর পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। মজীদ ওকে উঠিয়ে খোরলীতে শুইয়ে দিল, অতঃপর জনতার উদ্দেশ্যে বলল— দেখো, তোমাদের কারো প্রাণ রক্ষার সুযোগ থাকলে বাধা দিতাম না। চারদিক থেকেই ওরা গোটা জনপদ ঘিরে নিয়েছে। সন্ধ্যা আঁধারীর অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। আমাদের বন্দুকধারীরা আহত। তোমাদের যারা বন্দুক চালাতে জানে, তারা আমার সাথে এসো। অন্যরা শুয়ে পড়ো। চার বছরের এক কচি শিশু বলল— খুবেদার থাহেব! তুমিও থিকদের দুলি মালো। দেখ না ওরা দুলি মারছে। তুমি মারছ না কেন?

ঃ 'আমরা মারব।' মজীদ অনুচ্চ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল। লোকেরা এই প্রথম ওই লৌহমানবটির চোখে পানি দেখল যে কিনা বোমা ও গুলি বৃষ্টির সম্মুখে খিলখিল করে হেসে থাকে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। ভাঙ্গা ছাদ ও ধসে পড়া দেয়াল থেকে মুসলমানরা গুলিবর্ষণ শুরু করে। শিখরা এ বুঝে হামলা করেছিল যে, ওদের প্রতিরোধ বাযু ঢিল হয়ে গেছে; কিন্তু মুসলমানরা প্রদীপ্ত প্রত্যুজ্জ্বল ঈমানের উষ্ণতার প্রমাণ রেখে শিখদের পিছু হটতে বাধ্য করল।

www.amarboi.org

বোমা খেয়ে ইউসুফ মারাত্মক যখমী হল। নারীরা ওকে উঠিয়ে অন্দরে নিয়ে গেল। ঘরের ছাদের এক কোণ উড়ে গেছে।

রাতের জমকালো পর্দা নামতেই শিখদের হামলা স্তিমিত হয়ে এল। মসজিদের একটা দেয়াল ভেঙ্গে গেল। ছাদের এক কোণে সলীম ও সঙ্গীরা কোনক্রমে মোর্চা রক্ষা করছিল।

মজীদ কিছু লোকের সাথে হামলার পরিকল্পনা করে অপর লোকজনকে নির্দেশনা দিচ্ছিল। আচমকা সলীম বলে উঠল— মজীদ! সড়ক পথে ছোট একটা ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছে।

মজীদ স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওর মুখ দিয়ে কথা সরে না। মজীদ বলল— ট্যাংক আসবে কোথেকে? ট্যাংক নয়, ওটা অন্য কিছু। দেখি কি করা যায়।'

দাউদ আগে বেড়ে বলল— না মজীদ, তুমি দাঁড়াও। আমি গাছে চড়ে দেখছি।

দাউদ দেয়ালের বাইরে এসে বড় গাছে চড়ে বলল— হয়ত ব্রেন ক্যারিয়ার' ওটা। মজীদ সাথীদের লক্ষ্য করে বলল— এখন আর জমকালো রাতের অপেক্ষা নয়।' উপর থেকে দাউদ চিৎকার দেয়— সেনাদল ওই ব্রেন কেরিয়ারের দিকে দৌড়াচ্ছে। ওরা ওটাকে ঢাল বানিয়েই এদিকে আসবে বলে মনে হচ্ছে!

মজীদ বলল— দাউদ! তুমি জলদি নীচে নামো।

দাউদ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের দিক-নির্দেশনা দিয়ে মজীদকে বলল— আমি স্রেফ চারজন লোককে নিয়ে বেরোতে চাই। স্টেনগানটা আমাকে দাও। ওই 'ব্রেন ক্যারিয়ার' রুখবার কোশেশ করি। তোমরা এখানে থাকো। মনে রেখো, বীরত্বের মৃত্যু কাপুরুষতার মৃত্যু থেকে শ্রেয়। শিখদের এবারের লড়াই চূড়ান্ত লড়াই। ওদের মেরে তক্তা বানিয়ে ফেরত পাঠালে আঁধার রাতে হয়ত আমাদের কিছু লোক যিন্দা পালানোর সুযোগ পাবে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত জমাদ্দার এনায়েত আলী আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন।'

এনায়েত আলী দিনভর লড়াই করার দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি "চেইন অব কমান্ড" মানা এবং কমান্ড দেয়ার যোগ্যতা রাখেন। একটি সাঁজোয়া যান আখ ক্ষেতের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। জনাপনেরো পদব্রজী সেপাই এর পিছে। গাড়ীটা ক্ষেতে এককোণে যেতেই মজীদ সিংহশাবকের মত ক্ষেত থেকে বেরুল। ওই গাড়ী থেকে দু'টো ফায়ার হল। একটা গুলি মজীদের রানে আরেকটা লাগল বাযুতে। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে ফেলেছে মজীদ। কিন্তু এরপর ওর শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। যমীনে লুটিয়ে পড়ে ও। বোমা ব্রেন ক্যারিয়ারের ওপর বিস্ফোরিত হল। মজীদকে আক্রমণ করতে সৈন্যরা স্টেনগান থেকে গুলি ছুঁড়তে যাবে ঠিক সে মুহূর্তে দাউদ ওর দলবলসহ স্টেনগান টিপল। আটটা লাশের স্তূপে জায়গাটা উঁচু হয়ে গেল। শুয়ে শুয়ে আরেকটা বোমা মারল মজীদ। এতে পশ্চাদপদ তিনজন ছাতু হয়ে গেল। প্রায় পনের জন দিকবিদিক হয়ে ডোবায় ঝাঁপ দিল। সাঁজোয়া যানটি ড্রাইভারহীন এদিক সেদিক ছুটতে লাগল। মোর্চায় বসা শিখরা গাড়ীর পেছনে ছুটল। কিন্তু একটা প্রকাণ্ড গাছের সাথে টক্কর খেয়ে ওটা অকেজো হয়ে গেল। পানিতে ঝাঁপ দেয়া সেপাইরা মজীদকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। ক্ষেতের নিকটেই পড়েছিল মজীদের আহত দেহ। মাথা যমীনে কাত হওয়া।

www.amarboi.org

দাউদ সাথীদের বলল— মজীদ যখমী, আমি ওকে দেখছি। তোমরা ওদের ওপর ফায়ার করে যাও।

যমীনে বুক ডন দিতে দিতে দাউদ মজীদের কাছটিতে পৌছল। মজীদ কাতর কণ্ঠে বলল— দাউদ! তুমি যাও। সময় নষ্ট করো না।' কিন্তু এক সময় মজীদের মাথাটা দাউদের কোলে হেলে পড়ল। বেশ কিছু গুলি মজীদের মাথার চুল ছুঁয়ে গেল। দাউদের হাতের চামড়া ছিঁড়ে একটা গুলি চলে গেল। ওরা ভরা ক্ষেতে পৌছলে শিখরা চিৎকার দিয়ে উঠল— দেখ, ওই যে সুবেদার! পালাতে না পারে। তার পিছ ছেড়ো না।

মুহূর্তে গোটা শিখদের মাঝে কর্মচাঞ্চল্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। একটা রবই সর্বত্র-সুবেদার ক্ষেতে আছে। লক্ষ্য করো, পালাতে না পারে বেটা।

মজীদকে কোলে নেয় দাউদ। বলে সঙ্গীদের— পরপর পাঁচ মিনিট এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে যাও।' দাউদ চারদিক থেকেই শিখদের সতর্কীকরণ আওয়াজ পাচ্ছিল। কিন্তু মজীদকে নিরাপদ স্থানে পৌছে যে দিতেই হবে। এক ক্ষেত অতিক্রম করে অপর একটা ক্ষেতে ঢুকে যায় দাউদ। এভাবে তিন-চারটা। মজীদ বলছিল— দাউদ! খোদার দিকে চেয়ে আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি রণাঙ্গনে যাও! কিন্তু দাউদ নাছোড়বান্দা। উঁচু এক বাগানের কোন ওর কাছে বেশ নিরিবিল মনে হল। দাউদ মজীদকে কোল থেকে নামিয়ে ওখানে শুইয়ে দেয়। পাগড়ী খুলে ওর রান ও বাযুতে দেয় পট্টি বেঁধে।

আচমকা মজীদ চিৎকার দিয়ে ওঠে— শোন বেকুফ! ওরা মেশিনগান চালাচ্ছে। হায়! আমরা যদি ব্রেন ক্যারিয়ারটা কব্জা করতে পারতাম।'

✪ ✪ ✪

স্টেনগান হাতে তুলে নেয় দাউদ। দ্রুত এগিয়ে চলে জনপদের দিকে।

মজীদ ও দাউদকে মহল থেকে বেরুতে দেখে সমবেত জনগণ বুঝে নেয়— পরিস্থিতি এক্ষণে মারাত্মক ও ভীতিপ্রদ। এনায়েত আলী ভগ্নপ্রায় ছাদের থেকে সাঁজোয়া যানের ওপর মজীদ ও দাউদের হামলার ফল দেখছিলেন। গাড়ীটা নিয়ন্ত্রণহীন গাছের সাথে টক্কর খেলে তিনি 'বাহ্‌বা-বাহ্‌বা' বলে চিৎকার দিতে দিতে নীচে নেমে ভগ্নোৎসাহ লোকদের বললেন— দুশমনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বেকার হয়ে গেছে। এবার তোমরা জওয়াবী হামলার প্রস্তুতি নাও।'

অপরদিকে সলীম ও ওর সঙ্গীরা নারা লাগাচ্ছিল। কিছু সময়ের জন্য দুশমনের মর্টার-হামলাও যেন বন্ধ হল। লোকেরা ভাবল, বিপদের পালা বুঝি শেষ। কিন্তু ১০ মিনিট পর আবারো গোলাগুলি শুরু হল। সলীম উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল— হুঁশিয়ার! হুশিয়ার!! ওরা কিন্তু এগুচ্ছে।

এনায়েত আলী আবারো ছাদে চড়লেন। ব্রেন ক্যারিয়ারকে আবারো অগ্রসর হতে দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। ক্যারিয়ারের পেছনের লোকজন শ্লোগান দিচ্ছিল। এনায়েত আলী দেয়াল ও ছাদ থেকে ঝুঁকে দেখা লোকদের লক্ষ্য করে বললেন— যে কোন মূল্যে ওদের রুখতে হবে।' তিনি সিঁড়ির লম্বা পথে অগ্রসর হন। মুহূর্তে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এর দাবানল। জমাদ্দার শাহাদত বরণ করেছেন।

www.amarboi.org

শক্তি- নিঃশেষ বায়ু ও প্রতিরোধের সর্বশেষ হিম্মত ফুরিয়ে আসার শেষ দৃশ্য ওদিনের সূর্য অবলোকন করছিল। সন্ধ্যার জমকালো পর্দা নেমে আসছিল। সাঁজোয়া যান অগ্নিগোলা বর্ষণ করতে লাগল। স্টেনগানের মুহুর্মুহু গুলির মাঝে ভেসে আসছিল, 'পন্থ-এর জয়। জয় খালিস্তানের, গুরু নানকের জয়।' হামলার তীব্রতা পূর্বের রেকর্ড ভঙ্গ করল। নির্মমতা ও বর্বরতার সয়লাব ফুঁসে উঠল আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভার গতিতে।

এশীয় জাতির দিশারী দাবীদারদের মুখোশ পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হল। শিখদের নাঙ্গা তলোয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের শাহ্‌রগে পৌঁছার রাস্তা সাফ হল। হিন্দুস্তানী ফৌজের গুলি বরণ করার সীনাগুলো এখন ফাঁকা, বাধাহীন ও অবাধ।

হাবেলীতে প্রবেশকারী হামলাবাজরা জীবন্ত মানবতাকে পাইকারী হত্যা শুরু করল। জনপদের তামাম রাহা বন্ধ দেখে পলায়নপর মুসলমানরা আখক্ষেতের পথ ধরল। কিন্তু খুব কমই মেশিনগানের গুলি থেকে রেহাই পেল।

মসজিদের ছাদ থেকে সলীমের দু'সঙ্গীর অনবরত গুলির মুখে ফটকে আগুয়ান শিখরা তেমন একটা যুৎ করতে পারছিল না। সলীমের থলেতে মাত্র ক'টা গুলি অবশিষ্ট। ম্যাগজিনে শেষ গুলিটা ভরে বিপদ ডেকে আনা সাথীদের দিকে লক্ষ্য করে ও বলল— আমার কাছে স্রেফ একটা হাতবোমা আছে। ব্রেন ক্যারিয়ারে হামলা করতে যাচ্ছি আমি। ওটি যতক্ষণ বেকার না হচ্ছে, ততক্ষণ হামলা বিমুখ হচ্ছে না শিখরা।

জনৈক সঙ্গী বলল— মিছেমিছিই তুমি জীবনটা বিলাতে যাচ্ছ।

ঃ এক্ষণে আমার জীবনের কিইবা মূল্য আছে?

ঃ কিন্তু তুমি অবতরণ করবে কি করে? চারদিক থেকেই শিখরা আমাদের ঘিরে নিয়েছে। স্রেফ আখক্ষেতে গিয়ে লুকানোর ব্যর্থ কোশেশ করতে পার। তাও মেশিনগানের গুলি তোমাকে কতটা সুযোগ দেবে, ভাববার বিষয় তা।

ঃ ডোবার কিনারায় তো যেতে পারব। দাও আমার পাগড়ীটা।'

একজনে পাগড়ী এগিয়ে দিল। অপর একজনে প্রশ্ন করল— কিন্তু অবতরণের উপায় কি? তোমাকে দেখামাত্রই ওদের স্টেনগানগুলো পাগলা কুকুরের মত উন্মাতাল হয়ে যাবে যে!' সলীম এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গড়িয়ে মাটির মোর্চা থেকে বেরোল। ছাদের ফাটলের নিকটে গিয়ে বলল— রহিম বখ্‌শ। আমি এখান থেকে নীচে লাফ দিচ্ছি। পাগড়ীতে বেঁধে আমার রাইফেল নামিয়ে দিও।

ঃ না, সলীম না। মসজিদের অন্দর দরোজা দিয়ে বেরোলে ওরা হামলা করে বসবে!' সলীমের কি যেন বলার ছিল। এ সময় ওর পায়ের কাছে কি একটা যেন পতিত হল। 'তোমরা!' ওর সাথী চিৎকার দিয়ে চোখের পলকে বোমা ধরে নীচে নিক্ষেপ করল। বোমাটা শূন্যেই বিস্ফোরিত হল। সলীম ইতস্তত সাথীদের দিকে তাকাল। সহসাই একটা কড়া ধরে নীচে নামল। একজনে ঝুলিয়ে দিল রাইফেল। অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল সলীম। আচমকা ভারী একটা বস্তু ওর মাথায় লাগল। সলীম একপাশে ছিটকে পড়ল।

www.amarboi.org

হাবেলীতে তখনও এমন কিছু লোক ছিলেন যারা শেষ রক্ত বিন্দু বিলিয়ে দিয়েও দুশমনকে প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর। এরা ভগ্ন দেয়ালের আড়ালে বসে বন্দুক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু লোক ধসে পড়া ছাদ ও ভঙ্গুর বুরুজে শুয়ে ইট নিক্ষেপ করছিলেন। গোলাম হায়দার চিৎকার দিয়ে বললেন– এসো! দেখাই বীরের জাতি কি করে মৃত্যুকে বরণ করে। নারা দিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। সাথে তার ৫০/৬০ লোক। সকলেই শিখদের থেকে কেড়ে নেয়া তলোয়ার ও নেযাসহ মরণ লড়াই-এ নামল। এদের প্রেরণাময় লড়াইতে শিখদের পা নড়বড়ে হয়ে গেল। কিন্তু এ যে নিভু নিভু প্রদীপের শেষ ঝলক। হিন্দুস্তানী ফৌজের কমান্ডে শিখদের একদল উত্তর দেয়াল ভেদ করে হাবেলীতে হামলা করল। এদেরই একদল নারীমহলের কামরার সামনে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালাচ্ছিল। মুহূর্তে আগুন গোটা হাবেলীকে গ্রাস করল। বাইরে বেরোনো মুসলমানরা আগুনের কুণ্ডলী দেখে মহলের দিকে ছুটে এল।

সকলেই চিৎকার দিচ্ছিল– আমার মা, আমার বিবি, আমার সন্তান, আমার বোন!'

এর জবাবে তারা কেবল অগ্নিকুণ্ডলীর লেলিহান শিখায় বিপন্ন মা-বোনের আখেরী চিৎকার শুনছিল।

মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যাদের সম্ভ্রম রক্ষার পালা শেষ। এখন আর কেউ এদের নিয়ে ভাববে না। নিষ্ঠুর আগুন তাদের কণ্ঠকে চিরদিনের তরে স্তব্ধ করে দিল। কণ্ঠের মৃত্যু হলেও এর তিক্ত সাক্ষী ছাইভস্ম হয়ে গেল। শিখরা এ জ্বলন্ত চিতায় দাঁড়িয়ে পৈশাচিক চিৎকার দিয়ে বলল— পন্থ-এর জয়। জয় খালিস্তান কি!' দূর আকাশের বিক্ষিপ্ত মেঘপুঞ্জের আড়ালে তারকারাজি কানাকানি করছিল— 'পন্থ'-এর জয় নয়, জয় চরম মুসলিম বিদ্বেষী প্যাটেলের। 'খালিস্তানে'র জয় নয়, জয় মাউন্টব্যাটেন ও র‍্যাডক্লিফের।"

হুঁশ ফিরে পেয়ে সলীম চোখ খুলল। মসজিদের ফরাশে শায়িত ও। অন্ধকারে ক'জন ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছে ওকে। কেউ ওর চেহারায় টর্চ মেরে দেখল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে ও।

ঃ 'তুমি, তুমি কে?' আহত মাথা দু'হাতে চেপে ধরে প্রশ্ন করে।

জবাবে জনৈক যুবতী ক্রন্দন করছিল। এক মুহূর্তের জন্য পেছন অতীতের কল্পলোকে পৌছে গেল সলীম। তারপরও নিকটবর্তী লোকদের হাত থেকে টর্চ ছিনিয়ে বোতাম টিপে এক ঝলক দেখে নিল উপস্থিত জনতাকে। অতঃপর উঠে দাঁড়াল।

হাবেলী ও তার আশেপাশে মুসলিম বসতিতে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করছিল। সলীম নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মত সে দৃশ্য অবলোকন করল। পরে সহসাই মসজিদের আঙ্গিনা থেকে বেরোল। হাবেলীর থেকে বের হওয়া লোকজন ওর পিছু নিল। 'সলীম! সলীম! দাঁড়াও!' সকলেই ডাকল।

দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিশিখার সামনে বিক্ষুব্ধ নদীটির মত দাঁড়িয়ে সলীম। ওর পায়ের কাছে ঠিকরে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ। ভেতর আঙ্গিনা ও নারী কামরার আগুনের তেজ খুবই বেশি। ওই বিশেষ কামরাটি জ্বলে ছাই। বাইরের হাবেলীতেও আগুন লেগে গেছে। পশুশালা ও দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ছে তা। বড় যে বৃক্ষটি দেয়াল টপকে বাইরে

তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল; নিষ্ঠুর আগুনের কলঙ্কও তার গায়। বিশেষ করে ভূষি ও খড়কুটোর পালায় আগুন আকাশ ছুঁই ছুঁই। গোটা আঙ্গিনায় ছাইভস্ম লাশের ছড়াছড়ি ; কিন্তু এগুলো লাশ তো নয় বিকৃত গোশৃতপিণ্ড। পাষণ্ড শিখরা এদের মৃত লাশের ওপর তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করেছে যথেচ্ছ। কারো মাথা আলাদা, কারো হাত, কারো পা পৃথক। দেউড়ির সামনে জ্বলন্ত নারী-শিশুর লাশের স্তূপ। এরা আগুন থেকে বাঁচার আশায় দরোজা খুলে বাঁচতে চেয়েছিল। সলীম নির্বাক দাঁড়িয়ে। পেছন থেকে কেউ ওর কাঁধে হাত রাখল। সে অনুভূতি নেই সলীমের। ওর নজর ও মনোনিবেশ আগুনের লেলিহান শিখার প্রতি। আগন্তুক খানিক পর ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল— সলীম! সলীম!!

আগন্তুক মহিন্দর সিং। সলীম ওর দু'বাযু ধরে পাগলের মত চিৎকার দিয়ে বলল— মহিন্দর! ওরা কৈ? কোথায় গেল সবে? আমার খান্দানের নারীগণ। আমার বোন, চাচী, মা! তাদের ওপর কি কিয়ামত কায়েম হল? বলো মহিন্দর বলো, জবাব দাও?' এ প্রশ্নের জবাবে ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া আর কোন উত্তর নেই মহিন্দরের কাছে।

কাকু ঈসায়ী অগ্রসর হয়ে বললেন— ওরা আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে। তোমার খান্দানের কোন নারী-শিশু বেরোতে পারেনি। ওরা নারী শিবিরের ওপর আক্রমণ শানালে কাছের বৃক্ষে চড়ে তা দেখেছিলাম আমি। আগুন লাগার পর যারা দরোজা খুলে প্রাণে রক্ষা পেতে চেয়েছিল, তাদেরকে হয় কতল করেছে ওরা, না হয় আগুনে ঠেলে দিয়েছে। এদের খুব কমই ক্ষেত পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছে। তোমার বংশের নারীরা বের হতে পারেনি।

মহিন্দর বলল— আমি শিখ দলপতিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার আশা ছিল... তোমার বংশের নারীদের জীবিত রাখা। শিখরা দরোজা খোলার কোশেশ করছিল, কিন্তু ভেতর থেকে ছিটকিনি ছিল বন্ধ। ওরা দরোজা ভাঙ্গতে গেলে গুলি এসে ক'জনকে আহত করে। এতে ক্ষিপ্ত হয় শিখ জাতি। অতঃপর দেয় পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন।

সলীম অপরাপর লোকদের দিকে তাকায়। তন্মধ্যে ৮/১০ জন খ্রিস্টান ও মাত্র তিনজন মুসলমান। এদের আবার একজন মজীদ ও দাউদের সাথে সাঁজোয়া যানে হামলা করেছিল। দূরে এক জোয়ান সকলের থেকে পৃথকভাবে আগুনের শেষ ঝলক অবলোকন করছিল।

ঃ 'কে? বশির?' সলীম ওকে চিনতে পেরে বলল।

গর্দান ওঠাল বশির। কিন্তু স্থানচ্যুত হল না।

সলীম অগ্রসর হয়ে বলল— বশির! বশির!! খোদার দিকে চেয়ে বলো, ওরা কি সত্যি সত্যিই সকলে...?' আর বলতে পারল না সলীম। কণ্ঠ ধরে এল ওর।

বশিরের চোখে অশ্রুবন্যা। মনের অজান্তে ও সলীমের বুকে ঝাঁপিয়ে বোবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল— এসো সলীম! বেঁচে থেকে লাভ কি! এই আগুনেই ঝাঁপ দেই। এক্ষণে অগ্নিশিখা ছাড়া আমাদের কোন ঠাঁই নেই। সারা জীবন মর্মপীড়ায় না ভুগে এখনই সেটার দফা রফা করি। দেখো, এখন আর ওখান থেকে কেউ ফরিয়াদ,

www.amarboi.org

চিৎকার, সাহায্য, বাঁচাও বলে আওয়াজ দিচ্ছে না। সলীম! মৃত্যুভয়ে আমি পলায়ন করছিলাম, কিন্তু সেই মৃত্যুই এখন একমাত্র কাম্য আমার।

ঃ বশির! খোদার দিকে চেয়ে আমার কথার জবাব দাও! আমি স্রেফ জানতে চাই, ওরা কেউ ধরা পড়েনি তো?

ঃ না! মহিন্দরের কথা আগাগোড়াই সত্য। ওরা দরোজা ভাঙ্গছিল। কিন্তু কুদরত ওদের ইয্‌যত বাঁচিয়েছেন। ইউসুফ যখমী হয়ে নারী মহলে গিয়েছিল। ও ওখান থেকে ফায়ার করে। রাগে-গোস্বায় ওরা আগুন লাগিয়ে দেয়। সকলেই মরার পূর্বে উচ্চকণ্ঠে কালেমা উচ্চারণ করেছিল।'

সলীম খানিক থেমে বলল— আমাদের পুরুষরা কি কেউ বেঁচে নেই?

ঃ শিখদের ফিরে যেতে দেখে লাশের স্তুপে তোমায় তালাশ করছিলাম। আমার মত অন্য কেউ বেঁচে যেতে পারে।

কাকু বললেন— দাউদ, দেয়াল চাপা পড়ে কাতরাচ্ছিল। গাছ থেকে নেমে সর্বপ্রথম ওকে উদ্ধার করি। সে বলেছিল, সুবেদার যখমী। আমি তাকে আম বাগানে রেখে এসেছি। দাউদ গেছে সেখানে।'

ঃ মসজিদের ছাদে আমার সাথে আরো দু'লোক ছিল। আমি যখন ওখান থেকে নামি, তখন ছাদে বোমা পড়েছিল। ওদের কাউকে দেখনি?

ঃ ওদের লাশ ওখানেই পড়ে আছে। শিখরা তা দেখেই চলে গেছে। আমরা ধারণা করিনি, তুমি আহত হয়ে নীচে পড়েছিলে। ধারণা করেছিলাম, বোমা পড়ার পূর্বে হয়ত তুমি কোথাও বেরিয়ে পড়েছ। কিন্তু টর্চের আলোতে মহিন্দর তোমার বন্দুক দেখেছিল।

ঃ কোথায় আমার বন্দুক?

ঃ ওখানেই পড়ে আছে।

যুবতী যে মেয়েটা ক্রন্দন করছিল বন্দুকের কথা শুনে অগ্রসর হল। মিনতি ভরা কণ্ঠে সে বলল— দাদা! খোদার দিকে চেয়ে এবার নিজের জীবন বাঁচাও। দ্রুত পালাও এখান থেকে। সাথে নাও মজীদকেও।

যুবতীটি রূপা। শের সিং-এর মেয়ে, গোলাপ সিং-এর বোন। সলীম অনুচ্চস্বরে বলল— রূপা! তুমি বাড়ী যাও।

কিন্তু রূপা ওর হাত ধরে বলল— তুমি একাকী কিছু করতে পারবে না। ক'জনকে মারবে? ক'জনের সাথে লড়বে? খোদার দিকে চেয়ে পাকিস্তান যাও। রাতের আঁধারে বেরোতে পারবে।

সলীম চিৎকার দিয়ে বলল— রূপা যাও!

সলীমের বজ্রকণ্ঠের সামনে মাথা নোয়াল, রূপা। অতঃপর আগুনের আলোকে সলীমের মুখের দিকে গভীর নজরে তাকিয়ে বলল— সলীম! আমার আহ্বান, এক বোনের আহ্বান। একে অবজ্ঞা করো না। তুমিও শেষ হলে এ বংশে বাতি দেয়ার মত কেউ থাকবে না।

www.amarboi.org

সলীম যেন এবার নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলছিল— এখন আমার কোন খান্দান নেই। কোন জনপদ নেই, ঘর নেই, বাড়ী নেই, নেই ভাই-বন্ধু। এবার চাই প্রতিশোধ। শুধু প্রতিশোধ। রক্তের প্রতিশোধ রক্ত দিয়েই।

মহিন্দর বলল— যদি এক ইনসানের খুন জাতির কলঙ্ক মোছায় যথেষ্ট হত, তাহলে বলতাম, সলীম! তুমি আমার গর্দানে ছুরি চালাও। আমি নিজের বলিদান করতে প্রস্তুত। কিন্তু কওমের প্রায়শ্চিত্ত কেবল কওমই করতে পারে। আমার ব্যাপারে তুমি ভুল বোঝাবুঝিতে উপনীত না হও। ওই হিংস্র পশুদের পক্ষ হয়ে তাদের প্রতি কৃপাভিক্ষা করছি না আমি। একাকী বন্দুক চালিয়ে ওদের খতম করতে পারলে বারণ না করে তোমাকে আগে ঠেলে দেব; কিন্তু তোমার অজানা নয় যে, একাকী এ তুফানের মোকাবেলা করতে পারবে না। সলীম! ফওরান এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এ রাতটা অতিবাহিত হলে পালানোর মওকাও থাকবে না তোমার। কমপক্ষে ওকে বাঁচাতে পার। মজীদের জন্য আমি আমার ঘোড়া দিচ্ছি। হিম্মত করলে সকাল নাগাদ রাবী উপকূল অতিক্রম করতে পার।

জনপদের জনৈক খ্রিস্টান বললেন— ওদের গোটাতিনেক ঘোড়া সারাদিন এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করেছে। আরেকটা ঘোড়া দেখা যায়নি।

অপর একজন বলল— এইমাত্র মসজিদের আশেপাশে দেখেছি সেটা। মসজিদ সংলগ্ন জাম গাছের নীচে ঘাস খাচ্ছে।

মহিন্দরের কথার জবাব দেয়নি সলীম। আরেকবার স্তিমিত আগুনের দিকে তাকাল। আচমকা আরেকটা হাবেলী ওর চোখের পর্দায় ভেসে উঠল। ওই হাবেলীর বসতিদের চিত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল কল্পনার রঙ্গিন আকাশে। কি হচ্ছে সেই হাবেলীতে এখন? মনকে প্রশ্ন করল। ইসমত ও রাহাত এখন কি অবস্থায় আছে? পাকিস্তান সীমান্তে দরিয়া পার হয়ে হয়ত পাকিস্তানে পা রেখেছে ওরা। কিন্তু যদি ভারত সীমান্ত থেকে থাকে তাহলে? শিখ জাতি ওখানে হামলা করে থাকলে...? সলীম নেহায়েত পেরেশানির সাথে জীবনের ধূসর আঁচল খামচে চিন্তা করতে লাগল। জমকালো আঁধারপুরীতে মায়াবী তুফান তটে ওর ভাবনা তরী ধাক্কা খেল। এ শোকাতুর অগ্নি পরিবেশেও প্রেমের প্রদীপ্ত অনির্বাণ শিখা জ্বলে উঠল দপদপ করে। তুফানবহুল সাগর সৈকতে পাহাড়সম ঢেউ উতরে তীরে যেন কার অপেক্ষা অনুমান হল। ইসমত! ইসমত!! আমার ইসমত!!! হৃদয়ের তন্দ্রে তন্দ্রে ও প্রতিটি শ্বাসে প্রিয়তমার নামোচ্চারণ। ইসমত যেন জ্বলন্ত কুঠি থেকে দু'হাত উঁচিয়ে ডেকে বলছে— সলীম! তুমি কৈ? আমাকে বাঁচাও!

জনৈক খ্রিস্টান দৌড়ে এসে বলল— শের সিং-এর দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে। শিখদের মহল্লায় আগুন লাগিয়ে সে আমাদের মহল্লায় এসেছিল। সে বলেছে, এ তল্লাটের তামাম ঘরে আগুন দেব। তুমিও চলে যাও। এ তল্লাটে কেউ থাকতে পারবে না।

কাকু ও তার সাথী এ খবর শুনে বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটল। সলীম জনপদের দিগন্তে তাকাল। শিখদের বাড়ী থেকে আগুনের লেলিহান শিখা উপরে উঠতে দেখল।

www.amarboi.org

মহিন্দর বলল— এখন সে কারো কথা শুনবে না। সর্বপ্রথম তোমাদের বাড়ীর জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিল। বড় কষ্ট করে তাকে বারণ করাই। অতঃপর চিৎকার দিয়ে ছুটে পরে আবার এল। হাতে মেটে তেলের ড্রাম, পাগড়ীতে তেল মেখে লাঠির মাথায় পাকিয়ে আগুন ধরায়। 'এবার আমি গোটা জনপদ পুড়ে ছাই করে দেব। জনপদের শিখরা এসে কেবল আফজালের বাড়ীতে ছাইভস্ম দেখবে না।' গতকাল ধরে সে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। গতকাল যারা মার খেয়ে ভেগেছিল তাদের কতল করতে চাচ্ছিল। আমি তাকে তুলে কামরায় আটকে রাখি। সারাদিন গালি দিয়েছে, দরোজা ভাংতে চেষ্টা করেছে। জানতাম, সে বেরোলে শিখদের গুলির টার্গেটে পরিণত হবে। রূপা আমাদের জনপদে তালাশ করছিল। সন্ধ্যার দিকে জানলাম, খেল শেষ হয়েছে। ছেড়ে দিলাম তাকে। চলে এল এখানে। আমি ও রূপা তার পেছনে আসি।'

ঃ না, মহিন্দর! খেল খতম হয়নি। খেল কেবল শুরু। কওমের খেল এভাবে শেষ হয় না। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন ওই ছাইভস্ম থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হবে।' বলে সলীম খান্দানের লোকদের দেহ ভস্মের এক মুঠি তুলে রুমালে বাঁধল। বলল— 'এটা আমার কওমের পুঁজি। সাথে নিয়ে গেলাম। এর দ্বারাই কওমের নয়া মোর্চা ও নয়া কেল্লা তৈরী হবে। এ ছাইতেই জন্ম নেবে এক নতুন প্রজন্ম। খেল খতম হয়নিরে মহিন্দর।

খ্রিস্টানদের তল্লাটে নারী-শিশুদের আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছিল। শের সিং বলে চলেছে— আমাকে ছেড়ে দাও। সরে যাও বদমাশ। তোমরা বসে তামাশ দেখছ। এখন এ জনপদে কেউ থাকবে না।' রূপা ক্রন্দন করতে করতে বাইরে বের হল। বশির ও অন্যান্য সাথীদের দিকে তাকিয়ে সলীম বলল— তোমরা দেখো, ঘোড়া এখানে থাকলে ধরে এনো। আধা ঘন্টার মধ্যে যতটা গোলাবারুদ সংগ্রহ করা সম্ভব-জোগাড় করো। আমার রাইফেলটাও এনো, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।

মজীদ ও দাউদের সাথে ব্রেন ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় যে লোকটা হামলা করতে গিয়েছিল, সলীম বলল— দু'লোক আমার পিছু নিয়েছিল। তন্মধ্যে একজন পালায়, অপর জনকে যমীনে আছড়ে ফেলি। তার সাথে স্টেনগান ছিল।

সলীম বলল— সকলকে নিয়ে এসো।

বশির বলল— ক্ষেতে আরো অনেক কিছু পেতে পারি আমরা। কিন্তু অকেজো হাতিয়ার দ্বারা কি লাভ আমাদের?

সলীম জবাব দেয়— 'পথিমধ্যে ওইসব হাতিয়ার ব্যবহার করার যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে। যাও আসছি আমি। দাউদ মজীদকে কাঁধে করে নিয়ে এলে বলো প্রস্তুত হতে।' বলে সলীম দ্রুত খ্রিস্টন মহল্লার দিকে পা বাড়ায়।

খ্রিস্টানরা শের সিংকে একটি খাটিয়ার ওপর শক্ত রশির দুচ্ছেদ্য বাঁধনে চিৎপটাং করে রেখেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভিড় ঠেলে সলীম সেখানে পৌছুল। শের সিং সকলকে যা তা গাল দিচ্ছিলেন। রূপা কাঁদছে তার পাশটিতে দাঁড়িয়ে।

কাকু ঈসায়ী সলীমকে দেখে বলল— বাধ্য হয়ে তাকে বেঁধেছি আমরা। মঘাইর ঘরে আগুন লাগাচ্ছিল সে। বড্ড ঝুঁকি নিয়ে তার মশাল ছিনিয়ে নিয়েছি। এক লোককে মুষ্ঠাঘাত করে সে ছাদের নীচে ফেলে দেয়।

www.amarboi.org

শের সিং চিৎকার দিয়ে বলে— আমি সকলকে মেরে ফেলব। এ জনপদ ভূতের বাড়ী হবে। রূপা বলল— বাপু! দেখুন সলীম এসেছেন। সাবধানে কথা বলুন।

তিনি চিৎকার দিয়ে বলেন— রূপার বাচ্চী! খামোশ! ফের এ কথা বললে তোর গলা টিপে দেব। আমার বিশ্বাস, সলীম পাকিস্তান চলে গেছে। ওখান থেকে ও ফৌজ নিয়ে আসবে।

রূপা সলীমের দিকে তাকিয়ে বলল— সলীম! ওনার সাথে কথা বলো। বোঝাও!

ঝুঁকে শের সিংয়ের দিকে তাকাল সলীম। বলল— জনপদের খ্রিস্টানরা আমাদের কোন ক্ষতি করেনি; বরং সাহায্যই করেছে আমাদের। গরীব প্রজাদের ঘর এভাবে জ্বেলো না জ্যাঠা। শের সিং গর্জে উঠলেন— তুমি? তুমি কে? চলে যাও এখান থেকে!

রূপা সলীমের হাত থেকে টর্চ ছিনিয়ে নিল। বোতাম টিপে বাপের চেহারায় ফোকাস মেরে বলল— বাবা দেখো! ইনি সলীম! চিনলে না তাকে?

ঃ তুমি আমায় বেকুফ ঠাওরাচ্ছ! সেই সলীম আর এই সলীমের কত তফাৎ। আবারো বলছি, সে ফৌজ নিয়ে আসবেই আসবে। আফজাল ও গোলাপ সিং হত্যার বদলা নেবে অতি অবশ্যই।

সলীম কাকুকে বলল— কাকু! আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারছি না। তুমি এর খেয়াল রেখো। হয়ত তার শরাবে বিষ মিশ্রণ করা হয়েছিল।

অতঃপর রূপার হাত থেকে টর্চ নিয়ে বলল— রূপা! মাতলামি কমলে তাকে বলো, সত্যিই আমি একদিন আসব।

ক'কদম চলে ও থামল। ক্রন্দনরত মহিলারা ওর পাশে জমায়েত। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ও বলল— আমি তোমাদের কল্যাণকামিতাকে ভুলব না। সাধ্যে কুলালে তোমরা লাশগুলোর গায়ে মাটি ফেলো।

✪ ✪ ✪

রাত দু'টো।

সলীম ও ওর সঙ্গীরা কোচ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। গুলি লেগে ওদের ঘোড়ার পা একটা ভেঙ্গে ছিল। ওটি চলার যোগ্য নয়। আরেকটা ঘোড়ার পেছনের দিকটা মামুলি যখম। বাকী দুটো ঘোড়ার একটা, সলীমের অপরটা ফাজ্জু পালোয়ান রামচাঁদ থেকে সংগ্রহ করেছিল। মজীদ ঘোড়ার পিঠে চাপার মত সুস্থ নয়। মজীদের জন্য শিখদের ফেলে যাওয়া জিন ওঠানো হল। মহিন্দর তার নিজস্ব ঘোড়াটা আনতে জনপদে গেল। কিন্তু সলীম ওর অপেক্ষায় বসে থাকতে চাইল না। দাউদ বলল— সলীম! মজীদকে একটা ঘোড়ার পিঠে চড়াও। বাকী দুটো ঘোড়ায় তুমি ও বশির চড়ো। আমি ও মোখতার তোমাদের সাথে পদব্রজে চলব।

সলীম বলল মজীদকে— তোমার চলতে কষ্ট হলে আমার সাথে চাপো।'

মজীদ ছিল তখন অন্য জগতের বাসিন্দা! এ যাবত কারো সাথে কথা বলেনি ও। ওর দৃষ্টি ওই অগ্নিকুণ্ডের ওপর নিবদ্ধ, যা ওর জীবনোপকরণ ভস্ম করে দিয়েছিল।

www.amarboi.org

সলীমের প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পেয়ে ও বলল— 'না! তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি সওয়ার হতে পারব।'

ওরা সওয়ার হচ্ছিল। রওয়ানা হবে হবে সেই মুহূর্তে মহিন্দর ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত। ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম মজীদের হাতে দিয়ে বলল— জলদি করো।

সলীম বলল— দাউদ! তুমি ও মজীদ এ ঘোড়ার পিঠে চাপো।'

জনপদের খ্রিস্টানরা ফের ওদের আশেপাশে জমায়েত হল। ঘোড়ার পা সঞ্চালিত হলে কাকু অগ্রসর হয়ে বলল— তোমরা চলে যাওয়ার পর এখানে মানবতার অপমৃত্যু ঘটবে। আমরা এখানে থেকে গেলে তোমাদের রাস্তাই দেখতে হবে আজীবন। সে রাস্তায় রাহাগীর হবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মও। স্মৃতির সচিত্র এলবামে তোমরা যে কাজ করে গেলে আজীবন তা রোমন্থন করব।

ঃ কাকু! আমরা অবশ্যই আসব। এই পবিত্র ছাইভস্ম-ই তোমাদের প্রজন্মের জন্য হবে আশীর্বাদ।' বলল সলীম।

সলীমের লাগাম ধরে মহিন্দর আগে হাঁটতে লাগল। সলীম বলল— মহিন্দর। রূপাকে সান্ত্বনা দাও। শের সিং-এর দেমাগ ঠিক না হলে তাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাও।

ঃ কদ্দুর তোমাদের সাথে যেতে চাই। জরুরী একটা কথা আছে।'

মজীদের ঘোড়ার লাগাম ধরে কাকু ডুকরে কেঁদে উঠল। মজীদ চিৎকার দিয়ে বলল— কাকু? খোদার দিকে চেয়ে যাও। এ আগুন চোখের অশ্রুতে নেভার নয়।' নরম হয়ে ফের বলল মজীদ— মহিন্দর তুমিও যাও। পরে কোনদিন দেখা হলে তোমাদের শোকরিয়া জানাব।'

মহিন্দর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল— লজ্জা দিও না আর। তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। তোমাদের জনপদে উপনীত হয়ে ধারণা করেছিলাম, আমাকে দেখামাত্র বুঝি গুলি করবে। হায়! তোমরা যদি এমনটা করতে। এ জীবনের চেয়ে ওই মৃত্যু আমার কাছে সহজ।

ঃ এ জনপদে শিখদের মধ্যে মানুষের মত মানুষ তিন জন। এক. গোলাপ সিং, যাকে ওরা মেরে ফেলেছে। দুই. শের সিং, সম্ভবত সে পাগল হয়ে গেছে। তিন. তুমি।' বলল— সলীম।

ঃ গোলাপ সিং-এর মত মারা না গেলে আমিও বোধ হয় পাগল হয়ে যাব।' মজীদের ধৈর্যশক্তি লোপ পেল। ঘোড়া আগে বাড়িয়ে বলল— তোমরা সময় নষ্ট করছ। ঘড়ি রাত দুটোর কাঁটা পেরিয়ে তিনটায়।' আচমকা সরুপথের মোড়ে স্টেনগান বাগিয়ে কেউ বলল— দাঁড়াও! কারা তোমরা?

ঃ মজীদ! ও বাসন্তী। আমার বোন। তোমাদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে। বলল মহিন্দর। যুবতী ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল— আমি মহিন্দরের বোন।

মজীদ তেতো স্বরে বলল— বসন্তী মহিন্দর! জানি তোমাদের বোন তোমার চেয়ে ভিন্ন নয়। কিন্তু ওকে এখানে আনার জরুরত কি ছিল?

www.amarboi.org

ঃ এক মিনিট দাঁড়াও মজীদ! কাল হামলার সময় বাসন্তী বলনাথ সিং-এর স্টেনগান লুকিয়েছিল। ওতে বেশ গুলিও আছে। বলনাথ আমাদের সকলকেই মেরেছে। কিন্তু বাসন্তী ওই আগ্নেয়াস্ত্রের খবর দেয়নি। আমিও জানতাম না, স্টেনগান ও-ই লুকিয়েছে। ঘোড়া আনতে গেলে তবেই ও জানায় এ কথা।

ততক্ষণে যুবতী কাছে এসে গেছে। সলীম টর্চের বোতাম টিপে ওর মুখে ফোকাস মারল। বাসন্তীর চেহারা আঘাতে আঘাত ক্ষত-বিক্ষত। সলীম কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর গলা থেকে কোন আওয়াজ সরল না।

মজীদ বলল— সলীম! টর্চ মেরো না!'

সলীম টর্চ বন্ধ করল। বাসন্তী স্টেনগান ও গুলি ওর সামনে পেশ করল। মহিন্দর মজীদের দিকে তাকিয়ে বলল— মজীদ! এই জিনিষগুলো আমিই তোমার কাছে নিয়ে আসতাম। কিন্তু বাসন্তী আমার ওপর আস্থা আনতে পারেনি।

খানিক বাদে সলীম ও ওর সঙ্গীরা রাতের অন্ধকারে গায়েব হল। মহিন্দর ও বাসন্তী ওদের ঘোড়ার বিলীয়মান পদধ্বনি শুনছিল। বাসন্তী নিথর-নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে। শেষমেষ ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মহিন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'ভাইয়া! ভাইয়া!!' সে বলল— 'তুমি বিশ্বাস করো কি, ওরা পাকিস্তান পৌছতে পারবে?'

ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করি। এও বিশ্বাস করি, অচিরেই ওরা ফিরে আসবে। পাপের আগুন ইনসাফের আগুন জন্ম দেবে। যুলুম খতম না হওয়া পর্যন্ত এ আগুন নিভবে না কিছুতেই।'

পশ্চিম গগনে বিজলী চমকাচ্ছিল। নিশির মৃদমন্দ সমীরণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল। অগ্নিশিখা গোটা জনপদে ছড়িয়ে পড়ছিল। ঈসায়ীদের মহল্লায় চিৎকার ভেসে আসছে। সেই চিৎকার আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলছিল। বাসন্তী ভাইয়ের হাত ধরে বসতীর দিকে ইশারা করে বলছিল— মহিন্দর! এ আগুন নেভার নয়। এ সেই আগুন যা যুবায়দা, ছোগরা, আয়েশা, তাহেরা ও আনোয়ারাকে জ্বালিয়ে ছাই করেছে— কোনদিন নিভতে পারে না, নিভবে না।

✪ ✪ ✪

সলীম আরো কিছু কথা বলল। ভগ্নোৎসাহ সহযাত্রীদের মনে চেতনা এল এতে। পিপাসা ও যন্ত্রণার কথা ভুলে গেছে সলীম এক্ষণে। নিজের ঘোড়ার থেকে আহত বালককে নামিয়ে কাফেলার আগামাথা চৈতন্য উদ্দীপক নির্দেশনা দেয় ও। শেষমেষ সশস্ত্র সহযাত্রীদের কিছু কমান্ড দিয়ে আগে বাড়ার হুকুম করে। এখান থেকে তিনশ গজ দূরত্ব অতিক্রম করার পর কিছু লোককে আহতদের অন্য পথে চলার নির্দেশ দেয়া হয় এবং রাস্তা পরিষ্কার হওয়ার এন্তেযার করতে বলা হয়।

ব্রীজের কাছে এলে সশস্ত্র ৮ সেপাই ওদের গতিরোধ করে। এক লোক আগে বেড়ে বলে— দাঁড়াও! আমরা তোমাদের তল্লাশি করব। তোমাদের দেহ তল্লাশির পরই পাকিস্তান যেতে দেব বলে উপরের নির্দেশ। ভয় নেই দেখছ না, আমরা শিখ নই।' বলে

www.amarboi.org

সে টর্চের আলো নিজ সাথীদের ওপর ফেলে ফের বলল— এবার তোমাদের শঙ্কা লাঘব হল তো। আমরা নারীদেরও তল্লাশি করব না। তারা ওদিক দিয়ে যেতে পারবে। কেবল পুরুষদেরই তল্লাশি করব। জলদি করো। ভয়ের কারণ নেই। তোমাদের দেখভালের জন্য সরকার নিযুক্তি দিয়েছে আমাদের।

মজীদ অপেক্ষাকৃত দূরে গাছের আড়ালে দণ্ডায়মান। সলীম দ্রুত ওর কাছে এগিয়ে যায়। বলে লঘুস্বরে— মজীদ! এক মিনিটের মধ্যে ওদের খতম করতে সক্ষম আমরা।

মজীদ শান্ত নদীটির মত জবাব দেয়–এখনই নয়। লোকদের বল, নারীদের একদিকে সরিয়ে দিতে। দাঁড়াও, বন্দুক ও গুলি এখানে রেখে লোকদের সাথে শান্তভাবে কথা বলো।

রাইফেল ও গুলি গাছের আড়ালে রেখে সহযাত্রীদের কাতার চিরে সলীম অগ্রসর হয়ে বলল— 'দেখো ভাইয়েরা, ভয় নেই। কাপ্তান সাহেবের হুকুম মান্য করো।

ডোগরা সেপাই বলল— আমরা কাপ্তান নই— জমাদ্দার। তোমাদের ভালো লোকই মনে হচ্ছে। ওরা বড্ড ভড়কে গেছে— বোঝাও ওদের।

সহযাত্রীদের লক্ষ্য করে সলীম বলল— দেখো তোমরা কিন্তু ভুল করছ। ওয়াদা করেছিলে, সকলে আমার নির্দেশ মানবে। তোমার সে কথা ভুলে গেলে বলছি, তোমাদের কোনই ভয় নেই। মা-বোনরা শান্তভাবে এসে ডান দিকে বসে যান।

অন্যান্য সশস্ত্র লোকেরাও কাফেলার লোকদের বোঝাতে লাগল। সহযাত্রীরা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নারী-শিশুদের একপাশে ঠেলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে নারী-শিশুরা একদিকে সরে গেল। পুলের সরু রাস্তায় নারী-শিশুরা গিয়ে বসে পড়ল। মূল সেতুপথ খালি হল। ডোগরা সেপাই তৃপ্তির হাসি হাসল।

ডোগরা সেপাই এবার গলার ভয়েসও পাল্টে বলল— তোমাদের যার কাছে যে অস্ত্র আছে জলদি বের করো। তল্লাশির পর কারো কাছে পাওয়া গেলে গুলি করে নদীতে ভাসিয়ে দেব। জমাদ্দারের ইশারায় তার সঙ্গীরা সরুপথে এগোল। এদের মুখ ব্রীজের তলে লুকানো শিখদের প্রতি। ডোগরা জমাদ্দারের যে পজিশনে অবস্থান, তাতে কেউই তার গুলির নিশানামুক্ত নয়। সে পুলের নীচে ও ওপরে লুকানো শিখদের টর্চের দ্বারা সিগনাল দিল। অতঃপর কাফেলার সহযাত্রীদের বলল— বোঝা যাচ্ছে, তোমাদের হাত খালি। প্রথমে তোমরা পার হও। অতঃপর নারী-শিশু।

কিন্তু সহযাত্রীরা খামোশ দাঁড়িয়ে। ডোগরা সেপাই হয়রান হয়ে বলল— তোমরা আমাদের হুকুম মান্য করোনি। পুলের ওপর চড়তে দু'মিনিটের সময় দিচ্ছি। তোমাদের সে লোক কই, যে আমাদের কাপ্তান বলেছিল?

জমাদ্দারের ইশারায় তার সাথীরা রাইফেল উচাল। উদ্দেশ্য ভয় দেখানো। আচমকা গাছের আড়াল থেকে বজ্রকণ্ঠ ভেসে এল— সকলে শুয়ে যাও!'

মুহূর্তে দু'টো স্টেনগান ও মেশিনগানের টর্‌ টর্‌ আওয়াজ শোনা গেল। ডোগরা সেপাইরা ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

www.amarboi.org

অন্যদিকে ওপারে ওঁত পেতে থাকা আকালী সেনারা এ বুঝে অগ্রসর হতে লাগল যে, তাদের পথ প্রদর্শক সেপাইরাই হামলা করেছে। ওরা 'সত্যাশ্রয়ী আকালী সেনা' শ্লোগান দিয়ে অগ্রসর হল। ওরা মাঝব্রীজে আসতেই সলীম, দাউদ ও সহযাত্রীদের রাইফেলগুলো এক সাথে গুলিবৃষ্টি করল। শিখরা একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে পিছু হটতে কোশেশ করল। কেউ নদীতে ঝাঁপ দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলে জমে গেল লাশের স্তূপ। মজীদ ঘোড়া হঁকিয়ে লাশের ওপর দিয়ে চলতে চলতে স্টেনগানের গুলি খরচা করতে করতে। এগিয়ে যায় পুলের ওপর দিয়ে।

✪ ✪ ✪

ব্রীজের নীচে শিখদের পাঁচটি উপদল দণ্ডায়মান। তাদের কাছে বেশ কিছু নারী-শিশু রশিতে আটকা। ওদের আশে পাশে গোটা দশ-পনের ঘোড়া। ওই ঘোড়ায় নারী ও শিশুদের চড়ানো হল। এরা বেশ ক'ক্রোশ সফর করে ক্লান্ত-শ্রান্ত। কাফেলার ৮/১০ জন লোক ডোগরা সেপাই কর্তৃক নিরস্ত্র হয়েছিল। সলীম অগ্রসর হয়ে এদের হাত-পায়ের বাঁধন কাটল।

জনৈক যুবতী ফোঁপানো কান্নার সুরে বলল— আপনারা.... আপনারা বেশ দেরীতে এসেছেন। হায়! আপনারা তখন যদি আসতেন যখন আমাদের বসতীতে হামলা হয়!

যুবতীর কথা শুনে সলীমের চোখের সামনে অগ্নিতাণ্ডবের দৃশ্য ফুটে ওঠে। যুবতীর পায়ের রশি কাটতে গিয়ে ও বলল— কোথায় তোমার বসতী?

ঃ আমার বসতী? নদী উপকূলে জ্বলন্ত বসতি চোখে পড়েনি? ওটাই।

ঃ তোমার সাথে আর কেউ?' সলীমের আওয়াজ কণ্ঠনালীতে আটকে গেল। শেষ করতে পারল না কথা।

ঃ ছিল এক বাপ, চার ভাই ও দু'চাচা। কেউ নেই এখন। তিন বোন আগুনে পুড়ে ছাই। আমি ও মা কূয়োর দিকে পলায়ন করতে গেলে ওরা ধরে ফেলে। এখন এসেছেন আপনারা। কিন্তু লাভ কি তাতে—।' যুবতী ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

মাঝবয়সী এক লোক বললেন— আবেদা! আবেদা! বেটি সবর করো!

কাফেলার সহযাত্রীরা চলছিল। তারা পুরো কাফেলাকেই ঘিরে এগুচ্ছিল। আঁধারের আলোর রেখা প্রস্ফুটিত হল। মজীদ কাফেলাকে দ্রুততর হতে বলছিল। ঘোড়া নিয়ে কখনো কাফেলার আগে আবার কখনও পেছনে প্রদক্ষিণ করছিল। সহযাত্রীরা আঁচ করতে পারল, কে এ কাফেলার দিশারী!

তারা জানতে চাইত— সুবেদার! দরিয়া আর কদ্দুর? কখন পৌঁছব আমরা? সামনে কোন হামলার আশংকা নেই তো?' মজীদ অগ্রসর হয়ে কারো প্রশ্নের জবাব দিত আবার কাউকে মৃদু ধমকি দিয়ে সামনে অগ্রসর হত।

ভোর ছ'টার দিকে ওর চলৎশক্তি রহিত হয়ে গেল। একটা আর্তনাদ। মুহূর্তে ওর হাত থেকে স্টেনগান খসে পড়ল। ঘোড়া দাঁড়াল থমকে। লোকেরা শোরগোল করে দাউদ ও সলীমের কাছে গেল। ঘোড়া থেকে নামিয়ে ওকে নারী কাফেলায় শোয়ানো হল। সলীম গায়ে হাত দিয়ে আঁচ করল, প্রচণ্ড জরাক্রান্ত মজীদ।

www.amarboi.org

মজীদ চোখ খুলে দেখল, আবেদা ওর যখমে পট্টি বাঁধছে। ওর স্থলে সলীম কাফেলার দেখভাল করছে। বন্দুকের স্থলে ওর হাতে মেশিনগান। সলীম ওর কাছে এল। আবেদা বলল— এখন তিনি সংজ্ঞা পেয়েছেন।

যুবতীর মা বললেন— বেটা! ও তোমার ভাই বুঝি?

ঃ জ্বি হ্যাঁ।

জনৈকা মহিলা বললেন— ও সবার ভাই!

মাথা উঠিয়ে সলীমের দিকে তাকায় মজীদ। চেহারায় দুঃখের চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলে— কবিকে সেপাই বানাতে কত বড় এক ইনকিলাবের দরকার ছিল।

পথিমধ্যে কাফেলাভুক্ত লোকের মিছিল প্রলম্বিত হতে লাগল। সকাল ৮টার মধ্যে এ সংখ্যা তিন হাজারের কোটায় গিয়ে দাঁড়াল।

সড়কের এপাশে ওপাশে ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতির লাশ বিক্ষিপ্ত পড়েছিল। ডেরা বাবা নানক পর্যন্ত চারটি শিখ হামলার সম্মুখীন হল ওরা। কিন্তু নিরস্ত্র মানুষের প্রতি হামলা করে অভ্যস্ত শিখরা এদের কাছে বেশ বাধার সম্মুখীন হল। এ কাফেলাকে নিরস্ত্র মনে করে দিগন্ত হতে 'সত্যাশ্রয়ী আকালী-পন্থ-এর 'জয় খালিস্তান কি' নারা দিয়ে এগিয়ে আসত; কিন্তু মুখোমুখি হতেই গুলিবৃষ্টি উপহারের পাশাপাশি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' নারা শুনে হতবাক হয়ে যেত। 'খবরদার! এদের সাথে ফৌজ আছে। মুসলিম ফৌজ। বেলুচ রেজিমেন্ট। পালাও। নয়ত জানে রক্ষা নেই!!

এ পথের সবচে' মারাত্মক ঘাঁটি' 'ডেরা বাবা নানক' এখানেই গুরদুয়ারা ও আকালী সেনাদের হেড অফিস। হিন্দুস্তানী সাব ইন্সপেক্টরদের কেন্দ্রীয় দফতর। কিন্তু এ অফিসে পূর্বেই রটে গেল, নিরস্ত্র লোকদের পাহারা ফৌজসহ কাফেলা আসছে। কাজেই নিরবচ্ছিভাবে এখানটা অতিক্রম করা গেল।

শরণার্থী কাফেলা পুলিশ স্টেশন অতিক্রম করছিল। হানাদার পুলিশ বাহিনী প্রধান বন্ধ দরোজার ফাঁক দিয়ে এ দৃশ্য দেখছিল আর দাঁত কামড়াচ্ছিল। সাব ইন্সপেক্টর জনৈক শিখের টিকি ও দাঁড়ি খামচে বলল— বদমাশ! ওদের সাথে ফৌজ কৈ?

শিখ সেপাই বলল— জ্বি, মানে আমি মিথ্যে বলছি না। বচন সিংকে জিজ্ঞেস করে দেখুন! ওরা আমাদের ঘোড়ায় সওয়ার। আমাদের অস্ত্র ও তাঁবু ওদের দখলে। ব্রীজের ওপর আমাদের ৬০/৭০ কে হত্যা করেছে সে ওরাই। ডোগরাদেরকে স্টেনগানের মুখে ছাতু বানিয়েছে এ নিরস্ত্র লোকজনই। ফৌজ হয়ত দূরত্ব বজায় রেখে পেছনেই আসছে।

অপর এক শিখ বলল— কিরণ ব্রীজে ওদের ওপর চড়াও হয়েছিলাম আমরা। সিভিল পোষাকে ছিল ওদের সেপাই। আপনি তল্লাশি করলে ওদের অর্ধেক লোককেই সশস্ত্র পেতেন!'

তৃতীয় শিখ বলল— আপনার জন্য বড্ড এক তোহ্ফা এনেছিলাম। আমার ট্রলিতে আজীম খানের মেয়ে ছিল। ওরা আপনার সে তোহ্ফা আর ৮০০ টাকার বলদও নিয়ে যাচ্ছে।

www.amarboi.org

সাব ইন্সপেক্টর বলল— যাও। দরিয়ার পুলে গিয়ে তল্লাশি করো। বলদ যিন্দা না পেলেও কমপক্ষে মেয়েটার চামড়া ছিলে লবণ তো দিতে পারবে।

ঃ স্যার, আজীম খানের মেয়ে সেতো ভুবনমোহিনী!'

✪ ✪ ✪

ডেরা বাবা নান্‌কের আশে পাশে দিগন্ত জোড়া লাশের ছড়াছড়ি। কাফেলা সড়কে পৌঁছুতেই ক্ষেতের আড়াল থেকে দু'মুসলিম সেপাই বেরিয়ে আসে। হাতের ইশারায় কাফেলার গতি মন্থর করে তারা। সলীম ঘোড়া হাঁকিয়ে ওদের কাছে এলে বলে— ব্রীজ ডোগরা রেজিমেন্টের কব্জা। সামনে যাবেন না।

সলীম দাউদের দিকে তাকায়। দাউদ আগে বেড়ে বলে— আমরা যাবই। সামনে কোন বাধা এলে প্রতিরোধ ছাড়া গত্যন্তর নেই!

ঃ কিন্তু জাতির বধূ-মাতাদের তোমরা স্টেনগানের গুলির সামনে দাঁড় করাতে পার না। ওদের আছে আর্মড কার, সাঁজোয়া যান। এদিকে তাকাও!' বলে সেপাই সড়কে ছড়ানো লাশের স্তূপ দেখাল। বলল— বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫ হাজার মানুষকে শহীদ করা হয়েছে।

সলীম বলল— কিন্তু আপনারা বাউন্ডারী ফোর্সের হেড কোয়ার্টারে ম্যাসেজ পাঠালেন না কেন?

ঃ ম্যাসেজ পাঠিয়েছি। কিন্তু ওই ফোর্সের পুরোধা হচ্ছে শিখ ও হিন্দু। ওরা একদিকে আমাদের পাঠায়, অপরদিকে হামলা চালায়। নগণ্য যে কিছু মুসলিম অফিসার আছে তাদেরকে দূর-দরাজে পোস্টিং দেয়া হয়েছে। কাল সন্ধ্যার দিকে আমাদের রেজিমেন্টের সিপাহী বাটালা থেকে বহুত বড় কাফেলা নিয়ে আসছে। দেখবেন, ওই কাফেলার ডোগরাদের কোথায় কোথায় হামলা করতে পাঠানো হয়। যতক্ষণ আমাদের রেজিমেন্ট পুল হেফাযত করবে ততক্ষণ ওদের চেষ্টা থাকবে, শরণার্থী কাফেলা ওই সব সড়ক অতিক্রম করুন, যেখানে মুসলিম সেপাই কম। এক্ষণে আপনাদের রাস্তা একটাই। দরিয়ার কিছুটা নামায় হাজারো মুসলমান জমায়েত হয়েছে। ওখানে কিশ্‌তি পাবেন।

ডেরা বাবা নানক থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী উপকূলে আশপাশের প্রায় ২০ হাজার মুসলমান ছাউনি ফেলেছিল। প্রতি মুহূর্তে মুসলিম শরণার্থী বেড়ে চলছিল।

দুপুরের দিকে সলীমদের কাফেলাও পৌঁছে গেল। এ কাফেলার সহযাত্রীদের কাছে অস্ত্র দেখে মানুষের মুখে হাসি ফুটল। সকলেরই নিরাশ মনে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠল। ওরা শিখদের হাতে নিপীড়ন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও রক্তসাগরে ডোবার কাহিনী বলে যাচ্ছে মুখ ও চোখের ভাষা দিয়ে।

কাফেলার মানুষ শুনে যাচ্ছিল, অমুক স্থানে নয়া কাফেলার বীর সহযাত্রীরা শিখদের মোকাবেলা করেছে। অমুক স্থানে রামধোলাই দিয়েছে। সলীম ও মজীদের খান্দানের সকল কাহিনী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতায় বলে চলেছে।

www.amarboi.org

নিকট জনপদের অসংখ্য মানুষ নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার, গবাদিপশু ও ভূ-সম্পত্তি ফেলে চলে এসেছে বলে জানাল। এরা যা-ও সাথে নিয়ে এসেছিল, তা শরণার্থী শিবিরে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিল।

সলীম ও ওর সাথীরা ক্ষুধা-পিপাসায় মৃতপ্রায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের সামনে মজাদার খানা হাজির করা হোল। মজীদের জন্য জনৈকা মহিলা মেষের দুধ নিয়ে এল। সলীমের পীড়াপীড়িতে পেয়ালায় চুমুক বসায় ও। এক লোক মজীদকে একটা লেপ দিয়ে শুইয়ে দিল। আবেদা ও ওর মা বসল— পাশটিতেই।

মাঝি-মাল্লা ও নৌকার প্রাচুর্য সলীমের আশাতীত। ওপারে নৌকা ভেড়ানো। মাঝিরা দূর উপকূলে হুক্কা টানছে। লোকেরা মজীদকে বলল— ওপার থেকে কিছু লোক মাঝিদের এজেন্ট হয়ে এসেছে। ওদেরকে শ'পাঁচেক কিংবা হাজার রূপি দিলে আঁধার রাতে নারী-পুরুষদের পার করে দেবে।

ঃ এ সময় ওদের কোন এজেন্ট এখানে আছে কি?' প্রশ্ন সলীমের।

ঃ না। সন্ধ্যার দিকে আসবে। ওদের ধারণা অধিক মানুষ পার করতে গেলে আসল পারিশ্রমিকই পাওয়া যাবে না।

শ্বেত-শুভ্র দাড়ি বিশিষ্ট এক লোক আগে বেড়ে বললেন— আমার কাছে কাল নগদ ২শ' রূপি ও কিছু স্বর্ণালংকার ছিল। সবটাই ওদের সোপর্দ করেছি। কিন্তু এখন ওরা বলছে, তোমাদের খান্দানে ১১ জন লোক। এদের পার করাতে ৫শ' রূপি দিতে হবে।

ঃ কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে, মুসলমানদের মধ্যে এখন এমন লোক আছে?

ঃ ইসলামের সাথে ওদের সম্পর্ক কি? শিখদের চেয়ে ওরা মারাত্মক।

ঃ বাবা! এটা আমাদেরই কসুর। আমরা ওদের সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি।

জনৈক নওজোয়ান বলল— আসলে এ কসুর মাঝি-মাল্লার নয় উপকূলীয় জনপদের জনৈক চৌধুরী ওদের থেকে টোল আদায় করে। মাঝিরা ওদের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আমরাও তাকে বুঝিয়েছি। কিন্তু লোকটা বজ্জাতের শিরোমণি। বদমায়েশের দল নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। আপনি তাকে বোঝালে মাঝিরা ঠিক হয়ে যেতে পারে!

ঃ তুমি থাক কৈ?

ঃ নদী তীর থেকে এসেছি আমি। আমিও একজন মাঝি। কোন প্রকার অর্থ ছাড়াই আমি শরণার্থীদের পার করা শুরু করেছিলাম। তিনবার এভাবে পার করার পর দেড়শ' লোক আমার নৌকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদের কাছে মিনতি করি, হাতজোড় করি, কিন্তু কেউ পরোয়া করল না। পরিণতিতে নৌকা ডুবে গেল। আফসোস, ভাইদের আমি সাহায্য করতে পারলাম না।

ঃ অনেক কিছুই করতে পার তুমি। এসো আমার সাথে!'

বেলা আড়াইটায় সলীম, দাউদও এই ফকিরুদ্দীন নামের জোয়ান নদী সাঁতরে ওপার গেল। মাঝিরা প্রথমে টেরা জওয়াব দিল। কথা বলেই না, বললেও তা

www.amarboi.org

বক্তৃতাপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত ওরা নরম ভাষায় কথা বলতে লাগল। সলীম ১৫ মিনিট এদের মাঝে বক্তৃতা দিল। সকলের চোখে পানি এসে গেল। এই বক্তৃতা ওদের মাঝে অপূর্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। জনৈক মাঝি বলে ফেলল— 'অভিসম্পাত এ রোজগারের প্রতি।' সে নৌকার দড়ি খুলে সলীমের কথা আওড়াচ্ছিল, কওমের ইয্যত বরবাদ হচ্ছে আর আমরা জাহান্নামের আগুন দ্বারা উদরপূর্তি করছি।

জনৈক বৃদ্ধ লোক হুক্কা নদীতে নিক্ষেপ করে বলল— জনাব! মুসলমানদের পয়সা আমাদের জন্য শুয়োরের গোশততুল্য। সাদেক ওঠো। নয়ত তোমার হুক্কাও ভেঙ্গে ফেলব। কিছুক্ষণ পর পাঁচটা নৌকা ওপারের উদ্দেশ্য কূলত্যাগ করল।

মোটা তাগড়া কুশ্রী এক লোক পেরেশান হয়ে কখনও নিজের সঙ্গীদের প্রতি আবার কখনও সলীমের দিকে তাকাচ্ছিল। এ সময় সাদা গোঁফধারী জনৈক লোক ওখানে আচম্বিতে আবির্ভূত হল। বলল— কি হচ্ছে এখানে? দিনের বেলা এদের নৌকা নামাতে বলছে কে?

কুশ্রী লোকটা জবাব দেয়— চৌধুরীজী! এ লোকটা দারোগার চেয়েও অধিক প্রভাব ফেলেছে আমাদের ওপর।

চৌধুরী সলীমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। বলল— এরা কারো নওকর নয় যে, দিনভর কিশ্‌তি ঠেলবে। শিখরা ওপারে হামলা করলে কে এদের বাঁচাবে?' অতঃপর সে কিনারার দিকে তাকিয়ে বলল— ওই হারামজাদার দল! নৌকা ভেড়া!

ঃ হারামজাদা ওরা নয় তুমি।' কানের নীচে মেশিনগানের নল ঠেকিয়ে শক্ত অথচ শান্ত কণ্ঠে বলল সলীম। চৌধুরীর জনাপাঁচেক সাথী তেড়ে আসতে চাইলে দাউদের পিস্তল দেখে ওরা থমকে দাঁড়াল। চৌধুরীর আপাদমস্তকে ভূমিকম্প।

সলীম বলল— তোমার মত জাতীয় দুশমনের যিন্দা থাকার অধিকার নেই। আফসোস, তোমাকে ঘায়েল করার মত ফালতু বারুদ নেই আমার কাছে, জানি, তুমি লাঠির ভাষায় কথা বলতে জান। কিন্তু তারপরও তোমাকে একবার সুযোগ দিতে চাই। দ্বিতীয়বার তোমাকে এদিকটায় দেখলে মেশিনগানটা চুপ থাকবে না। বদমাশের এ দল তোমায় রক্ষা করতে পারবে না। জনগণ থেকে অর্জিত এক কানাকড়ির হিসাব দেয়া লাগবে তোমায়। যাও, বদমাশ! দূর হও।

চৌধুরী ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা দ্বিতীয়বার মুখ করে তাকানোর সাহস পেল না। দাউদ একটা ফাঁকা গুলি করল। ওদের চলার গতি বেড়ে গেল আরো এক ধাপ। কুশ্রী মাঝি কিনারায় নৌকা ভিড়িয়ে আস্তে বলল— আসুন জনাব।

নৌকা তখনও কূল থেকে অনেক দূরে। শরণার্থীরা বাল-বাচ্চা ও মাল-মাত্তা সহ দাঁড়িয়ে যায়। কিছু লোক হাঁটু পানি আবার কিছু কোমর পানিতে নামে প্রতিযোগিতামূলক। মাঝিরা এ দৃশ্য দেখে নৌকা দূর নদীতেই থামিয়ে দেয়। সলীম ও দাউদ নৌকা থেকে নেমেই লোকদের ধাক্কা দিয়ে কূলে ওঠায়। ওদের মধ্যকার পুলিশ শ্রেণীর লোকজন এ সময় খুবই কার্যকরী ভূমিকা নেয়। তারা লোকজন সরিয়ে কূল কিছুটা গ্যাঞ্জামমুক্ত করে।

www.amarboi.org

সলীম তীরে নেমে সকলকে বোঝায়— দেখো! তোমরা ধৈর্য ধারণের গ্যারান্টি না দেয়া পর্যন্ত একটা নৌকাও ছাড়বে না। তোমাদের হৈ-হুল্লোড়ে একটা নৌকা ডুবে গেছে ইতোমধ্যে। তোমরা এমনটা করলে একটা লোকও সুস্থে ওপারে পৌঁছতে পারবে না। সর্বাগ্রে আমরা নারী-শিশু ও যখমীদের পার করব। এরপর আসবে অন্যদের পালা। আমি এখনও নৌকা ছাড়ার যিম্মা নিতে পারি, কিন্তু তাতে মাঝিদের কাজে বিঘ্ন ঘটবে। তোমাদের একিন দিয়ে বলছি, একটা লোকও এপারে থাকতে আমি নিজে ওপারে যাব না। এ একিনও আমার আছে যে, এ সাথী (দাউদ) তোমাদের ছেড়ে পালাবে না। আমরা জীবিত থাকতে শিখরা এদিকে আসতে পারবে না।

✪ ✪ ✪

বিকেল পাঁচটা।

চোখ বুজে মজীদ বিছানায় শায়িত। সলীম ওর পাশে খামোশ দাঁড়িয়ে। আবেদা বলল— ওনাকে জলদি পার করে দিন। বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন উনি।

সলীম কোন প্রকার জবাব না দিয়ে ওর নাড়ীতে হাত দিল। মজীদ চোখ খুলল। সলীম বলল— নারী-শিশু নিয়ে নৌকার প্রথম বহর গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে। মজীদ বলল— সলীম! তুমি যাও। আমি এখানে থাকব। আমার চিন্তা করো না! সলীম হয়রান হয়ে বলল— মজীদ! তুমি ভাবতে পারলে, তোমাকে ছেড়েই আমি নৌকায় চাপব?

মজীদ বন্ধুয়ানা সুরে বলল— ভাই! ক্ষেপছ কেন? আমি তোমাকে পাকিস্তান যেতে বলিনি। আমার মতলব, তুমি ডাঃ শওকতের বাড়ী যাও। আমার খেয়াল ছিল, এখানে এসে প্রথম ওদের বাড়ী যাব। কিন্তু হায়! আমার যদি সামান্যতম শক্তি থাকত! এখন তুমি যাও। জানি, তোমার ছিল দেমাগ ওই বাড়ীতেই কেন্দ্রীভূত। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তাদের নিয়ে আসতে পারবে।

সলীম বলল— মজীদ! দাউদ ও বশিরকেও তোমার সাথে নাও। দাউদ তোমাকে নদী পার করে ডাক্তারের কাছে সোপর্দ করে আসবে। সফরের উপযুক্ত হলে তুমি বোন আমেনার ওখানে যাবে। তোমার জন্য আমি ঘোড়া পারাপারেরও ব্যবস্থা করছি।

এরপর সলীম আবেদা ও তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল— আপনারাও তৈরী হোন। আবেদার মা বললেন— বেটা! নারওয়ালে আমার কুটুম আছে। তোমার ভাইকে ওখানে নিয়ে যাব। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের হেফাযতে থাকবে। নারওয়ালে ভালো ডাক্তার না মিললে শিয়ালকোটে আমার ভাই আছে, ওখানে নিয়ে যাব। ওর মা-ই মনে করতে পার আমাকে!

সলীম মজীদের দিকে তাকালে সে বলল— সময় নষ্ট করো না সলীম! এ আগুন থেকে যাকে পারো বাঁচাও। জানি, আমায় তুমি ছেড়ে যেতে পারবে না। আমি ওদের সাথে যেতে পারব। বশির একাই আমার সাথে থাকলে যথেষ্ট। দাউদের এখানে দরকার। এখানকার প্রতিটি লোকের জীবন আমাদের নিজেদের জীবনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

www.amarboi.org

এক ঘন্টা পর সলীম ও দাউদ মজীদ, বশির, আবেদা ও তার মাকে আল-বিদা জানাচ্ছিল।

মজীদ ঘোড়পৃষ্ঠে আর বশির ওর লাগাম ধরা। রুখসত কালে মজীদ ভেতর পকেট থেকে পিস্তল বের করে সলীমকে দিয়ে বলল— নাও! এটাও কাছে রাখো। বারুদ খতম হয়ে গেলে ফেলে দিও না। পাকিস্তানে এর জরুরত পড়বে।

ক্যাম্পের হাজারো মানুষকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে সলীমের যেতে মন চাইল না। দাউদ ছাড়া কেবল ওই তিনজনের কাছে মনের এরাদা যাহির করল সলীম যারা এলাকা থেকে ওর সাথে এসেছিল। অন্যান্য লোকদের জমায়েত করে ও বলল— ঘন্টাখানেকের জন্য আমরা বাইরে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে ওদের দেখভালের দায়িত্ব তোমাদের। ফিরে না এলে দেখে রেখ ওদের। খবরদার এদের রেখে পালিও না। আমি তোমাদের থেকে এমন ওয়াদা নিতে চাই যে, ক্যাম্পের মধ্য থেকে এমন লোক তালাশ করো, যারা নৌকা চালাতে জানে। মাঝিরা হাঁপিয়ে উঠলে তারা যেন বৈঠা ধরতে পারে। আমাদের কাছে গোলা-বারুদ খুবই কম। সাবধানে খরচা করো এগুলো।

জনৈক পুলিশ কনস্টেবল বলল— আমরা আত্মসম্ভ্রমবোধহীন নই। যখন আমাদের হাত খালি ছিল তখনও নারী-শিশুদের ছেড়ে পালাইনি। এক্ষণে আমাদের হাতে রাইফেল। যতক্ষণ হাত কাটা না হচ্ছে ততক্ষণ লড়ব। তবে আপনার এখানে থাকা দরকার ছিল। আপনার স্থলে অন্য কেউ গেলে হয় না?

ঃ না।

ঃ তাহলে আরো কিছু লোক নিয়ে যান না?

ঃ না, আর কারো দরকার নেই।

আরেক লোক বলল— আপনি যাচ্ছেন কৈ?

ঃ এখানে দশ-বার মাইল দূরবর্তী এক জনপদে। এবং ওখানে....ওখানে!' সলীমের গলা বসে গেল। আসমানের দিকে হতাশ হয়ে দৃষ্টি ফেরাল ও।

আচমকা সলীম একটা ঘোড়ার রশি খুলে তাতে চেপে বসল।

ঃ 'সলীম দাঁড়াও! দাঁড়াও!' দাউদ ওর ঘোড়ার লাগাম ধরে বলল— 'তুমি একাকী যেতে পারবে না।'

ঃ জলদি এসো দাউদ!'

এক মিনিটের মধ্যেই দাউদও ওর তিন সাথী ঘোড়ায় চাপল। ওদের চলার পথে জ্বলে যাওয়া বস্তির পর বস্তি চোখে পড়ল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিকৃত লাশের স্তূপ। এদের কারো মাথা কাটা। চিল-শকুন ভিড় জমিয়েছে। ভারতের হিংস্র হায়েনারা প্রয়োজনের চেয়েও বেশী শিকার করে ফেলেছে। ওরা হয়ত পরস্পর বলাবলি করছে— আমরা চেঙ্গিস ও হালাকু খানের দাওয়াতকে উপেক্ষা করেছি। দস্তরখানে আমরা যতগুলো তাজা মাথা পরিবেশন করতে পারব ততগুলো পারেনি তারা। হালাকু ও চেঙ্গিস মেজবানীর আদব জানত না। ওরা কখনওবা আমাদের ওপর লৌহ পোষাকাচ্ছাদিত লাশ ছুঁড়ে মারত। ওদের লৌহ বর্মের দরুন আমাদের কাজে বিঘ্ন

www.amarboi.org

ঘটত। কিন্তু আমাদের এ মেজবানদের পরনের টুকরো করে পোষাকও ছিঁড়ে শত টুকরো করা হয়েছে। অতঃপর আমাদের ওই কাপড় কেটে টুকরো দেয়া হয়, যাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়। চেঙ্গিস আর হালাকু কোন নারীকে কতল করেছে বলে ইতিহাসে প্রমাণ নেই, কিন্তু ভারতীয় হালাকুরা নারী-শিশু হত্যায় আজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ও হো! সেটা তো ছিল তথাকথিত মধ্যযুগ, আর এখন? এখন বিংশ শতাব্দীর চোখ ধাঁধানো চরম উৎকর্ষের পরম যুগ। এখন ভারত মাতার সন্তনরা গাধা-মেযাজ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। বল— ভারত মাতার জয়!'

পথিমধ্যে এমনও লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হল, যারা নদীর দিকে রোখ করছিল। সলীম ঘোড়া থামিয়ে ডাঃ শওকতের হাল-হকিকত জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু কারো যেন হুঁশ নেই। সবারই অবস্থা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'। সাধারণত ও এদের থেকে এ ধরনের জবাব পেত—

ঃ আমার বাপ অন্ধ। তাকে ওই জায়গায় রেখে এসেছি।' প্রলাপ বকত কেউ এমন।

ঃ আমার এতটা সন্তান ছিল। তন্মধ্যে কিরণ-এ ডুবেছে এক। বাদবাকীরা অপর কিনারে।

ঃ আমি আমার খান্দানের লাশ দাফনও করতে পারিনি।

ঃ ঘরের কাউকে চিনিই না আমি।

ঃ পথিমধ্যে তোমরা আমার বোনকে দেখেছ কি? ওর দোপাট্টার রং ছিল এমন। চেহারার কাটিং এই।

ঃ সামনে যেও না। কিছুতেই নয়!

একটি জনপদের নিকট দিয়ে চলতে গিয়ে ওরা নারী-শিশুর আর্তনাদ শুনতে পেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। লাগাম কষল সলীম। ওর এক সঙ্গী বলল— প্রতিটি জনপদেই এখন এ আর্তনাদ। সন্ধ্যা হয়েছে। সকলকেই আমরা বাঁচাতে পারব না। সর্বাগ্রে ওদের খবর নেয়া দরকার।

ঃ না! আমরা এদের উপেক্ষা করে চলে যেতে পারি না।' বলে সলীম ঘোড়ার গতি সেই জনপদের দিকে ঘোরায়।

সেখানকার লোকজন মকানের ছাদে চড়ে হামলাবাজদের ওপর ইষ্টক নিক্ষেপ করছিল। শিখ কর্তৃক ওরা অবরুদ্ধ। কিছুদূরে জনৈক শিখ ফায়ার করছিল। দাউদের মেশিনগান গর্জে উঠল। এক শিখ মুখ থুবড়ে পড়ল। অপর একজন পালাল। সলীম ঘোড়া হেঁকে সামনে অগ্রসর হতে হতে গুলি চালাল। পালাল কাপুরুষের জাতি। লাঠি ও কুড়াল সজ্জিত মুসলমানরা নানা ধ্বনি দিয়ে উঠল। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে ওরা আগন্তুকদের সংবর্ধনা জানাল। অন্যান্য নারী-পুরুষও ঘর ছেড়ে এদের শোকরিয়া জানাল। কিন্তু সলীম ও সঙ্গীরা এগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল। লোকেরা প্রশ্ন করছিল— কারা এরা? দাঁড়ান না কেন এতটুকু? কেন সুযোগ দিল না আমাদেরকে শোকরিয়া জানানোর?

জনৈক শ্বেত-শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট বৃদ্ধা ওদের বোঝাল— এরা রহমতের ফেরেশতা। পাকিস্তানের সেপাই।

www.amarboi.org

ওই জনপদের দেড় মাইল অতিক্রম করার পর সলীম চৌরাস্তার মোড়ে ঘোড়ার লাগাম কষল। সঙ্গীদের করল ইশারা। বলল— আমার ধারণা, এ সেই সড়ক, যা গিয়ে পাকা রাস্তার সাথে মিশেছে। এবার আমাদের ডানে মোড় নিতে হবে।

দাউদ বলল— রাত হয়ে আসছে। আমাদের শান্ত হওয়া দরকার।

কাছ থেকে মোটরের আওয়াজ ভেসে আসছে।

দাউদ বলল— আমরা সড়কের বিলকুল কাছে এসে পড়েছি।

সলীম বলল— তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখে ফিরব আমি। এতে আমার আন্দায হয়ে যাবে।

সলীম ঘোড়ার গতি পরিবর্তন করছিল, এমন সময় ওর এক সাথী বুলন্দ আওয়াজে বলল— দাঁড়াও! বোধহয় কোন সওয়ার আসছে।

স্বচ্ছপথে ঘোড়ার ক্রমাগত খুরধ্বনি অপ্রত্যাশিত এক পরিস্থিতির সম্মুখীন করল সলীম ও ওর সঙ্গীদের। সন্ধ্যার আবছা আলোয় সওয়ারকে দেখল ওরা। সঙ্গীদের বন্দুক এম করতে দেখে সলীম বলল— দাঁড়াও! সম্ভবত সে কোন মুসলমান। এক শিখের পক্ষে ৫ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব নয়।

খানিক পর ঘোড়ার পিঠে ২০/২২ বছরের এক নওজোয়ানকে দেখা গেল। খালি পা ও খালি মাথা তার। এক হাতে লাগাম অপর হাতে বর্শা। ঘোড়া আগন্তুকদের কাছে এনে লাগাম কষল জোয়ান। কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়া সে বলল— তোমরা আমাদের জনপদ রক্ষা করেছ। তোমাদের এ ইহ্সানের ভাষা নেই আমার কাছে।

সলীম বলল— আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। তোমাদের ওপর ইহ্সান করিনি।

ঃ আমি জানতে এসেছি, এ বন্দুক তোমরা পাও কোথায়? গাঁয়ের জনৈক শিখের বন্দুক হস্তগত হয়েছে আমাদের। আরো ৫/৬টা বন্দুক পেলে আমৃত্যু লড়াই করতে পারব আমরা। অর্থের বিনিময়ও তা কেনা গেলে বধূ-মাতাদের অলংকার বেচতেও আমাদের দ্বিধা নেই।

ঃ হায়! পাঁচ মাস পূর্বেই যদি এমন ভাবনা শুরু করতাম আমরা!

নওজোয়ান ঠোঁট কামড়ে বলল— পাঁচ মাস পূর্বে তো আমরা ধারণাও করতে পারিনি যে, এভাবে প্রতারণার শিকার হতে হবে। এলাকার লিডাররা ঘোষণার একদিন পূর্বেও বলেছেন, আমাদের এলাকা পাকিস্তান-এ পড়বে। শিখ-হিন্দুর তুলনায় আমরা দ্বিগুণ। কিন্তু এসব কথায় এখন লাভ কি? আমাদের বন্দুক চাই। বিনিময়ে যা লাগে-প্রয়োজনে দেব তাও। আমাদের সম্ভ্রমবোধ ওদের সামনে থেকে কাপুরুষোচিত পশ্চাৎপদ হতে দিতে নারাজ। তোমরা ক'টা ফায়ার করলে, ওরা পালাল, খোদার দিকে চেয়ে বলো, বন্দুক পাই কৈ? এই নাও আমার বিবি, বোন ও মায়ের অলংকার। তোমরা পাঁচটা বন্দুক কালেকশন করে দিতে পারলে গ্রামের সমস্ত মহিলাদের স্বর্ণালঙ্কার এনে দেব।'

নওজোয়ান পকেট থেকে একটা অলংকার থলে বের করে সলীমের সামনে মেলে ধরল।

www.amarboi.org

সলীম বলল— ভাই আমার! কোথায় যেন তোমার বুঝায় ভুল আছে। আমরা কওমের ইয্যতের সওদা করতে আসিনি। বন্দুক বিক্রির হীন উদ্দেশ্যও নেই আমাদের। এক্ষণে বন্দুক হাসিল করতে হিম্মতের দরকার। এ বন্দুক আমরা শিখ ও হিন্দুস্তানী ফৌজের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। নাও, ভরা আছে এটি। এক্ষণে আর গুলি নেই। এটা যথার্থ ব্যবহার করো। করলে পাঁচটি গুলির বিনিময়ে পাঁচটা বন্দুক হাসিল করতে পার। তুমি এখন যেতে পার। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ঃ আপনারা কোথায় থাকেন।

ঃ ডাক্তার শওকত কি তোমার পরিচিত?

ঃ তাকে কেই বা না চেনে?

ঃ তাদের জনপদে যাবার রাস্তা কি এটাই?

ঃ না! সে রাস্তা আগে বাড়লেই পাবেন। কিন্তু আপনাদের সে চিন্তা না করলেও চলবে। আমিই না হয় পৌঁছে দিলাম।

ঃ তুমি যাবে আমাদের সাথে?

নওজোয়ান মুচকি হেসে বলল— বন্দুক হাসিল করার চেয়ে আপনাদের সাথে থাকা ভালো।

ঃ আপনারা কোথেকে এসেছেন? প্রশ্ন তার।

ঃ গুরুদাসপুর থেকে।

ঃ আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। ওহ্! ইলেকশনের দিনে।

ঃ হ্যাঁ! ওই সময় আমি এদিক এসেছিলাম।

ঃ সলীম আপনার নাম?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ আমীর আলী আমার নাম। দিনদুয়েক আপনার সাথে ছিলাম। ডাক্তার সাহেব আপনার আত্মীয় বুঝি?

ঃ হ্যাঁ! কিন্তু ওই জনপদ আর কদ্দুর?' সলীম আলোচনার মোড় ঘুরানো জরুরত মনে করল।

ঃ ক্রোশখানেক।

সলীমের মনের কম্পন বাড়ল। কল্পনার রঙ্গিন পেখম মেলে চলে গেল বিলীয়মান অতীতের ছায়াঘেরা পাখিডাকা পল্লীতে। কখনও সেখানে ভেসে উঠছিল ইসমতের কৃতজ্ঞতার অশ্রু। কখনওবা ভেসে আসছিল ওর কলিজা বিদীর্ণকারী আর্তনাদ। কখনও বা কল্পনায় দেখছিল, ওরা খোলা উঠানে জড় হয়ে ওকে নানান প্রশ্ন করছে।

ঃ 'দাঁড়ান।' আমীর ঘোড়া থামিয়ে আচমকা বলে উঠল।

চকিতে লাগাম কষল সলীম। আমীর আলী ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে বলল— এদিকে তাকান!

সলীম ওর থেকে বেশ সামনে অগ্রসর হয়েছিল। আস্তে ওর কাছে এল। যমীনে একটা পতিত লাশ। টর্চ বের করে ফোকাস মারে সলীম। দাউদ ঘোড়ার থেকে নেমে বলল— এ লাশ আজকের নয়। দুর্গন্ধ আসছে!

www.amarboi.org

আমীর আলী বলল— এদিকে দেখুন! ওই যে ডাঃ শওকতের জনপদ। ওই উঁচু ঘরটাই ডাঃ শওকতের হাবেলীর নিদর্শন।

সলীম আশাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলল— গ্রাম সম্পূর্ণ নিরাপদ। আগুন দেখা যাচ্ছে না। হল জলদি করো!

ঃ আস্তে চালান ঘোড়া। দুশমন জনপদের বাইরে ওঁত পেতে থাকতে পারে। কদ্দুর চলার পর আরো কিছু লাশ দেখতে পেল ওরা। আমীর আলী ঘোড়া থামিয়ে ভারাক্রান্ত সুরে বলল— আমার দোস্তের জনপদে হামলা হয়েছে।

ঃ 'না, না!' চিৎকার দিয়ে কথাটা বললেও সলীম ওকে বারণ করার চেয়েও নিজকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল বেশী।

খানিক পথ অগ্রসর হবার পর ওদের সামনে ডাক্তার শওকতের চার দেয়াল দেখা যাচ্ছিল। দেখা যাচ্ছিল ওই দেয়াল সংলগ্ন ছড়ানো-ছিটানো অজস্র লাশ।

আমীর আলী কবরস্থানের বরই গাছের নীচে ঘোড়া থামিয়ে বলল— 'ঘোড়া এখানে বাঁধুন। সামনে যাব আমরা। একজন থাকবে ঘোড়ার কাছে।' সলীম বলল— তোমরা দাঁড়াও এখানে। আমি যাচ্ছি।

আমীর আলী জবাব দেয়— আপনার হুকুমের বরখেলাফ করব না; কিন্তু আমাকে সাথে নিলে ভালো হয়। এই ধারণা করেন না যেন, আমি বন্দুক চালাতে জানি না। একজনকে ঘোড়ার কাছে রেখে সলীম আলীকে বলল— ওর রাইফেলটা নিয়ে পিস্তালটা দিয়ে দাও।

ডাঃ শওকতের বাড়ীর সম্মুখে কটা লাশ পড়েছিল। আঙিনার দরোজা খোলা; কিন্তু সলীমের অগ্রসর হবার হিম্মত নেই। কাঁপছে ওর হাত-পা, ঘামছে শরীর। ফটকের সম্মুখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে। ফটকের সম্মুখ উঠানে বিক্ষিপ্ত লাশ। চোখের সামনে সলীমের রাজপথের আখেরী মশাল যেন নিভে গেছে। ওর ভাবনাকাশের তারকাপুঞ্জ টক্কর খেয়ে যমীনে আছড়ে পড়ছে যেন এক এক করে। আশে পাশের বিক্ষিপ্ত লাশের নিস্তব্ধতা ওর জন্য অগ্নিশিখা, বন্দুকের আওয়াজ ও তলোয়ারের ঝনঝনানির চেয়েও ভয়ানক। ওর যবান নিথর। কিন্তু হৃদয়ের কম্পন ইসমত! ইসমত! ইসমত!!! বলে ডাকছিল। ইসমত নামটি জীবনের স্পন্দন ওর এখনও। উত্তেজনা বাড়ছে দ্রুত। ফুলে ফেঁপে ওঠে ওষ্ঠদ্বয়— ইসমত! ইসমত!!' চিৎকার দেয় সলীম। সহসাই ঢুকে পড়ে আঙিনায়। থলেতে টর্চের উপস্থিতি হাতড়ায়। ফোকাস মেরে ঝুঁকে ঝুঁকে লাশ নিরীক্ষণ করে। মুসলমানদের পাশাপাশি শিখদের লাশও দেখা গেল। এদিক সেদিক টর্চ মারতে মারতে একটি মুখের ওপর ওর নজর পড়তেই চমকে উঠল। লাশটি আমজাদের। দেহ থেকে হাত বিচ্ছিন্ন। শাহরগ এভাবে কাটা যেন শুইয়ে যবেহ করা হয়েছে ওকে। মাথা তরমুজের মত কেটে দু'ভাগ করা হয়েছে মাঝখান দিয়ে। সেই সুন্দর চোখ, নাক, এখনও স্মৃতি ছড়াচ্ছে। বলছে-দেখো! ভালো করে দেখো! আমি আমজাদ, ইসমত ও রাহাতের ভাই। আমি সেই মাসুম হাসি যার যিন্দেগীর ঠোঁট কেটে নেয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

বারান্দার একটা দরোজা ভাঙ্গা। করিডোরের ভেতর ও বাইরে বেশ কিছু লাশ পড়ে আছে। কম্পিত হাতে টর্চের বোতাম টিপল সলীম। লাশের অধিকাংশই বয়োবৃদ্ধা নারী। টর্চ বন্ধ করে ও। ওর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দুটো নামোচ্চারিত হয়— ইসমত। রাহাত!! এর জবাবে ভেতর থেকে কুকুরের আওয়াজ ভেসে আসে।

দাউদ বলল— হল, ভেতরটা দেখে আসি।

সলীম কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দাউদ ওর হাত থেকে টর্চ কেড়ে নেয়। বাহু ধরে ভেতরে টেনে নেয় ওকে। কামরায় এমনও অসংখ্য নারীর লাশ স্তূপীকৃত, যাদের চেনে না সলীম। অন্দরের দরোজাও ভাঙ্গা। বিবেকের মায়াবী শিরাতন্ত্রীটা সলীমের শিথিল হয়ে গেছে। ভয়ানক সব পরিস্থিতি ওর কাছে এক্ষণে তুচ্ছ। আচমকা দাউদের হাত থেকে টর্চ ছিনিয়ে নেয়। প্রবেশ করে বৈঠকখানায়। বৈঠকখানা শূন্য, জনমানবহীন। ফরাশে রক্তের ছাপ। ওপাশের কক্ষের দরোজাও ভাঙ্গা, করিডোরের শেষ মাথায়ও লাশের পর লাশ। তন্মধ্যে দুটো লাশ শিখ হামলাবাজদের, এর ঠিক অদূরে পতিত একটা লাশ দেখে সলীম চমকে ওঠে। উলংগ অসহায়ত্ব ও নিপীড়িত ওই লাশ যেন বোবা যবানে বলছে, আমার দিকে তাকিও না। এসো না আমার নিকটে। জগতের তামাম প্রদীপ নিভিয়ে দাও। চন্দ্র, সূর্য ও তারকাপুঞ্জকে বলো, চিরদিনের তরে নিষ্প্রভ হতে। এ অবস্থায় কেউ যেন আমার দিকে দৃষ্টিপাত না করে। দাউদকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় সলীম। বৈঠক খানায় অপেক্ষমাণ লোকদের থাকতে বলে ওখানেই।

এক মুহূর্ত পরে লাশের পিঠে টর্চ মারে। কক্ষের একটা দেয়াল-আলমারী খোলা। অবশ্য তাতে নেই কিছু। কিছু পরিধেয় বস্ত্র এলোমেলো। সলীম এর কোন রহস্যের তলা খুঁজে পায় না। পালঙ্কের স্ট্যান্ড ভাঙ্গা। অন্ধকারে পা ফেলে ও। আচমকা ওর পায়ে কি একটা ভারী বস্তু টক্কর খায়। অন্ধকারে ঝুঁকে হাতড়ায় ও।

বেরোনোর জন্য আনমনে টর্চ মারে ও। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হয়, এ লাশ হয়ত অপরিচিত কারো। হয়ত চিনতে ভুল করেছে ও। সিন্দুকের ডালি খুলে ফেলে। বেরোয় উৎকট গন্ধ। টর্চের আলো ফেলে আবারো সন্দেহ দূর করে ও। কিন্তু একি। এ যে ইসমত ও রাহাতের মা। চুলগুলো বিক্ষিপ্ত। চেহারা ক্ষত-বিক্ষত। চোখ নিমীলিত। ওই চোখে বিশেষ এক ধরনের আকুতি। বিশেষ এক পয়গাম। নিথর ওই দু'নয়ন জাতির পুত্র সন্তানদের বলছে—.

'আমি তোমাদের আত্মসম্ভ্রম— তা দ্বারা আমার সতীত্বের কসম খেতে পার। আমি সেই বোন যার কারণে দামেশকের প্রাসাদে কাঁপন ধরেছিল।

মোহাম্মদ বিন কাসিমের তলোয়ারকে কোষমুক্ত করেছিলাম আমিই। সিন্ধু বিজয় হয়েছিল আমাকে কেন্দ্র করেই। আমি সেই মা যার দুধপান করে তৃপ্ত হয়েছে সুলতান মাহমুদ গজনবী। সোমনাথ মন্দির ভাংতে উৎসাহ যুগিয়েছিলাম সেতো আমিই। আমি সেই অগ্নিকন্যা, যার শিরা-উপশিরায় তৈমুর লং-এর রক্ত প্রবাহিত। দিল্লীর লাল কেল্লা নির্মিত হয়েছিল আমার উপলক্ষে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তোমার বিজয় গীত গেয়েছি আমি। জাতি হে! দেখো আমি কে!!'

www.amarboi.org

আরেক নম্বর দিয়ে সলীম বেরিয়ে এলো। গোটা বাড়ীর কক্ষ পাতা পাতা করে তাল্লাশ করল সলীম প্রতিটি লাশের প্রতি ভ্রু-কুঁচকানো দৃষ্টি ফেলে। সঙ্গীরা ওর সাথে ঘুরতে থাকে। দাউদ ওর কাঁধে হাত রেখে ভারাক্রান্ত স্বরে বলে— সলীম! মনে হচ্ছে, তোমাদের জনপদের মত এই বাড়ীও মানুষের আখেরী আশ্রয়স্থল হয়েছিল।.... তোমাদের....!'

ঃ 'না, ইনি ওদের মা।' বলল কান্না জড়িত আওয়াজে সলীম।

ঃ হল সলীম!'

ঃ দাঁড়াও! আমি ছাদটা দেখে আসি। 'সিঁড়ির ধাপে পা রেখে বলে সলীম। সাথীরা নেয় ওর পিছু। ছাদে মুসলমানদের পাশা-পাশি তিন শিখের লাশ চিৎপটাং। ইসমত ও রাহাত ওখানে নেই। সলীমের ভরসার আখেরীস্থলও যেন টুটে গেছে। আসমানের দিকে তাকায় ও। সেখানে মেঘের আড়ালে সেতারার উঁকি। কালো মেঘখণ্ড এক সময় চাঁদকে গিলে নেয়। সলীম ওঠে চিৎকার দিয়ে আচমকাই

'আমজাদ! তোমার রক্তের শপথ! তোমার মায়ের বিক্ষিপ্ত চুলের দোহাই! এখন আর আমার হাত কাঁপবে না। পা টলবে না। চোখ কুঁচকাবে না। নাক কুঞ্চিত হবে না। শহীদানের আত্মা হে! দোয়া করো, তোমার খান্দানের জোয়ান বেটাদের শিরার খুন শুকায়নি। তাদের সীনায় প্রতিশোধ বহ্নি জ্বলছে ধিকি ধিকি। তারা এ পবিত্র মাটির মাহাত্ম্য ভুলবে না, তোমাদের রক্তে যার বুক ভিজেছে। যার ওপর তোমাদের বধূ-মাতার ইয্যত লুণ্ঠিত হয়েছে। যমীন, আসমানের মালিক। আমার হিম্মত দাও। আমি বিচার দিবসের এন্তেযারে।' বলে সলীম সেজদায় লুটিয়ে পড়ল।

যে আঁসু কোন মানুষের সামনেই বিসর্জন দেয়নি সলীম, এক্ষণে তা চোখ বেয়ে পড়তে লাগল অবিরাম। এগুলো ওরই আওড়ানো খানিক পূর্বের শব্দগুচ্ছের প্রতিক্রিয়া। আমীর আলী, দাউদ ও অন্যান্য সাথীরাও এক সাথে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

আচমকা শোরগোল কানে আসায় সলীম সচকিত হয়ে ওঠে। সকলেই সেজদা থেকে উঠে পড়ে। করতে থাকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি। শরাবে মত্ত মাতাল শিখদের এ চিৎকার।

আমীর আলী বলল— জনপদের বাইরে মান সিং-এর হাবেলীতে হবে হয়তবা একান্ত। আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। খবর নিয়ে আসছি আমি।

ঃ 'না, তা হয় না। আমরা সকলেই আসছি।' সলীমের হৃদয়ে নয়া কম্পন শুরু হল। আমীর আলী ওদের সামনে। গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলছে ওরা। হাবেলী যতই কাছে এগিয়ে আসছে ততই মদ্যপদের প্রলাপের পাশাপাশি নারী কণ্ঠের আর্তনাদও। ভেসে আসছে বাগানের ভেতরে পাইন গাছের প্রলম্বিত সারি। ওই বাগানের নিকটে এসে আমীর আলী হাতের ইশারায় সকলকে থামাল। নিজে চড়ল উঁচু পাইন গাছে। উঁকি-ঝুঁকি মেরে হাবেলী নিরীক্ষণ করে বলল— এর মধ্যে লোকসংখ্যা ৩০/৪০-এর বেশী নয়; কিন্তু বাইরের থেকে আরো লোক ঢুকছে। সামনের দেউড়িতে চ্যাপ্টা একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে। ওখানে অবস্থান করে ফায়ার করা যাবে।

www.amarboi.org

✪ ✪ ✪

ভেতর হাবেলীতে বিগত বারো ঘন্টায় অর্জিত বিজয়োল্লাস করছিল শিখ। ৩০/৪০ জন শিখ উঠানে বসে মদের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল। ৮/১০ জন শিখ মদ গিলে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছে। কেউ নাচছে, কেউ ধরছে অশ্লীল গানের ছত্র। এতে বাহ্‌বা দিচ্ছে কেউবা। দেয়ালের খুঁটিতে জ্বলছে টিমটিমে কুপি। নৃত্যশীল লোকেরা দু'জনকে এনে ওই কুপির সামনে দাঁড় করাল। অন্যরা হাসছে হো হো করে। মান সিং ঘরানার নারী মহল হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। এ দু'শিখ কাপড়ের বাড়তি ঝামেলা এড়িয়ে দিগম্বর সেজেছে।

জনৈক নারী চিল্লিয়ে বলল— ওদেরকে এই লোকদের সামনে হাজির করো!

ঃ মান সিং, তোমাদের দুলহানরা লজ্জাবোধ করছে। ওদের শরাব পান করাও।

ঃ হ্যাঁ, ভাই! শরাব আনো!

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ! শরাব চাই শুধু শরাব!

অন্যান্য শিখরা একথা সমর্থন করল।

জনৈক শিখ এক নারীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে বলল— এদিকে এক গ্লাস জ্ঞান সিং। দু'শিখ তড়পানো এক নারীর চুলের গোছা ধরে শরাব পানের কোশেশ করল।

নারী চিৎকার দিয়ে বলছে— কুত্তার বাচ্চা। শুয়োরের গোষ্ঠী। আমাকে মেরে ফেল— তাও ওই মল মুখে দিসনে!

ঃ 'দাঁড়াও! ও এভাবে পান করবে না।' জনৈক শিখ আগে বেড়ে নারীর বসন খামচানো শুরু করল।

দরোজার ওপাশ থেকে একটি বজ্রকণ্ঠ সকলকে হতবাক করল— যালেমের দল! 'খোদাকে ভয় করো। মান সিং! খোদাতায়ালা সব কিছু দেখছেন!'

ঃ 'আরে! কুত্তার জান দেখছি বড্ড শক্ত।' বলে মান সিং অগ্রসর হল। ডাক্তার! তুমি প্রায়ই নারী দেখে মায়াকান্না জুড়ে দাও। এবার তোমার মেয়েদের পালা। তোমার বিবির পরিণতি দেখে চিৎকার দিয়েছিলে। এবার তোমার মেয়েদের স্বাধীন খালিস্তান হচ্ছে। এখনো বলো, অলংকারাদি কৈ রেখেছ— তোমার মেয়েদের সতীত্ব রক্ষা পেতে পারে!

ঃ আমি সবকিছু তোমাদেরকে হাওয়ালা করে দিয়েছি!

ঃ বদমাশ! ওগুলো তোমার বিবির অলংকার। আমি তোমার মেয়েদের অলংকারের কথা বলছি। ওদের বিয়ের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক যে অলংকার গড়েছিলে— সেগুলো কৈ?

ঃ ওগুলো অমৃতসরে ফেলে এসেছি!

ঃ বহুত আচ্ছা ডাক্তার! মেনে নিলাম তোমার কথা। কিন্তু এক্ষণে তোমার একটা কথা মানতে হবে। এখনও তোমাদের মেয়েদের সতীত্ব লুণ্ঠন করা হয়নি। তোমার বিবির সাথে যে ব্যবহার হয়েছে, মেয়েদের বেলায় তা না চাইলে ওদেরকে বলো অমৃতের স্বাদ নিতে। আমি তোমার জামাই হতে প্রস্তুত। বড় মেয়ে আমার রাজরাণী

www.amarboi.org

আর ছোটটা সরওয়াল সিং-এর বউ হবে। তুমিও অমৃতের স্বাদ নাও ডাক্তার। আমাদের গ্রামে ডাক্তারের প্রয়োজন।'

ডাক্তার সাহেব চিৎকার করে বলেন— তোরা কুকুরের দল। শুয়োরের বাচ্চা। এক লোক লাঠি ওঠাল। মান সিং টেনে ধরল তার হাত। ধাক্কা দিয়ে পেছনে ঠেলে বলল— 'না, এখনই নয় জ্ঞান সিং। নীচতলা থেকে ডাক্তার-নন্দিনীদের নিয়ে এসো। একলোক খানিক পরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দু'যুবতীকে ভেতরে নিয়ে এল। মান সিং বলল— জ্ঞানীজী! অমৃতের পেয়ালা নিয়ে এসো।

জ্ঞানী বলল— সর্দারজী! ইতোপূর্বে ওরা অমৃত ফেলে দিয়েছে। এক্ষণে বোঝান।

ঃ আসুন জ্ঞানীজী! এবার ওদের আখেরী মওকা। এবার মদ ফেলে দিলে আমার কাছে মদ আছে। ডাক্তার! এখন সময় এসেছে। বোঝাও ওদের। মেয়েদের প্রতি না তাকিয়ে ডাক্তার সাহেব তাকান আসমানের দিকে। বলেন— পরওয়ার দেগার! এবার তোমার কাছে ইয্যতের মওত চাই।

যুবতীদ্বয়— 'আব্বাজান! আব্বাজান! বলে অগ্রসর হতে চাইলে মান সিং বাধা হয়ে দাঁড়াল। বলল— 'দাঁড়াও! এখনও অমৃতের স্বাদ নিলে তোমাদের বাবা বেঁচে যেতে পারে।

'ডাক্তার তোমাকে শেষবারের মত বলছি, ওদের বোঝাও।' ডাক্তার সাহেব বিড়বিড় করে দোয়া আওড়াচ্ছিলেন। মান সিং মদের পেগ যুবতীদের দিকে বাড়িয়ে বলল— নাও! পান করো। তোমাদেরকেও শেষবার বলছি। পান করবে না। দাঁড়াও! মজা দেখাচ্ছি। মাখন সিং! মাখন সিং!! সামনে এসো।

খর্বকায় মদ্যপ এক শিখ কক্ষে এল। যুবতীদ্বয় ভয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

মান সিং-এর ইশারায় সে এক যুবতীর চুলের গোছা ধরল, লেবাস খামচানো শুরু করল। অপর যুবতী তাকে বাঁচানোর কোশেশে সামনে এগোল। কিন্তু মান সিং মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরাল। যুবতী আপ্রাণ চিৎকার করছে। বাড়ছে ডাক্তারের দোয়ার শব্দ। আচমকা স্টেনগানের 'টর্ টর্' আওয়াজ হল। মাখন, মান সিং ও আশে পাশের ক'জন শিখ পাকা আমের মত যমীনে পড়ে গেল।

ঃ 'ওরা এসে গেছে। মুসলিম ফৌজ!' শিখরা দৌড়ে ফটকে এল। ফটক ভেতরে থেকে বন্ধ। গুলিবৃষ্টিতে ছিটকিনি খুলে আঁচ করতে পারল, বাইরের থেকেও কেউ ছিটকিনি আটকে দিয়েছে।

দেয়াল টপকে ভেতরে নামল সলীম। বলল— ফায়ার বন্ধ কর।' বন্দুকগুলো খামোশ হয়ে গেল।

সলীম ক'কদম আগে বেড়ে বলল— পলায়নের কোশেশ বৃথা। ফৌজ এই বাড়ী অবরোধ করে রেখেছে। তোমরা একখানে জমায়েত হও। বাড়ী তল্লাশি করব আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এসে যাবে। ওদের হাতে সোপর্দ করব তোমাদের। কিন্তু এর আগে কেউ হাত নাড়িয়েছ কি মরেছ।

www.amarboi.org

শিখদল আচানক হামলায় যতটা বিস্ময়াভিভূত, পুলিশের কথা শুনে কিন্তু ততটা আশ্বস্ত। ওই এলাকার দারোগা ওদেরই পথপ্রদর্শক। মহলের কোণ থেকে ৫/৬ জন লোক দেয়াল টপকানোর কোশেশ করছিল। সলীম স্টেনগানে হাত রাখল। মুহূর্তে পাঁচটা লাশের রক্তে আঙ্গিনা রক্তাক্ত হয়ে গেল। সলীম টর্চের আলো জ্বেলে অন্যান্য লোকদেরকে বলল— আর কারো পলায়নের ইচ্ছে আছে কি? জবাব না দিয়ে শিখরা এক কাতারে দাঁড়াল।

সলীম বুলন্দ আওয়াজে বলল— জমাদ্দার দাউদ! দু'জোয়ানের সাথে ভেতরে এসো।

সুবেদার আমীর আলী! তুমি এখানে ডিউটি দাও। কেউ উল্টোসিধে করলে একটার বেশী গুলি খরচা করতে যেও না। পুলিশ না আসা পর্যন্ত ওদের ছাড়ছি না।

দাউদও দেয়াল টপকে নামল। ফৌজি নিয়মে সলীমকে সালাম দিয়ে সামনে দাঁড়াল।

ঃ জমাদ্দার! তোমরা ওদের খেয়াল রেখ!

জনৈক শিখ বলল— সরকার! আমরা বে-কসুর! এসব নুষ্টামি মান সিং-এর।

ঃ এ কথা পুলিশকেই বলো। মান সিং কে?

ঃ মান সিং ওদিকে পড়ে আছে।

ঃ তার বাড়ীর আর কেউ?

ঃ এ তার ছেলে সরকার। আমরা বে-গোনাহ!

ঃ কে তার পুত্র? এদিকে এসো। জলদি। ভয় নেই।

ষোল বছরের এক কিশোর যে কিনা মদে মদে বুঁদ সামনে এল। সলীম উঁকি মারল। 'হল! আমাকে বাড়ী দেখাও!

ছেলেটা সামনে চলছে। দরোজার সামনে এক নারী হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে গেল— 'পরমাত্মার দিকে চেয়ে আমার পুত্রকে ছেড়ে দিন! আমি সবকিছু দিয়ে দেব আপনাদের। যত সোনা আছে আমার কাছে নিয়ে নিন।'

ঃ বন্দুক রেখেছো কোথায়?

ঃ ভেতরে। সিন্দুকের মধ্যে। ভগবান— আল্লার দিকে চেয়ে আমার বেটাকে মেরো না!

সলীম গর্জে উঠল— ভেতরে হল!

দালানের কুঠরিতে ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ হচ্ছিল। সলীম টর্চ বন্ধ করল। লঘু পায়ে সামনে অগ্রসর হল। কামরার সামনে এসে টর্চ জ্বালাল। দু'জন লোক সিন্দুক ভাঙ্গার কোশেশ করছে। সলীমের উপস্থিতি টের পেয়ে এক লোক তলোয়ার উঁচাল। কিন্তু ততক্ষণে মেশিনগান চিৎকার দিয়ে ফেলেছে। দুটো লাশ ফেলে তবেই ক্ষান্ত দেয় মেশিনগান। সলীম দালানের শার্সি খুলে বুলন্দ আওয়াজে বলে— দাউদ! আমি ঠিক আছি! তুমি ওদের খেয়াল রেখো।

মান সিং-এর পুত্র কুঠরীতে ঢুকে ভেতর থেকে দরোজা লাগিয়ে দেয়। সলীম দরোজা থাবড়াতে থাকে। ছেলের মা ওর আঁচল ধরে দেয় চিৎকার— গুরুমহারাজের কসম! ওই ঘরে কিছু নেই। আমার বাবাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের বন্দুক বের করে দিচ্ছি।

www.amarboi.org

সলীম কি ভেবে দরোজার ছিটকিনি বাইরে থেকে লাগিয়ে দেয়। মহিলাকে ও পাশের কামরায় ঠেলে দিয়ে বলে— জলদি করো!

দরোজা থাবড়ায় ওই মহিলা। সলীম টর্চ মেরে বলে— কি করছ তুমি?

ঃ সিন্দুকের চাবি তালাশ করছি— এই নিন। তাকে হাত রেখে বলে সে।

ইসমত ও রাহাত সলীমের গলার স্বর চিনতে পারে। কিন্তু শার্সি খুলে ফৌজি কায়দায় কমান্ড করলে ওরা মনে করে, এ বোধহয় অন্য কেউ।' কিন্তু জমাদ্দার ও সুবেদারকে আরো কিছু বলার পর রাহাত বলে, আপা! আমি নিশ্চিত, এ কণ্ঠ সলীম ভাইয়ার।

ঃ 'হ্যাঁ, রাহাত! হ্যাঁ! ও সলীমই।' ইসমত, রাহাতকে বোঝানোর চেয়ে নিজকে প্রবোধ দিচ্ছিল অধিক।

এরপর নিকটে এসে মান সিং-এর বিবির সাথে কথা বলছিল এবং দেয়ালে লটকানো লণ্ঠনের ম্রিয়মাণ আলোয় ওর চেহারায় তাকিয়ে ছেঁড়া-ফাটা লেবাছ গুঁজে রাহাত ইসমতের পেছনে লুকোবার কোশেশ করে।

মনের কল্পনারোধ করা দুঃসাধ্য হল ইসমতের। ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ফোঁপানো কান্না সংযত করার চেষ্টা করছিল ও। হাত উঁচু করে ওর দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছিল। বলতে সাধ করছিল, সলীম! সলীম!! তুমি এসেছ। আমি জানতাম তুমি আসবে। দোয়া করেছি। খাব দেখেছি। সলীম! সলীম!! আমার দিকে তাকাও। তুমি কি আমাকে চেন না?'

কিন্তু ওর পা স্থানচ্যুত হল না। কথা গেল আটকে কণ্ঠনালীতেই। এবার ও নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল— ও কি আমাকে চেনেনি? ও কি আমাকে দেখেনি?' তারপর আচমকাই নিপতিত এক শিখের তলোয়ার উঠিয়ে বাবার বাঁধন কাটতে থাকে। হাতের বাঁধনের পর পায়ের বাঁধন কাটছিল এমন সময় মেশিনগানের গুলি ভেসে এল। ইসমতের হাত থেকে কৃপাণ পড়ে গেল, রাহাত ভয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। এরপর সলীম যখন দাউদকে কমান্ড করে তখন ইসমতের অবস্থা বেতস পত্রের মত। পতিত কৃপাণ উঠিয়ে পায়ের বাঁধন কাটে এবার। রশির দুচ্ছেদ্য বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে ডাঃ শওকত মাথায় হাত রেখে বসে পড়লেন। রাহাত জড়োসড়ো অন্যান্য নারীদের কাছে গেল। কারো দিকে নিজ গায়ের ওড়না নিক্ষেপ করল। কারো কাঁধে হাত রেখে বসিয়ে দিল। ইসমত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেয়ালস্থ ল্যাম্প নিভিয়ে ফেলল।

ততক্ষণে সলীম মান সিং-এর বিবি থেকে দু'টো রাইফেল সিন্দুক থেকে উদ্ধার করে সেরেছে। একটি স্টেনগান, মেশিনগান ও প্রচুর গোলাগুলিও সংগৃহীত হয়। নীচের তাক থেকে একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল, আধুনিক রিভলবার ও ২০ কেজির মত কার্তুজ।

ওপাশের কামরায় সংগৃহীত মালমাত্তা ভরপুর। মানসিং-এর বিবি বলে চলেছে— খোদার দিকে চেয়ে আমার সবকিছু নিয়ে নাও। কিন্তু আমার বাচ্চাকে কিছু বলো না।

ঃ তুমি সব অস্ত্রই এখন পর্যন্ত দাওনি!

www.amarboi.org

ঃ গুরু মহারাজের কসম! মিথ্যে বলছি না। ওরা সব অস্ত্রই ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে ইতোপূর্বে। এগুলোই ছিল কেবল।

সলীম কাপড়ের ব্যাগ খালি করতে গিয়ে বলল— এই গোলা গুলো ওতে রাখো। দ্রুত!'

মহিলাটি কোন প্রকার টালবাহানা না করে সলীমের হুকুম পালন করল। টর্চের আলোয় সলীম গোটা কামরা অনেকবার নিরীক্ষণ করল। যেসব কাপড় ব্যাগ থেকে বের করা হল তার অধিকাংশই সিল্ক ও দামী কটনের। বিক্ষিপ্ত কাপড়গুচ্ছ থেকে একটা ছবি বেরিয়ে পড়ল। সলীম ঝুঁকে ছবির প্রতি নযর বুলিয়েই বলে ওঠল— আমজাদ, আরশাদ, ইসমত ও রাহাতের শৈশবের চিত্র।' মহিলা বারুদের জন্য আরেকটা ব্যাগ খালি করে দেয়। কাপড়গুলো ওতে ভরে দেয়।

ল্যাম্প হাতে ইসমত দরোজার কাছে আসে। টর্চ নিভিয়ে মেশিনগান ঠিক করে সলীম বলে— কে?

ইসমতের ফোঁপানো কান্না গুমরে বের হয়— আমি ইসমত!'

মেশিনগানের নল নীচে নেমে যায়। ইসমত দরোজায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকায়। কাপড়ের গাট্টি ওর দিকে বাড়িয়ে সলীম বলে— আমার ধারণা, রাহাত ও অন্যান্য নারীদের কাপড়ের প্রয়োজন। এগুলো নিয়ে যান।

স্যুটকেস হাতে নিয়ে সলীমের দিকে তাকায় ইসমত। ভারাক্রান্ত আওয়াজে প্রশ্ন করে–আপনাদের বাড়ীর লোকজন কোথায়?

জবাব না দিয়ে বারুদভর্তি বক্স উঠিয়ে করিডোরে রেখে ও বলে— আপনি স্যুটকেস রেখে আসুন, অতঃপর নেবেন এটা!

ইসমত বলল— কিন্তু আপনাদের বাড়ীর লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম?

ঃ 'ইসমত! কথা বলার সময় নেই।' ইসমত পুনরুচ্চারণের সাহস হারায়। একের পর এক স্যুটকেস বাইরে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়বারে ডাক্তার শওকতের সাথে আরো কিছু মহিলা এল। সলীমের নির্দেশে তারা এক একটা বাক্স ওঠাল।

বাইরে এসে সলীম ডাঃ শওকতকে বলল— ডাঃ সাহেব! নারীদের নিয়ে এক পাশে সরে যান আপনি।

ডাঃ অনুচ্চকণ্ঠে বললেন— ওদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। কারো কাছে পিস্তল থাকতে পারে।

ঃ 'সে চিন্তা আপনার করতে হবে না।' বলে একদিকে সরে সলীম শিখদের প্রতি মনোনিবেশ করল, তোমাদের মহিলাদের বল এক পাশে সরে যেতে। পুলিশ আসতে দেরী করছে। সকাল নাগাদ হয়ত তারা আসবে। এজন্য তোমরা ভেতরে ঢোক।

শিখরা কিছু বুঝতে না পেরে এদিক সেদিক তাকায়। সলীম বলে— জমাদ্দার সাহেব! তুমি ওদের ভেতরে ঢুকিয়ে দরোজা বন্ধ করে দাও। দরোজায় বসিয়ে দাও, দু'জনের পাহারা। ৮ জন গোটা হাবেলী পাহারা দেবে। আমি অস্ত্র ও গোলা-বারুদ বের করে নিচ্ছি। সুতরাং ওদের ভেতরে থাকায় তেমন একটা সমস্যা হবার কথা নয়।

www.amarboi.org

শিখদের মধ্যে শুরু হোল কানাকানি। দাউদ গর্জে ওঠল— বদমাশের দল! জলদি করো, নয়তো একজনকেও যিন্দা ছাড়ব না।

৮/১০ জন দরোজার কাছে গিয়ে পেছনে তাকাল।

সলীম বলল— জমাদ্দার! ওরা এভাবে বশ মানবে না। আমি ১–৩০ পর্যন্ত গুনব। এরপর তুমি গুলি চালাবে। পুলিশ আসার আগে মরলে সে দোষ ওদেরই।

সলীম গণনা শুরু করল ১-২-৩!'

মান সিং-এর বিবি চিৎকার দিয়ে ওঠল— ভায়েরা ভয় নেই! ওরা নিষ্পাপ লোকদের কিছু বলবে না। সন্ত্রাসীরাই ওদের টার্গেট। ওরা কেবল আমাদের সিন্দুক খুলে অস্ত্র নিয়েছে। গায়ে হাত দেয় নি। অন্যান্য শিখ নারীরাও এভাবে স্বামী, ছেলে ও বাবা-ভাইদের সাহস দিচ্ছিল।

সলীম ১০-১২ পর্যন্ত গুনতে ৮/১০ জন শিখ ভেতরে চলে গেল। ২৫ গোনা হলেই সকল শিখ ভেতরে ঢুকে গেল। দালানের ছিল দু'টো দরোজা। দাউদ একটি দরোজার দিকে এগোলো। স্টেনগান দেখিয়ে শিখদের ভেতরে ঠেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর এক সাথী দু'টো দরোজায় ছিটকিনি ঠুকে দেয়। ওই দুই দরোজার ছোট খাট একটা শার্সি ছিল। কিছু শিখ ওখান থেকে মাথা বের করে দেখছিল। আমীর আলী দেউড়ি থেকে নেমে জনৈক শিখের মাথা টেনে বের করে দেয়ালের নীচে ছুঁড়ে মারল। শিখরা ভয় পেয়ে ওই শার্সিপথও বন্ধ করল।

সলীমের সাথীরা খিড়কি পথে পেট্রোল ছিটাতে লাগলে মনি সিং-এর বিবি চিৎকার মেরে বলল— খোদার দিকে চেয়ে আমার হরিদীপকে টেনে বের কর।' সলীম তার হাত টেনে ধরল। জনৈকা মুসলিম যুবতী মান সিং-এর বৌকে ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিল। বলল— এই কুত্তির বাচ্চা আমজাদের লাশ বিকৃত করেছে, আর আম্মিজানকে ওর স্বামী...।' যুবতী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। এ যুবতীর নাম রাহাত।

দাউদ মান সিং-এর বৌ'র মুখে স্টেনগানের নল ঢুকালে সলীম বুলন্দ আওয়াজে বলে ওঠে— না, দাউদ! যুদ্ধে আমরা অন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারব না।

সলীম পেট্রোল ছিটানো খিড়কিতে জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে মারল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। অগ্নিশিখা যেন আসমানের সাথে কানাকানি করতে চায়।

শিখ-নারীরা কান্না জুড়ে দেয়। সলীম অগ্রসর হয়ে বলে— যে যমীনে তোমাদের কওম আগুন জ্বেলেছে সে যমীন তোমাদেরকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করবে না।

আচমকা কেউ ফটক খুলে পিস্তলের গুলি করল। একটা গুলি সলীমের বাহু ছুঁয়ে গেল, আরেকটা লাগল মান সিং-এর বৌয়ের বুকে। সলীম ও দাউদ এক সাথেই মেশিনগান ও স্টেনগান থেকে গুলি ছুঁড়ল। ফটকের আশপাশের অসংখ্য শিখ গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ইসমত সলীমের বাহু ধরে বলল— আপনি সুস্থ তো?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ইসমত!

www.amarboi.org

মহলে এক স্থানে অনেক পাথর জমা ছিল। উঠান থেকে মদের বোতল উঠিয়ে তাতে পেট্রোল মেখে সলীম ওগুলো ছুঁড়ে মারল। মুহূর্তে ওটা বোমের মতো বিস্ফোরিত হল। হাবেলীর ঘোড়াগুলো এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। সলীম বলল— হল দাউদ! ঘোড়াগুলো নিয়ে নাও। আমীর আলী! তামাম হাতিয়ার তোমার। আমরা ওর থেকে স্রেফ অর্ধেকটা নিলাম।

আমীর আলী জবাব দেয়— এ গোলাবারুদের দ্বারাই আমরা আশেপাশের গুরুদুয়ারের তামাম অস্ত্র জমায়েত করতে পারব।

ঃ তুমি স্টেনগান ও মেশিনগান চালাতে জানো কি?

ঃ আমাদের জনপদে জনাচারেক ফৌজ আছে।

ওরা হাবেলীর বাইরে বেরোলে ইসমত বলল— আপনি বাড়ী হয়ে এসেছেন কি?

ঃ হ্যাঁ!' হালকা জবাব সলীমের।

ঃ আপনি আম্মিজান ও আমজাদ...' আওয়াজ বসে গেল ওর।

ঃ সবকিছু দেখেছি। আরশাদ দিল্লী বুঝি এখনো?

ঃ জ্বি, হ্যাঁ!' ইসমত জবাব দেয়।

রাহাত সলীমের হাত ধরে বলে— ভাইজান! আমজাদ ও আম্মিজানের লাশ...!'

ঃ ওখানে অসংখ্য লাশ ছিল। তিনি কেবল একা নন। প্রতি কদমে লাশের স্তূপ দেখেছি আমরা। এ সেই পবিত্র আমানত, যা আমরা এ সরেজমিনে রেখে গেলাম।

ঃ ভাইজান! আপনার খান্দানের লোকজন?

রাহাতের প্রশ্ন এড়িয়ে সলীম ডাঃ সাহেবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল— ডাক্তার সাহেব! আপনি যখমী। তাই একটা ঘোড়ার পিঠে চাপুন।

ঃ না, আমি হাঁটতে পারব। তুমি ওই মেয়েদের...!'

ঃ সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। জনপদের বাইরে বেশ কিছু ঘোড়া আছে। ওখানে গিয়ে নারী-শিশুদের সওয়ার করা যাবে।

✪ ✪ ✪

জনপদের বাইরে যাদের ঘোড়ার পাহারায় রেখে গিয়েছিলো ওরা, তারা বড্ড পেরেশান অবস্থায় কালক্ষেপণ করছিল। চারটি তাজাদম ঘোড়া হওয়ায় ওদের কাছে মোট ৯টি ঘোড়া এক্ষণে। এজন্য কিছু ঘোড়ার পিঠে দু'জন করে নারী সওয়ার করানো হয়। যে সব ঘোড়া দাম্ভিক মনে হল, সেগুলোর লাগাম দেয়া হল পুরুষদের হাতে।

চাঁদ ডুবেছে। সেতারা ঢুকে গেছে মেঘের উদরে। আমীর আলী কাফেলার রাহ্বর। যে পথে শিখ হামলার সম্ভাবনা ছিল, সে পথ এড়িয়ে চলল সে। আমীর আলীর ঘোড়ার পিঠে ডাক্তার শওকত। এরা ওর গোলাবারুদ হেফাযত করে রাখছিল। সলীমের ঘোড়ায় ইসমত ও রাহাত। সলীমের হাতে লাগাম।

www.amarboi.org

নিজ জনপদে পৌছে সলীমকে লক্ষ্য করে আমীর আলী বলল— আমাদের বোনেরা ক্ষুধার্ত। উপকূলবর্তী ক্যাম্পে হয়ত কিছুই পাবেন না। তাই খানিক যাত্রা বিরতি করলে যা কিছু সম্ভব তা হাজির করব।

ঃ ভাই! এক্ষণে আমাদের হিম্মত হয় না। তোমাদের জনপদে অবস্থান করলে ওঠা মুশকিল হয়ে যাবে।

ঃ আপনাদেরকে ঘন্টাখানেকের বেশী অবস্থান করতে বলব না। ঘরে আচার ও মাখন আছে অতি অবশ্যই। বাসি রুটি না থাকলেও গরম রুটি সেঁকতে আধা ঘন্টার বেশী লাগবে না।

মহিলাদের নিরবতা তাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় খবর দিচ্ছিল। সলীম বলল— 'বহুত আচ্ছা।'

আমীর আলীর জনপদ থেকে খানা খেয়ে এরা দু'টোর দিকে ওখান থেকে রওয়ানা হল। আমীর আলী সকলকে ক্যাম্পে পৌছে দিয়ে ফিরে এল।

ক্যাম্পে আরো দু'হাজার মানুষের অন্তর্ভূক্তি হয়েছে। পাহারাদারদের সাথে কথা বলার পর সলীম জানতে পেরেছে, মাঝিরা রাত বারোটা পর্যন্ত নৌকা পার করেছে। পরিশ্রান্ত হয়ে ওরা এখন ঘুমুচ্ছে।

সলীম বলল— কিন্তু আমি বলেছিলাম, ওরা শ্রান্ত-ক্লান্ত হলে অন্য যারা নৌকা চালাতে জানে— তারা পারাপার করবে।

জনৈক পুলিশ কনস্টেবল বলেন— মিয়া সাহেব! কিছুক্ষণ পূর্বে সকলেই কাজ করেছে। ভুল হয়েছে আমাদের। আমরা তাদের স্ব স্ব বাল-বাচ্চা পারাপারের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু বাল-বাচ্চা ওপারে যেতেই তারা এদিকে ফিরেও তাকায়নি। ফকিরুদ্দীন মাঝি অনেক পরিশ্রম করেছে। আপনি আসার এক ঘন্টা পূর্বেও সে শেষ পালা পার করেছে। ক্লান্তিতে সে নেতিয়ে গেছে। আমিই তাকে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছি।

সলীম ডাক্তার শওকতকে লক্ষ্য করে বলল— ডাক্তার সাহেব! এই নারীরা এ মুহূর্তেই পার হয়ে গেলে আমি খুশীই হতাম। আমি যেয়ে নৌকা নিয়ে আসছি, সকলকে নিয়ে আপনি উপকূলে পৌছান।

ডাক্তার বললেন— সলীম! তুমিও কি কম ক্লান্ত! আরাম করো। সকালে দেখা যাবে।

ঃ না, ডাক্তার সাহেব! সকালে অনেক কাজ করতে হবে।

তাগড়া জোয়ান হয়েও দাউদ কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এতদসত্ত্বেও সে বলল— সলীম! নৌকা যদি এখনই আনা লাগে, তাহলে আমিই গিয়ে না হয় নিয়ে আসি। তুমি বড্ড ক্লান্ত।

ঃ আমি আমার ঘোড়ার সাথে নদী পার হতে পারব।

ঃ 'না, ভাইজান! এখন যাবেন না।' বলল রাহাত।

কিন্তু সিদ্ধান্তে অটল সলীম। ঘোড়ার লাগাম ধরল ও। নেমে গেল নদীতে। গভীর পানিতে নেমে ঘোড়ার জিনে হাত রাখল। মুহূর্তেই গেল অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে।

www.amarboi.org

এক ঘণ্টাও হয়নি তখন, ওর সাথীরা একটা নৌকা তীরে ভিড়তে দেখল। তীরে পৌঁছল নৌকা। দাউদ টর্চ মারল। ফকিরুদ্দীনের সাথে আরেক মাঝি। প্রশ্ন করে দাউদ— সলীম কি ওপারেই?

ফকিরুদ্দীন বলে— নৌকায় অচেতন পড়ে আছে সে। নৌকায় চড়েই শুয়ে যায়।

টর্চ মেরে দাউদ দেখল— সলীম নৌকার গলুইতে নাক ডেকে দিব্যি ঘুমুচ্ছে।

ফকিরুদ্দীন বলল— তাঁকে ওভাবেই থাকতে দিন। জাগ্রত করবেন না। সকালে আমার সাথে নিয়ে আসব। বড্ড শ্রান্ত উনি।

ঃ 'বহুত আচ্ছা। ডাক্তার সাহেব! আপনি নৌকায় উঠুন' বলে দাউদ ঝিমুতে ঝিমুতে যমীনে বসে পড়ল। দু'তিন বার হাই তোলার পর পা বিছিয়ে দিল। নারীগণ নৌকায় বসে গেল। ইসমত নৌকায় পা রাখতেই বাবাকে বলল— আব্বাজান! ওই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করুন!

ঃ সলীমের খান্দান সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারবেন?

দাউদ এ প্রশ্নের জবাবে ঢুলুঢুলু চোখ খুলে শুধু বললো- হামলা হলে আমাকে জাগাবেন।

ডাক্তার আবারো বলেন— দেখুন! আপনাকে সলীমের খান্দান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম!

ঃ ওখানে কেবল সলীমের খান্দান ছিল না। ছিল অগণিত মানুষের মিছিল। হামলা হলে আমাকে জাগ্রত করবেন।' বিড়বিড়িয়ে দাউদ চোখ বুজল। সলীমের অন্যান্য সাথীও নদী তীরে পৌঁছে শুয়ে যায়।

পুলিশ সেপাই বলল— ভালো খবর হলে সলীম খোদ্ আপনাদেরকেই জানাত।

ঃ তুমি কিছু জানো?

ঃ ভাই সাহেব! এটা শোনা কিংবা শোনানোর কাহিনী নয়। এরা আপনাদের জন্য কেবল ছাইভস্ম রেখে এসেছে।

মাঝি হাঁক ছাড়ছে। ডাক্তার সাহেব আর কিছু না বলে নৌকায় চাপলেন।

রাহাত ওর বাবার হাত ধরে বলল— আব্বাজান! কি বললেন উনি!

ঃ 'কিছু না!' ডাক্তার সাহেব ভারাক্রান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন।

✪ ✪ ✪

দূর আকাশে জমাট মেঘপুঞ্জ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। পার্শ্ব পরিবর্তন করে সলীম ঘুমাল। কে যেন ওর মাথায় হাত রেখে বলল— সলীম! সলীম!!

সলীম তার হাত ধরে বলল— মজীদ! জ্বালাতন করো না তো! এইমাত্র শুইলাম। চাচীজান! মজীদকে বারণ করুন।

ঃ সলীম! এখন ঘড়ির কাঁটা ৯-এর ঘর ছড়িয়ে ১০-এ।

ঃ বাজুক না দশটা। তুমি সর্বদাই আমাকে জ্বালাতন করো' বলে সলীম আবারো পার্শ্ব পরিবর্তন করে চোখ খোলে। নদী তীরের বালুচরে শায়িত সে। ডাক্তার শওকত, ইসমত ও রাহাত ওর পাশটিতে বসা।

www.amarboi.org

ঃ 'কোথায় আমি?' ঘাবড়ে প্রশ্ন করে ও। 'উহ্! স্বপ্ন দেখছিলাম বুঝি। খুব সম্ভব নৌকা নিতে এসেছিলাম। এরপর হয়ত নৌকাতেই ঘুমিয়ে যাই।'

চোখ খুলে এদিক ওদিক তাকায় সে। মাঝিরা ওপার থেকে নৌকা ভরে লোক পারাপার করছে। নিকটেই ওর ঘোড়া ঘাস চিবুচ্ছে।

ঃ সলীম, বেটা! তুমি নৌকায় শুয়েছিলে। এপার আসার পর নৌকার মাঝিরা তোমায় এখানে শুইয়ে দেয়!

ঃ আমাদের সাথের মা-বোনেরা...?

ঃ তারা এক কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেছে।

ঃ আপনারা যাননি কেন?

ঃ তুমি বড্ড ক্লান্ত ছিলে। ৮টার দিকে তোমাকে জাগাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তখন অচেতন। সামনের এক জনপদে নারীগণ আমাদের অপেক্ষা করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সাথে আমরা মিলিত হব। এখন ওঠো বাবা!

ঃ ডাক্তার সাহেব! আপনি আমার ঘোড়া নিয়ে যান।

ঃ 'ভাইজান! আপনি আমাদের সাথে যাবেন না?' প্রশ্ন রাহাতের।

ঃ না, রাহাত। ওদের ছেড়ে আমি যেতে পারি না!

ঃ আমিও যেতে চাই না সলীম! ওদের সওয়ারীর এন্তেযাম করেই ফিরে আসব।' ডাক্তার শওকত বলেন।

ঃ এ স্থান আপনার জন্য নয় ডাক্তার সাহেব। এ যাবত লাহোর ও অন্যান্য শহরে হাজার হাজার যখমী মানুষ উপনীত হয়েছে। ওখানেই আপনাকে কাজে লাগবে। এখানে আমাদের বন্দুক দরকার। পারাপারের জন্য দরকার অসংখ্য নৌকা। পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্ত্রী কিংবা নেতাদের সাথে মিলিত হয়ে ভালো কোন বন্দোবস্ত করতে পারেন, তাহলে বহুত বড় কাজ হবে। হিন্দুস্তান আজ না হলেও কাল হামলা করে বসবে। অন্যূন দুটো মেশিনগান ও এক প্লাটুন ফৌজ এলে আমরা ওদের সহজেই পার করাতে পারব। নেতাদের বলবেন, রাবীর কিনারস্থ ব্রীজে মুসলিম ফৌজের পাহারা দরকার। ডোগরা ও শিখদের হাতে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী প্রদেশে মুসলিম হত্যা চলছে।

ঃ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। তবে আমার যদ্দুর বিশ্বাস, পশ্চিম পাঞ্জাবের লিডাররা এক্ষণে গলাবাজিতে লিপ্ত। খোদাতাআলাই ভালো জানেন, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে কি পরিমাণ শরণার্থী পাকিস্তানে উপনীত হয়েছে। ওরা এদেরকে আশ্রয় দিতে পারলে সেটা হবে বীরোচিত কাজ।

ঃ আপনি মুসলিম সেনানিবাসেও যাবেন। অফিসারদের সাথে মত বিনিময় করবেন। বলবেন, বাউণ্ডারী ফোর্সের হিন্দু, শিখ ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ মুসলিম জাতির জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

ঃ বাউণ্ডারী ফোর্সের পরিকল্পনায় এমন এক ছক আঁকা হয়েছে যাতে, মাউন্টব্যাটেন, র‍্যাডক্লিফ, প্যাটেল ও মাস্টার তারা সিং-এর চিন্তাধারায় টক্কর না খায়।

www.amarboi.org

কিছুদিনের মধ্যে হয়ত বেলুচ রেজিমেন্টকেও পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বদলী করে দেয়া হবে।

ঃ ডাক্তার সাহেব! এ তুফান পূর্ব পাঞ্জাবের পর কাশ্মীর অভিমুখে ধেয়ে যাবে। কাশ্মীরের ব্যাপারে আগাম চিন্তা-ভাবনা দরকার। তাদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগ্রত করবেন! পূর্ব পাঞ্জাবে পাইকারী মুসলিম নরমেধযজ্ঞের উদ্দেশ্য কাশ্মীরের রাস্তা ছাফ করা ছাড়া কিছু নয়।

ইসমত তার বাবার হাত ধরে আপনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। ডাক্তার সাহেব বললেন— সলীম! জানি ওই প্রশ্নের জবাব দিতে তোমার তকলীফ হবে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আমি যেতে পারি না। এখন কোন সংবাদই আমার জন্য সহ্যের বাইরে নয়। বলো, তোমাদের জনপদ ছেড়ে কবে বেরিয়েছ, কি অবস্থা তোমার খান্দানের?

সলীম এক নিমিষে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার আবারো বললেন— রাহাত ও ইসমতের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছ তুমি, অন্যের সামনে এর পুনশ্চারণ করতে যাইনি আমি। ইসমতের মায়ের লাশ দেখে এসেছ তুমি। শিখদের জন্য কিছুই অসম্ভব নয়। সলীম! যা কিছু হয়েছে খোদার দিকে চেয়ে গোপন করো না!

ঃ আপনি কেবল এক ব্যক্তিসত্তার উপাখ্যান জানতে পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু এক্ষণে আমি কেবল ব্যক্তিসত্তা নই— এক কওম। কওমের কথা জানতে চান তো বলি, হতভাগ্য কওম রক্ত সাগরে নিমজ্জমান। এটাই আমার উপাখ্যান। ডাক্তার সাহেব! আমার কাছে জওয়াব থাকলে খামোশ থাকছি কেন?

সলীমের চোখে আঁসু জমছে। মুখ ফিরিয়ে আস্তিনে মোছে তা।

ডাক্তার সাহেব ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন— আঁসু বইতে দাও বেটা! হৃদয়ের তড়পানি কমবে কিছুটা এতে।

ঃ আমার অন্তরে কেবল আগুন। এক জ্বলন্ত চিতা আমি।' ডাক্তারের বাহুবন্ধন থেকে নিজকে ছাড়িয়ে দূরে বসে সলীম।

ইসমত ফোঁপানো কান্নার সুরে বলে— খোদার দিকে চেয়ে বলুন, ওরা কোথায় কেমন আছে? আপনার দাদী, মা, যুবায়দা এবং খান্দানের অপরাপর নারীগণ? আপনার বাবা, চাচা-চাচী, দাদা ও ইউসুফ...?

সলীম নিরুত্তর তাকায় ওর দিকে। ইসমত কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। পকেট থেকে রুমাল বের করল সলীম। ছাইয়ের একটা পুটলি বের করে ইসমতকে দিয়ে বলল— তাদের একটা স্মৃতিই অবশিষ্ট আছে আমার কাছে। এই ছাইয়ের মধ্যে তাদের যিন্দেগী লুকানো। আপনার কাছে রাখুন!

স্তম্ভিত সকলে ওর দিকে তাকালো। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার সাহেব বলেন— তাদের কেউই জীবিত নেই?

ঃ আমি ও মজীদ ছাড়া কেউই জীবিত নেই!

ঃ তোমার বাবা...?

www.amarboi.org

ঃ ছুটি নিয়ে আসছিলেন তিনি। রেল থেকে নামতেই তাকে শহীদ করা হয়।

ঃ মজীদ কোথায়?

ঃ যখমী ছিল ও। আমাদের জনপদের এক লোকের সাথে তাকে নারওয়ালে পাঠিয়েছি। ইসমত ভারাক্রান্ত সুরে বলল— আমেনা হয়ত শ্বশুরবাড়ী ছিল তাই না ?

ঃ হ্যাঁ। সে সেখানেই।

ডাক্তার, ইসমত ও রাহাতের প্রশ্নের জবাবে সলীম সংক্ষিপ্তভাবে ওর কাহিনী বলে গেল।

✪ ✪ ✪

বেলা ১১টা।

সলীম ওদেরকে খোদা হাফেয বলছিল। ডাক্তার সাহেবকে আপনার ঘোড়া দিতে কোশেশ করছিল সলীম, কিন্তু উনি বললেন— না! এর দরকার নেই। নারওয়াল পর্যন্ত আমরা পায়ে হেঁটে যেতে পারব। ওখানকার এক দোস্তের মোটর আছে। তিনি আমাদেরকে লাহোর পৌছে দেবেন।'

বিদায় বেলায় ডাক্তার বললেন— বেটা! তোমাকে এখন কিছু বলতে চাই না। তাও তোমার স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখার কথা না বলে পারলাম না। কওম তোমার কাছে যতটা প্রিয়, কওমও ততটা তোমার অস্তিত্বপ্রিয়। আচ্ছা, খোদা হাফেয।

রাহাত কাঁদতে কাঁদতে সলীমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল— ভাইজান! ওয়াদা করুন! আপনি জলদি ফিরবেন।

সলীম ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল— 'রাহাত আমার মিশন অতি দীর্ঘ। ইসমত করুণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাচ্ছে। রুদ্ধ ওর যবান। আঁসু গেছে শুকিয়ে। ও সেই জগত থেকে বহুদূরে, যেখানে হাসি-কোলাহল টইটুম্বুর। সলীমের কথা কানে গুঞ্জন করছে ওর এখনও— আমি এখন এক ব্যক্তিসত্তা নই— এক কওম।'

ডাক্তার আস্তে বলেন— হল ইসমত।

বাবার সাথে ক'কদম চলার পর ইসমত ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। সলীম ও ওর মাঝে আঁসুর আড় পড়ল।

আচমকা সলীমের কি একটা মনে হল। দ্রুত পকেট হাতড়ে বলল— দাঁড়ান! থামল ইসমত। পকেট থেকে একটা বস্তু বের করে বলল— আব্বাজান আপনার জন্য এটা বানিয়ে এনেছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি এটা আমায় দেন। ইসমত বাবার দিকে তাকায়। বাবার ইশারা ইতিবাচক দেখে কম্পিত হস্তে আংটি গ্রহণ করল ও।

অপর হাত ডাক্তারের প্রতি বাড়িয়ে সলীম বলল— ডাক্তার সাহেব! কিছু পুরানা নোট। পথে দরকার পড়বে।

ঃ না, বেটা! এটা তোমার কাছেই রাখো। পথিমধ্যে যা লাগবে— তা পেয়ে যাব।

ঃ 'আচ্ছা, খোদা হাফেয।' বলে সলীম উপকূলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

লোক নামিয়ে মাঝি নৌকা ছেড়েছিল, সলীম হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে ঘোড়াসহ উঠে পড়ল।

www.amarboi.org

ডাক্তার সাহেব বলেন— হল বেটি।

কাঁদতে কাঁদতে বাবার বুকে মিশে গেল ইসমত। ডাক্তার সাহেব ওর দীঘল কালো চুলে হাত বুলিয়ে বলেন— বেটি। হিম্মত করো। ও এক মুজাহিদ।

✪ ✪ ✪

নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার তুফান পূর্ব পাঞ্জাবে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানরা এ কিয়ামতের বিভীষিকা মোকাবেলায় প্রস্তুত ছিল না। হিন্দু ফ্যাসিজমের ক্রমাগত উত্থান ও ভারত বিভাগের পূর্বে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ও আকালী সেনাদের মাথাচাড়ার সুবাদে একথা বলা ভুল হবে যে, মুসলিম আওয়ামের মত তাদের নেতৃস্থানীয়রা ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা বিশ্ব দরবারে আপোষকামিতা ও শান্তির অন্বেষায় অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিলেন। হিন্দু কংগ্রেসের একতরফা পৃষ্ঠপোষকতায় যখন জনগণ সংঘবদ্ধ ও সশস্ত্র হচ্ছিল, তখন গালভরা বুলি আর শান্ত থাকার তালিম দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা নির্বিচার। আখেরী সময় পর্যন্ত তারা এ প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, দেশ বিভাগের মৌলিক নিয়ম-পদ্ধতি মেনে নেয়ার পর হিন্দুস্তানী প্রশাসন মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বজায় রাখবে। এটি আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ তো নয়। যখন তারা মাউন্টব্যাটেনকে পণ্ডিত নামের নেহেরু ও প্যাটেলের নৌকায় চড়তে দেখলেন তখন এ আত্মপ্রবঞ্চনা এক রকম বাধ্য-বাধকতা হয়ে দাঁড়াল। ১৫ আগস্টের পর চিরশত্রু ভারতের তলোয়ার বিশেষ উদ্দেশ্যে কোষমুক্ত হল এবং পাঞ্জাবের লিডাররা দেখলেন, প্রতিরোধের যে হাত উত্থিত হবার কথা— তা রিক্ত। মাউন্টব্যাটেনের হিন্দুঘেঁষা ভাব আর র‍্যাডক্লিফের বেঈমানী বর্বরতা তুফানের কোন দিকই বাকী রাখল না। ওদিকে পাকিস্তানের অবস্থা তখন এই যে, সেখানে অর্ধেকেরও বেশী অমুসলিম ফৌজ বিদ্যমান।

পূর্ব পাঞ্জাবের জনগণের সাথে লিডারদের গণসংযোগ ততক্ষণ বাকী ছিল যতক্ষণ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটপ্রাপ্তির প্রয়োজন ছিল। আর তখনও তারা আওয়ামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, যখন ইউনিয়নিস্টদের মন্ত্রিসভা বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। এরপর খুব কমই নেতা দেখা গেল যারা জনগণের সাথে সম্পর্ক রাখতে কোশেশ করেছিলেন।

১৫ আগস্টের পূর্বে, পূর্ব পাঞ্জাবের আওয়াম শিখ ও সেবক সংঘী জানোয়ারদের মোকাবেলা করে যাচ্ছিল। কিছু কিছু এলাকায় অমুসলিম ফৌজ আর পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও ওরা তেমন একটা সুবিধা করতে পারেনি। অমৃতসরে ফৌজ ও পুলিশের সংঘবদ্ধ হামলা আওয়ামের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও জাতির বীর সেনানীরা ছ'মাস ধরে আকালী সেনা, সেবক সংঘ ও সিভিল পোষাকের শিখদের হামলার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৫ আগস্টের পর পাঞ্জাবের অমুসলিম ফৌজ ও অমুসলিম আওয়াম একাত্ম হয়ে যায়। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে এক চাপরাশি আর কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা থেকে মামুলি রাজাকার পর্যন্ত সকলেই এক প্রোগ্রামে ঐকমত্য হয়েছিল। আর সেটা মুসলিম নিধন!

www.amarboi.org

পূর্ব পাঞ্জাবের গলাবাজ আপোষকামী শান্তির শ্বেত পায়রা উড়ানেওয়ালা নেতারা সপরিবারে দাঙ্গার পূর্বেই পাঞ্জাবে চলে যান। তারা লুণ্ঠিত মুসলিম কাফেলার খবর পর্যন্ত জানতেন না। আওয়ামের অবস্থা ওই ভেড়াদলের মত, হিংস্র ব্যাঘ্রের দল আচমকা হুংকার দিয়ে যাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জনতার যে দল ফৌজ ও পুলিশের গুলি থেকে বেঁচে যায়, তারা সড়ক, গলি, নদী আর ব্রীজে ওঁৎ পেতে থাকা রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ও শিখদের হামলার সম্মুখীন হয়। মুসলিম আবাদীর প্রভাবশালীগণ বিশেষ করে পাকিস্তান প্রবক্তাদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়।

আশ্রয়কামীদের গাড়ী লাশের স্তূপ নিয়ে পাকিস্তানে উপনীত হল। পূর্ব পাঞ্জাবের অমুসলিম রেলকর্মীরা শিখ জানোয়ারদের আগে ভাগেই এ খবর জানিয়ে রাখত যে, আজ অমুক গাড়ীতে মুসলিম শরণার্থীরা পাকিস্তানমুখো হচ্ছে। যাতে তারা যে কোন ষ্টেশনে ওঁৎ পেতে থাকতে পারে। এরা পুরুষদের হত্যা ও নারীদের বন্দী করে রাখত। হামলাবাজ হায়েনাদের পৌঁছুতে বিলম্ব হলে ষ্টেশন মাষ্টার গাড়ী ছাড়তে দেরী করত। যে শিখ, গুর্খা ও ডোগরা সেপাই সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকত— এ নারকীয় হত্যালীলায় শরীক হত তারাও। স্রেফ ওইসব রেল নিরাপদে পাকিস্তান উপনীত হতে পারত, যার গার্ড থাকতেন মুসলিম সেপাই।

দূর-দরাজের জনপদের মানুষের অবস্থা আরো করুণ, আরো ভয়াবহ। কোন এক বস্তিতে হামলা হলে মানুষ অন্যান্য নিরাপদ বস্তির উদ্দেশে ছুটে যেত। পথিমধ্যে তাদেরকে লোকেরা বলত— ওই বস্তিতে হামলা হয়েছে। সুতরাং তারা লোকজন সহ অন্য বস্তির উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এভাবেই তারা কখনও উত্তর, কখনও দক্ষিণ আবার কখনও পূর্ব-পশ্চিমে ছুটে যেত। এদের মধ্যে এমনও লোক ছিল যারা জানত না পাকিস্তান কোনদিকে? ওরা ছোটখাটো শিখ হায়েনা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকত। চারদিকেই আগুন ও রক্তের বন্যা দেখে উদ্‌ভ্রান্ত মানবতা নিকটতম শহরের উদ্দেশে কদম বাড়াত। কদমে কদমে তারা হামলার শিকার হত। ওদের পেছনে পড়ে থাকত বিশাল লাশের স্তূপ। শহরে গিয়ে দেখত সেখানেও লাশ ও ছাইয়ের পাহাড়। ওখানেও সেবক সংঘ ও আকালী সেনাদের শানিত কৃপাণের সম্মুখীন হতে হত তাদের।

জলন্ধর, হুঁশিয়ারপুর, ফিরোজপুর ও অমৃতসর জেলার মুসলমানরা উপলব্ধি করতে পারছিল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো পাকিস্তানভুক্ত হবে এবং মুসিবতকালে অমুসলিম সংখ্যাগুরু কিংবা হিন্দুস্তানী শরণার্থীরা এখানে আশ্রয় নিতে পারবে। কিন্তু বেঈমান র‍্যাডক্লিফ তাদের সে আশার ওপর মরণ কামড় দিয়েছিল।

গুরুদাসপুর জেলা ট্র্যাজেডি স্রেফ মুসলমানদের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং এ তিন জেলার পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলও মুসলিম জাতির জন্য মওতের পয়গাম নিয়ে এল। কংগ্রো, হুঁশিয়ারপুর ও অমৃতসর সীমান্তবর্তী জেলার নাম গুরুদাসপুর। কাশ্মীর সম্পর্কে নেহরু ও মাউন্টব্যাটেনের দ্বৈত-সাজশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ জেলাকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত না করলে হুঁশিয়ারপুরের মুসলমানরা বিয়াস পার হয়ে এখানে আশ্রয়

www.amarboi.org

নিতে পারত। অমৃতসরের অর্ধেক বাসিন্দা লাহোর না যেয়ে এখানেই অতি সহজে অবস্থান করতে সক্ষম হত। কংগ্রো, চেম্বা ও দূর-দরাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানরা অন্য কোথাও না যেয়ে এ জেলায় বিপদ মুহূর্তে আগমন করতে পারত। কিন্তু সাধের সে গুরুদাসপুরেই যখন যুলুম, নিপীড়ন ও বর্বরতার তুফান উথলে উঠল তখন এসব লোকের অবস্থান ওই গুহাবাসীর মত হল, বের হবার যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে যাদের।

পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোয় রোজানা এ ধরনের খবর ছেপে আসত— "আজ অমুসলিম ফৌজ ও পুলিশ পূর্ব পাঞ্জাবের অমুক এলাকায় হামলা করেছে। শিখরা আজ সিভিল পোষাকে অমুক জনপদে মুসলিম হত্যা সাধন করেছে। অমুক সড়ক, ব্রীজে ওঁত পেতে থাকা শিখটুলি নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে এতজন মানুষ হত্যা ও এত নারীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। অমুক স্টেশনে শরণার্থীদের ওপর বর্বরতার তুফান বইয়ে দেয়া হয়েছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রশাসন এ বর্বরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে পূর্ব পা াব প্রশাসন একে অস্বীকার করে। ফিরোজপুরে পাইকারী মুসলিম নিধন হচ্ছে। পাঠানদের ওপর হিন্দুস্তানীরা ট্যাংক ও মেশিনগান দ্বারা হামলা করেছে। জলন্ধরে ভারতীয় ফৌজ কারফিউ জারী করে বাড়ী বাড়ী মুসলিম হত্যা করছে। ফৌজ ও পুলিশ একযোগে হামলা চালায়, আগুন ধরায়। ঘর থেকে বের হলে দেখামাত্র গুলি করে। অমুক তারিখে তাদের ওপর নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, ৫ মিনিটের মধ্যে বাড়ী খালি করে দাও— নইলে গুলি চালিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে পাকিস্তান পৌঁছার গ্যারান্টি দেয়া হলেও স্টেশনেই তারা শিখ হামলার সম্মুখীন হয়। এতজন পুরুষ হত্যা ও এত নারীকে ব্লাকমেইল করা হয়েছে। আজ অমুক শিখরা মুসলিম রমণীগণকে উলঙ্গ করে মৌন মিছিল বের করেছে। প্রশাসন ও পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকায় তামাশা দেখেছে। আজ অমুক স্টেশনে শরণার্থীদের তল্লাশি করা হয়েছে। শরণার্থীদের যে রেশন দেয়া হয় তাতে ছলনা করে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। আশেপাশের সমস্ত কূয়োর পানিতে এস্ট্রিন ঢেলে দেয়া হয়। আজ ভারতের হিন্দু প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু পূর্ব পাঞ্জাব সফর করে ফিরে প্রেস ব্রিফিং-এ বলেছেন, পরিস্থিতি শান্ত; বিশৃঙ্খলা, লুট-তরাজ ও হত্যাকাণ্ডের সুযোগ দেয়া হবে না। অমুক নেতা ও মন্ত্রী বলেছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আজ অমুক শহরে ভাষণ দানকালে চরম মুসলিম বিদ্বেষী প্যাটেল পাকিস্তানকে ধমক দিয়েছেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের অমুক নেতা এর বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারী দিয়েছেন।

মানবতার দুশমনরা জানত, পাকিস্তান হুঁশিয়ারী ও আপীল ছাড়া তাদের কিছুই করতে পারবে না। ওরা পশ্চিম পাঞ্জাবের নেতাদের দরখাস্ত মোতাবেক আপোষমূলক মন্ত্রী কনফারেন্স ডাকত। যেখানে আলোচনা-পর্যালোচনা হত। সন্ত্রাসের নিন্দা প্রস্তাব পাশ হত। একটি যৌথ ইশতেহার প্রণয়ন করা হত। পশ্চিম পাঞ্জাবের নেতারা আত্মতৃপ্তিতে চলে আসতেন। কিন্তু ঠিক এর পরদিন শোনা যেত, অমুক শহরে হামলা হয়েছে, অমুক স্থানে সরকারী আমলার গাড়ী ভাংচুর হয়েছে, অমুক সড়কে এত হাজার শরণার্থী কাফেলার সহযাত্রীকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

শান্তি কনফারেন্স হতে থাকত। যুক্ত ইশতেহার ছেপে আসতে থাকত। পাশাপাশি চলতে থাকত পূর্ব পাঞ্জাবে পাইকারী মুসলিম নিধন। ভারত মাতার সন্তানরা যেখানে যুলুম-বর্বরতার ইতিহাসের নয়া ও ছোট অধ্যায় রচনা করত, সেখানেও তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে বিশ্বের দরবারে নিজকে নির্দোষ প্রমাণ করত। পূর্ব পাঞ্জাবে নেহেরু প্রশাসনের তরী মুসলিম খুনে সাঁতরাচ্ছিল আর পশ্চিম পাঞ্জাবের লিডাররা স্রেফ ঠুন্‌কো বিবৃতির মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে শান্তিকামী এলান করে না করা দোষকেও ঘাড়ে তুলে নিতেন। এমন কি লাহোরে নিয়োজিত গুর্খা ও শিখসেনারা যখন গুলিবৃষ্টি করছিল তখন তারা মুসলমানদেরকে সবর করার তালিম দিচ্ছিলেন নির্বিচারে। পশ্চিম পাঞ্জাবের নেতারা গাড়ীতে পেট্রোল পুড়ে সাংবাদিকদের আশায় বসে থাকতেন। কোথাও থেকে কোন অন্যায়ের খবর এলে পরদিন পত্রিকার প্রথম পেজে তাদের বক্তব্যের খবর আসত মোটা অক্ষরে। এরা প্রকারান্তরে বাঘ-সিংহকে ইনসানিয়তের দরস দিতে চাচ্ছিল, কিন্তু আপোষ ও শান্তিকামী এ তথাকথিত নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি হিন্দুস্তানী প্রশাসনের বর্বরতাকে বিশেষগুণে বর্ধিত করতে সহায়ক হল। পূর্ব পাঞ্জাবীরা মনে করল, পশ্চিম পা াবে যা ঘটছে, তা কেবল ঘর গোছানোরই ফালাফালি মাত্র।

পূর্ব পাঞ্জাবের সর্বত্রই আগুনে আগুনে জাহান্নামে হাবিয়ায় পরিণত। লুধিয়ানা, রুইতক, করনাল, হেসার ও গরগাঁওয়ের মুসলমানদের পতন ও ধ্বংসের উপাখ্যান অন্যান্য জেলার মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন ছিল না। শহর, নগর, বন্দর ও জনপদের ভুখা, নাঙ্গা, নিঃস্ব ও নিরন্ন মানুষগুলো জ্বলন্ত ঘর, বিপন্ন বস্তি ও স্তূপীকৃত লাশ ফেলে পাকিস্তানমুখো হচ্ছিল।

বিবি জানত না স্বামী কোথায়। ভাই জানত না বোনের খবর। দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাকে ফেলে মা পালাত, আর বর্বরতা ও নিপীড়নের তুফান তাদের পিছু ধাওয়া করত। পূর্ব পাঞ্জাব একটি জঙ্গলে পরিণত হল, যেখানে হায়েনা প্রশাসন আর পশুসেনাদের দখল।

লুধিয়ানায় মুসলিম নিধন শুরু হলে পূর্ব পাঞ্জাবের গভর্নর জলন্ধর সফর করে এসে বলতেন, এখনকার পরিস্থিতি প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শান্ত। গরগাও ও হেসারে শিখ ও ভারতীয় হানাদার বাহিনী হামলা করলে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সংবাদ প্রচারিত হত, আজ অমুক মন্ত্রী মুসলমানদের শান্ত থাকতে বলেছেন। কেননা, তাদের কোন ভয় নেই। একদিন তো প্রকাশ্য ঘোষণাই এল, পাঞ্জাব প্রশাসনের এটা আদৌ লক্ষ্য নয় যে, মুসলিম জাতিকে ঘরদোর থেকে বের করে দেয়া হবে। ওদিকে অন্য এক শহর থেকে ততক্ষণে খবর আসত, সেখানে এক ঘন্টার মধ্যেই মুসলমানদের বাড়ীঘর ছেড়ে পালাতে চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়েছে।

✪ ✪ ✪

পূর্ব পাঞ্জাব প্রশাসন পাইকারী মুসলিম নিধনে হিস্যা নিয়েছিল প্রতিযোগিতামূলক। কাপুর-এ মুসলিম জনসংখ্যাধিক্য ছিল। সুতরাং ওখানে শিখ ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের হাতে ট্যাংক ও ভারী অস্ত্রের যোগান দেয়া হল। ভরতপুর ও ইন্দোরে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ মুসলিম রক্তে হোলি খেলে রুইতক ও হেসারে প্রবেশ করেছিল। নাভা প্রশাসনও সাধ্যমত এদেরকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদের জোগান দিয়ে যাচ্ছিল।

www.amarboi.org

পাটিয়ালার মহারাজা যিনি পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলিম নিধনে পুরোপুরি শরীক ছিলেন; ১৫ আগস্টের ক'মাস পূর্বেই শিখ, আকালী ও সেবক সংঘীদের জন্য রাষ্ট্রীয় অস্ত্রগুদাম উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পাটিয়ালার শিখদের অন্ন-অস্ত্রে দু'হাত ভরে পর্দার নেপথ্যে পূর্ব পাঞ্জাবের সর্বত্রই ছড়িয়ে দেয়া হয়। মহারাজা পৌর পোপকে সাজিয়ে দেন; কিন্তু এখানকার মুসলিম জাতি তখনও আত্ম প্রবঞ্চনার শিকার হতে থাকল, যখন হামলার পূর্বেও তারা শিখ-হিন্দুদের সাথে শান্তি বৈঠক করল। বিশেষ করে খোদ্ মহারাজাই যখন এ ঘোষণা করলেন যে, যে কোন মূল্যেই দাঙ্গা বন্ধ রাখতে হবে। সন্ত্রাসী যে জাতিরই হোক না কেন— শাস্তি তাকে পেতেই হবে। হুকুমতের পুলিশ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের রুখতে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় আছে।

চরম হতাশাকালে মানুষ আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়। পাটিয়ালার ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতির কপালে তাই জুটল। চরম মিথ্যাবাদী রাজা প্রতারণা-পর্দার মুখোশ খুললেন। স্রেফ পাটিয়ালায়-ই নয় বরং আশেপাশের জেলার মানুষ ঘরদোর ছেড়ে এখানে আশ্রয় নিল। এমন কি কর্নাল, লুধিয়ানা ও পড়শী প্রদেশের মানুষও পাটিয়ালা অভিমুখে ছুটল। অতঃপর মহারাজা আস্তিনের ছুরি বের করলেন। সশস্ত্র হায়েনাদের লেলিয়ে দিলেন। শুরু হল পাইকারী হত্যা। পাটিয়ালা সীমান্ত অতিক্রমকারীদের ওপর প্রথমে হামলা হল। মুসলমানরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করলে শিখ-হিন্দু নেতারা বলতেন, শহরে শান্তি বিরাজ করছে। এক্ষণে তোমরা ওখানেই যেতে পার। শুধু কি তাই, এদের ভয় দেখানো হত যে, পাকিস্তান সেতো বহুদূর। রাস্তায়-ই তোমরা প্রাণ হারাবে। কাফেলা মাত্রই সন্ত্রাসীদের হামলার সম্মুখীন হয়েছে ইতোপূর্বে।

এরপর মহারাজার চেলা-চামুন্ডারা সীমান্তের বস্তিগুলো খালি করাত এবং বহির্বিশ্ব যাতে এখানকার খবরা খবর না পায়— সে ব্যবস্থাও নেয়া হত। এবার ওদের শিকার চারপাশ দিয়েই অবরুদ্ধ। ১০ দিন ধরে শিকারী কুকুরের দল মুসলিম জাতির প্রাণসংহার করল। অথচ ধুরন্ধর রাজা রোজানা বয়ান করে যেতেন— দেশে সন্ত্রাসীর ঠাঁই নেই। মুসলমানদের জান, মাল ও ইয্‌যতের কোনই ভয় নেই।

মহারাজা বল্লভ ভাই প্যাটেলের চোখে প্রিয়পাত্র হবার জন্য হিংস্রতা ও বন্য শুয়োরের খাসলত গ্রহণ করার পাশাপাশি পৌরাণিক কাপালিকতার লেবাসও পরিধান করেছিলেন, যাতে এখানে অন্য কাউকে নিযুক্তির চিন্তাও না করেন প্যাটেল বাবু।

এরপর এল দিল্লীর পালা। এ শহর অহিংস নীতির দেবতার রাজধানী। এখানকার বিরলা মন্দির ও মেথর কলোনীতে মহাত্মাগান্ধী অহিংস নীতির দরস দিতেন। এখানেই বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অফিস। এখানকার দলপতিরা এলান করল— ১৫ আগস্টের পর বাউন্ডারী ফোর্সের উপস্থিতিতে কোন প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় নেই। এ সেই দিল্লী যেখানে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সর্দার বলদা সিং ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের অবস্থান। প্রশাসন, প্রেস, প্লাটফর্ম ও অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বারবার এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, 'দিল্লী পুরোপুরি শান্ত। এখানে দাঙ্গাকারীদের রেহাই নেই।' বাইরের যে সব শিখ ও সেবক সংঘী রাজাকাররা এখানে জমায়েত হত, তারা সকলেই সশস্ত্র।

www.amarboi.org

এজন্য শান্তি কমিটি দাঙ্গার ভয়ে তল্লাশি ও ধরপাকড় শুরু করে। তবে ধরপাকড়ের মধ্যে শিখ-হিন্দুর নাম নেই— ধরপাকড় হত মুসলমানদের বেলায়। তল্লাশির নামে মুসলমানদের কাগজ কাটা ছুরি, সব্জী কাটা বটি ও হকিস্টিক গুলো ক্রোক করা হয়। এমন কি গরানের লাঠি পর্যন্ত বাদ যায় না। এসব বস্তু সরকার ক্রোক করে নেন। এরপর 'জয়হিন্দ' ও 'সত্যাশ্রয়ী আকালী' নারা বুলন্দ হত। অল ইন্ডিয়া রেডিও ঘোষণা করত— "আজ মৃদু দাঙ্গা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত। আজ সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে। আজ অমুক স্থানে দাঙ্গা হলে পন্ডিত নেহেরুর ঝটিকা উপস্থিতি উদ্ভূত পরিস্থিতিকে ঠাণ্ডা করে। শান্তি কমিটি আজ এ এলান করেছে যে, পন্ডিত নেহেরু বিদেশী সংবাদ সংস্থা ও নিউজ এজেন্সীকে ঘটনা রং চড়িয়ে বাড়িয়ে লেখার সমালোচনা করেছেন। সুতরাং এ কথাকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না।"

লাল কেল্লার দেয়াল ও দিল্লী জামে মসজিদ চত্বরে মুসলিম জাতির রক্তগঙ্গা বইছিল। নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার হাত মানবতার টুঁটি চিপে মারছিল। গান্ধীর চেলারা তাদের শাসন যুগের অধ্যায় রচনা করেছিল মুসলিম খুন দ্বারাই।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখনও ভাইসরয়, পন্ডিতজী তখনও প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু দিল্লীতে গুণ্ডাদের শাসন। খুব সম্ভব লজ্জা-শরম ফেলে ভাইসরয় সাহেব প্রাসাদে দাঁড়িয়ে রক্ত ও আগুনের খেল প্রত্যক্ষন করছিলেন। শয়তান বুঝি তার কানে কানে বলছিল— 'আমি এ দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষের বেশ ধরে এসেছি। আদমকুঞ্জে বারবার আগুন লাগিয়েছি। বোখারা ও সমরকন্দে আমি চেঙ্গিস খানের রূপে এসেছিলাম। বাগদাদে আবির্ভূত হয়েছিলাম হালাকু খান হয়ে। কিন্তু সারথী হে! আমার রাজপথের সকল মিশন পরিচালক সেতো তুমিই।

দিল্লীতে নরমেধযজ্ঞ খতম হলে অহিংসনীতির তথাকথিত মহাত্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে কুম্ভিরাশ্রু ফেলেন।

✪ ✪ ✪

পাকিস্তান এক্ষণে লাখো উদ্বাস্তুর আশ্রয়স্থল ও যখমীদের হাসপাতাল। পূর্ব পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা জনশূন্য। এক্ষণে হামলাবাজদের সম্মুখে হয় কাফেলা, না হয় শরণার্থী ক্যাম্প। বাউন্ডারী ফোর্সের বিলুপ্তি ঘোষণা হল। সুতরাং মুসলিম নিধনের টুকটাক যে পরিস্থিতি ছিল তাও দূর হল। দিল্লী থেকে আশ্রয়কামীদের লাইন 'আগ্রো' পর্যন্ত। অধিকাংশ কাফেলার মানযিলে-মাকসূদ লাহোর। লাহোরের সড়ক, গলি ও স্টেশনে তিল বরাবর ফাঁক নেই।

পথিমধ্যে হাজার মাইলের সফর, অনিদ্রা ও ক্ষুধার দরুন আশ্রয়কামীরা শ্রান্ত-ক্লান্ত। পাকিস্তান সীমান্তে পা রাখতেই তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' নারা দিয়ে যমীনে শুয়ে যেত। এ সেই স্বপ্নের ঠিকানা যার জন্য এরা আজীবনের অর্জিত পুঁজি খতম করেছে। হুকুমত পেরেশান। সরকার হতাশ। শরণার্থীদের বসতে দেয়ার জায়গা নেই। কিন্তু লাহোরের উদার মানুষেরা প্রমাণ করল, লাহোরবাসী এ পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম। রেডিও লাহোর ঘোষণা করল, আজ অমুক সময় এত লাখ শরণার্থী লাহোরে উপনীত হয়েছে। জনগণ মহল্লা ও অলি গলিতে খানা পাকিয়ে শকট ও টাঙ্গা করে বিতরণ করত।

www.amarboi.org

আত্মোৎসর্গ লোক অন্য শহরেও ছিল। সম্মিলিত মুসিবত সামাল দিতে সম্মিলিত অনুভূতি পয়দা হয়েছিল; কিন্তু যে সয়লাব ভারতীয় কাপালিক প্রশাসন শিশু পাকিস্তানের ওপর উছলে দিয়ে একে যথেষ্ট মনে করছিল— তা কিন্তু ফলপ্রসূ হল না। তাকে বারণ করে রাখাও মামুলি কথা নয়। এ মুসীবতের ধকল সামলাতে পরিপক্ক শাসন ব্যবস্থা দরকার। দরকার বিশাল ও অশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পাকিস্তানের অবস্থা ওই শিশুর মত, বোঝা বহনের যোগ্য হবার পূর্বেই যাকে বোঝা বইতে বাধ্য করা হয়। পশ্চিম পাঞ্জাব প্রশাসনের যেমন বিশাল কর্মতৎপরতার দরকার ছিল, তেমনি তাদের অভিজ্ঞতা ছিল অপরিপক্ক। এমনও আমলা ওই প্রশাসনে ছিল যারা ডান্ডা-গুলি ছেড়ে মন্ত্রীত্বের কলম হাতে নিয়ে বসেছিল। সচিব পর্যায়ে ওই সব লোক চেয়ার দখল করেছিল, যারা দিনের কাজ মাসে শেষ করত। এক সুশৃঙ্খল স্কীমে অমুসলিমদের পদশূন্যতার দরুন পুরো শাসন ব্যবস্থায় দহরম মহরম হয়েছিল। অভিজ্ঞ যেসব আমলা ভারত থেকে পাকিস্তানের পথ ধরেছিল, তাদের অধিকাংশকেই কতল করা হয়েছিল। যারা কোন ক্রমে পাকিস্তান পৌছেছিল, তাদের ছিল না হুঁশ। এদের কারো স্ত্রী, কারো বোন ও কারো বাবা-মা মারা গেছে। কারো প্রিয়জন লাপাত্তা। ওদের তালাশে এরা পাগলপ্রায়।

পাকিস্তানের দুশমন ও পাকিস্তানের চেয়েও মানবতার ঘোর দুশমন তার তূনিরের শেষ তীরগুলো চালিয়ে যাচ্ছিল। পূর্ব পাঞ্জাবের নিঃস্ব মুসলমানরা ঘরদোর ছেড়ে ক্যাম্পে জমায়েত হয়েছিল এবং এখন থেকে মুসলিম ফৌজ তাদেরকে অতি সহজেই পাকিস্তান পৌঁছে দিত। এদের ওপরও হামলা হত। তবে খোলা সড়কে নয়। শহরের উঁচু ইমারত থেকে হাতবোমা ফেলত শিখরা। যে কাফেলার সাথে ১০/১৫ জন মুসলিম সেপাই থাকত, সেখানে হাজারো ভীরু শিখ হামলার সাহস পেত না প্রকাশ্যে। কিন্তু দূর-দরাজের যারা হিন্দুস্তানী ফৌজের পাহারায় চলত তাদের পরিণাম হত এর উল্টা। কোন দরিয়া বা নহরের কিনারে তাদের থামানো হত এবং তাদের থেকে পাহারাদারির পারিশ্রমিক তলব করা হত। লোকেরা অল্পস্বল্প পুঁজি যা সাথে নিয়েছিল— তাও ওদের দিয়ে দিত। এসব এলাকার পুলিশরা ভিড় করত। যুবতী নারীদের ছিনিয়ে নিত। অবশিষ্ট লোকদের পৌছে দিত মৃত্যুর দুয়ারে। অনেকে বধূ-মাতাসহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। পাষণ্ডরা তীরে বসে নিশানা করত। পূর্ব পাঞ্জাবের এমন কোন নদী, খাল ও ডোবা ছিল না, যা মুসলিম রক্তে লাল কিংবা লাশে ভরপুর হয়নি।

পূর্ব পাঞ্জাবের বেশ কিছু কূয়োর পানিতে বিষমিশ্রিত করা হয়। অনেক কূয়োয় ফেলা হয় লাশ। বিক্ষিপ্ত লাশের পাশাপাশি বৃষ্টি হওয়ায় পরিবেশ নোংরা হয়ে ওঠে। শরণার্থীদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উঠে বসার এজাযত ছিল না। সশস্ত্র শিখরা ক্যাম্পের আশে পাশে নিষিদ্ধ প্রহরা বসিয়ে রাখত, যাতে মুসলিম ফৌজ একে সংরক্ষিত মনে করে অন্যত্র চলে যায় আর ওরা সহজে হামলা করতে পারে।

হিন্দুদের ব্যবসায়ী পেশার লোকজন এ সময় সঠিক কামাইয়ের কোশেশ করছিল। এরা ক্যাম্পের পাশে বাজার বসাত। এক সের সব্জী তারা স্বর্ণের দামে বেচত। এখানে

www.amarboi.org

কেবল খাদ্যের মূল্যই শোধ করতে হত না, শোধ করতে হত পেশাব-পায়খানা ও পানীয় জলের দামও। ভারত মাতার জারজ সন্তানরা দেশের উন্নতির জন্য এক মটকা পানি একশো' রুপিতে বিক্রি করত। পরিষ্কার পানি অসুস্থ, শিশু ও যখমীদের জন্য ক্রয় করা হত। অন্যান্যরা বৃষ্টির পানি হাউজ করে কিংবা নদীর পানির ওপর ভরসা করত।

ক্ষুধা ও অর্থ কষ্টে মানুষ গাছের পাতা ও ঘাস খেত। পূর্ব পাঞ্জাবের যারা পাকিস্তানমুখো হত— যখমীদের ছাড়াও কলেরা রোগীও তাদের সাথে নিত। এ সময় পাকিস্তান প্রেস ও রেডিও এমন সংবাদ পরিবেশন করত—

"অমুক ক্যাম্প থেকে এত জন মুহাজির রওয়ানা হয়ে গেছে। পথে এত জন যখমী ও কলেরা রোগীর জীবনাবসান হয়েছে। এখন পশ্চিম পাঞ্জাবের অমুক ক্যাম্পে কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সকলকে সাবধান থাকতে বলা হচ্ছে। আজ দিল্লী থেকে অমুক গাড়ী লাহোরে পৌঁছেছে। তাতে জীবিত কেউ ছিল না, সবই মরা লাশ। অমুক নেতা বলেছেন— রেল-এ চড়া এক্ষণে নিরাপদ নয়।'

রেডিও পাকিস্তান মুহাজিরদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা সংবাদ বুলেটিন প্রচার করত "অমুক অমুক মেয়ের বাবা অমুক ক্যাম্পে থেকে খবর পাঠিয়েছেন যে, তারা সুস্থ থাকলে যেন ক্যাম্পে পৌঁছে যায়। অমুক বানু, অমুক বেগম প্রিয়জনকে লক্ষ্য করে বলছেন, তিনি যখমী হয়ে হাসপাতালে। লাহোর, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ার থেকে অমুক অমুক লোক সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে আগত তার কোন প্রিয়জন থাকলে যেন খবর দেন। অবস্থা বড় করুণ। অমুক সাহেব তার খান্দানের অমুক বানু ও বেগমের পক্ষে বলছেন, তারা স্বামীর সন্ধানপ্রার্থী। অমুক শিশু কাফেলায় হামলার সময় বাবা মা থেকে আলাদা হয়ে যায়। কেউ সন্ধান পেলে যেন খবর দেন।'

এই সংক্ষিপ্ত পয়গাম ওই লাখো বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার শিরোনাম মাত্র। পুরো কাহিনী বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাকিস্তান হাজারো মুসীবত, অজস্র হতাশা ও অগণিত পেরেশানির সম্মুখীন। দিকচক্রবালে অন্ধকার আর অমানিশার কালো পর্দা, কিন্তু এ হৃদয় বিদারক তুফানের মধ্যেও সকলের মধ্যে একটা আশার আলো চমকাচ্ছিল। এ দুর্দিনে জাতির কাণ্ডারী কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র প্রেরণাসুলভ ভাষণে ঈমান-একীন শতগুণে বেড়ে গেল— 'পাকিস্তানকে কেউ অস্তিত্বের পৃষ্ঠা থেকে মুছে দিতে পারবে না। এ অমানিশার কালো পর্দা ছেদন করে বের হয়ে আসবই আমরা।'

এ সময় হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানী হিস্যার ফৌজ আসতে লাগল।

সেপাইদের ললাটে জাতি নবজীবনের ঝলক দেখছিল। এ যাবত মুষ্টিমেয় বেলুচ রেজিমেন্ট যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তাতে পাকিস্তানী সোলজার বিশাল স্কীম উতরে যাওয়ার প্রেরণা খুঁজে পেল। আওয়াম সেপাইদের চলার পথে পুষ্প ছিটাত এবং কৃতজ্ঞতার আঁসু বহাত। কওমের বেটিরা তারানা গেয়ে তাদের বরণ করত। বোবা কণ্ঠে আরেকবার উচ্চারিত হল— 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

www.amarboi.org

গান্ধীর শান্তিকামী চেলারা তলোয়ারের তেয কেবল নিরস্ত্র মানুষের গর্দানে পরীক্ষা করত— তারা বিপক্ষের হাতে তালোয়ার সহ্য করতে পারত না। সুতরাং পাকিস্তানী ফৌজের ওপর পুরানো কায়দায় তলোয়ারের ধার পরীক্ষার কোশেশ করা হল। পথিমধ্যে স্পেশাল গাড়ী পাহারায় থাকত। তারা বলত— তোমাদের হাতিয়ার সোপর্দ করো, সশস্ত্র ফৌজ গাড়ীতে করে তোমাদের পাকিস্তান পৌঁছে দেবে। কিন্তু মহাসভার হিন্দুরা বুঝতে পারল, মেকি ফৌজ ও কাঁচা সেপাইদের মধ্যে এদের সাথে বেশ ফারাক। মুসলিম সেনানীরা জীবন থাকতে অস্ত্র সমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। এ বীর সেপাহীদের একটাই জবাব— আমরাই আমাদের সংরক্ষক।'

কোথাও কোথাও শিখ জানোয়াররা সেমসাইড করে ফেলত। হিন্দুস্তানী এ গাড়ীর ওপর হামলা করে বসত। ও সব গাড়ীর হিন্দু অফিসারদের অবস্থা ঐ শিকারীর চেয়ে কোন অংশে কম হত না, শিকারী বাঘ যার চামড়া খাবলে তুলে নেয়।

✪ ✪ ✪

রাবী নদীর কিনারে আশ্রয়কামীদের সংখ্যা শনৈ শনৈ বৃদ্ধি পেতে লাগল। গুরুদাসপুর ও অমৃতসরের সিংহভাগ মুসলিমের অগ্রযাত্রা এক্ষণে এদিকেই। ডেরা বাবা নান্‌কের পুলের উপরে-নীচে ছোট খাটো ছাউনি দেখা গেল। কিছু এলাকায় খেয়া করে শরণার্থীদের পারাপার করতে দেখা গেল। অনেক উপকূলে ঘাস ও কুটোর পাশাপাশি গবাদিপশু পার করছিল। অনেকে আবার মহিষ-গুরুর ওপর চড়ে নদী পার হচ্ছিল। সকলের আশা, যে করেই হোক সাধের ভারত ছাড়তেই হবে। যুবকরা অনেকে কলাগাছে চড়ে নদী পারাপারের চেষ্টা করছিল। কিন্তু যখমী নারী ও শিশুরা পড়ে যায় বিপাকে।[১]

টীকা : গুরুদাসপুরের সবচে' বড় শহর হচ্ছে বাটালা। জেলার শিখ ও আমলাদের ভয় ছিল, কোথাও মুসলিম সেনা মোর্চা গঠিত হলে তা বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং বাউন্ডারী কমিশনের ঘোষণা হবার পরপরই পুলিশ মুসলিম বসতিদের শহর ছাড়তে বলল। আশে পাশের জনপদের মানুষ শহরমুখো হচ্ছিল। ওদিকে শহরের মানুষ ঘরদোর ছেড়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছিল শরণার্থী শিবিরের উদ্দেশ্যে। এরপর কিছু লোককে মুসলিম সেপাইরা ট্রাক ও লরীতে করে লাহোর পৌঁছে দিচ্ছিল আর বাদ বাকীরা ডেরা বাবা নান্‌কের পথ ধরল। ভারতীয় প্রশাসনের দৃষ্টি এবার পড়ল কাদিয়ানের ওপর। আহমদিয়া (কাফের, কাদিয়ানীর অনুসারী) জামাতকে ভারতীয় প্রশাসন অভয় দিল যে, তোমাদের কোন ভয় নেই। বাটালার পরিস্থিতিতে পেরেশান হয়ে কাদিয়ানের ৬/৭ মাইল বিস্তীর্ণ এলাকার শরণার্থীরা তাঁবু ফেলেছিল। এরপর আগুনের ছোবল এ এলাকায় কমতে শুরু করে। এ মর্মে খবর আসতে থাকে যে, আজ কাদিয়ানী জামাতের অমুক প্রতিনিধি অমুক নেতার সাথে সাক্ষাত করেছে এবং এ অঙ্গীকার আদায় করে যে, কাদিয়ান এলাকা হামলামুক্ত থাকবে; কিন্তু পরদিন ঠিক এর উল্টো খবর আসে যে, আজ কাদিয়ানের অমুক অঞ্চলে হামলা হয়। এতে এত জন মারা যায়।' অবশ্য কাদিয়ানের মন্ত্রী বড় গলায় বলেন, এ এলাকায় কোন দাঙ্গার ভয় নেই। আরেক খবরে শোনা যায়, "আজ কাদিয়ানে কারফিউ। কাদিয়ান বাসিন্দাদের তালাশ করা হচ্ছে। কাদিয়ানের অমুক অমুক এলাকায় হামলা হয়েছে। কাদিয়ান খবরের ব্লাক আউট। আহ্‌মদিয়া কাফের জামাতের বিমানকে লাহোরে ল্যান্ড করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাদিয়ানীদের লাহোর থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। আজ পাকিস্তানের পথ ধরেছে ৪০ হাজার লোক। কাদিয়ান ও বাটালার মাঝে শিখ জানোয়ারদের বর্বরতা-বিপন্ন শরণার্থী। কাদিয়ান খালি হয়ে গেছে। পুলিশ ও প্রশাসনের লুটতরাজে সরাসরি অংশগ্রহণ।" অথচ তখনও দিল্লীর অহিংস কোয়ার্টার থেকে ঘোষণা হয় যে, কাদিয়ানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে পুরোপুরি। একেই বলে গোয়েবলসীয় তথ্য সন্ত্রাস!'

www.amarboi.org

শহর ও গ্রামের বাড়ী খালি হবার পর শিখদের লক্ষ্য এবার সড়ক, ব্রীজ ও রাবী উপকূলে সীমান্ত অতিক্রমকারী শরণার্থী।

গৃহহারা, স্বজনহারা ও দেশছাড়া মানুষের সামনে দরিয়া আর পেছনে আগুন। শ্রাবণের থৈ থৈ পানি এখন নেই। কিন্তু ওই বছর আগস্টের শেষের দিকে বর্ষা মৌসুম ছিল। দু'চার ঘন্টার জন্য আকাশ পরিষ্কার হলে একে অপরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত— এখন দু'চার দিনের অপেক্ষা। নির্বিঘ্নে নদী পার হতে পারব আমরা। কিন্তু পরদিন মুষলধারে বৃষ্টি হলে তারা বলত— না; নদী পার হওয়া গেল না। এগুলো কিয়ামতের বিভীষিকা।' শ্রাবণ মেঘের রাত্রে দুধের বাচ্চা কাঁদত; যখমী, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া এবং টাইফয়েডের রোগি কাতরাত। আচমকা আঁধার রাতের নিরবতা ভেঙ্গে ভেসে আসত— হায় হায়! আমার বাচ্চা মারা গেছে।' এ আওয়াজ শেষ হতে না হতেই বাপহারা মাতম ভেসে আসত। বিপদের ওপর বিপদ পতিত হত এদের ওপর। কেউ জোর গলায় বলত— পানি এসে গেছে। এখান থেকে পালাও। দরিয়া ফুঁসে উঠছে।' চারদিকেই হুলস্থুল পড়ে যেত। কেউ হতাশ হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিত। তাদের সলিল সমাধি হত। অন্ধকারে মানুষ প্রিয়জনকে ডাকত। বৃষ্টি কমলে মানুষের শোরগোলে ভাটা পড়ত। মানুষ বিছানা ছেড়ে কাদা পানিতেই বসে পড়ত।

দরিয়া উপকূলে প্রতিটা দিন সলীমের কাছে কিয়ামত মনে হত। রাতটাও মনে হত কিয়ামতের বিভীষিকা। আমৃত্যু যারা ওর সাথে লড়ে যেতে অঙ্গীকার করেছিল, একে একে শহীদ হল তাদের আটজন। তিন জনকে প্রচণ্ড জ্বরের দরুন অপর পারে পৌছানো হয়। এর দু'জনকে আবার কলেরায় ধরে।

সলীমের সামনে বিশেষ কোন মোর্চা হেফাযত উদ্দেশ্য নয়। ক্যাম্পে হামলা হলে কেবল সে সময়টা ও লড়ত। নিকট দূরের কোন জনপদে হামলা হলে ঘোড়া ছুটিয়ে যেত। ওরা বারচারেক শিখদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। পঞ্চমবার শিখরা মরণ কামড় দিতে এগিয়ে এল। সন্ধ্যার দিকে দু'শো সওয়ার ও প্রায় এক হাজার শিখ চক্রাকারে নদী তীরে এগিয়ে এল। হামলাবাজরা চারশ' গজ দূর থেকেই গুলি শুরু করল। সলীমের সাথীরা মোর্চার আড়ালে অবস্থান নিল। গোলাগুলির স্বল্পতাহেতু প্রয়োজনাতিরিক্ত গুলি খরচা করতে নিষেধ করল সলীম। ঘন্টাঘানেক গুলি চালাচালির পর শিখরা ক্যাম্পের ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সওয়াররা অগ্রে, তলোয়ারধারীরা পেছনে। ওরা যখন ক্যাম্প থেকে আনুমানিক ১৫০ গজ দূরে তখন সলীম ফায়ার করার হুকুম দিল। কয়েক মুহূর্তে ওরা ৩০/৪০টা লাশ ফেলে দিল। কিন্তু হামলাবাজরা পিছু হটার স্থলে সামনে অগ্রসর হল, জমায়েত হোল মোর্চার কাছাকাছি। এবার সলীমদের ফায়ার করতে অসুবিধা। বাধ্য হয়ে ওরা মোর্চা ছেড়ে প্রকাশ্যে নেমে ফায়ারিং করে। সলীমের চিৎকারে সকলে যমীনে শুয়ে গেল। এবার ওর অবশিষ্ট সঙ্গীরা মোর্চা ও তাঁবুর আড়াল দিয়ে গুলিবৃষ্টি করে। অবশ্য ততক্ষণে বর্বর শিখরা ক্যাম্পে ঢুকে গেছে। মুসলমানরা দা-বেটি ও লাঠি-সোটা দিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকে। যে সব জোয়ান শিখদের থেকে বিগত যুদ্ধে অস্ত্র কেড়েছিল তারা আগেভাগে হামলা চালাল। কিন্তু

www.amarboi.org

অনবরত গুলিবৃষ্টি ওদের বিক্ষিপ্ত করেছিল। শিখরা মুসলিম শরণার্থীদের সাথে এভাবে ধস্তাধস্তি শুরু করল যাতে চেনাই মুশকিল— কে শিখ, কে মুসলিম।

নারীরা বেহুঁশ হয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতে লাগল। যারাই পিছপা হচ্ছিল তারা তাদের সাথী-স্বজনকে গভীর পানিতে সাঁতরাতে বলল। শিখদের প্রচণ্ড এক আক্রমণ বেশ কিছু পুরুষকে নদীতে নামতে বাধ্য করল। বেশ কিছু নারী প্রবল স্রোতের মুখে হাবুডুবু খেতে লাগল। আত্মীয় পুরুষরা এবার ওদেরকে ডোবার থেকে বাঁচানোর ফিকির করল। মহিলাদের সিংহভাগই সাঁতার জানত না। পরিণতিতে শিশু-বাচ্চাসহ তারা অতল পানিতে ডুবে গেল। যারা মোর্চার সামনে শুয়েছিল তাদের ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ শানাল শিখ জানোয়াররা।

হামলাবাজদের নেতা ঘটনাস্থল থেকে দু'ফার্লং দূরে দাঁড়ান। ডানে-বায়ে তারা দু'দেহরক্ষী। তীর-বল্লম আর বর্শাসজ্জিত মুসলমানরা শিখদেরকে দলপতির পঞ্চাশ গজের কাছাকাছি নিয়ে গেল। দলপতি চিৎকার দিয়ে বলল— আত্মসম্ভ্রমবোধহীনের দল। পিছপা হতে শরম লাগে না!' শিখরা পুনরায় জবাবী হামলা চালায়। ওদেরই একদল ময়দানে নেমে পড়ে। লাশের স্তূপ মাড়িয়ে শরণার্থীগণ আবারো জমায়েত হতে বাধ্য হয়। সলীমের সাথীদের প্রায়ই বন্দুকের শেষ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল।

সলীমও ওর শেষ রাউন্ড গুলি ও মেশিনগানটা এক সাথীর হাতে সোপর্দ করে পকেটস্থ পিস্তলটা বের করল। দ্রুত গড়িয়ে মোর্চাস্থ দাউদের কাছে পৌছল। ওখানে বসেই গুলি চালায় ওরা। দাউদের পাশের লোকটা মাথায় গুলি খেয়ে শাহাদত বরণ করে। আশেপাশের মাল-সামান গুলিতে ঝাঁঝরা প্রায়। দাউদের ললাটে রক্তরেখা দেখে সলীম বলল— দাউদ! তুমি যখমী?

ঃ গুলি আমার খুলি স্পর্শ করে গেছে। এই মামুলী চোট মাত্র।

ঃ দাউদ! আমার গুলি ফুরিয়ে এসেছে। স্রেফ পিস্তলে আছে নামমাত্র ক'টা।

ঃ আমার কাছে দু'রাউন্ড আছে।

থলেতে হাত দিয়ে হাতবোমা বের করে সলীম বলল— নাও এটা।

দাউদ চিৎকার দিয়ে উঠল— মাথা নীচু করো!

মাথা নীচু করে সলীম বলল— নাও দাউদ! জলদি!

দাউদ হাতবোমা নিল। সলীম যমীনে শোয়া লোকদের কাছে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে যেতে লাগল।

ঃ যাচ্ছ কৈ?' দাউদের প্রশ্ন সলীমকে।

ঃ কথা বলার সময় নেই।

গড়িয়ে সলীম শায়িত একজনের পাগড়ী খুলে নিল। মাথার অর্ধেকে পেঁচিয়ে শিখদের দিকে যেতে লাগল। পাজামার দড়ি টাইট করে বেঁধে নিল। পূর্ণশক্তিতে চলতে লাগল। মুহূর্তে ঢুকে গেল শিখদের মধ্যে। জনৈক বর্শাধারী মুসলমানদের নদীতে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করছিল। সলীম পূর্ণশক্তিতে বেটার কোমরে বর্শা মারল। লোকটা পড়ে

www.amarboi.org

গেলে সলীম বর্শার মাথায় ওর মাথা কেটে ঢুকিয়ে ছুটন্ত একটা ঘোড়া থামিয়ে তার পিঠে বসে গেল। কিছুদূরে এক শিখ হামলা করে যাচ্ছে। সলীমকে এক্ষণে একজন পূর্ণ শিখ মনে হতে লাগল। শিখরা বলাবলি করতে লাগল— আরে এ যে দলপতির ঘোড়া! দলপতি পিঠে নেই কেন? একজন বলল— সেতো যখমী। সলীম দলপতির দিকে ছুটছে। শিখরা ভাবছে— ও বোধহয় দলপতির ঘোড়া দিতে যাচ্ছে। লোকটা আসলেই প্রভুভক্ত। না হলে এই মুহূর্তে কে কার খবর রাখে।' সলীম চলছে। একেবারে দলপতির কাছটিতে গিয়েই ও থামল। বর্শায় গাথা মাথাটা একপাশে ফেলে দলপতির দিকে ও বর্শা ঘোরায়। দলপতি পিস্তল বের করার পূর্বেই সলীমের বর্শা তার বক্ষ ভেদ করে। দলপতির লাশ ঘোড়ায় চাপিয়ে দেয় সলীম। তিন মণ ওজনের বিশাল লাশটি নিয়ে ঘোড়া উদ্‌ভ্রান্ত ছুটতে লাগল। শিখদেরই একজন দলপতির হাত থেকে পতিত ঝাণ্ডা ওঠানোর কোশেশ করল। সলীমের পিস্তলটা গর্জে উঠল। বেটা একটা চিৎকার দেয়। পরমুহূর্তে সব শেষ। আরেক লোক চিৎকার দিয়ে সাহায্যে এগিয়ে এসে বলল— দলপতি মারা গেছে। ঘোড়ার পিঠেই তার লাশ। দলপতিকে নিয়ে ঘোড়া যখন কাতারের মাঝখানে ঢোকে তখন শিখদের টনক নড়ে।

ঃ দলপতি নেই— দলপতি মারা গেছে।' মুহূর্তে গুঞ্জনটা গোটা শিখদের কানে পৌছে যায়। সলীম ঘোড়া হাঁকিয়ে ভিড়ের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হলে দেহরক্ষী চিৎকার দেয়— ওই দেখো! হন্তা পালাচ্ছে। দলপতিকে ওই বেটাই মেরেছে। কিন্তু দেহরক্ষীর এ কথা কেবল হাওয়ায় ভেসে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মুসলমানরা পূর্ণশক্তিতে হামলা চালায়। শিখরা মৃত্যুর চেয়ে ভয় প্যাচ্ছিল এ আক্রমণকে। ময়দান ছেড়ে পালায় ওরা। দূর বহুদূর থেকে একা-দোকা গুলি করে ওরা।

সলীম ঘোড়ার পিঠে জোর গলায় বলছিল— দলপতি শেষ। বেলুচ রেজিমেন্ট এলাকা ঘিরে নিয়েছে।

দলীয় লোকদের পিছু হটতে দেখে মূল হামলাবাজরা ভড়কে গেল। বিশেষ করে নেতার মৃত্যু বিজলীর মত তাদের মনে প্রভাব ফেলল। তদুপরি পাকিস্তানী ফৌজের আগমনবার্তা তাদের পাজামা ভিজিয়ে দিল। প্রস্রাবে কখন ভিজেছে পাজামা সে খবর নেয়ার ফুরসত নেই। চূড়ান্তভাবে ময়দান ছাড়ার আরেকটা ঝটকা দরকার এক্ষণে। ঠিক সেই মুহূর্তে অসংখ্য ঘোড়ার খুরধ্বনির পাশাপাশি 'নারায়ে তকবীর-আল্লাহু আকবর' ধ্বনি ওদের কলিজা বিদীর্ণ করে দেয়। একদল ফৌজ ঘোড়াসহ ওদের পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সলীম পাগড়ী খুলে ঘোড়ার থেকে নেমে মোর্চার সামনে শায়িত লোকদের কাছে পৌছায়। বলে— দুশমন পালাচ্ছে— আজ খোদা তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হামলা করো। একশান একশান— ডাইরেক্ট একশান— কুইক!

যারা খানিক পূর্বেও মৃত্যু বিভীষিকায় ভড়কে গিয়েছিল তাদের মনে নবউদ্যমের জোয়ার এল। যখমী ও শহীদানের হাতিয়ার উঁচিয়ে ময়দানে নামল শার্দুলের জাতি। সওয়াররা দুশমনকে মাইল কয়েক হাঁকিয়ে দিলে পরে সলীম জানল, এ নয়া দলের নেতা আমীর আলী।

www.amarboi.org

আমীর আলী সলীমকে দেখামাত্রই বলল— ভাইজান! আমাদেরকে বুযদিলির ধিক্কার দেবেন না। আমরা তিনটা হামলা ইতোমধ্যে মোকাবিলা করে সেরেছি; কিন্তু বারুদ খতম হয়ে গেছে। একটি গুরুদুয়ারা থেকে ৮০০ কার্তুজ ও দু'টো রাইফেল ছিনিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু স্রেফ দু'টো কার্তুজ আছে আমার কাছে।

ঃ মহিলাদের কি হয়েছে?

ঃ তারা এসে গেছে। গুলির আওয়াজ শুনে দরিয়ার এক নিঝুম উপকূলে তাদের বসিয়ে দিয়েছি। এক্ষণে আপনার কাছে কি পরিমাণ বারুদ আছে?

পিস্তল খুলে ক'টা গুলি বের করে সলীম বলল— মাত্র একটা। অন্যান্যদের বারুদও বুঝি শেষ। দাউদ বলল— আমার কাছে হয়ত স্টেনগানের ক'টা গুলি আছে।

ঃ অন্যসব রিক্তহস্ত! আমীর আলী পেরেশান হয়ে বলল— 'ওরা এবার পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে নামবে। যে কোন মূল্যে আমাদের গুলি সংগ্রহ করতে হবে।'

সলীম বলল— আমীর আলী! এখানে আমাদের মিশন সমাপ্ত না হলে খোদা তা'আলা একটা ব্যবস্থা করে দেবেন অতি অবশ্যই!'

✪ ✪ ✪

মধ্যরাত!

ক্যাম্পের লোকজন বালি খুদে শহীদানকে দাফন করছিল। শহীদানের সংখ্যা সাত শতাধিক। যখমী প্রায় এর তিন গুণ। সলিল সমাধি হওয়া নারী-শিশুদের সংখ্যা কম করে হলেও পাঁচশ'। এদের বাঁচাতে গিয়েও মারা পড়েছে শ'আড়াইয়েক লোক। শিখরা জনা পনেরো যুবতী মেয়ে ধরে নিয়ে গেছে।

হামলা চলাকালে নৌকার মাঝিরা জীবন অপেক্ষা নৌকার মায়া করছিল অধিক। কিছুদিন পূর্বে শিখরা একবার ক্যাম্পের ওপর চড়াও হয়েছিল। নৌকার পাশে হামলাবাজরা উপনীত হওয়ার আগেভাগেই দু'টো নৌকা উপকূল ত্যাগ করে মাঝ নদীতে এসেছিল। কিন্তু অপর একটি নৌকা ওই দু'নৌকার মাঝিদের শত চিৎকার সত্ত্বেও ছাড়তে পারল না। শরণার্থীরা নৌকাটি যেন কামড়ে ধরেছিল। সকলের স্ব-স্ব পরিবারকে ওঠাতে ব্যস্ত। শিশু, নারী ও যখমীদের আগেই সওয়ার করানো হয়েছিল। নতুন হামলার দরুন নৌকা পানি ছুঁই ছুঁই। বালিতে আটকা পড়ার মত অবস্থা। এ সময় উদ্‌ভ্রান্ত শরণার্থীরা নৌকার পাশ ধরে থাকল। অনেকে এদের বোঝাতে ছিল। কিন্তু বক্তা সকলেই। বোঝার সংখ্যা খুব কম। একজন মাঝির কলার ধরায় মাঝি পড়ে গেল পানিতে। আবার এ সময় কেউ নৌকা গভীর পানিতে ঠেলতে লাগল। অসহায় নৌকাটি বাহন ক্ষমতা সহ্য করতে না পেরে ডুবে গেল। এরপর মাঝিরা নৌকা কোমর পানির আগে ভেড়ায়নি। আজও তারা শিখ হামলা দেখে নৌকা ছেড়ে দিল। হামলার তীব্রতায় কাউকে এসে জীবিত পাবে বলে মনে হল না ওদের। ক্যাম্পের ক'মাইল দূরে তারা নৌকা ভেড়াল। কিন্তু শিখদের পিছপা হতে তাদের মনে নবজোয়ার সৃষ্টি হল। ফকীরুদ্দীন নারা দিয়ে ওঠল। মাঝিরা সব সে নারায় উদ্দীপিত হল। ওপারের নৌকাগুলো ওদের দেখাদেখি উপকূল ছাড়ল।

www.amarboi.org

যখমী, শিশু ও নারীদের পারাপারে ব্যস্ত সলীম। আমীর আলী দাউদের হাত ধরে নিরিবিলি স্থানে নিয়ে এসে বলল— দাউদ! এখন উপায় কি?

ঃ 'হামলা ছাড়া এখানে আর কিইবা আছে।' বেপরোয়া জবাব দাউদের।

ঃ কিন্তু বারুদ যে নিঃশেষ। এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা?

ঃ কিছু না। বেশ কিছুদিন ধরে আমরা চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি। ভাবনা যেটুকু করে তা ওই সলীমই করে। সেও হয়ত এখন চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিয়েছে।

ঃ তুমি না বলেছিলে, স্টেনগানের কিছু গুলি আছে তোমার কাছে?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ ওগুলো আমাকে দাও। গুলির সন্ধান আছে আমার কাছে।

ঃ আমি যাব তোমার সাথে। রাইফেলেরও কিছু গুলি পেতে পারি। আমার কাছে একটা হাতবোমা আছে। কখন যেতে চাচ্ছ তুমি?

ঃ এখনই!

ঃ ঘোড়ায় চড়ে?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ হল!

ঃ সলীম ভাইয়ার অনুমতি?

ঃ ওকে কিছু বলতে যেও না। বিপদক্ষণে বন্ধুদের আগে বাড়ার অনুমতি দেয় না ও।

ঃ এসো!

✪ ✪ ✪

অতি প্রত্যুষে দাউদের অনুপস্থিতিকে সলীমকে ভাবিয়ে তুলল। ওর ব্যাপারে সঙ্গীদের কাছে জিজ্ঞাসা করল। এক লোক বলল— গভীর রাতে দাউদ ও আমীর আলীকে সে ক্যাম্প থেকে ঘোড়ায় চেপে বের হতে দেখেছে।' আরোক লোক কম্পিত স্বরে বলল— আমার কাছে অল্পস্বল্প যে কার্তুজ ছিল তাও সে যাবার সময় নিয়ে গেছে। আমি তাকে গন্তব্য জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাই— এখন নয়। ফিরে এসেই জবাব দেব!

সলীম ভারাক্রান্ত স্বরে বলে— আমার মন বলছে, বারুদের সন্ধানে বেরিয়েছে ওরা।

ঃ অল্প-স্বল্প গুলি পেলে আমরা আবারও হামলা প্রতিরোধ করতে পারব।' বলল জনৈক সঙ্গী, 'এ পরাজয়ের পর শতগুণ শক্তি নিয়ে দুশমন ময়দানে নামবে। ওসব লোকের খেয়াল করতে হবে আমাদের, যারা পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে। অপেক্ষমানদের চেয়ে নতুন লোক আসছে বেশি। বিমারির সংখ্যা রোজানা বাড়ছে। রেশন ফুরিয়ে আসছে। কিছুদিন হামলা না হলেও না খেয়েই এরা মারা পড়বে।

ঃ গত পরশু পাকিস্তানী ফৌজের পাহারায় হাজারো শরণার্থী ব্রীজ পার হয়েছে। ওখানকার ক্যাম্পের লোকও এদের সঙ্গ দিয়েছে। সময়মতো খবর পাইনি আমরা। মুসলমান সেপাইদের পাহারারত কোন নয়া কাফেলার অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের।

www.amarboi.org

ব্রীজ নিরাপদ হতেই ওখানে ফিরে যেতে হবে। গোলাম আলী! তোমাকে এখনই সাদেকের সাথে যেতে হবে। তোমার আশেপাশের আর কারো ঘোড়া থাকলে তাকেও নিয়ে যাও। নয়ত আমীর আলীর লোকদের থেকে, দু'টো ঘোড়া নিয়ে যাও। ব্রীজের ওপর নিরাপদ বিধায় এখান থেকে খেয়াপার হয়ে ওপারের কিনারা ধরেই যাবে। আমাদের খবর দেবে যথাসময়ে। মুসলিম সেনা অফিসারের দেখা পেলে বল—ব্রীজের ওপর স্বতন্ত্র প্রহরা দরকার।

সলীম যখন এ কথা বলছিল তখন একজনে পেছনের দিকে তাকিয়ে বলল—ওদিকে দেখুন! খুব সম্ভব ওরা আসছে।

সলীম ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তিন ফার্লং দূরে ধানক্ষেতে এক সওয়ার দেখা যাচ্ছে। ঘোড়ার গতি মন্থর। সলীম দুঃখে মাথা নত করল। নিকটে এসে সওয়ার ঘোড়া থামাল। উৎসুক জনতা ওদের পার্শ্বে ভীড় জমাল। আমীর আলী ওই ঘোড়ায় সওয়ার আর তার কোলে দাউদের লাশ।

লোকেরা লাশ নামিয়ে যমীনে শুইয়ে দিল। আমীর আলী তন্দ্রাচ্ছন্নের মত জিন থেকে ধপ্ করে পড়ে গেল। রক্তে ওর শরীর চাপ চাপ। চেহারা হলুদ। এক যুবতী চিৎকার দিয়ে এগিয়ে এল। আমীর আলীর মাথা বুকে চেপে ধরল।

সলীম অশ্রুসজল নয়নে দাউদের দিকে তাকায়। ওর বক্ষদেশ ঝাঁঝরা। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলে ও আমীর আলীর দিকে তাকায়। সমবেত লোকের কাতার চিরে ওর কাছে বসে গেল। নাড়ীতে হাত রেখে জামা খুলে ফেলল। ওর পেট ও বুকে তিনটি যখম। আবারো নাড়ীর স্পন্দন পরখ করল। উপস্থিত লোকজনকে লক্ষ্য করে বলল— মারাত্মক এ যখম হবার পরও ওর এখানে পৌঁছা রীতিমত মোজেযাই একটা।

দরিয়ার কিনারে লোকেরা যখন কবর খুদছিল তখন আমীর আলীর স্ত্রী সকলকে মাতম করে বলছিল— ও মরেনি— জীবিত ও। তোমরা সবে পাগল হয়ে গেছ। খোদার দিকে চেয়ে ওকে পরখ করো। তোমাদের হল কি। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে তোমরা দাফন করেছ।' সলীমের বাযু ধরে লাশের কাছে টেনে নিয়ে বলল— ভাই। খুব ভালো করে দেখো, ওরা পাগল হয়ে গেছে, ও জিন্দা, আমার স্বামী জীবিত, কেউ তাকে মারতে পারবে না।

ঃ ঠিক বলছ তুমি বোন আমার! ও জীবিত। শহীদ মরে না।

দাউদ ও আমীর আলীকে দাফন করে কবরের পাশে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল সলীম। কে যেন ওর কাঁধে হাত রেখে বলল— দাউদ আপনার ভাই বুঝি?

ঃ দাউদ ও আমীর আলী উভয়েই আমার ভাই। বলে সলীম দু'কবরের মাঝে বসে পড়ল।

মুসীবত ও নিষ্ঠুরতার যে সয়লাব সুস্থাবস্থায়ও প্রতিরোধ করে যাওয়া হচ্ছিল—টুটে গেল তা। বেশ কিছুদিন হালকা জ্বরের প্রকোপ ছিল। এতদসত্ত্বেও জাতির চিন্তার সামনে ওটা তেমন একটা প্রাধান্য পায়নি সলীমের। নৌকা পারে ভিড়লে জনতা ওতে চড়ার

www.amarboi.org

প্রতিযোগিতা করে বিশৃঙ্খলা করত— সলীম পরিস্থিতি আয়ত্ত আনত ঘন্টার পর ঘন্টা উপকূলে দাঁড়িয়ে থেকে। ওখানের কাজ সেরে রোগির সেবা করত। বাদ এশা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত ক্যাম্পের আশেপাশে টহল দিত। প্রহরীদের বলত চৌকস থাকতে। খানা দস্তরখানে পেট পুরে না খেয়ে খেয়াল রাখত— শরণার্থীদের কেউ না খেয়ে আছে কি-না! নিকট দূরে কোথাও হামলা হলে ছুটে যেত সেখানে। দাউদ প্রায়ই ওকে বলত– সলীম! তুমি আরাম করো। তোমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে— রং হলুদ হয়ে যাচ্ছে।

সলীম জবাব দিত— আমি সুস্থ। তোমাকে আমার চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু আজ ও দাউদের কবরের সামনে বসে আফসোস করছিল— হায়! আজ যদি দাউদ বলত, 'সলীম! তুমি ঘুমাও।' নিজকে বড় অসহায় মনে করছিল। ভাবতে ভাবতে এক সময় ওখানেই শুয়ে যায় ও। স্বপ্নঘোরে চলে যায় শৈশবের সেই সোনালী তটে যেখানে দাউদ, মজীদ, জালাল ও বশিরের সাথে লকলকিয়ে ওঠা গম ক্ষেতে খেলা করত। ওদের সাথে দল বেঁধে যেন পাখির বাসা উদ্ধার করছিল। রকমারী ফুলের স্তবক তৈরি করছিল। স্বপ্নপুরীতে দেখতে পায়, বাড়ীর মহিলাদের মাঝে বসে গল্প শোনাচ্ছে। চাচা ইসমাঈল হাসির আসর জমাচ্ছেন, হাজারো নারী-পুরুষ হো হো করে হাসছে। আচমকা চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আগুন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে।

ঃ সলীম! সলীম!! কেউ ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলে। ধড়ফড়িয়ে উঠল। অনেক নারী-পুরুষ ওর পাশে সমবেত। এক লোক পানির পেয়ালা উঠিয়ে বলল— নিন! আপনি তলব করছিলেন।

সলীমের কণ্ঠনালী শুষ্ক। পেয়ালা মুখে ছোঁয়াল, পানি পান করে যমীনে শুয়ে বলল— খুব সম্ভব স্বপ্নেই পানি চেয়েছি আমি!'

শ্বেত-শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট এক লোক ওর মাথায় হাত রেখে বললেন— বেটা! তোমার জ্বর। হল, তোমাকে আমার ঘোড়ার পিঠে করে নিয়ে যাই।' আমীর আলীর চাচা এ লোক।

সলীম তাকে প্রশ্ন করল— কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?

ঃ আমরা ব্রীজের দিকে যাচ্ছি। আপনার লোক বেলুচ রেজিমেন্টের জনাচারেক সেপাই নিয়ে পৌছে গেছেন।

সমবেত লোকদের মধ্যে গোলাম আলী ও বেলুচ রেজিমেন্টের জনৈক হাবিলদারকে দেখে সলীম আবারো উঠে বসল।

গোলাম আলী বলল— পুলের কাছে যেয়েই ওনাদের পেয়ে যাই।

হাবিলদার বললেন— আমাদের কাপ্তান সাহেব সন্ধ্যার পূর্বেই আপনাদেরকে ব্রীজে পৌছুতে বলেছেন। তিনি একটা কাফেলা নিয়ে চলে গেছেন। আপনার হেফাযতের জন্যই ওনার আমাকে পাঠানো। জলদি তৈরী হোন।

এক ঘন্টা পর প্রায় ১০ হাজার লোকের কাফেলা ব্রীজাভিমুখে রওয়ানা হল। কিন্তু প্রায় দেড় হাজার লোক অসুখ, ল্যাংড়া-লুলা থাকায় তাদের চলা মুশকিল হল। এরা চলার উপযোগী নন। চলমান লোকদের দিকে এরা কেবল অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

www.amarboi.org

প্রিয়জনেরা এদের ছেড়ে যেতে চাচ্ছিল না। সলীম সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, সকাল নাগাদ সকলেই ওপারে পৌঁছে যাবে। ব্রীজ পার হয়ে আপনারা এদের নিয়ে যাবেন। সলীমের পরামর্শে ওর বেশ কিছু সাথী তাদের ঘোড়া নারী-শিশুদের দেয়।

বেশ কিছু নওজোয়ান সলীমকে প্রচণ্ড জ্বরের মুখে ফেলে যেতে চাচ্ছিল না। ওদের আপীল-আকুতির জবাবে সলীমের জবাব একটাই— এ ক্যাম্প খালি না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না।

গোলাম আলী, সাদেক ও বেশ কিছু লোক আমৃত্যু সলীমের সাথে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করল। বিদায় বেলা হাবিলদার সলীমকে লক্ষ্য করে বলল— আপনার সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই শুনেছি। বহুত বড় কাজ করেছেন আপনি। এখন আমাদের সাথে চলুন। ক্যাপ্টেনের অনুমতি ছাড়াই আমার দু'লোক আপনার এখানে রেখে যাচ্ছি। সলীম বলল— আপনার লোকদের সর্বস্থানেই জরুরত। আপনারা আমাদের জন্য কিছু করতে চাইলে ক'রাউন্ড বন্দুকের গুলি দিয়ে যান।

হাবিলদার কোন কথা না বলে পেটি থেকে ক'রাউন্ড গুলি বের করে সলীমের সামনে রেখে দিলেন। বললেন— অল্প-স্বল্প বারুদ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক পারাপার করবেন। এজাযত পেলে আমি খোদ্ ওখানে পৌঁছে যাব।

সলীম বলল— আপনাকে আর একটা তকলীফ দিতে চাই।

ঃ আমি এক মুসলমান। আপনি যা করেছেন তাতে আমাকে হুকুম দিতে পারেন।

ঃ আমাদের টোটা-ফাটা বন্দুকগুলো আপনারা নিয়ে যান। এক্ষণে হয়ত বাদবাকী লোকদের হেফাযত করা যাবে। এক একটা লোকের জন্য আমাদের কয়েকটা জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। এদেরকে কওমের আমানত মনে করবেন। কওমের কাছে এক্ষণে এছাড়া আর চাওয়ার কিছু নেই।

কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেলে নদী তীরে মাঝিদের লক্ষ্য করে সলীম বললো- ভাইয়েরা! এবার তোমাদের শেষবার পারাপারের পালা। খোদার দিকে চেয়ে হামলা হবার পূর্বে এদের পর করে নাও। জানি, তোমরা শ্রান্ত-ক্লান্ত। আমরাও তেমন।' বলে সলীম যমীনে পড়ে গেল।

সাদেক অগ্রসর হয়ে সলীমের নাড়ীতে হাত রাখল। বলল— গোলাম আলী! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। এসো তাকে পার করি।

ঃ না না! তোমরা ওদের চিন্তা করো। আমি সুস্থ্। কাজ করো। লোকদের একত্র করো। তরকারীর খালি টুকরিগুলোতে বালি ভরো। নদী তীরে তিন চারটা মোর্চা বানাও। গোলাম আলী ও সাদেক সলীমকে গাছের ছায়ায় শুইয়ে মোর্চা বানাতে লেগে গেল।

ফকিরুদ্দিন মাঝি সাথীদের বলছিল— ভায়েরা! আজ আমাদের অগ্নিপরীক্ষা। কসম খোদার, এ লোকগুলো পার না হওয়া পর্যন্ত আমার ঘুম হারাম।

মধ্যরাতে মাঝিরা হাজার খানেক লোককে পার করে সেরেছিল। ব্রীজ পার হয়ে অনেক লোক আত্মীয়-স্বজনকে নিতে ওপারে এসে পৌঁছেছিল। এখন বাকী মাত্র শ'

www.amarboi.org

পাঁচেক মানুষ। মাঝিদের ধারণা, শেষ রাতের মধ্যেই এদের পার করা সম্ভব। কিন্তু রাত ১২টার দিকে নতুন আরো দেড়শ' মুসলমান এসে যোগ দিল। শহীদদের দাফন শেষে এরা এ ক্যাম্পে শামিল হয়েছে। মাঝিদের যারা ওপারে ছিল, এ খবর শুনতেই তারা নৌকা ছাড়ল। ফকিরুদ্দিন সলীমকে পার করতে পীড়াপীড়ি করছিল। কিন্তু বাঘের বাচ্চার জবাব বাঘের মতই— আমার হাত এখনও বন্দুক চালনার শক্তি রাখে।

✪ ✪ ✪

রাত একটা।

এপারে বন্দুকের টর্ টর্ আওয়াজ হচ্ছে।

এ সময় তিনজন লোক দ্রুত মাঝিদের কাছে এসে দাঁড়াল। এদের ফৌজি উর্দি দেখে মাঝিরা ভিড় করল।

জনৈক নওজোয়ান সাথীদের বলল— এরা সংখ্যায় তিন।' অতঃপর সে মাঝিদের বলল— আমাদেরকে জলদি পার করে দাও।

জনৈক মাঝি জবাব দেয়— কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনারা তিনজন ওপার গিয়ে কি করতে পারবেন। এলেন যদিও— তাও মাত্র তিনজন। রাইফেল দেখছি দু'টো মাত্র। ওখানে হয়ত পুরো ফৌজ গুলিবর্ষণ করছে।

ঃ খোদার দিকে চেয়ে আমাদের সময় নষ্ট করো না।

নওজোয়ানের এক সাথী বলল— কাপ্তান সাহেব! ওরা এভাবে বললে মানবে না। ওদের সাথে আমাদের কথা বলতে অনুমতি দিন।

ফকিরুদ্দিন মাঝি আগ বেড়ে বলল— ভাই সাহেব! আপনারা নারাজ হবেন না। কাপ্তান সাহেবের সিপাহি ওপারের হালত দেখে গেছে। ওখানে কেবল যখমী ও অসুস্থ মানুষ আছে। তারা ক'রাউন্ড গুলি দিয়ে যাওয়ায় পাঁচ-ছ'জন লোক শিখ জানোয়ারদের রুখে যাচ্ছে। শিখরা গুলিবর্ষণ করছে। ওই বারুদ খতম হয়ে গেলে ক'মিনিটেই ক্যাম্পে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। কাপ্তান সাহেব! এলেনই যখন, হাতে কিছু নিয়েই আসতেন।

নওজোয়ান বলল— ভাই! আমি সোজা লাহোর থেকে এসেছি। কিছুই জানতাম না। এখান থেকে দু'মাইল দূর পর্যন্ত জীপ চলার রাস্তা নেই। ওখান থেকে শুনতে পাই সেপাইগণ ওদেরকে ব্রীজে নিয়ে গেছে। রয়ে গেছে যারা তাদেরকে তোমরা নৌকা করে পার করছ। প্রিয়জনের তালাশে এসেছি আমি। শুনলাম, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে ওখানেই থাকবে। সলীম আমার সেই প্রিয়জন। হয়ত তোমরা তাকে চিনে থাকবে।

সলীমের নাম শুনতেই অনেক লোক ওখানে জমা হোল। ফকিরুদ্দিন বললেন— কাপ্তান সাহেব! উনি অসুস্থ। কিন্তু পাহাড় উঠিয়ে আপনি ওপারে নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু তাকে টলাতে পারবেন না।

ঃ আমি এক ডাক্তার। পার করে দাও। হয়ত জীবন বেঁচে যেতে পারে তার।

ঃ আসুন।

www.amarboi.org

ফকিরুদ্দিন নৌকার দড়ি খুলল। চাঁদনী আলোয় নদীতীরে লোকের হুজ্জুম দেখতে পেল ওরা। সে বলল— কাপ্তান সাহেব। খুব সম্ভব বেলুচ রেজিমেন্টের সেপাই আসছে। কাপ্তান বললেন— পেছনে দেখো না, জলদি বৈঠা মারো।

খানিক দূর চলার পর ফকিরুদ্দিনের জনৈক সাথী হাঁক ছেড়ে বলল— ফকিরুদ্দিন! ফকিরুদ্দিন!! দাঁড়াও! .....সেপাই এসেছে।'

ফকিরুদ্দিন কতকটা থতমত খেয়ে জবাব দেয়— অন্য নৌকায় করে তাদের পার কর! আমি স্রোতধারায় পড়ে গেছি।

আরো কদ্দুর চলার পর ফকির মিয়া বলল— এখানটায় কোমর বরাবর পানি। এখানেই নামতে হবে আপনাদের। নৌকা দূরে থামিয়ে আপনাদের অপেক্ষা করব।'

এক হাতে ব্যাগ অপর হাতে পিস্তলসহ নৌকা থেকে নামলেন কাপ্তান। ক্যাম্পের নারী-পুরুষ মাটিতে শোয়া। তাদের সামনে বালির তিনটা মোর্চা। দেড়শ গজ সামনে থেকে হামলাবাজরা গুলি চালাচ্ছে। মোর্চার ভেতরে থেকে মুসলমানরা এক্কা-দোক্কা ফায়ার করছিল।

কাপ্তান ও তার সাথীরা বালিতে শুয়ে শুয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। উপকূলে শায়িত লোকজন আশার আলো দেখতে পেয়ে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। এক লোক ভুলবশত রাইফেল ছিনিয়ে নিতে চাইল এদের। বলল— তোমরা? সেপাই একথায় হয়রান হয়ে গেল। কাপ্তান যিনি আগে বেড়েছিলেন পেছনে ফিরে বললেন— ভাই! ওপার থেকে এসেছি আমরা। ওদিকে দেখো ফৌজ আসছে।' লোকেরা মাঝ নদীতে তাকাচ্ছিল। আট-দশ গজ দূরে দুশমনের মর্টার বোমা ফাটল। নারী-পুরুষের আর্তনাদ ভেসে এল। ভগ্নোৎসাহ লোকটা বন্দুক ছেড়ে বলল— ভাই! মাফ করবেন! আমি আপনাদের দুশমন ভেবেছিলাম।

কাপ্তান একটা মোর্চার সামনে গিয়ে ডাকলেন— সলীম! সলীম!!

ঃ কে?' এক লোক পেছনে ফিরে প্রশ্ন করে।

ঃ আমি সলীমের তালাশে এসেছি। কোথায় সে?

ঃ সলীম ওই মোর্চায়।' ডান দিকে ইশারা করে বলল সে, আপনারা সেপাই বুঝি! দাঁড়ান! আমায় কিছু বারুদ দিয়ে যান।

কাপ্তানের ইশারায় তার এক সেপাই মোর্চায় বসে গেল। তিনি গেলেন ডান মোর্চায়। একটা গুলি মাথার চুল স্পর্শ করে আরেকটা বাযু ছুঁয়ে শাঁ করে চলে গেল।

মর্টারের দু'টো গোলা পরপর বিস্ফোরিত হল। লোহার একটা টুকরো ওই সেপাইয়ের বাযুতে বিধল।

ঃ সলীম! সলীম!! মোর্চার কাছে গিয়ে কাপ্তান ডাকেন। কিন্তু সলীমের স্থলে আরেক লোক কথা বলায় কাপ্তানের মন মুষড়ে পড়ল।

ঃ তুমি কে? সলীম বেহুঁশ।'

www.amarboi.org

কাপ্তান জবাব না দিয়ে অগ্রসর হল। কাপ্তান রাখেন ওর নাড়ীতে হাত। বলেন— কখন থেকে বেহুঁশ সে?

ঃ এইতো কিছুক্ষণ হল। বোমের টুকরো তার রানে বিধেছে। কিন্তু বেহুঁশীর কারণে যখমের চেয়ে জ্বর বেশী। সকাল থেকেই কষ্ট পাচ্ছে সে। তা আপনারা কোত্থেকে?

ঃ বহুদূর থেকে।

ঃ নৌকা করে নদী পার হয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ নৌকা ছেড়ে না গেলে খোদার দিকে চেয়ে তাকে পার করুন। আমাদের বারুদ নিঃশেষ।

ঃ আমার কাছে যথেষ্ট বারুদ আছে।'

কাপ্তানের সঙ্গী মোর্চায় বসে বন্দুক তাক করতে গিয়ে বলল— ডাঃ সাহেব! পেছনের নৌকাটায় ফৌজ এসে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ময়দান খালি হয়ে যাবে। গুলি বৃষ্টির সামনে তাকে বের করা মুশকিল হবে। মোর্চায় বসা দু'লোক সমস্বরে বলল— ফৌজ আসছে কি সত্যিই?

ঃ হ্যাঁ! কাপ্তান জবাব দেন এবং সলীমের রাইফেল নিয়ে মোর্চায় বসেন।

মোর্চার একলোক উঁচু হয়ে দরিয়ার দিকে তাকায়। বলে— নৌকা বোধহয় নামায় যাচ্ছে। বোধহয় ডান দিক দিয়েই তারা হামলা করবে।

মর্টারের গুলি বের হতে লাগল। টর্‌টর্‌। দু'মিনিটের মধ্যে শিখ জানোয়াররা এ বলে রণেভঙ্গ দিল যে, 'ফৌজ এসে গেছে, ফৌজ এসে গেছে, বেলুচ রেজিমেন্ট তোমাদের ঘিরে নিয়েছে।'

www.amarboi.org

চতুর্থ খণ্ড

জাতি হে।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

৪

সংজ্ঞা ফিরে নিজকে দুগ্ধ ফেননিভ বিছানায় শায়িত দেখল সলীম। কক্ষের ছাদে বিজলী বাল্ব। তন্ময় হয়ে সলীম এদিক-সেদিক তাকায়। এ কোথায় আমি ? আস্তে আস্তে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়— হাঙ্গামার মধ্যে বন্দুক চালাচ্ছিল ও। ' পেরেশানি আর অস্বস্তিতে চোখ বুজে ফেলে ও। দেমাগ ঝিম ধরে যায়। নারী-শিশুর আর্তনাদ আর বন্দুকের টর্ টর্ আওয়াজ কানে গুঞ্জরিত হয় ওর। চোখ বুজে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ ও। চোখের সামনে ভেসে ওঠে জনপদের অগ্নিশিখা। অতঃপর দেখে আগুন কমে আসার দৃশ্য। সলীম আবারো হুঁশ ফিরে পায়। বন্দুকের টর টর ও নারী কণ্ঠের আর্তনাদের স্থলে ওর কানে এবার টেবিল ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ আসে। আবারো চোখ বন্ধ করে— এ কোথায় আমি? দিল-দেমাগে প্রতি মুহূর্তেই এ প্রশ্ন। বিছানা ওঠাল, কিন্তু প্রশ্নের জবাব নেই। বাঁহাতের ঘড়ি টিক টিক করছে। সামনে দু'টো খিড়কি পথ উন্মুক্ত। সেখান থেকে বেলকনিতে বেয়ে ওঠা বেলি ফুলের ঝুলন্ত গাছ। খিড়কির কাছে টিপয়ে পানির ঘড়া ও কাঁচের গ্লাস। বাইরের মৃদুমন্দ বাতাস ভেতরে আসছে। শির শির করে উঠছে সে বাতাসের ঝাপটায় বৃক্ষ-তরুলতাদির পাতা। পার্শ্ব পরিবর্তন করার কোশেশ করে সলীম। কিন্তু তকলীফ বোধ করে ও। বাঁহাত হাতড়ে দেখল সেখানে পট্টি বাঁধা। এবার ওর বিশ্বাস হয়, দরিয়ার কিনারের আখেরী দৃশ্য স্বপ্ন নয়। হামলায় সময় গোলাম আলী ও সাদেকের সাথে ও মোর্চায় বসেছিল। এরপর হয়ত গুলি লেগেছিল। না ..... হয়ত নিকটেই বোমা পড়েছিল। কিন্তু ...... এরপর? কোথায় সেই দরিয়া? কোথায় সঙ্গী-সাথীরা? খুব সম্ভব শিখদের কারাগারে আমি? কিন্তু এ বিছানা, বিজলী বাতি। শিখরাতো লাশ বিকৃত করে ফেলে। কিন্তু ওরা আমায় জীবিত রাখল যে? কোনক্রমে ডান পার্শ্ব পরিবর্তন করে ও কাছেই চেয়ারে জীবন্ত কেউ ঝিমুচ্ছে। আবারো ওর মাথা চক্কর দেয়। এবার বেহুঁশির মাত্রা কম হল পূর্বের তুলনায়। মিনিট পাঁচেক পর হুঁশ ফিরে পেয়ে মনে মনে বলে— এটা স্বপ্ন। নিছক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। না, না— এটা স্বপ্ন হয় কি করে? টেবিল ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে সাড়ে চারটা বাজার সংকেত দেয়। ওপাশের টেবিলটায় ওষুধ ও ব্যাণ্ডিজ সামগ্রী। বাল্বের উজ্জ্বল আলোতে কামরা আলোকিত। ঐতো বেলী ফুলের ঝাড়। বাতাসে ওর পাতা করছে শির শির। এখন জীবিত সলীম। সুস্থ, কিন্তু বাঁ হাতের ব্যথাটা করছে টন টন। জীবনের জীবন্ত বাস্তবতা ওর সম্মুখে— ইসমত ওর দু'বিঘত দূরে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। কুরসীর হাতলে বিছানো ওর একখানা হাত সলীমের দিকে বিছানো। ইচ্ছে করলে সলীম ছুঁতে পারে। 'ইসমত আমার ইসমত: জীবন আমার, আমার রূহ!' চিৎকার দিয়ে বলতে চাচ্ছিল সলীম। কিন্তু আওয়াজ কণ্ঠনালীতেই আটকে থাকল। মোহাচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন ও।

পৌনে পাঁচটা বেজে গেছে। এক সময় পাঁচটা বেজে গেলে ঘড়ির এলার্ম বেজে ওঠে। চকিতে চোখ খোলে ইসমত। দ্রুত এলার্ম বন্ধ করে ও। অতঃপর তাকায়

www.amarboi.org

সলীমের দিকে, আচানক ওর দিল-দেমাগের গোটা অনুভূতি দু'চোখে জমা হয়। কম্পিত দু'ঠোঁটে উচ্চারিত হয়— আল্লাহর অশেষ শোকর।' পর মুহূর্তে দু'চোখ বেয়ে নামে অশ্রু। চেহারা দু'হাতে ঢেকে নেয়— 'আল্লাহ! তোমার শোকর জানানোর ভাষা নেই, আমার মাবুদ! তুমি মহান ইসমত ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ঃ আমি সুস্থ ইসমত। আমি সুস্থ, ক্ষীণ কণ্ঠে বলে সলীম। চোখের আঁসু ওড়নায় মুছে ইসমত উঠে দাঁড়ায়। টেবিল থেকে থার্মোমিটার উঠিয়ে বলে— আমি আপনার টেমপারেচার দেখতে চাই।

ঃ স্বপ্ন না হলে বল— এ কোথায় আমি ?

ঃ লাহোরে।

ঃ লাহোর। কিন্তু কি করে ?

ঃ 'ইনজেকশন দিয়ে নেই, পরে সব কিছু বলব।' বলে ইসমত ইনজেকশন প্রস্তুত করে।

ঃ ইসমত।

ইসমত ঘুরে তাকায়। সলীম ফের বলে— দাঁড়াও ইসমত! খানিক বসো না এখানে!

এই কথায় বিশেষ আকুতি ছিল, ছিল অনুনয় ও দরখাস্ত। ইসমত চেয়ারে বসে গেল। সলীম বলল— বলো না ইসমত! কি করে এলাম এখানে ?

ঃ ভাইজান আরশাদ আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, দিল্লী থেকে ফিরেই তিনি আপনার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। আপনাকে ওখান থেকে বেহুঁশ অবস্থায় উদ্ধার করেন।

ঃ কিন্তু অপেক্ষমান শরণার্থীদের ভাগ্যে কি হয়েছে? কি জুটেছে নারী-শিশু ও যখমীদের ভাগ্যে? সলীম শোক-তাপে চোখ বন্ধ করল।

ঃ ভাইজান বলেছেন, ওখানে মুসলিম সেপাই পৌঁছে গিয়েছিল। শিখদের মেরে তাড়িয়ে ওদের নিয়ে আসে।

ঃ ফৌজের সেপাই। হায়! বাস্তবেও যদি তাই হত— বলে চোখ খোলে সলীম।

ঃ এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি আমি। আপনার সঙ্গীদের অনেকেই দেখতে আসে, আজো কেউ আসতে পারে। আপনি সত্যাসত্য জেনে নেবেন তাদের থেকে।

ঃ কতদিন ধরে আমি এখানে ?

ঃ এগার (১১) দিন।

ঃ ১১ দিন! আমি এগার দিন ধরে এখানে পড়ে আছি ?

ঃ না, আজ সাত দিন। এর পূর্বে হাসপাতালে ছিলেন। অপারেশনের পর ভাইজান এখানে নিয়ে এসেছেন। ওখানকার ডাক্তার-নার্সদের দম ফেলার ফুরসত নেই। যখমীদের ভীড়ে হাসপাতালের বারান্দাও পূর্ণ।

ঃ আরশাদ কোথায় ?

আরশাদ ও আব্বাজান বেলকনিতে ঘুমুচ্ছেন। রাত দু'টোয় ক্যাম্প থেকে ফিরেছেন তাঁরা। ক'দিন ধরেই তাঁদের এ তাড়া।

ঃ বিগত সাত দিন ধরেই তাহলে আমি বেহুঁশ?

www.amarboi.org

ঃ জ্বি হ্যাঁ! আপনার প্রচণ্ড জ্বর। কাল সন্ধ্যার দিকে টেমপারেচার ছিল ১০৪°। রাত দু'টোয় ভাইজান দেখেছেন, তখন তা ১০৩°-এ নেমেছিল। সে প্রথম তিনি শান্ত হন।

ঃ তাহলে বড় ধকল যাচ্ছে তোমার ওপর দিয়ে!

ঃ ধকল! আমার আবার ধকল! ইসমত এর চেয়ে বেশী কিছু বলল— না। হাসি ওর মুখে। চোখে মুক্তো দানার চিকচিকি। চোখ রগড়াতে রগড়াতে রাহাত কক্ষে প্রবেশ করল। ঘড়ির দিকে নযর দিয়ে বলল— আপাজান! সোয়া পাঁচটা বাজে। আমাকে জাগালেন না কেন? আজ আবার বিনিদ্র কাটালেন। আরাম করুন!

ইসমত বলল— রাহাত! উনি সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন।

রাহাত অগ্রসর হয়ে সলীমের দিকে তাকাল। খুশীতে ঝিলিক মারছে ওর চেহারা। সলীমকে অনেক কিছু বলতে চাচ্ছিল রাহাত। রোজানা ও ভেবেছে, সলীমের হুঁশ ফিরে এলে অনেক ঘটনা তাকে বলবে। অগণিত প্রশ্ন করবে। তাকে বলবে— ভাইজান! আপনি এতদিন বেহুঁশ ছিলেন। বেহুঁশ অবস্থায় বিড় বিড় করেছেন। অমুক অমুকের নাম ধরে ডেকেছেন। অমুক দিন প্রচণ্ড জ্বরের প্রকোপে আমার দিকে চেয়ে বলেছেন— যুবায়দা! পালিয়ে যাও। ওরা মহলে আগুন লাগাচ্ছে। অমুক দিক ভাইজান আপনার নাড়ীতে হাত রাখলে বলেছিলেন— দাউদ! শুয়ে পড়ো, গায়ে গুলি লাগবে। অমুক রাতে ইসমত সেজদাবনত চিত্তে দোয়া করেছেন। লাহোরে লাখো মানুষের ভিড়। ক্যাম্পে যখমী ও শিশুর আর্তনাদ। হিন্দুস্তান থেকে এতটা গাড়ী কেবল লাশে ভরপুর ছিল। বলব বলে ভেবেছিল— আপনার থেকে জুদা হবার পর ইসমত কেমন ছিল। কি শব্দে দোয়া করত।" কিন্তু এখন সলীমের হুঁশ ফিরেছে, কিন্তু রাহাত খামোশ।

ইসমত বলল— বসো রাহাত!' ইসমত নিজেও একটা চেয়ার টেনে বসল। রাহাত বলল— ভাইজান! কেমন লাগছে আপনার?

ঃ 'ভালো!' জবাব সলীমের।

আঁধারের কালো পর্দা সরছে। ফুটে ওঠছে দিনের রেখা। আরশাদ কামরায় ঢুকল। ওর চোখ নিদ্রা ঢুলঢুলু। শরীর আড়মোড়া দিয়ে হাই তুলে অগ্রসর হয় ও। রাহাত ঠায় দাঁড়িয়ে, আরশাদ বলে— তোমরা দু'জন সজাগ? জ্বর কমেছে কি একটু?

ঃ ভাইজান! উনি এখন সুস্থ। হুঁশ এসেছে! বলল রাহাত।

আরশাদ সলীমের নাড়ীতে হাত রেখে বলল— ইসমত! তুমি টেমপারেচার নিয়েছ?

ঃ হ্যাঁ, ভাইজান! এখন ১০১° ডিগ্রী। ইনজেকশনটা দিয়ে দিন। 'বলে ইসমত উঠে দাঁড়িয়ে ইনজেকশন সামগ্রী প্রস্তুত করতে লাগল।'

আরশাদ নাড়ী ছেড়ে ললাটে হাত রেখে বলল— এখন তোমার কেমন লাগছে সলীম?

ঃ আগে বলো, উপকূলের যে লোকজন আমার সাথে ছিল তাদের কি হয়েছে?

ঃ সকলেই পাকিস্তান পৌঁছেছে।

ঃ ফৌজের সেপাই নিয়ে গিয়েছিল যে— সে তুমি?

www.amarboi.org

ঃ আমার সাথে কেবল দু'জন লোক ছিল। কিন্তু আমরা উপকূলে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে জনৈক হাবিলদার ৮ জন বেলুচ রেজিমেন্ট ফৌজ নিয়ে উপস্থিত। তারা দিবালোকে কাফেলা নিয়ে যায়। তুমি তাকে ফালতু বন্দুক দিয়েছিলে, মনে পড়ে?

ইনজেকশন পুশ করার পর আরশাদ সলীমের যখমে নয়া ব্যাণ্ডিজ বেঁধে দিল। ততক্ষণে ডাঃ শওকতও বিছানা ছেড়ে কামরায় আসেন। বিগত তকলীফ ও পেরেশানির দরুন তিনি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁকে চেনাই মুশকিল। এতদসত্ত্বেও সলীমকে সুস্থ দেখে তার মুষড়ে পড়া চেহারায় সজীবতা এল। তিনি বললেন— ইসমত বেটি! এখনই ওকে খত্ লিখে দাও যে, সলীম আমাদের কাছে। ও বড্ড পেরেশান, গত পরশু ওর খত্ এসেছে।

ঃ কার খত্? চকিতে প্রশ্ন করে সলীম।

ঃ আমেনার খত্। ও তোমাকে নিয়ে খুব পেরেশান।'

ঃ আমেনা জানে, আমি এখানে?

ঃ না! ও এখনও জানে না। আমি এখানে পৌঁছেই টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে যাই। এ জন্য বিস্তারিত জানাতে পারিনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নেতা ও প্রশাসকদের কাছে কটা পত্র লিখি? কিন্তু কেউ আমায় সান্তনাদায়ক জবাব দেননি। আমেনার খেয়াল ছিল, নৌকা থেকে আমরা আমেনাদের বাসায় উঠব। ও ওখানে পত্র লিখে তোমার কথা জানতে চায়। আমেনার জবাব না পেয়ে হতাশ আমরা। তুমি এখানে আসার দু'দিন পূর্বে আমেনার স্বামীর পত্র পাই। উত্তর দেরী হবার কারণ ওর স্বামীর অনুপস্থিতি। তোমাদের জনপদের একজন জানিয়েছে, মজীদ শিয়ালকোটে এক পরিবারের চিকিৎসার আওতায় আছে। আমেনার সাথে ওর স্বামী ওখানে গেছে।

ঃ মজীদ সম্পর্কে তারা আর কিছু লিখেছে ?

ঃ মজীদ সম্পর্কে ওরা ভালো বলেই লিখেছে। আমেনা ওকে নিয়ে আসবে।

ঃ মজীদ তাহলে এখন আমেনার ওখানে ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আপনি আমার সম্পর্কে কি লিখেছেন ?

ঃ তোমার তবিয়ত তখন ভালো ছিল না। এ জন্যে ওকে পেরেশান করতে চাইনি। তুমি ভালো হলে ওকে নিয়ে আসব বলে স্থির করেছি। ইসমত তুমি আজই একটা পত্র লিখে দাও।

সলীম বলল— না, আমিই ওখানে যাব। আমেনাকে মজীদের কাছে থাকা দরকার।

আরশাদ বলল— হ্যাঁ, আব্বাজান! মহিলাদের জন্য গাড়ীতে সফর করা মুশকিল। চারিদিকেই কলেরা! আমি ওকে সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখছি।

এরপর দশদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। সলীমের যখম চাঙ্গা হয়ে উঠছে। এক সকালে ও বিছানায় শুয়েছিল। ইসমত ও রাহাত কব্রিডোরে নামায আদায় করছে। খিড়কির সামনে চড়ুই পাখি কিচির-মিচির করছে। দুটো চড়ুই দরোজার উপর বসা।

www.amarboi.org

সলীম দেখছে এ দৃশ্য। আরো কিছু চড়ুই ওখানে জমায়েত হল। শোয়া থেকে উঠে দাঁড়াল সলীম। চড়ুই গেল উড়ে। করিডোরে লঘু পদধ্বনি শোনা গেল। সলীম টিপয়ে থেকে থার্মোমিটার তুলে নিল এবং তা মুখে পুরে দিল।

ইসমত কামরায় প্রবেশ করল। সলীমের মুখে থার্মোমিটার দেখে ওর মুখে চিলতে হাসি ফুটে ওঠল। সলীম হাতের ইশারা করতেই ও চেয়ারে বসে গেল। রাহাত ভেজানো দরোজা ঠেলে বলল— আপা! নাশ্‌তা তৈরী করব কি ?

ঃ হ্যাঁ, জলদি করো।

রাহাত সলীমকে বলল— কেমন লাগছে ভাইজান ?

মুখ থেকে থার্মোমিটার বের করে ইসমতকে দিলে সে বলল— আসলেই আপনি সুস্থ।

ঃ ডাক্তার সাহেব ও আরশাদ চলে গেছে ?

ঃ তাঁরা আজ রাতে আসবেন না! ক্যাম্পে যখমীর সংখ্যা বেশী। কলেরা মহামারী আকার ধারণ করেছে। এভাবে বসলে আপনার তকলীফ হবে। আপনার জন্য তাকিয়া নিয়ে আসছি। ইসমত উঠে ওপাশের কামরায় চলে গেল।

খিড়কিতে চড়ুই পাখি আবারও জমায়েত হল। ইসমত তাকিয়া নিয়ে এলে হাতের ইশারায় তাকে ঢুকতে নিষেধ করে সলীম। পেরেশান হয়ে লঘু পায়ে আগে বেড়ে ইসমত বলে— কি হল? চড়ুই পাখি আচমকাই উড়ে গেলে সলীম বলল— তুমি ওদের ভয় দিয়েছো।

ঃ ওহ্‌হো! চড়ুই পাখির কথা বলছেন! আপনি যখন বেহুঁশ তখন ওরা আপনার বিছানায় বসত।

ঃ আমাদের বসতীর চড়ুই পাখিরা আমায় ভয় পেত না। বাল্যকালে কাকের সাথে আমার এতই সখ্যতা ছিল যে, ওরা আমার হাত থেকে রুটির টুকরো নিতে ভড়কাত না। চড়ুই পাখির ছানা বাসা থেকে পড়ে গেলে আমি ওগুলো বাসায় তুলে দিতাম। আমাদের বাড়ীতে রকমারী পাখির আনাগোনা ছিল। বর্ষা মৌসুমে ছাদে ওদের জন্য নীড় বানাতাম। মজীদ মাঝে মধ্যে ওদের ধরার জন্য ফাঁদ পাতত। এ নিয়ে ওর সাথে বাঁধত বচসা। আমি বলতাম, এ পাখি আমার। তুমি পারলে বাইরের থেকে ধরে আনো। ইসমত, ভাবছি ওই পাখিগুলো এখন কি ভাবছে। কে শুনবে ওদের কূজন। ওরা ছাইভস্ম দেখে থাকবে— ওরা হয়ত ধারণা করতে পারবে না যে, এটা এক সময় জনবহুল বসতী ছিল, সলীম আচানক খামোশ হয়ে গেল। ইসমত ওর দিকে অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে। এ পর্যন্ত জনপদের কাহিনী বলা থেকে নিজকে বিরত রেখেছে সলীম। কেউ এ প্রশ্ন ওঠালে সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেত। কিন্তু চিরাচরিত অভ্যাসের বাইরে আজ ও নিজের পক্ষ থেকে ওই প্রসঙ্গ তুলেছে। ইসমত বলল— আমার জিজ্ঞাসা করার অধিকার আছে মনে করলে আমাকে পুরো কাহিনী শোনাতে পারেন।

সলীম বলল— ইসমত! আগে মনে করতাম, কেবল চিত্তাকর্ষক কাহিনী বলার জন্য আমার জন্ম, আর তুমি কেবল ফুলের সাথে খেলা করতে; কিন্তু ছাইভস্ম ছাড়া আমার

www.amarboi.org

ঝুলিতে আর কিছু নেই। তোমার মনে আছে ইসমত। বাল্যকালে ভয়ানক কাহিনী শোনালে তুমি ভয় পেতে। তোমার চেহারায় ভীতিভাব লক্ষ্য করতেই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতাম। আমি তোমার চেহারায় মুচকি হাসি দেখার খায়েশ করে আসছি আজীবন। আমার মনে আছে, একবার তোমায় ভয় দেয়ার জন্যই ভয়াবহ কাহিনী শুনিয়েছিলাম, ওই কাহিনী প্রকৃতপক্ষে সাধারণ ঘটনা; কিন্তু কাহিনীর এক পর্যায়ে নায়ককে অজগরের মুখে পুরেছিলাম। কিন্তু তোমার চোখের পানি আমি সহ্য করতে পারিনি। তোমার চোখের পানি দূর করতে 'বজ্রপাতে অজগর মারা যায়' বলে কাহিনী শেষ করেছিলাম। আমার কাহিনী অজগর ও মানুষের কাহিনী। মানুষ গভীর ঘুমে অচেতন ছিল। অজগর তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। হায়! এদের ওপর যদি বজ্রপাত হত। তাহলে আমার কাহিনীর যবনিকাপাত ঘটত; কিন্তু ইসমত সেদিনটির অপেক্ষা করো, যেদিনটিতে আমি তোমার কাছে এসে বলব, আমরা অজগরের চোয়াল ছিঁড়ে ফেলেছি। মানবতার বস্তি থেকে আমরা ব্যাঘ্রদের তাড়িয়ে দিয়েছি।

ঃ আমি অজগর ও বাঘ দেখেছি। আপনার যে কোন কাহিনী শুনতে পারব। ওদিন বলেছিলেন, এ ছাইভস্ম আমার পুঁজি। কিন্তু ওটা স্রেফ আপনার নয়, পুঁজি আমাদের দু'জনার। আমি কেবল আপনার মুচকি হাসির হিস্যাদার নই, আপনার আঁসুতেও আমার হিস্যা থাকবে। আপনার জীবন চলার কানন কুঞ্জের ফুল যদি আমার জন্য থাকে তাহলে জ্বলন্ত খৈলানের অঙ্গারও থাকবে অভাগীর ভাগে। আপনি নিঃসঙ্গ নন। আব্বাজান বলতেন, কথা বললে আপনার মনের বোঝা হালকা হবে। আপনার খান্দান সম্পর্কে অন্যলোকের কাছে বেশ শুনেছি। কিন্তু আমার অভিযোগ যে, অদ্যাবধি আমাকে এ পর্যায়ের যোগ্য মনে করেননি যে, আপনার থেকে ওই কথা শুনতে পারি, মানুষ যা স্রেফ নিজের হিসাবে শোনে।

ঃ ইসমত! আমার হৃদয়ের আগুন হালকা করতে চাই না। কিন্তু তোমাকে বলব। আগাগোড়া সবই বলব।' বলে সলীম ওর কাহিনী বলা শুরু করল। ও যখন বাড়ীর শেষ দৃশ্য বয়ান করছিল তখন ইসমতের চোখে অশ্রুর বন্যা।

সলীম বলল— ইসমত! তুমি কাঁদছ ?

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপানো কাঁদার সুরে ইসমত বলল— এ আমার চোখের শেষ আঁসু।

বাইরে কারো পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আরশাদ কামরায় ঢুকে বলল— কি অবস্থা সলীম ?

ঃ ভালো।

আরশাদ ইসমতের দিকে তাকালে ও বলল—আজ জ্বরের তাপমাত্রা ৯৯°-তে নেমে গেছে।

ঃ ইনশাআল্লাহ ও ভালো হয়ে যাবে, নাশ্তা খাওনি তোমরা ? রান্নাঘর থেকে রাহাতের গলা শোনা গেল— নাশতা প্রস্তুত ভাইজান! এ আসছি।

ঃ আব্বাজান আসেননি ? প্রশ্ন ইসমতের।

www.amarboi.org

ঃ তিনি বেশ কিছুদিন আসতে পারবেন না। গত দুপুরে ওহাগা চলে গেছেন। শোনা গেছে, ওহাগায় দু'লাখ শরণার্থী পৌঁছুবে। ওই বিশাল কাফেলায় হাজারো মানুষ যখমী ও অসুস্থ।

নাশতা ও চা নিয়ে এল রাহাত। জলদি চা পান করে উঠতে গিয়ে আরশাদ বলল— সলীম! তুমি এতমিনাদের সাথে আপনা হিস্যা খতম করো। বারটার পর আসব আমি।

ঃ আরশাদ! আমিও যেতে চাই।

ঃ কোথায় ?

ঃ আমেনার কাছে। এখন আমি সফরের উপযুক্ত।

আরশাদ আবারো কুরসিতে বসে বলল— সলীম! পূর্ণ সুস্থ নও তুমি এখনও। আগামী এক সপ্তাহ তুমি কোথাও বেরুতে পারবে না। এখানকার সফরের কষ্ট তুমি কল্পনাও করতে পার না। ইসমত! তুমি আমেনাকে পত্র লেখো। লেখবে, সলীম সুস্থ, দিন দশেকের মধ্যে তোমার কাছে আসছে।

ঃ না! না! লিখবে, আমি সুস্থ, কিছুদিনের মধ্যেই আসছি।

পাঁচ দিন পর।

✪ ✪ ✪

সলীম, আরশাদ ও ডাঃ শওকত দুপুরের খানা খাচ্ছিল। ইসমত, রাহাত পড়শী ক'জন যুবতীর সাথে ওপাশের কামরায় গল্প করছিল, ঘরের বাইরে একটি সেনা যানের ব্রেক কষার শব্দ শোনা গেল। জনৈক জোয়ান দরোজায় দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ল— ডাক্তার সাহেব!

ঃ কে ? নওকর রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করে।

ঃ ডাক্তার সাহেব কি এখানেই থাকেন ?

ঃ হ্যাঁ! ভেতরে খানা খাচ্ছেন। বারান্দায় চেয়ার পাতা আছে, বসে যান। এখুনি বের হবেন।

ঃ জলদি করতে বলো, আমি সলীমের সাথে দেখা করতে চাই। তিনি এখানে অবস্থান করছেন।

এই আওয়াজ সলীমের কানে নতুন নয়। রুটির লোকমা গলায় আটকা থাকল। ও বুঝল, এ কণ্ঠ মজীদের। খানা মুখে নিয়েই বেরোল ও।

মজীদ সেনা পোষাকে। পূর্বের চেয়ে বেশ হালকা। সলীম এসে ওকে বুকে জড়াল।

আরশাদ ও ডাঃ শওকতও বেরেলো। মজীদ বলল— ডাক্তার সাহেব! মাফ করবেন। অসময়ে আপনাকে তকলীফ দিয়েছি, কিন্তু আমার তাড়া আছে।

ডাঃ সাহেব অগ্রসর হয়ে ওর সাথে মোসাফাহা করে বললেন— কিসের তাড়া, চলো খানা খাবে।

www.amarboi.org

ঃ খানা খেয়েই এসেছি।

আরশাদ ওকে জড়িয়ে ধরে বলল— এসো! ভেতরে এসো!

ঃ এখান থেকে বিদায়ের অনুমতি পেলে ভালো। সঙ্গীরা বাইরে অপেক্ষা করছে।

ঃ চলুন! ওদেরও সাথে নিয়ে আসি।' বলল আরশাদ

ঃ না, না! আমি ফেরার পথে দেখা করে যাব।' বলল মজীদ।

ঃ কোথায় যাচ্ছ তোমরা ? প্রশ্ন সলীমের।

ঃ আমি আজ এখানে পৌঁছতেই হেড কোয়ার্টার থেকে হুকুম আসে, আমাকে লুধিয়ানা যেতে হবে। ওখানে পঞ্চাশ হাজার লোক আমাদের অপেক্ষায়। এক মিনিটও নষ্ট করার সময় নেই। দু'টোয় আমরা রওয়ানা করব।

এখন বাজে ১ টা ৪০ মিনিট।'

ঃ তোমার স্বাস্থ্য ভালো তো ?

ঃ বিলকুল ? তুমি কেমন ?

ঃ ভালো।

ঃ দাউদ।

ঃ শহীদ হয়েছে। ভারাক্রান্ত স্বরে বলে সলীম।

ঃ আর অন্যান্যরা।

ঃ সাদেক ও গোলাম আলী শেষ পর্যন্ত আমার সাথে ছিল। ওরা পাকিস্তান পৌঁছেছে।

ঃ আচ্ছা সলীম। এখন উঠতে হয়। সফরের যোগ্য হলে আমেনার ওখানে যেও। ও তোমাকে খুব স্মরণ করে। বশিরকে ওখানে রেখে এসেছি।

ঃ আমি আগামীকাল যাচ্ছি— বলল সলীম।

মজীদ নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল— বহুত আচ্ছা। এখন যাই তাহলে। দু'টোর মধ্যে ছাউনিতে যেতে হবে।

মোসাফাহার জন্য ডাক্তার সাহেবের দিকে হাত বাড়ায় মজীদ। কিন্তু তিনি বলেন— আমরা তোমার সাথে মহাসড়ক পর্যন্ত যেতে চাই।

ইসমত ও রাহাত দরোজার ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছিল। মজীদ, আরশাদ, সলীম ও ডাক্তার সাহেব বেরিয়ে গেলে এরা বেলকনিতে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে সেনাযান গড় গড় করে উঠল। জনৈকা যুবতী ইসমতের কাঁধে হাত রেখে বলল, কে এই লোক ইসমত?

ইসমত ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দেয়— এ সেই লোক, এ মাত্র তোমার সাথে যার প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করেছিলাম।

✪ ✪ ✪

www.amarboi.org

মাই ডিয়ার লর্ড মাউন্টব্যাটেন!

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমার রাজ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আপনার হুকুমত থেকে জরুরী সাহায্যপ্রার্থী আমি। বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুস্তানী প্রশাসনের মদদ কামনা ছাড়া কোন গতি নেই। কিন্তু আফসোসের বিষয়, হিন্দুস্তান আমার ডাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাড়া দেবে না, যতক্ষণ আমার রাজ্য (কাশ্মীর) ভারতের অন্তর্ভুক্ত না করা হচ্ছে। আমি আমার প্রদেশকে ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত স্থির করেছি এবং সংশ্লিষ্ট দরখাস্ত আপনার মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ করেছি। আমার প্রদেশকে বাঁচাতে হলে যথাশীঘ্র সাহায্য করতে হবে।

–আপনার বিশ্বস্ত

হরি সিং

আমার প্রিয় মহারাজা সাহেব!

আপনার দরখাস্তের বিবরণমতে বৃটিশ প্রশাসন কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গ করবে বলে মঞ্জুর করেছে। আপনার আপীল মোতাবেক হিন্দুস্তানী ফৌজ কাশ্মীরে প্রেরণের এন্তেযাম করেছে আমার সরকার। এরা রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও প্রজাদের জানমাল রক্ষার যিম্মা নেবে।

—আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

মাউন্টব্যাটেন অব বার্মা। গভর্নর জেনারেল ভারত।

এ দু'পত্র লজ্জাকর ষড়যন্ত্র এবং ওই নিকৃষ্ট প্রদেশের প্রথাগত হস্তান্তর, যাকে প্রাপ্তির জন্য দিল্লী থেকে ওহাগার বিস্তীর্ণ জনপদে মুসলিম নিধন হয়েছিল। একমাত্র এজন্যই ৮০ লাখ মুসলমানকে পাকিস্তানে পুশ করা হয়েছে। এ সেই সূবা যার জন্য র‍্যাডক্লিফের দেমাগ খরিদ করা হয়। এ জন্যই পাকিস্তানী ফৌজকে আটকে রাখা হয়েছিল। ভূ-স্বর্গকে কুক্ষীগত করার জন্য পাকিস্তানের হিস্যার অস্ত্রকে জবর দখল করে রাখা হয়েছিল।

রাজা হরি সিং-এর শিরায় ডোগরার খুন ছিল যিনি সামান্য কিছু রূপীর বিনিময়ে কাশ্মীরের লাখো মুসলমানের আযাদী বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

আর মাউন্টব্যাটেন সেই ফিরিঙ্গি বণিকদের একজন যিনি কাশ্মীরের মুসলমানদের ইয্যত-আযাদীর মূল্য উসূল করেছিলেন।

কাশ্মীরের ৩৫ লাখ মুসলমানের ইয্যত-আযাদী আরেক দফা বিক্রি হচ্ছিল। এবারের ক্রেতা-বিক্রেতা যালিম ডোগরা ও হিন্দু ফ্যাসিজম। মাউন্টব্যাটেন অব বার্মা এদের মাঝে এ লজ্জাষ্কর ষড়যন্ত্রে নিছক দালালের ভূমিকায় ছিলেন। হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে রক্ত নাটকের নতুন অংক মঞ্চায়িত হতে যাচ্ছিল। একদিকে নেহেরু-প্যাটেল তাদের কাপালিক ফৌজের মহড়া করছিল অপরদিকে হরি সিং-এর

www.amarboi.org

বর্বর হিংস্র ডোগরা সৈন্য কুচকাওয়াজ করছিল। কাশ্মীরের জনতার সামনে গোলামীর যিঞ্জির ঝনঝন করছিল। মঞ্চের পর্দার আড়ালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ডাইরেক্টরের ভূমিকা পালন করছিলেন। এটা ছিল বাঘ আর বাঘদের খেলা। বাঘকে বাঘের ওপর হামলা করার পূর্বে বিচারকের আসনেও এক বাঘকে বসানো হয়।

শেখ আব্দুল্লাহ যাকে হরি সিং দেশ বিভাগের কিছুদিন পূর্বে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দোষে কয়েদ করেছিলেন এবং তাকেই সাহায্য করার জন্য দেশপ্রেমিক পণ্ডিত নেহেরুকে হলোর ব্রীজ পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যেতে হয়েছিল। হিন্দু ফ্যাসিজম ও বর্বর ডোগরাদের মাঝের দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল খালি হাতেই। হিন্দু ও ডোগরাদের দ্বন্দ্ব মেটাতে শেখকে জেল থেকে বের করার জরুরত পড়ল। জেল থেকে শেখ আব্দুল্লাহকে বের করে কেবিনেট প্রধান বানানো এবং হরিসিং ও মাউন্টব্যাটেনের চিঠি চালাচালি স্রেফ প্রথাপালন ছাড়া কিছু নয়। কেননা, পূর্ব পাঞ্জাব ও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশের মত কাশ্মীরী জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রোগ্রাম তৈরী করা হয়েছিল সেই কবে। মাউন্টব্যাটেনের মদ্যপ বন্ধু র‍্যাডক্লিফ মুসলিম সংখ্যাগুরু পূর্ব পাঞ্জাবকে ভারতভুক্তি করে কাশ্মীরের এক কোণ হিন্দুস্তানের সাথে সন্নিবেশিত করে দিয়েছিল এবং গান্ধির চামচারা লাখো মুসলমানদের লাশের ওপর হিন্দু ফ্যাসিজমের রথযাত্রা চালনায় কাশ্মীরীদেরকে আগুন ও খুনের পয়গাম দিচ্ছিল।

১৫ আগস্টের পূর্বেই পাটিয়ালার মহারাজা ও কাশ্মীর প্রশাসনের মধ্যে দর কষাকষি হচ্ছিল। কাশ্মীর সীমান্তবর্তী পূর্ব পাঞ্জাবের গুজরাট, শিয়ালকোট ও ঝিলাম জেলার শিখদের কাশ্মীরাগমনের হুকুম দেয়া হয়েছিল। সেপ্টেম্বর-এ পূর্ব পাঞ্জাব, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ, আযাদ হিন্দ ফৌজ, আকালী সেনা ও পাঞ্জাব সেপাইরা কাশ্মীরে লুটতরাজের তুফান বইয়ে দিল। এ মাসের শেষের দিকে হাজারো আশ্রয়কামী পশ্চিম পাঞ্জাবে হিজরত করল।

জম্মুর মুসলমানদের বাড়ীঘরের আগুন শিয়ালকোট থেকে দেখা যেতে লাগল। আচানক একদিন খবর এল, মহারাজা কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করার ফয়য়ালা করে ফেলেছেন। কাশ্মীরের এক কোণ হিন্দুস্তানের সাথে মেলানোর জন্য সরুপথকে হাইওয়েত রূপান্তরিত করা হয়েছে। রাবীতে ব্রীজ তৈরী হচ্ছে এবং এন্তেযামাদি শেষে ডোগরা প্রশাসন সরাসরি ভারতভুক্তির ঘোষণা করবে। কাশ্মীরের ৯০% মুসলমান এখন জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাচ্ছে। ৩৫ লাখ মুসলমান এ সময় ওই তলোয়ারগুলো তাদের শাহ্‌রগের নিকটে দেখছিল, যেগুলো পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, কাপুরথালা, নাভ, পাটিয়ালা, ভরতপুর ও ইন্দোরের লাখো নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে যবেহ করেছিল। তাদের বধূ-মাতাদের ওপর ওই কালো হাতগুলো প্রসারিত হচ্ছিল, যেগুলো কাশ্মীরে ধাবিত হওয়ার পূর্বে যমুনা থেকে রাবীর সুবিস্তৃত উপকূলে মযলূম ও নিরন্ন মানুষকে ধাওয়া করেছিল। এ কাশ্মীর কসাই নেহেরুর জন্মভূমি। এক্ষণে তিনি আবার স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীও। তাই মহাত্মা গান্ধীর চেলারা কাশ্মীরের ৩৫ লাখ মুসলমানের স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ মিসমার করাকে অপরিহার্য মনে করল।

www.amarboi.org

কাশ্মীর সীমান্তে তিব্বত, রাশিয়া ও চীনের সন্নিবেশ ছিল। আর এখন মাউন্টব্যাটেন ও র‍্যাডক্লিফ তার এক কোণ হিন্দুস্তানের সাথে জুড়ে দিলেন। এজন্যই পণ্ডিত নেহেরু বলতেন— হিন্দুস্তান কাশ্মীর থেকে মুখ ফেরাতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশ কাশ্মীর। এখানকার মানুষের ভবিষ্যত অন্ধকার আর অতীত অগ্নি জ্বলজ্বল। তাদের শেষ ভরসা পাকিস্তান। কিন্তু ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরের পাকিস্তান যে মুসীবতের সম্মুখীন হল তাতে কসাই নেহেরু, কুলাঙ্গার প্যাটেল, নপুংসক হরি সিং ও বেঈমান মাউন্টব্যাটেন নিশ্চিত হল যে, কোন রকম বাধা ছাড়াই কাশ্মীর গিলে নেয়া যাবে।

কাশ্মীরকে ভারতভুক্তির অন্তরায় হিসাবে মহারাজা পুঞ্চের মুসলমানদের ভয় পাচ্ছিলেন। কেননা পুঞ্চে এমন ৬০ হাজার ফৌজ ছিল যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মালয়, বার্মা, লিবিয়া ও ইটালীতে লড়াই করেছে। সুতরাং এদের জীবদ্দশায় কাশ্মীরকে ভারতভুক্তি চাট্টিখানি কথা নয়। পুঞ্চের যে সব সেপাই পাকিস্তান সেনানিবাসে এবং যে সব জনসাধারণ পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমান্তবর্তী প্রদেশের আমলা ছিলেন তারা এ সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না যে, ভারতভুক্তির পরিণতিতে পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের ওপর দিয়ে কোন্ কিয়ামত সংঘটিত হয়েছিল।

কাশ্মীর প্রশাসন এসব লোকদের মনে ভীতিভাব সৃষ্টিকল্পে ডোগরা সেপাইদের কতল ও লুটতরাজের ঢালাও অনুমতি দিল। এ অমানবিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার পুঞ্চের মানুষের মুখ থেকে পাকিস্তানের নারা বুলন্দ হোল। যুলুম যত বাড়তে লাগল তত এ আওয়াজ বুলন্দ হতে থাকল। পুঞ্চের মানুষ বধূ-মাতা ও সন্তান-সন্ততিকে আগুনে পুড়তে দেখল। ভবিষ্যত সম্পর্কে এক রকম প্রায় নিশ্চিত হল তারা। রাজা হরি সিং হুকুম দিয়েছিলেন, যারা তার হুকুমের বরখেলাফ করবে কিংবা যার ওপর সন্দেহ হবে তাকে দেখামাত্র গুলি করবে।

পানি এবার নাকের ডগা অবধি— পুঞ্চের মুসলমান তাদের আখেরী ফয়সালা করতে বাধ্য হল। যখন পাকিস্তানের নেতারা বক্তৃতা-বিবৃতি আর আপোষের শ্লোগানে মুখরিত তখন এ এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠী ডোগরা যালিমদের গুলির সামনে সীনা টান করে দাঁড়িয়ে গেল। ওই অজানা অসংখ্য সেপাই পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় উপকারী যারা সীনায় গুলি খেয়েও ডোগরাদের বন্দুক ছিনিয়ে এনেছিল। কওম ওই শহীদানের এহসান ভুলতে পারে না, সর্বপ্রথম যারা ডোগরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাগ্নি জ্বেলেছিল।

কুদরত আরেকবার এ বাস্তব সত্যটি প্রকাশ করে দিলেন যে, মুসলিম জাতি মরণকে তুচ্ছ মনে করে ময়দানে নামলে জীবন তাদের পদচুম্বন করে। পুঞ্চের যুদ্ধ শেষতক কাশ্মীরীদের যুদ্ধ আর কাশ্মীরীদের যুদ্ধ পাকিস্তানের যুদ্ধে রূপ নিল। পুঞ্চবাসী একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে নেমে কওমকে জানিয়ে দিল— আমরা মরিনি, যিন্দা এখনও। পুঞ্চের যমীন থেকে এ নারা সহসাই পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্তবর্তী উজিরস্থলের চাপরাতাল শৃঙ্গে ঝংকার তুলল। কবিলার মানুষ মুজাহিদীন ভাইদের আহ্বানে সাড়া দিল

www.amarboi.org

এবং ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডোগরারা পালাল লেজ গুটিয়ে, পালাল সেবা সংঘী ও আকালী সেনারা। মুজাহিদীনের গন্তব্য এবার শ্রীনগর।

পরিস্থিতির এ অকস্মাৎ বিবর্তন কাশ্মীর ও ভারত প্রশাসনের ধারণাতীত। রাজা হরি সিং তার প্রিয় মাউন্টব্যাটেনকে লিখলেন— আমি যথাশীঘ্র আপনার সাহায্যকামী। মাউন্টব্যাটেন ফওরান জবাব দেয়— ভারতীয় বাহিনীকে কাশ্মীরে প্রেরণের এন্তেযাম করা হয়েছে যাতে আপনার ও কাশ্মীরী জনতার ইয্যত- আযাদী রক্ষা হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন অব বার্মা স্রেফ পূর্ব পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশগুলো নয়, তার বাসভবনের আশে পাশের তথা দিল্লীর মুসলিম নিধনকে তামাশার দৃষ্টিতে দেখছিলেন। যখন মুহাজির ক্যাম্পের কাফেলাসমূহ ও গাড়ীবহরের ওপর হামলা হচ্ছিল, যখন হাজারো মুসলিম বধূ-মাতার সম্ভ্রমহানি হচ্ছিল তখন এ বেঈমান ভাইসরয়ের দরদে হৃদয় উথলে ওঠেনি। কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম নিধনের পর ডোগরা কুলাঙ্গাররা হরি সিং-এর নেতৃত্বে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের কচুকাটা করলে এর প্রতিরোধ বহ্নি জ্বলে ওঠায় কাঠবডির এ নপুংসক লর্ডের হৃদয় দরদে আকুলি-বিকুলি করে ওঠে।

কাশ্মীরের রাজা ও তার প্রিয় মাউন্টব্যাটেনের ওই সময় কাশ্মীরী জনগণের জান-মাল ও ইয্যত-আবরু হেফাযতের চিন্তা আসেনি যখন জম্মুর মুসলিম বধূ-মাতাদের পূর্ব পাঞ্জাবের শহরগুলোয় ক্রীতদাসীর মত বিক্রি করা হয়; কিন্তু কাশ্মীরকে ভারত মাতার ঝুলিতে পুরে দেয়ার জন্য এক যালেম ও হিংস্র দানব প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে ভাইসরয়ের হাতে ফৌজ ছিল, ট্যাংক ছিল, ছিল জঙ্গী বিমান। বিলেতের শ্বেত ড্রাগন কালী পূজারীদের চেয়েও নিজের রহস্য গোপন করার তালিম রপ্ত করেছিল।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিশ্ব জনমতকে শান্ত করার জন্য এ ঘোষণাও করছিল যে, কাশ্মীর পরিস্থিতি শান্ত হলে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে জনগণের রায়ের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে, কিন্তু এর মাজেরা একমাত্র মাউন্টব্যাটেনের কাছে স্বচ্ছ ছিল যে, ডোগরা, শিখ, সেবা সংঘী ও হিন্দুস্তানী ফৌজের ট্যাংক, তোপ ও জঙ্গী বিমানের সামনে ওই জনমত যাচাই ধুলিসাৎ করতে সময় লাগবে না এক মুহূর্তও। মরা মানুষ ভোট দেয় না। সুতরাং কাশ্মীরে গণভোট হবে না কোনদিনও।

✪ ✪ ✪

ক'হপ্তা ধরে সলীম লাপাত্তা, লাহোর থেকে ওর চলে যাবার পর ইসমত খত্ লিখে আমেনাকে সুস্থতার কথা জানালে আমেনা লেখে— 'সলীম এখানে পৌঁছার দিন তিনেক পর পত্রিকায় এক দোস্তের এ বিজ্ঞপ্তি পড়ে যে, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে হিজরত করে সে কাসূরস্থ আত্মীয়ের কাছে চলে গেছে। পরদিন আমার শত অনুরোধ উপেক্ষা করেও সে ওখানে চলে যায়। পনের দিন পর সলীমের পত্র পায় আরশাদ। তাতে লেখা— আমি কাসূরের ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকায় কাজ করছি। এখানে মামা বাড়ীর কিছু লোকের সাথে সাক্ষাত। তাদের কথা দ্বারা জানলাম— মামুজান সপরিবারে বাহওয়ালপুর

www.amarboi.org

হিজরত করেছেন। এ জন্য আমি ওখানে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ ওখানে থেকে সোজা লাহোরে আসছি।

এরপর অনেক দিন চলে গেছে। ইসমতের পেরেশানি ভীতিতে রূপ নেয়। ডাঃ শওকত ওর মুষড়ে পড়া চেহারা দেখে বলতেন— বেটি! মুহাজির ক্যাম্পের হালত উদ্বেগজনক। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সলীমের মত দেশপ্রেমিক সুস্থ থাকে কি করে। ও হয়ত বাহওয়ালপুর ক্যাম্পে কাজ করছে। এ ধরনের বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লোকের দেশে বড় অভাব।

ইসমত কখনও কখনও বাবার সাথে মুহাজির ক্যাম্পে রোগীর সেবায় যেত। আস্তে আস্তে ওই কাজে ওর মন লেগে গেল। এরপর রোজানা যেতে থাকে ও।

ক্যাম্পের কলেরা রোগী ও যখমীদের ড্রেসিং বিরাট এক ঝামেলার মুখোমুখি হয়। কাজের বিস্তীর্ণতার সামনে সনদবিহীন হাতুড়ে চিকিৎসকদের কদর হতে থাকে এখানে।

কাশ্মীর জেহাদ শুরু হবার পর লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি চলে গেল আরশাদ। বিদায় বেলা ইসমত ওকে বলে— ভাইজান! আমার মন বলছে, ও কাশ্মীর চলে গেছে। রাওয়ালপিণ্ডিতে আপনি খবরাখবর পেতে পারেন।

ঃ ইসমত! বেশ কিছুদিন ধরে আমিও কথাটা ভাবছি। সলীম ওখানে থেকে থাকলে আমার জন্য খোঁজ নেয়া তেমন একটা মুশকিল হবে না। ইন্‌শাআল্লাহ্ জলদি তোমায় খবর পাঠাব।

ঃ ভাইজান ......!' ইসমত লজ্জানম্র কণ্ঠে ডাকল।

ঃ বলো ইসমত! কি বলতে চাও ?

ঃ ভাইজান! কাশ্মীরে যখমী মুজাহিদদের নার্সিংয়ের দরকার হয় কি ?

ঃ হ্যাঁ, ইসমত! ওখানে নার্সের সংখ্যা খুবই কম— তুমি কি ওখানে ..."

ঃ হ্যাঁ, ভাইজান! আমি ওখানে যেতে চাই।

ঃ বহুত আচ্ছা ইসমত! রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছেই তোমায় খত্ লেখব।

একদিন ইসমত ক্যাম্প থেকে কাজ সেরে বাড়ী এল। রাহাত ওকে দেখেই বলে উঠল আপাজান! আপাজান!! সলীম ভাইয়ের খত্ এসেছে। উনি কাশ্মীরে। দৌড়ে কামরা থেকে খত্ নিয়ে এল রাহাত।

ইসমত নিথর নিস্তব্দ দাঁড়িয়ে। ওর বাকশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। হৃদয়ের স্পন্দন খামোশ। বিশ্বজগতে কেমন একটা নিস্তব্ধতা সাড়াহীন। ওর এক পা সিঁড়ির ধাপে আর এক পা নীচে। ওর চিঠি ? মনে মনে আওড়ায় ও। মনের অস্থিরতা এবার ওঠে মাথাচাড়া দিয়ে— সলীমের চিঠি ? ওর নিস্তব্দ পুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংগীতের সুর মূর্ছনা। মনের আকাশে হালকা গানের চুপি গুঞ্জন। বৃক্ষ, তরু-লতাদি ঝিমুচ্ছে। পুষ্পকলি বিকশিত হচ্ছে। পত্র-পল্লব মুচকি হাসছে। মন-মাধুরী সুখ প্রাপ্তির আমেজে রঙিন ফানুস ওড়াচ্ছে— 'সলীম! আমার সলীমের চিঠি।' কালচক্রের খণ্ড বিরহ পুনঃ মিলনের তীরে জোড়া লেগেছে যেন। চিঠি নিয়ে কুরসীতে বসে যায় ও। রাহাত বলে

www.amarboi.org

চলেছে— আপাজান! অ্যাড্রেস দেখে তাঁর পরিচয় জেনে আপনার অনুমতি ছাড়াই খাম ছিঁড়েছি।

ঃ রাহাত! আমার এজাযতের দরকার ছিল না তোমার।' বলে ইসমত চিঠিতে ডুবে গেল।

সলীম লিখেছে—

"আমার ইসমত!

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর রণাঙ্গন থেকে লিখছি তোমায় এ চিঠি। কাসূর থেকে মুলতান যাবার এরাদা করছিলাম, ইতোমধ্যে হানাদার ভারতীয় বাহিনীর কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের খবর পাই। মুলতান যাবার এরাদা বদলে কাশ্মীর জেহাদে হিস্যা নিতে ছুটে আসি। যাবার সময় ইচ্ছে ছিল, লাহোরে তোমাদের ওখানে অন্তত একটা দিন কাটিয়ে যাব। কিন্তু লাহোর প্লাটফর্মে আফতাবের সঙ্গে সাক্ষাত। ও আমার ক্লাসমেট। ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবীর নেতা হয়ে কাশ্মীর যাচ্ছিল। তন্মধ্যে পাঁচজন এমন ছিল যারা আমার বাল্যসাথী। লোকেরা ওই মুজাহিদবৃন্দের গলে মালা দিচ্ছিল।

আফতাব ও বাকী সঙ্গীরা আমার পাশে জমায়েত হল। কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল আফতাব। জবাব দিলাম— তোমাদের গন্তব্য যেথায়। আফতাব আমার গলে মালা দিল। ওর দেখাদেখি অন্যরাও তাদের মালা আমার গলে পরাল। উৎসুক জনতা এ দৃশ্যে প্রভাবিত হল। গাড়ী ছাড়তে তখনও মিনিট দশেক বাকী। ওরা সিটে বসল। আমি তখন দরোজায় দাঁড়ানো। আফতাবকে বলতে চাচ্ছিলাম, আগামীকাল রাওয়াল পিন্ডিতে ঠিক সময় তোমাদের সাথে রওয়ানা করব, কিন্তু কিছুই বলতে পারিনি। আফতাব বলল, ভেতরে এসো সলীম! ইতস্তত করে আমি রেলের সিঁড়িতে এক পা রাখলাম। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে জনতা মুজাহিদদের নারা দিয়ে বিদায় জানাচ্ছিল। জনৈকা বোরকা পরিহিতা নারী এসে আমার গলায় শ্রদ্ধার নিদর্শন মালা পরালেন। পরে বয়োবৃদ্ধ একজন অগ্রসর হয়ে বললেন, গাযীদের বিজয় কামনা করো। মানুষেরা হাত ওঠাল। হাত ওঠালাম আমি। গাড়ী সিটি বাজাল। বসলাম ওদের কাছে গিয়ে।

এক্ষণে আমি কাশ্মীরে। এখানেই আমার ঘর। পূর্ব পাঞ্জাবের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগছে এখানে। বিগত তিনমাস ধরে ওই গেরিলা দলের সাথে কাজ করছি যারা হানাদার ভারতীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে থাকত। এই দলে সাধারণত সীমান্তবর্তী প্রদেশের মুজাহিদ। আমাদের সিপাহসালার মাহসুদ কবিলার এক জোয়ান। ওকে দেখে মনে হয়েছে, আমার কওমের মাঝে এখনও প্রাণ আছে। এরা বুকে গুলি খেয়ে হাসে। মৃত্যুকে মনে করে তামাশা। এরা দুশমনের তোপ ও জঙ্গী বিমানে ভয় পায় না। তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ে রক্ত জমাটকারী হিমবায়ু ওদের চলার পথকে পারে না রুদ্ধ করতে। ওদের অনেকের হাতেই রাইফেল ছিল না। দুশমন থেকে ছিনিয়ে নেয়ার আশায় চাকু-ছোরা নিয়ে ময়দানে নামে ওরা।

একদা পঞ্চাশজন নয়া মুজাহিদ আমাদের কাছে এল। এর মধ্যে সুলায়মান পাঠানও ছিলেন যিনি পাঞ্জাবে রুটি বানিয়ে খেতেন। এরা এক্ষণে জেহাদে এসেছে। এদের অধিকাংশের কাছে চাকু ছিল, আবার অনেকের কাছে তাও ছিল না। ওদের

www.amarboi.org

নওজোয়ান লিডারকে জিজ্ঞেস করলাম— ভাই! রাইফেল ছাড়া তোমরা কি করবে ? উত্তরে সে বলল— ভয় করো না। আমাদের কাছে রাইফেল না থাকলেও দুশমনের কাছে তো আছে।

রাতের বেলা ওরা আমাদের সালার থেকে ১৫ টা রাইফেল ধার নিয়ে ১৫ মাইল দূরবর্তী এক হিন্দুস্তানী চৌকির ওপর হামলা করে ৮০ টা রাইফেল ছিনিয়ে আনে। কয়েক'শ রাউন্ড গুলি ও তিনটা মেশিনগানও ছিল ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রের ফিরিস্তিতে। ওই অভিযানে ১৫ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। ওরাও শিখ ডোগরাদের ৫০ জনকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে। পরদিন আমরা ওই এলাকাটা পরিদর্শন করে দেখতে পাই নেহেরু ও প্যাটেলের পেটোয়া বাহিনী যতটা বুযদিল ততটা যালিমও। জান বাঁচিয়ে যেসব ডোগরা সেপাই চলে যাচ্ছিল— তিন মাইল দূরের এক মুসলিম জনপদে ওরা অগ্নিসংযোগ করে।

গোষ্ঠীগত মুজাহিদবৃন্দ পুরো দুনিয়ার আদর্শিক মডেল। আমার চোখের সামনে তারা তিনটি জঙ্গী বিমানকে ভূপাতিত করে। অন্যান্য খণ্ডযুদ্ধেও বেশ কিছু বিমান ঘায়েল করা হয়। এক্ষণে ভারতীয় বিমান বাহিনী দূর-দরাজের গ্রামে বোমাবর্ষণ করে ক্ষান্ত থাকছে।

মুজাহিদদের সাথে খুবই তৃপ্ত ছিলাম আমি। ওদের মাঝে থেকে নিজকে অপরিচিত মনে হয়নি কখনও। ঝুঁকি থেকে ঝুঁকিতর অভিযানে ওদের সঙ্গ দিতে আমি এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করিনি। আমাদের প্রধান কাজ ছিল হিন্দুসেনাদের সাঁজোয়া যান ও রসদবাহী লরির ওপর হামলা করে তছনছ করে দেয়া। নির্ধারিত কোন ঠিকানা ছিল না আমাদের। দুশমনের অস্ত্রবাহী গাড়ীর খবর পেলে আমরা দুর্গম পাহাড়ের নির্জন চূড়ায় আক্রমণ শানাতাম। নয়া ফৌজ আগমনের খবর শুনলে বোমা মেরে ব্রীজ উড়িয়ে দিতাম। এ পরিস্থিতিতে তোমায় পত্র না লেখায় আশা করি উষ্মা প্রকাশ করবে না।

এক্ষণে আমি এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকি হেফাযতে নিয়োজিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ন'হাজার ফুট উচ্চে এ চৌকি। এখানে হিন্দুস্তানী ফৌজের তোপ ও মেশিনগান ছিল। জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে জেনারেল তারেক আমাদের ম্যাসেজ পাঠান যে, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ওই চৌকি দখল না করলে বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। ওই অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি একজন ক্যাপ্টেন পাঠান। ক্যাপ্টেন মিয়ানওয়ালী শহরের (অবঃ) ফৌজি অফিসার। বার্মা ও মালয়ে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়াই করেছেন। ক্যাপ্টেন আমাদের বললেন, আসন্ন অভিযানে এমন ৪০ জন জোয়ান চাই যাদের মনে বিজয়ের চেয়েও শাহাদতের তামান্না থাকবে বেশী।

শহীদী কাফেলার ব্যানারে নাম লেখাতে প্রতিযোগিতা লেগে গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন নেবেন ৪০ জন-ই, বেশী না একজনও। তাঁর নজর কাড়তে সমর্থ হই আমি। ৪০ জনের একজন আমিও। তুষারপাতের মধ্যরাতে আমরা চৌকির ওপর চড়াও হই। দুশমনও গাফেল ছিল না। পর্বতশৃঙ্গ থেকে আমরা তখনও ১ হাজার ফুট নীচে। এ সময় নেমে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। ভোর পাঁচটার দিকে গুলি উপেক্ষা করে চূড়ার নিকটে উপনীত

www.amarboi.org

হই। তবে ইতোমধ্যে হারিয়ে বসি ১৫ জন সাথী। সূর্যের প্রথম আলোতে আমরা দুশমনের তোপ ও দুটো মেশিনগান দখল করি। আরেকটা মেশিনগানের ওপর বোমা ফেলতে গিয়ে ক্যাপ্টেন পড়ে যান। জানলাম, ওনার বুকে তিনটা গুলি লেগেছে।

আচানক দূরের এক চূড়া থেকে মর্টার ও মেশিনগানের গুলি আসে। আমাদের সাত সাথী শহীদ হয়। দমরুদ্ধ ক্যাপ্টেন চিৎকার দিয়ে বলেন— সূর্যের আলোতে এ চৌকি দখল করতে না পারলে আমাদের কুরবানী বৃথা যাবে। আমরা তিনদিক থেকেই চূড়ার ওপর চড়তে থাকি। আমার সামনে ছিল এক আফ্রিদী মুজাহিদ। চূড়ায় উঠেই হাতবোমা নিক্ষেপের কোশেশ করল। কিন্তু পশলা গুলির সামনে সে পড়ে গেল। অন্যদিক থেকে আমাদের দু'সাথী চূড়ার ওপর উঠে গেল। পাথরের আড়াল থেকে ওরা ফায়ার করতে লাগল। ওদের দিকে মেশিন গানের নল ঘোরানো হলে আমি সহসাই হাত বোমা নিক্ষেপ করি। চূড়া কব্জা করে আমরা দ্রুত নেমে আসি। ক্যাপ্টেনকে বলি, আমরা চৌকি দখল করেছি। ক্যাপ্টেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন— এখন থেকে যে কোন মূল্যে এ চৌকি তোমাদের হেফাযত করতে হবে। বলে তিনি হস্ত প্রসারিত করলেন আমার দিকে। আমি তার হাতে হাত রাখলাম। ১০ মিনিট পর জাত্যাভিমানী এ মুজাহিদ শেষ দম নিচ্ছিলেন। চৌকিতে এমন চারজন যুবতীর দেখা পাই, নেহেরু ও প্যাটেলের আদর্শে অনুপ্রাণিত ফৌজ যাদেরকে তুলে এনেছিল। এর তিনজন ডোগরা ও শিখদের পাশবিক লালসার শিকার হয়েছিল। অন্যজন গগনচুম্বি টিলা থেকে লাফিয়ে ইয্‌যত বাঁচায়। তার লাশ বরফ পড়েই এক রকম দাফন হয়েছিল। এ সেই ফৌজ মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু, প্যাটেল ও গান্ধিজী যাদেরকে কাশ্মীরী জনগণের জানমাল হেফাযতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

তৃতীয় দিন এ অভিযানে আযাদ কাশ্মীরের ফৌজ বিরাট বিজয় অর্জন করে। খোদ্ জেনারেল তারেক এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন। বিজয়ের পর তিনি আমাদের দখল করা চৌকি পরিদর্শনে আসেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য আমাকে এ চৌকির দেখাশোনার ভার দিয়ে চলে যান।

এখন আমি সেখানে। তুষারপাত হচ্ছে প্রচুর। বসন্তকালের পূর্বে এখানে শত্রুর কোন ভয় নেই। রাস্তা বন্ধ। হিন্দুস্তানী ফৌজ ট্যাংক কিংবা সাঁজোয়া যান ছাড়া কোন শহর কিংবা লোকালয়ের ওপর হামলা করতে জানে না। মাঝে মধ্যে জঙ্গী বিমান এসে এক্কা দোক্কা বোমা ফেলে শাঁ করে উড়ে যায়। অদ্যাবধি এ চৌকির উদ্দেশ্যে যে কটা বোমা ফেলা হয়েছে এর সবচেয়ে নিকটে নিক্ষিপ্তটি দু' ফার্লং দূরে। আমরা একটা বিমানকে ঘায়েল করেছি।

গেরিলা বাহিনীতে থাকতে তোমায় দু'কলম লেখারও ফুরসত হয়নি। এখন পর্যাপ্ত সময় হাতে আছে। কিন্তু তোমার কাছে পৌঁছানোর কোন সুরত নেই। আজ ক'সেপাই আমাদের এখানে রসদ নিয়ে এসেছিল, তাদেরই একজনের হাতে তুলে দিলাম এ পত্র। পক্ষান্তরে তোমার পত্র আমার কাছে পৌঁছার কোনই গোঞ্জায়েশ নেই। তুমি যদিও রেডিও আযাদ কাশ্মীর মারফত খবরাখবর রাখতে পার। হিন্দুস্তানী ফৌজ এখানে

www.amarboi.org

রেডিওর ব্যাটারী সেট রেখে পালায়। আমরা এখানে বসেই প্রতি সন্ধ্যায় এখানকার ফৌজি কর্মতৎপরতা প্রচার করে থাকি।

অবসরকে কাজে লাগাতে একটা লেখায় হাত দিয়েছি। একটি ছোট পুস্তিকা হবে লেখাটা। বিষয়-'জাতি হে!' পূর্ব পাঞ্জাবের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড আমার মুখে শুনে আফতাব এ কথার ওপর জোর দিয়েছে যে, তুমি কওমের নামে কিছু একটা লেখ।

আমি ছেপে বিনামূল্যে বিলি করব। ইনশাআল্লাহ ক্ষুদ্র এ পুস্তিকা খুব জলদি সূর্যের মুখ দেখবে। অচিরেই তা তোমার হাতেও শোভা পাবে।

পত্রের অবয়ব দীর্ঘ করে ফেলেছি। তবে মনে হচ্ছে, কিছুই লিখতে পারিনি। কিন্তু রসদবাহী সেপাইরা প্রস্থানের জন্য তৈরী।

ইসমত! হিন্দুস্তানের হাতি কাশ্মীর-দোলনায় ফেঁসে গেছে। দোয়া করো বিজয়ের সংবাদ নিয়ে যেন তোমার সামনে উপস্থিত হতে পারি।'

—তোমারই সলীম।

✪ ✪ ✪

পূর্ব পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানে শামিল প্রদেশগুলোয় মুসলিম জনশূন্যতা দেখা দিল। ভারতের ৮০ লাখ মুসলমান হিজরত করে পাকিস্তানে উপনীত হয়। কিন্তু তখনও গান্ধী মহারাজ দিল্লীতে বসে অহিংস নীতির দরস দিয়ে যাচ্ছেন, আর তার পা-চাটা চেলা-চামুণ্ডারা ভারতীয় মুসলমানদের রক্ত ও আগুনের পয়গাম শোনাচ্ছিল।

জুনাগড় পাকিস্তান-এ শামিল হয়েছিল। ওখানকার প্রশাসক মুসলমান। অবশ্য প্রজাদের সিংহভাগ হিন্দু। এজন্যে ওখানে ভারতীয় ফৌজ প্রেরণ করা হয়। পক্ষান্তরে, কাশ্মীরের ৯০% অধিবাসী মুসলমান, রাজা ছিল হিন্দু। এজন্যে ওখানেও ভারতীয় হানাদার বাহিনী পাঠানো হয়। ভারতীয় প্রশাসনও হিন্দু প্রশাসন। এজন্যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ভাগ্য আকালী সেনা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের হাতে সোপর্দ করা হয়।

প্যাটেলের মুখ দিয়ে আগুন ঝরছিল। সে কোন শহরে বক্তৃতা দিলেই তার পরের দিন শোনা যেত, ওখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। জওয়াহের লাল নেহেরু কাশ্মীরে তার বীর পেটুয়া বাহিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর গান্ধীজী পুরো দস্তুর অহিংস নীতির ঢাকঢোল পিটিয়ে যাচ্ছেন। একই কেন্দ্র থেকে নানান সুর বেরোচ্ছে। দেশমাতার সন্তানরা গান্ধী মহারাজের পূজা করত। নেহেরুর ইয্যত-সম্মান বজায় রাখত। প্যাটেলের কথায় নাচত। অল ইন্ডিয়া রেডিও গান্ধীর আপীল, প্যাটেলের জ্বালাময়ী সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানো ভাষণ, যুদ্ধ পরম্পরায় মহামন্ত্রী নেহেরু এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলদেব সিং-এর বাণী প্রচার করত।

গান্ধীজী এখনও হিন্দু ফ্যাসিজমের আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য লুকানোর কোশেশ করে যাচ্ছিলেন। বিশ্ব দরবারে নিজেকে দিগম্বর হতে দিতে নারাজ তিনি। তিনি দেখছিলেন, নেহেরুর কাশ্মীর অভিযান দিন থেকে সপ্তাহ ও সপ্তাহ থেকে মাসে রূপ নিচ্ছে। তিনি

www.amarboi.org

সীমান্তবর্তী হিংস্র হায়েনাদেরকে চরকার প্রথম প্যাঁচেই কুপোকাত করেছিলেন। নিজের এ চরকা-কারিশমা ব্যর্থ হতে দেখে অহিংস যাদুকর পাকিস্তানে গোষ্ঠীগত ফেরকাবাজির মূর্তি দাঁড় করিয়ে দেন। সীমান্তে তার চাটুকাররা 'পাঠানস্তান'-এর নারা বুলন্দ করে। কিছুদিনের মধ্যে এ নারা মারাত্মক আকার ধারণ করল। গান্ধীর মুসলিম পদলেহী চাটুকারদের যারা অবিভক্ত ভারতের আদলে চিরন্তন হিন্দুত্বের গোলামীর যিঞ্জীর গলায় পরতে বে কারার ছিল, তারা পাঠানদেরকে পাকিস্তান থেকে পৃথক আবাসভূমি তলব করার পরামর্শ দিল। তুফানের পূর্বে স্বাধীনচেতা এ কংগ্রেসী মুসলমানরা দশ কোটি মুসলমানকে গোলামীর রশির দুশ্ছেদ্য বাঁধনে কষে হিন্দু ফ্যাসিজমের বেদীতে আছড়ে ফেলতে চেয়েছিল। আর তুফানের পরে এ আত্মঘাতী শ্রেণী পাক-প্রান্তরে গোষ্ঠীগত উস্কানি দিয়ে শিশু দেশটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করার পাঁয়তারায় লিপ্ত ছিল।

কিন্তু খোদার ফজলে এ যোগসাজশ পূর্ণতার মুখ দেখেনি। কাশ্মীরের যুদ্ধ কুফর ও ইসলামের লড়াইয়ে পরিণত হল। ইসলামের তলোয়ার কোষমুক্ত হতেই গোষ্ঠীগত তলোয়ারের ধার ভোঁতা হয়ে গেল। অহিংস আন্দোলনের যাদুকরের মূর্তি কাশ্মীরের অলিতে গলিতে পদদলিত হয়ে ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হল। সীমান্তবর্তী কবীলা, পাঞ্জাবী, বেলুচী ও সিন্ধির মুজাহিদবৃন্দ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

মহাত্মা গান্ধী যিনি আজীবন হিন্দুদের ঐকমত্য করতে এবং মুসলিম জাতিকে শতধাবিচ্ছিন্ন করতে ঘাম ঝরা মেহনত করেছেন— এ পরিস্থিতিতে তাঁর চিন্তার ললাটে ভাঁজ পড়ল। কাশ্মীরে ফৌজ পাঠানোর আগে-ভাগে তিনি পাঠান ও অ-পাঠানদের মতানৈক্য নিরসন জরুরী মনে করলেন। কিন্তু চেলা-চামুণ্ডাদের তড়িঘড়ি তার আশার গুড়ে বালি দিল। এক্ষণে পাঠান জাতি কাশ্মীর রণের ব্যাঘ্র। ইসলামী বিশ্বে উদ্বেগাকুল পরিস্থিতি বিরাজমান। সুতরাং কাশ্মীর সম্পর্কে তার মূল পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল, যার জন্য দিল্লী থেকে গুরুদাসপুর অবধি মুসলিম্ নিধন সংঘটিত হয়েছিল।

গান্ধীজী বিষাক্ত ছোরা ফুলের ডালিতে লুকানোর প্রবক্তা। তিনি দেখছিলেন, চেলাদের অতিরিক্ত উদ্দীপনা তার যুদ্ধংদেহী বক্তৃতামালা মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিতে প্রবৃদ্ধি আনছে। এ জন্য তিনি আততায়ীদের মুখ থেকেও ঠাণ্ডা ও মিঠাকথা শুনতে চাচ্ছিলেন। সাপের দংশনকে তিনি ভয় পান না, ভয় যত তার সাপের উদ্যত ফণায়। তিনি জানেন, ফণা তোলা সাপ শেষ পর্যন্ত মারা যায়। এজন্য তিনি পূর্ব পাঞ্জাবে পুরোপুরি মুসলিম নিধন এবং দিল্লীর লাখো মুসলমানকে হিজরতে বাধ্য করে বিরলা মন্দিরে শান্তি ও অহিংসার দরস দিতে শুরু করলেন।

তিনি বিশ্ব বিবেককে শান্ত রাখার জন্য পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে গেলেও হিন্দুদের ধ্বংসাত্মক বর্বরতা এলার্জি, যা বিগত বছরগুলোয় মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং ১৫ আগস্টের পর স্বাধীন হয়ে যারা মুসলিম রক্তে হোলি খেলেছিল; তারা কোন প্রকার ভয়-ডর কিংবা কালক্ষেপণের পক্ষপাতী হতে প্রস্তুত ছিল না। কাজেই একদিন খবর এল, জনৈক সেবক সংঘী মহাত্মা গান্ধীকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে।

www.amarboi.org

জনৈক সাপুড়ে একটা অজগর লালন-পালন করেছিল। শহুরে মানুষ ওই অজগরের কাছে যেতে ভয় পেত। জনতাকে নির্ভয় দেয়ার জন্য শহরের চৌরাস্তায় অজগরটির গালে পা ঢুকিয়ে সাপুড়ে বলত— একে ভয় পাও তোমরা। দেখছ না, আমায় কিছুই করছে না। আমি ওকে বশে এনেছি। ওর গোটা প্রকৃতিই বদলে দিয়েছি।

আস্তে আস্তে মানুষের ভয় দূরীভূত হল। এরপর সাপুড়ে অজগরটিকে ছেড়ে দিত। অজগরটা আশপাশের পথচারীদের দংশন করে ফিরে আসত। তার দুঃসাহস বাড়তে থাকল। মাঝে মধ্যে সে মানুষের ঘরে ঢুকেও শিকারকে হামলা করত। শেষ পর্যন্ত শহরবাসী সাপুড়ের কাছে এসে অভিযোগ ঠুকল। জনগণকে নির্ভয় প্রদানের স্বার্থে সাপুড়ে অজগর সাপের মুখে পা ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু অজগর এখন মানুষের রক্ত-মাংসের মজা পেয়েছে। সাপুড়ের রক্ত-মাংস অন্যান্য মানুষের তুলনায় ভিন্ন ছিল না। লোকদের সামনেই অজগরটি সাপুড়েকে গিলে ফেলল।

মহাত্মা গান্ধীর অবস্থা ওই সাপুড়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার পর তিনি উত্থিত সয়লাব রুখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সয়লাবই তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

✪ ✪ ✪

বসন্তের ফুরফুরে বাতাসের এক প্রত্যুষে ইসমত ও রাহাত রাওয়ালপিণ্ডি সড়ক সংলগ্ন বাড়ীতে দরোজায় দাঁড়িয়ে কাশ্মীরমুখো মুজাহিদদের দেখছিল। জনতা 'আল্লাহু আকবর' 'মুজাহিদীনে কাশ্মীর-জিন্দাবাদ' নারা লাগাচ্ছিল। এ মুজাহিদবৃন্দ বিভিন্ন প্রদেশ, পাকিস্তান ও বিশ্বের নানান অঞ্চল থেকে নেহেরু প্যাটেল বাহিনীকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে এসেছিলেন। এরা দেশী রাইফেল দিয়েই চিরশত্রুর ট্যাংক, জঙ্গী বিমান ও কামানের মোকাবেলা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইসমত ও রাহাত ওসব বিজলী দেখছিল, পূর্ব পাঞ্জাবের ছাইস্তূপ যাদের জন্ম দিয়েছে।

মুজাহিদ বহর চলে গেল। ইসমত অশ্রুসজল নয়নে বলল— আমার ভায়েরা এগিয়ে চলো। খোদা তোমাদের মাহমুদ গজনবী ও মোহাম্মদ বিন কাসিমের কুওয়াত দান করুন! বেগোনাহদের খুন কাশ্মীরে ডাকছে তোমাদের। আহ্বান করছে তোমাদের পূর্ব পাঞ্জাবের বিধ্বস্ত মসজিদগুলো। দিল্লীর লালকেল্লা তোমাদের স্মরণ করে। কওমের বেটারা আমার। কওমের অসহায় বেটিদের হৃত সম্ভ্রমের দোহাই— এগিয়ে যাও!

একটা টাঙ্গা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। ডাক্তার শওকত চামড়ার ব্যাগ হাতে টাঙ্গা থেকে নেমে এলেন।

ঃ আব্বাজান! আব্বাজান!!' রাহাত ও ইসমত এক কণ্ঠে বলল।

ডাক্তার শওকত উঠানে প্রবেশ করেন। রাহাত তার হাত থেকে ব্যাগ নেয়। ও পেরেশান হয়ে বলে— আব্বাজান। বেশ ভারী মনে হচ্ছে। কি এতে ?

ঃ বেটি! তোমার বোনের জন্য বিরাট এক তোহ্‌ফা নিয়ে এসেছি।

ঃ কি আব্বাজান ?' প্রশ্ন ইসমতের।

www.amarboi.org

ঃ দাঁড়ান! আপা, খুলে দেখছি।' বলে যমীনে ব্যাগ রেখে খুলে বলল— ওমা! এতে দেখছি বই।

বইয়ের প্রচ্ছদে মোটা হরফে লেখা— 'জাতি হে!'

ইসমত রাহাতের হাত থেকে বই ছিনিয়ে নেয়। ডাক্তার বললেন— সলীমের এক দোস্ত এ বই ছাপাতে লাহোরে এসেছিল। গত সপ্তাহে আমাকেও ৫০ খানা দিয়ে যায়। এর কিছু বিলি করেছি। বাদবাকীগুলো তোমাদের জন্য এনেছি। তোমরাই বিলি করো। গত সপ্তায় সলীমের চিঠি পাই, যেটা তৎক্ষণাৎ তোমার কাছে পাঠাই।

ঃ জ্বি হ্যাঁ, সে চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে।

ঃ আরশাদ কোথায় ?

ঃ আজ ভোরে তিনি হাসপাতালে চলে যান।

রাহাত বলল— চলুন আব্বাজান! ভেতরে চলুন!

ঃ না, বেটি! আমি চলে যাচ্ছি।

ঃ বেটি, পাঁচজন ডাক্তারের সাথে আমি কাশ্মীর যাচ্ছি। লাহোরে ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে দু'টো এম্বুলেন্স ও দশহাজার রুপির ঔষধ কিনে দিয়েছেন। সন্ধ্যার পূর্বেই আমাদের রওয়ানা করতে হবে। স্টেশনে সঙ্গীরা আমার অপেক্ষা করছে। ভেবেছিলাম, আমার সেবা-জীবন বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সলীমের লেখনী আমাকে জোয়ান বানিয়ে দিয়েছে। আমি ওর সাথে দেখা করার কোশেশ করব।'

ডাক্তার শওকত ওদেরকে খোদা হাফেয বলে টাঙ্গায় চাপেন।

বইয়ের পাতা উল্টিয়ে ইসমত কুরসীতে বসল। গোড়া থেকে পড়া শুরু করল।

ওপাশের কামরায় রাহাত জোরে জোরে পড়ছে। ইসমত বলল— রাহাত! আস্তে পড়!

রাহাত ক'মিনিট খামোশ থাকল। কিন্তু পরে আবার সে জোরে পড়া শুরু হয় ওর। ইসমত ওকে আবারো বারণ করল। রাহাত কামরা থেকে ইজি চেয়ার টেনে উঠানে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল।

এ বইয়ের প্রথম অংশ ১৫ আগস্টের পূর্বের কাহিনীর পর্যালোচনা। দ্বিতীয় অংশে লেখকের নিজ চোখে পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলিম হত্যার প্রত্যক্ষ বর্ণনা এবং শেষাংশে কওমের নামে সলীমের পয়গাম, সেই পয়গামটা ছিল এমন—

"জাতি হে! মানবেতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার যুগ দেখেছ তুমি। যালিম-মযলুমের উপাখ্যান অতীত ইতিহাসের বস্তু। ইনসানিয়াতের খৈলানে কতবার বজ্রাঘাত হয়েছে। বাগ-ই-আদমে কতবার তুফান এসেছে। বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার লোমশ কালো হাত বারবারই মানবতার মুখ চিপে ধরেছে; কিন্তু রক্তসাগরের যে উত্তাল তুমি (ভারতে) দেখেছ, তা আর কেউ দেখেনি।

তোমার সাহিত্যিক, তোমার কবি, তোমাকে দিলকাশ কাহিনী আর সংগীতের সুর-মূর্ছনা শোনাতে এসেছিল— অথচ রক্ত পাথারে সাঁতরাচ্ছিলে তুমি। ওরা তোমার

www.amarboi.org

কলিতে স্মিত হাসি আর চাঁদনি কিরণ দিতে এসেছিল, কিন্তু তোমার সামনে ছিল অগ্নিকুণ্ড, ছাইভস্ম আর লাশস্তূপ। ওরা তোমার পদযুগলে তারকার হাসি, রামধনুর রঙ আর যমীনের তামাম ক্রীড়া-কৌতুক নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তখন লুণ্ঠিত হচ্ছিল তোমার সম্ভ্রম।

জাতি হে! আমি তোমার জন্য পূর্ব পাঞ্জাব থেকে অগ্নিস্ফুলিংগ নিয়ে এসেছি, যা তোমার বাল-বাচ্চাকে পুড়ে ছাই করেছে। নিয়ে এসেছি সেই ছেঁড়া-ফাটা আচকানের টুকরা, যা তোমার বধূ-মাতার খুনে ভেজা। চিত্তাকর্ষক মিউজিকের ধুম-ধাড়াক্কা নয়, নিয়ে এসেছি দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাবের ইথারে-পাথারে ভেসে বেড়ানো হৃদয় বিদারক চিৎকার ধ্বনি। আমি তোমার সাথে আগুনে খেল খেলেছি। রক্তপাথারে সাঁতরেছি। আমার অতীত ও ভবিষ্যত তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত। তোমাকে আমার আহ্বান ওই কবি ও সাহিত্যিকের মত নয়, অন্ধকারে মাহফিল সাজাতে গিয়ে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অপরের রঙ্গ-রসের আসরে আত্মতুষ্টি খুঁজে বেড়ায়। তোমাকে নিয়ে আমার উত্থান, তোমার পতনেই আমার পতন।

তিক্ত বাস্তবতার ওপর আমি কল্পনার রঙীন ফানুস ওড়াব না। দিল্লী থেকে নিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের শেষ কোণ পর্যন্ত আমাদের শহর বরবাদ করে দেয়া হয়েছে। বসতভিটা বিরান করা হয়েছে। জ্বলে ছাই হয়েছে বাড়ী-ঘর। মাসুম বাচ্চাদের মেরে বর্শাফলকে গাঁথা হয়েছে। লাখো মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত করা হয়েছে। ইয্যত হরণ করা হয়েছে লাখো বধূ-মাতার। এ সেই যমীন দোর্দণ্ড প্রতাপে সুদীর্ঘ ৮'শত বছর ধরে যা শাসন করেছি আমরা। এ সুবিশাল সময়ে ভাগ্যের তারকা দেদীপ্যমনে ছিল আমাদের সে যমীনেই আজ দেখছি অসহায় জাতির কাফন-দাফন। এ সেই আসমান, যা একদিন মোহাম্মদ বিন কাসিমের সামনে রাজা দাহিরকে মস্তকাবনত এবং মাহমুদ গজনবী ও ঘোরীর কালজয়ী দাপট দেখেছিল; সে আসমানই নিরব দর্শকের ভূমিকায় জাতির অসহায়ত্ব ও অপদস্থ অবস্থা দেখে মুখ টিপে হাসছে। কিন্তু এগুলো ঘটেছে কি খামাখা? এটি কোন দুর্ঘটনা কি ?

না, খামাখাই নয়, নয় কোন দুর্ঘটনা। কুদরতের অমোঘ নীতিতে উত্থান-পতনের একটা ধারা আছে। ইয্যত ও উৎকর্ষ তাদের জন্য যারা সফলতা প্রাপ্তির পথে দৃঢ়পদে থাকে, আর যারা পতনের রাহা এক্তিয়ার করে; তারাই শেষ নাগাদ অপদস্থতার গহ্বরে ছিটকে পড়ে। কুদরত কোন জাতির সম্মিলিত কর্মকাণ্ডকে বিফল করেন না— পূর্ব পা াবে আমাদের পতন, দলন, নিপীড়ন ও বিধ্বস্ততা; স্বোপার্জিত আলসেমি, অদূরদর্শিতা ও ভুল সিদ্ধান্তের তেতো পরিণাম। ভেড়ার যিন্দেগী এক্তিয়ার করতে গিয়ে বাঘের হামলার শিকার হয়েছি আমরা। একমাত্র আমাদেরই আলসেমী আর আত্মপ্রবঞ্চনার দরুন এমন এক দুশমনের তলোয়ার জাতির শাহ্‌রগে উঠেছে যাদের ধর্ম ও চরিত্রে রহম ও ইনসাফের গোঞ্জায়েশ নেই। আমাদের দুশমন ওরাই, যারা দুনিয়াতে সর্বপ্রথম বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার ঝাণ্ডা প্রোথিত করেছিল, শতাব্দীকাল পরে ইনসানিয়াতের এ দুশমন পতিত কূয়োয় এক নয়া সমাজের জন্ম দিয়েছে। আর সে কূপ ভরাট করতে বেছে নিয়েছে মুসলিম জাতির খুন ও অস্থি-মজ্জা। হিন্দুদের নবগঠিত ঐকমত্যের বুনিয়াদ

www.amarboi.org

হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম বৈরিতা। আমরা এ সব কিছু দেখছিলাম, কিন্তু অতীতে পরমুখাপেক্ষী, বর্তমানে গাফেল ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ছিলাম বেপরোয়া।

মোর্চা বানানোর খেয়াল ঠিক তখনই এল আমাদের, যখন দুশমন কামান দেগে ফেলেছে। বাঁধ দেয়ার চিন্তা তখনই করেছি, যখন বন্যা এসে গেছে।

দিনে ঘুমাতাম আমরা, দুশমন এল, আমাদের বাঁধলো, মাথায় তলোয়ার ওঠাল। অসহায় ছিলাম আমরা। ছিলাম মজবূর। বচসা করেছিলাম। মিনতি করেছিলাম। বিশ্ববিবেকের কাছে আপীল করেছিলাম। একচোখা পরিদর্শকদেরকে নিজেদের অসহায়ত্ব পরীক্ষায় আহ্বান করেছিলাম, কিন্তু পরে জানতে পারলাম— যেখানে জঙ্গলের আইন সেখানে নিছক বাঘের হুংকার শোনা যায়। ভেড়ার ডাকে কেউ কান খাড়া করে না।

কওমের দরদীরা আপোষকামিতা, বৈঠক ও বক্তৃতায় গলা শুকিয়ে কাঠ করছিল— বিহারে পাইকারী মুসলিম হত্যা হলে তারা বিরোধিতার সুর তুলল। নিন্দা প্রস্তাব আনল, গড় মহেশ্বরের পালা এলে তারা উদ্বেগাকুল হল। পাঞ্জাবে বর্বরতার তুফান এলে তারা বক্তৃতা ভাণ্ডারের তামাম শব্দমালা আওড়াল— নিন্দা প্রস্তাবকদের গলা শুকিয়ে গেল। শব্দকোষ ফুরিয়ে গেল; কিন্তু বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও কাপালিকতায় এতটুকু ভাটা পড়ল না।

আমাদের কাছে শব্দকোষের কোনই কমতি ছিল না। এতে আমরা ছিলাম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, কিন্তু ট্র্যাজেডি যা তা হচ্ছে এ পাকিস্তানের হিস্যার অস্ত্র মাউন্টব্যাটেনের হাতে গচ্ছিত ছিল। ট্র্যাজেডি ছিল, পাকিস্তানের ফৌজ বাইরে। সবচে' বড় ট্র্যাজেডি ছিল, ইংরেজ প্রশাসনের আবহমান কালের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মাতবতার দুশমনকে দিল্লীর তখতে বসানো।

✪ ✪ ✪

জাতি হে! আমরা বেঈমানী ও বেইনসাফির শিকার। এর একমাত্র কারণ, আমদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা এমন এক আদালতের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে যেখানে সুবিচারের আর্জি করা নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

কুফর ও ইসলামের লড়াইতে আমরা শতাব্দীর তাবত ইতিহাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি। অতীত ইতিহাস সাক্ষী, অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থায় আদল-ইনসাফের তখতাসীনদের মযলুম মানবতার আঁসু যালিমের অট্টহাসির খোরাক যুগিয়ে এসেছে হামেশাই। আদল-ইনসাফ স্রেফ তাদের জন্য যারা বেইনসাফের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে জানে।

জাতি হে! তোমার ব্যথার এলাজ আন্তঃরাষ্ট্রীয় কনফারেন্সে নয়। তোমার দুশমন স্থান-কাল পাত্র ভেদে কর্মকাণ্ড বদলালেও অভীষ্ট লক্ষ্যে বদল আনবে না সে এতটুকু। ওরা খণ্ডিত ভারত চায়নি, কিন্তু যখন দেখেছে, মাউন্টব্যাটেন ওদের নৌকায় বসেছে তখন অবশ্য অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিবর্তন এনেছে। দেশ বিভাগকে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিয়েছে। তুমি তখন আত্মতৃপ্তিতে খোশ হয়ে ভেবেছ— কোন প্রকার কুরবানী

www.amarboi.org

ছাড়াই আমরা পাকিস্তান লাভ করেছি। দুশমন তার তূনিরের এক নয়া তীর বের করল, দিল্লী থেকে পাঞ্জাব অবধি হত্যা ও অগ্নিসংযোগের জাহান্নামী পরিবেশ কায়েম করল।

সর্বোপরি র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড তোমার বুকে খঞ্জর ফলা ঢুকাল। তোমার সেপাই বাইরে, তোমার অস্ত্র শ্বেত ড্রাগনের হাতে। তোমার যে হাত প্রতিরোধের জন্য উত্থিত হতে পারত, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হল তা আগে ভাগেই। এ অবস্থায় মানবেতিহাসের সবচে' নিকৃষ্ট যুলুম ও বেইনসাফির সামনে মাথা নোয়ানো ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না তোমার সম্মুখে। এরপরও তুমি আশা করেছিলে— র‍্যাডক্লিফের ফয়সালা মেনে নেয়ার পর দুশমন তোমার আপোষকামিতা ও একনিষ্ঠতার কদর করবে। কিন্তু এও এক ধরনের আত্ম-প্রবঞ্চনা ছিল তোমার। আরো ধারণা করেছিলে, পূর্ব পাঞ্জাবের তুফান ওখানেই থেমে যাবে, কিন্তু তা থেমেছিল কি? ওই তুফান দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল। তোমার বুদ্ধির ঢেঁকি এক শ্রেণীর নেতা তোমাকে বোঝাল, পাক-ভারত যুদ্ধের কোনই সম্ভাবনা নেই। এটা উভয় দেশের জন্য আত্মহত্যার শামিল। কিন্তু হিন্দুস্তান দোসরা কদম উঠিয়ে কাশ্মীরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর তুমি বিশ্ব দরবারে আপোষকামিতা ও শান্তির ঢাকঢোল পিটিয়ে যাচ্ছিলে। বলেছিলে, ভারতীয় হানাদার বাহিনী জুনাগড়ে প্রবেশ করেছে।

জাতি হে! তোমার সন্তানরা বিশ্ব মোড়লদের কাছে সুবিচার চাচ্ছিল। কাশ্মীরে ভরদুপুরে ডাকাতি হচ্ছিল কিন্তু বিশ্ব শান্তির ইজারাদাররা নিরব দর্শকের ভূমিকায় তা দেখে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তোমার দেহে আন্দোলনের ধূম্রগিরি উদগীরণ হল— অসহায়ত্ব, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও কাপালিকতার ফেনোচ্ছাস সীমাতিক্রম করলে তোমার নিস্তেজ শিরাতন্ত্রীতে নবজীবনের খুন সঞ্চালিত হল। তোমাদের বীর মোহাম্মদ বিন কাসিম জাতির অসহায় বধূ-কন্যাদের আঁসু দেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। হিন্দুস্তানে সোমনাথের নয়া পূজারীরা তোমার দেহে আরেকবার সুলতান মাহমুদ গজনির প্রাণ ফিরিয়ে দিল। কাশ্মীর প্রান্তরে এসব শেরদিল সন্তানরা হুংকার মারল। তোমার জিগরের টুকরারা তখনও উপকূলে বসে পারাপারের চিন্তা করছিল। তোমার দেওয়ানরা নদীতে ঝাঁপ দিল। স্রোতধারার বিন্ধ্যাচল উতরে গেল তারা।

নেহেরুর পেটুয়া বাহিনী তোমার সন্তান বীর মুজাহিদদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ মাত্র ছ'দিনে তছনছ করার ইবলিসী পরিকল্পনা নিয়ে ময়দানে নামল, কিন্তু যে তলোয়ার পূর্ব পাঞ্জাবের অসহায় নিরস্ত্র মানুষের ওপর চালিয়েছিল; কাশ্মীরে তা ভোঁতা প্রমাণিত হল।

প্যাটেল, নেহেরু ও বলদেব প্রাত্যহিক এ এলান করত— 'সাবাশ বাহাদুরগণ, ভারত মাতা তোমাদের নিয়ে গর্ব করে।' কিন্তু ভারত মাতার সন্তানরা ভেবে হয়রান, নিরস্ত্র মানবতাকে তাদের সামনে বেঁধে আছড়ে ফেলা হচ্ছে না কেন? হিন্দুস্তান পাকিস্তানের প্রতি অভিযোগ ঠুকল যে, সে গোষ্ঠীগত ও সীমান্তবর্তী স্বেচ্ছাসেবীদের বর্ডারে কেন আটকাচ্ছে না? কোটালী, মীরপুর ও আখনৌর-এ হিন্দুস্তানী ফৌজ দাঁতভাঙ্গা জবাব পেয়েছিল। আউড়ী ও পুঞ্চে হানাদার বাহিনী জনবল ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হওয়া সত্ত্বেও চরম মার খেয়ে যাচ্ছিল।

www.amarboi.org

শেরদিল মুজহিদবৃন্দ অস্ত্রের প্রয়োজন মেটাতে এদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিল। আল্লামা ইকবালের স্বর্গীয় আত্মা কাশ্মীরের পর্বতশৃঙ্গ ও উপত্যকায় গাযীদের সাধুবাদ দিচ্ছিল আর হিন্দুস্তানী মহাজনরা খাতা খুলে ক্ষতির খতিয়ান কষছিলেন।

সীমান্ত থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে তারেক বিন যিয়াদ ও খালিদ সাইফুল্লাহর উত্তরসূরিরা তাদের বীরত্ব গাঁথা উপাখ্যানের জন্ম দিয়ে যাচ্ছিল। এক্ষণে বক্তৃতা -বিবৃতি না দিয়ে তলোয়ারকেই তারা বেছে নিল। উল্টো এবার ইউ, এন, ও-এর কাছে খোদ্ ভারতই আপীল করতে লাগল।

কাশ্মীর সমস্যাকে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে সোপর্দ করার কথা বললে আগ্রাসনবাদী, সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ভারত সে কথায় কান দেয়নি; কিন্তু সে সময় তারা সাত সমুদ্দুর তের নদীর পাড়ের ইউ, এন, ও-এর কাছে ফরিয়াদ ঠুকল। ভারতীয় হায়েনারা অভিযোগে বলেছিল পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও জুনাগড়ের মত কাশ্মীরেও কেন ভারত মাতার সন্তানদের স্বাধীনতা উৎসব পালন করতে দেয়া হচ্ছে না? হায়েনাদের দলপতি বিশ্ব শান্তির মোড়লদের কাছে আপীল করছিল— তোমরা পাকিস্তানকে হুকুম দাও— আযাদ কাশ্মীরের হাত-পা বেঁধে আমাদের কাছে সোপর্দ করো।

আজ কাশ্মীর সমস্যা সিকিউরিটি কাউন্সিলের সামনে। পাকিস্তান এর ওকালতি করছে শান্ত, স্থির ও দৃঢ় মস্তিষ্কে। হিন্দুস্তান বিশ্ব বিবেকের সামনে দিগম্বর হয়ে দাঁড়ানো। কিন্তু ভুল ধারণা করে বসে থাকা ঠিক হবে না যে, ইউ-এন-ওতে বিশ্ব শান্তির ইজারাদাররা আমাদের ওপর ইনসাফ করবে। বেইনসাফের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি থাকতে তো নয়ই। আজো যদি হিন্দুস্তানের সাথে ইউ-এন-ওতে পাকিস্তানের আওয়াজ শোনা যায় তাহলেও ওসব মুজাহিদদের শোকর গোযার হতে হবে, আমাদের— জীবন নিয়ে খেলা করে যারা বিশ্ব দরবারে কাশ্মীর সমস্যা পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলেছেন। যারা একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে সুপার পাওয়ার হবার স্বপ্ন দেখছে যে ভারত— কাশ্মীর দোলনায় আটকে গেছে সে। কাশ্মীর যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি এবং আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, হিন্দুস্তান কাশ্মীরের শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজার আশায় বিশ্ব শান্তির ইজারাদারদের দরোজা খটখটাচ্ছে। হিন্দুস্তানের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে বলেই সুর পাল্টিয়েছে। বিগত অপূরণীয় ক্ষতি সামলে ওদের চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামা প্রয়োজন। কাশ্মীরের তুষারপাত ও বরফবৃষ্টি ওদের সৈন্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

শীত মৌসুমে ভারতীয় বাহিনী রসদ ও গোলা-বারুদ জমা করছিল। নতুন সড়ক ও নতুন ব্রীজ নির্মাণ করছিল। বসন্তের গোড়াতেই ওরা পূর্ণ শক্তিতে হামলা করেছিল। জুনাগড় গিলে নেয়ার পর ওদের একীন হল, বিশ্বশান্তির ইজারাদার ওই ফয়সালাকে রোধ করবে না, যা শক্তিবলে অর্জিত হয়েছে।

পাকিস্তানকে শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর যুদ্ধে নেমে পড়তে হবে। মুজাহিদীনে কাশ্মীর প্রস্তুতির সামান্য যে ফুরসত দিয়েছে তাতে পাকিস্তানের ফায়দা উঠাতে হবে।

www.amarboi.org

যারা একথা মনে করেছিল যে, নিজেদের অসহায়ত্ব ও বর্বরতার কাহিনী শুনিয়ে ইউ, এন, ওকে কার্যকরি পদক্ষেপে বাধ্য করা হবে— তারা ফিলিস্তীন থেকে সবক নিতে পারেন। বিশ্বশান্তির ইজারাদাররা একথার প্রমাণ দিয়েছে যে, কমযোর কওমের ইনসাফ ও সুবিচারের আশা করা উচিত নয়। আরব দেশগুলো সম্প্রসারণবাদী ইয়াহুদীদের মোকাবেলায় কার্যকর কোন আঘাত হানতে পারেনি। পরিণতিতে সিকিউরিটি কাউন্সিল ফিলিস্তীন বিভক্ত করণে সাহায্য করেছে। এংলো আমেরিকান ব্লকের একপেশে ইয়াহুদী সমর্থন নীতি দেখে মানুষ মনে করেছিল, রাশিয়া এ ব্যাপারে চুপ করে থাকবে না, কিন্তু ক্যাপিট্যালিজাম ও কমিউনিজম মুসলিম বিদ্বেষী একই বোটার দুটো ফুল বলেই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল। ওরাই বিশ্ব ফকির ভূমিহীন ইয়াহুদীদেরকে আরব— কলিজায় বিষফোঁড়ার মত বসিয়ে দেয়।

ফিলিস্তীনী মানুষের অপরাধ, তাদের কথার পাওয়ার খুবই ক্ষীণ। অপরাধ, তারা নিজেদের ঘরদোর সামলাতে পারে না। ওদের কাছে ওই তলোয়ার ছিল না, যা অবিচারের পথ রুখতে পারে।

পরিস্থিতি এবার পাকিস্তানকে হাত গুটিয়ে বসতে দিল না। জুনাগড় দখলের পর সকলের মনে শংকা জাগল, কাশ্মীরও এভাবে ভারত মাতার খাই খাই উদরে ঢুকে যাবে। তলোয়ারের ফয়সালা কথার দ্বারা নয়, প্রতিরোধ করতে হয় তলোয়ার দিয়েই। মুজাহিদীন নিরস্ত্র ও বুভুক্ষাবস্থায়ও যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে আবহমান কালের ইতিহাসে তার নযীর খুবই কম। মনে রাখতে হবে, কাশ্মীর যুদ্ধ পাকিস্তানেরই যুদ্ধ। স্রেফ ৩৫ লাখ কাশ্মীরীদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নয়, লড়াই জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার। উপমহাদেশে কুফর ও ইসলামের চূড়ান্ত লড়াই। এ সম্মিলিত যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব কেবল নিরস্ত্র নিরীহ মুজাহিদবৃন্দের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। মুজাহিদবৃন্দের বায়ু শূন্য হওয়া এবং শিরার শেষ ফোঁটা খুন বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। আযাদ কাশ্মীরের রাইফেল অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত দুশমনের ট্যাংক, জঙ্গী বিমান ও মেশিনগানের সামনে টিকতে পারবে না। কাশ্মীর পাকিস্তানেরই সম্পদ। এ কাশ্মীর-দুশমনকে ওখানেই খতম করতে না পারলে ওরা যে কোন সময় পাকিস্তানের ওপরই চড়াও হয়ে বসবে।

হিন্দুস্তান দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাব থেকে কোটি মানুষকে পাকিস্তানে তাড়িয়েছে। বিহার ও পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) আশ্রয় নিচ্ছে। জুনাগড়ের মুসলমানদের করাচী ও সিন্ধুতে পুশ করেছে। কাশ্মীরে হিন্দুস্তানী ফৌজ অনুপ্রবেশ করবে এবং মুসলিম অধিবাসীদেরকে পশ্চিম পাঞ্জাবে পুশ করা হবে। পাকিস্তান আনসারদের কেল্লা। পাকিস্তান সেই উপকূল, খুনের দরিয়া পার হয়ে যেখানে উপনীত হয়েছি আমরা। এ সেই বৃক্ষ রক্ত ও আঁসু দিয়ে যার গোড়া সিঞ্চিত করেছি। এ সেই মঞ্জিল যার চলার পথের গর্তগুলোকে আমাদের লাশ দিয়ে পূরণ করেছি। এ সেই চার দেয়াল, যার মাঝে কওমের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শক্তির সমন্বয় সাধন করেছি। পাকিস্তানের আনসার, মুহাজিরদের ভাবতে হবে, এ চার দেয়ালের মাঝে দৌড়ে প্রবেশ করার সুযোগ না পেলে পরিণতি কি হবে।

www.amarboi.org

এক্ষণে তিক্ত অভিজ্ঞতার ওপর রঙিন পর্দা ফেলায় কোন ফায়দা হবে না। কওমের মনে শান্তি-স্বস্তি আনতে নেতাদের জ্বালাময়ী ভাষণও যথেষ্ট নয়। এখন আমরা দুনিয়ার গোটা মুসলিম দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করব। এখন সময় জাতির দিব্যদৃষ্টি খোলার। কেননা মুসলিম জাতি পৃথিবীর বৃহৎ খ্রিস্ট পরাশক্তির মুখোমুখি। এ হল সেই জাতির পরিণতি বিগত ৮ শতাব্দী ধরে যারা পেশোয়ার থেকে রসকুমারী পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার রাজ কায়েম করেছিল। পতন যুগের এ দুই শতাব্দীর সর্বশেষ ঘাঁটি হচ্ছে এ মোর্চা। দুশমন এখন এ বৃক্ষের গোড়া কাটা এবং জ্বলন্ত চেরাগের রোশনি নিভিয়ে দিতে চায়। এটা আমাদের বিরান বস্তির আখেরী চেরাগ ও বসন্ত কাননের শেষ বৃক্ষ।

আমরা আমাদের ইতিহাসের ভয়ানক যুগ অতিক্রম করছি। এ বিভীষিকার সামনে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ৮ কোটি মুসলমানকে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে ক্ষুদ্রস্বার্থ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ওইসব মতানৈক্য দূর করতে হবে যা হয় গরীব-ধনীর বেলায়। শ্রমিক ও পুঁজিপতির বেলায় যা হয়ে থাকে তাও দূর করতে হবে। মর্মর পাথরে বাঁধা প্রাসাদে অবস্থানরত লোকদের খন্দকে নামতে হবে। গোষ্ঠীগত হীনস্বার্থ দু'পায়ে দলে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এক্ষণে আমরা এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে যেখান থেকে একচুলও স্থানচ্যুত হওয়ার অর্থ হচ্ছে ধ্বংস ডেকে আনা। অবরোধকারী দুশমনকে কাশ্মীর দখলের অবকাশ দিলে এ অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। যে কওম নিজস্ব বলয়ে থেকে আত্মরক্ষামূলক আক্রমণ করে তারা শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের সামনে দাঁড়াতেই পারে না। তারা সর্বত্রই মার খায়। রণাঙ্গনে কেবল দুশমনের আঘাতই ফেরানো যাবে না বরং আঘাতের পরিবর্তে প্রতিঘাতও করতে হবে।

হিন্দু কংগ্রেসের সাথে অস্তিত্বের লড়াইতে বিগত ক'বছর আমাদের কর্ম-তৎপরতা ছিল এমন যে, প্রতিটি কাজে আমরা নিন্দা প্রস্তাব এনেছি এবং তর্কযুদ্ধে কুপোকাতের ওপর তুষ্ট থেকেছি। এ কাজে আমাদের পদে পদে পস্তাতে হয়েছে। আমাদের আপোষকামিতা ও সন্ধিগ্ধ মনোভাব হিন্দুদের কর্মকাণ্ডে কোন প্রভাব আনেনি। সর্বোপরি বিগত কিছু জিঘাংসার পর আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টিকল্পে এ কাপালিক দাদাদের ওপর ভরসা করার কোনই সুযোগ নেই। এমনটা করলে আমাদের অবস্থা ওই লোকদের তুলনায় কোন অংশে কম হবে না যারা দিনের আলোতে চোখ বন্ধ করে নেয়। এখন হিন্দুস্থানের তুনিরের নয়া তীর বের হবার অপেক্ষা নয়, সময় এখন নিজেদের তুনিরের তীর বের করার।

✪ ✪ ✪

জাতি হে! পূর্ব পাঞ্জাবে যা কিছু হয়েছে, তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণতি নয়। মানবেতিহাসের এ বিশাল হত্যাকাণ্ডকে বিশ্বশান্তির ইজারাদাররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে পরিস্থিতিকে বিতর্কিত করার কোশেশ করছে। পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, ভরতপুর, ইন্দোর, পাটিয়ালা, ফরিদকোট, নাভ ও কাপুরথালায় খুনের যে নাটক মঞ্চায়িত হয়েছিল ; এর সাথে সাম্প্রদায়িকতার কোন যোগসাজশ ছিল না, বরং এটা পাইকারী হত্যালীলা, যা

www.amarboi.org

ভারতীয় প্রশাসন, সেনা-পুলিশ ও নয়া প্রদেশের রাজাদের মদদে সংঘটিত হয়েছিল। নেহেরু থেকে এক সেবা সংঘী এবং প্যাটেল থেকে সাধারণ আকালী সেনাদের সকলেই মুসলিম নিধনে শরীক ছিল। এ পাইকারী হত্যা ভারত থেকে মুসলিম জাতিকে পুরোপুরি খতম করার নীল নক্‌শা মাত্র।

কিন্তু পাকিস্তানে এখন এমনও লোক আছে, যারা নেহেরু ও প্যাটেলের আচকান থেকে রক্তের দাগ মোছাকে ফরয মনে করছে। এরা মুসলিম জাতিকে থাপ্পড় দিয়ে আবারো ঘুম পাড়ানোর ব্যর্থ কোশেশ করছে।

দেশ বিভাগের পূর্বে মুসলমানদের ওপর মরণ আঘাত হানার জন্য কংগ্রেস যখন শিখ ও মাস্তান আকালীদের সংঘবদ্ধ করছিল তখন অদূরদর্শী এসব লোক মুসলমানদের বোঝাচ্ছিল, 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই'। হিন্দুদের ব্যবহারের প্রতি মুসলমানদের অতি উৎসাহের কিছু নেই। মুসলমান সংগঠনের নাম সাম্প্রদায়িকতা, হীনমন্যতা আর গান্ধী বুঝি দুধে ধোয়া তুলসি পাতা। সুতরাং মুসলমানদের কোন ভয় নেই। দেশ বিভাগের পর এসব হীনমন্য অদূরদর্শীদের জায়গায় এক শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক ময়দান দখল করল। এরা একক্ষণে হিন্দু ফ্যাসিজমের সাফাই গাচ্ছিল। ওদের উদ্দেশ্য, মানুষের মন থেকে পূর্ব পাঞ্জাবের হৃদয় বিদারক কাহিনী মুছে ফেলা। যেন এ দাঙ্গার ৫০% দায়ভার হিন্দু শিখদের ও ৫০% মুসলমানদের ওপর পতিত হয়। আর এটা এজন্য করা হয়, যাতে মুসলমানরা পূর্ব পাঞ্জাবের ট্র্যাজেডি থেকে নসীহত অর্জন করে সংঘবদ্ধ না হতে পারে। ভারত জুনাগড় গিলে নিয়েছিল, কাশ্মীর গিলতে চাচ্ছিল। কাশ্মীর গিলে গোটা ভারতের মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করার প্রোগ্রাম হাতে নিতে চাচ্ছিল ফ্যাসিস্ট হিন্দুরা। সর্বশেষ ওদের টার্গেট পাকিস্তান।

ওই কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে মুসলিম জাতির ইয্‌যত-আবরু ও জান-মালের কোন দরদ ছিল না। ১০/১৫ লাখ মুসলিম হত্যাও এদের কাছে তেমন উদ্বেগজনক বিষয় নয়। এ রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দেউলিয়া কবি-সাহিত্যিকরা কোকেনের ব্যবসা করত এবং পাকিস্তানের কিছু প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্তানে বই বিক্রির জন্য এ কোকেন বিক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করত।

সম্মিলিত মুসীবত ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টা চাই। আর সম্মিলিত প্রচেষ্টা সম্মিলিত অনুভূতি, সম্মিলিত ফিকির ও যৌথ পরিকল্পনা ছাড়া হতে পারে না। পূর্ব পাঞ্জাবের ঘটনার পর পাকিস্তানের মুসলমানরা ভাবতে শুরু করল, যদি ফ্যাসিস্ট হিন্দুদের সামনে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রদর্শন করা না যায় তাহলে পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, ও জুনাগড়ের ইতিহাস খোদ্ পাকিস্তানেই কায়েম হবে। জাতির আসন্ন দুর্যোগ আঁচ করতে ৮ কোটি মানুষের সুখী জীবনের জন্য তারা লড়াই করল। এখানে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব বিশাল খতরার মোকাবেলা করছিল। কাশ্মীর সমস্যা কেবল এতদঞ্চলের নয়, সমস্যা পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখার। এ কাশ্মীর উপত্যকায়ই পাকিস্তানের ঝরনা প্রবাহিত হয়। জাতির অস্তিত্ব রক্ষার ভিত্তি এ অঞ্চলের আযাদীর মধ্যে নিহিত। খুন ও আগুন সেই নাটকের একটা দৃশ্য মাত্র, যার শেষ অংক মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু ও

www.amarboi.org

প্যাটেল পাকিস্তান স্টেজে মঞ্চায়িত করতে চেয়েছিল। জাতির এ চরম দুর্যোগ মুহূর্তে সেপাইদের তলোয়ার আর কবি-সাহিত্যিকদের কলমের একই রাস্তা হওয়া দরকার। তুফানের সময় এক জাতিতত্ত্বের সিড্যাকসিন ইনজেকশন পুশকারী রাজনীতিকরা থাপ্পড় দিয়ে কওমকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে; কিন্তু ঘুমন্ত কওম ধ্বংসের পরও তাদেরকে ঘুম পাড়ানীর গান শোনায় নীতিজ্ঞানহীন এ কলামিস্টরা। এদের ভাবশিষ্য রাজনীতিবিদরা কওমকে ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি খাওয়ায়। আর জাগ্রত মুসলমানদের গালে কোকেন তুলে দেয়। এদের কাছে আযাদীর ব্যাপারটা 'কুচ নেহি' পর্যায়ের। ভবিষ্যতের যে কোন আশংকা তাই ওদের ভাবিয়ে তোলার কথা নয়।

দেশ বিভাগের পূর্বেও মুসলিম জাতির ভবিষ্যত, বর্তমান ও অতীত নিয়ে প্রাবন্ধিকদের এ দল বিশেষের তেমন কোন মাথাব্যথা ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের সমূলে ধ্বংসকল্পে তামাম কুফুরী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অমানিশার তুফান চারদিক থেকেই পাকিস্তানকে অবরোধ করে রেখেছিল। পরিস্থিতিই মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করল; কিন্তু এসব লোক মনে করল, ঐক্যবদ্ধ পাক-প্রতিরোধ শক্তির ভিত্তি হবে ইসলাম। সেই ইসলামী সমাজে সেক্যুলারিস্ট এসব মগজবেচা লেখক-সাহিত্যিকদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে না। এ সেই ইসলাম যা তাদেরকে মানসিক বন্দীখানায় ঠুকিয়ে দেবে। এজন্য এরা নব উদ্যমে নব উৎসাহে ময়দানে নামল এবং নীতিজ্ঞানহীন মানুষের হৃদয়ে তারাই কোকেন মালিশ করতে থাকল। ফ্যাসিস্টরা তাদের ওপর যাদুবিদ্যা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা উপলব্ধি করতে পারল না যে, রগ কেটে খুন বেরোচ্ছে।

হিন্দুস্তানের এ সাফাই গায়কেরা মুসলমানদের মধ্যে আস্থা আনা ছাড়াও তাদের ভুখা-দরিদ্রতার কথা তুলল। পাকিস্তানের আওয়াম ও মজদুর শ্রেণীর দরিদ্রতা নিয়ে এরা বেশ চিন্তায় রইল। আওয়াম ও মজদুরের আর্থিক সংকট নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যা ছাড়া উন্নয়ন–অগ্রগতি সম্ভব নয়; কিন্তু এসব দরদী বন্ধুদেরকে আওয়াম ও মজদুররা জিজ্ঞেস করল— হিন্দুস্তানী হায়েনাদের থেকে আমাদের বধূ-মাতার ইয্যত বাঁচানোর কি কোনই অধিকার নেই? পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলিম ও মজদুর হত্যা হলে তোমরা কৈ ছিলে? আজ আমাদের পেটের চিন্তায় তোমাদের দরদসিন্ধু উথলে উঠছে যে খুব। আকালী সেনা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ যখন আমাদের বউ-বেটি, মা ও শিশুদের হত্যা করছিল, কোথায় ছিল তোমাদের সহমর্মিতা? তোমাদের চোখের সামনে লাখো ইনসান কতল, লাখো মেয়ের সম্ভ্রমহানি, হাজারো নারীর ইয্যত লুণ্ঠন হল, আর সেই তোমরাই কিনা হিংস্র দানবদের সাফাই গাইতে গিয়ে কিচ্ছা খতম করছ যে, এটা নিছক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা?

আজ হিন্দুস্তানী জঙ্গী বিমান কাশ্মীরী মজদুরদের বস্তিতে বোমা ফেলছে। কিন্তু তোমরা মুখে কুলুপ এঁটেছো কেন? এটাকেও কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চালিয়ে দিতে চাও? কাশ্মীরে অস্তিত্বের লড়াই চলছে কিন্তু তোমরা চাচ্ছ পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ লাগাতে। আমাদের স্বার্থচিন্তা নয়, তোমরা মূলতঃ দুশমনের স্বার্থোদ্ধার করতে চাচ্ছ।

www.amarboi.org

কবি-সাহিত্যিকদের অপর দলটা পাকিস্তানের স্বার্থেই কথা বলছিল। কিন্তু তারা তখনও কবিতার পংক্তি নিয়ে ব্যস্ত, যখন ইংরেজ জাতি দিল্লীর লাল কেল্লার কড়া নাড়ছিল তখন এরা রঙ্গ-আসর সাজিয়ে কবিগান করছিল। আজ ইংরেজদের চেয়েও নিকৃষ্ট দুশমন পাকিস্তান অবরোধ করে রাখার কোশেশে ময়দানে নেমেছে, আমাদের কবিবর্গ কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। জাতির সাহিত্যিক-সাংবাদিক হে! তোমার সামনে রয়েছে মুসলমানদের দেহ ভস্ম। তোমার ক্ষুরধার কলমের প্রতি কণা কালি আন্দোলনের অগ্নিবান উৎক্ষিপ্ত করতে পারে। পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীর শহীদদের খুনকে বৃথা যেতে দিও না। তোমার কলমের কালি জাতির যুব প্রজন্মের মাঝে নবস্পৃহা, অনাবিল স্পন্দন ও আন্দোলনের ধূম্রগিরি উদগীরণ করতে পারে।

জাতি হে! আযাদীর লড়াইতে আওয়ামকে জেহাদী প্রেরণা দিতে হবে। আমাদেরকে মানসিক দৃষ্টিকোণে এদের প্রস্তুত করতে হবে। কওমের অনুভূতি আছে। পাক-আওয়াম ইয্যত-আযাদীকে জিইয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। এক্ষণে জাতির কর্ণধারদের দায়িত্ব জনতার এ অনুভূতি ও উদ্দীপনাকে পুঁজি করে দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। ইট-সুড়কি মজুদ, এখন কেল্লা নির্মাণ করতে দরকার রাজমিস্ত্রীর। পাকিস্তানী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিরক্ষা উপলব্ধি ঢুকিয়ে দেয়া দরকার। কারখানার কল ঘোরানো এবং ক্ষেতের হাল চালানো দিনমজুরের কানে উন্নয়ন-অগ্রগতির শ্লোগান দিতে হবে। স্কুল-মাদ্রাসায় এমন সিলেবাস নির্ধারণ করতে হবে যাতে ছাত্ররা সোনালী যুগের মুসলমানদের থেকে চারিত্রিক দীক্ষা পেতে পারে। যে শিক্ষা কওমের ছাত্র-স্কলারদের নৈতিক অবক্ষয় করে তার দরোজা রুদ্ধ করতে হবে। কওমের যে সব লোকের বন্দুক উঁচিয়ে ধরার শক্তি আছে তাদেরকে ফৌজে ভর্তি করতে হবে।

অনেক কিছুই হারিয়েছি আমরা। বিশাল সম্ভাবনাময় পুঁজি আমাদের। জনগণের দৃঢ় হিম্মত সেই পুঁজি। যুগের বিরাট বিরাট দুর্যোগ মোকাবেলায় জনতার ঈমান-একীন তাদের সীনায় গচ্ছিত। কুফরের সয়লাব তাদের রাসূল-প্রেমের স্ফুলিংগকে নির্বাপিত করতে পারবে না। তাদের নিঃস্বার্থ কর্ম, একনিষ্ঠ আত্মদান আমাদের অনবদ্য সম্পদ। কিন্তু পাকিস্তান এ সম্পদ থেকে অদ্যাবধি উপকার গ্রহণ করতে পারেনি।

যে নদী থেকে ফসলী ক্ষেত সিঞ্চিত হয় না সেটা হয় ঝিল কিংবা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, কিংবা কোন মরু তাকে শুষে নেয়। যে শক্তি সময় থাকতে কওমের উন্নয়নের কাজে লাগানো হয় না, সময় চলে গেলে তা ধ্বংসের পথে পা বাড়ায়। পাক-জনতার মধ্যে যিন্দেগী আছে, স্পন্দন আছে, আছে উচ্চাশা, প্রেরণা ও প্রাপ্তির অদম্য বাসনা। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, আমাদের শাসকশ্রেণী শিথিলতা ও আলসেমির ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে ওই জনতার জোশের ওপর। আমাদের শাসকবর্গের এখনও এ অনুভূতি আসেনি যে, তাদের ওপর এমন এক কওমের অস্তিত্ব রক্ষার যিম্মা চেপেছে যাদেরকে ইনসানিয়তের ইতিহাসে সুবিশাল দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের নেতৃত্বে এমনও নেতা এক্ষণে ক্ষমতার-মধু চাটছেন, যারা জনসংযোগের কোন তোয়াক্কাই করছেন না। পূর্ব পাঞ্জাবে দুর্যোগ এসেছে, কিন্তু তাদের এমন খুব কমই

www.amarboi.org

ছিলেন যারা জনগণের সাথে বাঁচা-মরার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তারা জনগণের হালত না দেখেই সপরিবারে পাকিস্তানে চলে আসেন। চলে আসার সময় জনগণকে তারা এতটুকু বলার প্রয়োজন মনে করেননি যে, পাকিস্তান এদিকে।

একথা সত্য যে, আওয়াম পূর্ব পাঞ্জাবের পরিকল্পিত দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত ছিল না। যেখানেই তারা কর্মতৎপর নেতা পেয়েছে সেখানেই দুর্যোগ মোকাবেলা করেছে। তাইতো এদের অনেক জনপদে হামলা শানাতে ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান নিয়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু নেতাদের অনেকেই এর পূর্বে লাহোর চলে এসেছিলেন। এদের অনেকে লাহোরে সুবিধা করতে পারবে না দেখে করাচীর উৎসবে যোগ দেন। ওদিকে রেডিও লাহোর ঘোষণা করছিল, অমুক নেতা, অমুক সদর, অমুক সেক্রেটারী, অমুক এম, এল, নির্বিঘ্নে লাহোরে পৌঁছেছেন। তারা বলেছেন, পূর্ব পাঞ্জাবের অবস্থা বিভীষিকাময়, তাদের কোন আত্মীয়-স্বজন লাহোরে পৌঁছে থাকলে অমুক রোডের অমুক ফ্ল্যাটে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

পূর্ব পাঞ্জাবের যে এলাকার লোকেরা এ এলান শুনত যে, তাদের এম, এল, আঁই পাকিস্তান পৌঁছেছে তারা সহসাই লাহোরের পথ ধরত। কওম শরণার্থী ক্যাম্পে তড়পাচ্ছিল আর লিডারগণ এলটমেন্ট দফতরে হাওয়া খেতেন। পূর্ব পাঞ্জাবের লিডারগণ হিজরত করে পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাই- বন্ধুদের সাথে মিলতেন আর পূর্ব পাঞ্জাবের জনগণের বোঝা পশ্চিম পাঞ্জাবের আম জনতার ঘাড়ে পড়ত।

পশ্চিম পাঞ্জাবের সামনে এক্ষণে শরণার্থীদের পুনর্বাসন সমস্যা দেখা দিল। এ জন্য চাই নিঃস্বার্থ মন ও মেহনতী অনভিজ্ঞ মানুষ। কিন্তু এ দায়িত্ব চাপল অনভিজ্ঞ, অলস, দেহপূজারী ও স্বার্থপর মানুষের কাঁধে। এলটমেন্টে প্রাপ্য-অপ্রাপ্যের প্রশ্ন ছিল না। প্রকৃত মুহাজিরদের কোন পার্থক্য করা হল না। যে সব মুহাজিরদের নিজস্ব চতুর্থ শ্রেণীরও একজন অফিসার থাকত, তারা নির্দ্বিধায় দোকান বা ছোট বাড়ী পেয়ে যেত। যারা বড় অফিসারদের দরোজায় ধর্না দিতে পারত তারা বিশাল এলটমেন্ট পেয়ে বসত। তবে মন্ত্রী পর্যায়ে যাদের লোক ছিল তারা বিলাসবহুল বাড়ী পেয়ে যেত। মন্ত্রীদের অবস্থা এমন হাস্যকর ছিল যে, তারা কারখানা বা ফ্যাক্টরীতে একটা পদের জন্য কয়েকজনকে ছাঁটাই করে দিতেন। অধিকাংশ মন্ত্রীই সকলকে খোশ রাখার তথাকথিত গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ওপর বদ্ধপরিকর ছিলেন। কার্যত তাঁরা ছিলেন আলসেমী ও দুর্নীতির মূর্ত প্রতীক।

কওমের যে নিঃস্বার্থ নেতৃস্থানীয় লোকেরা এদের বিরোধিতা করত, তাদেরকে বিশাল বাড়ী-গাড়ী দিয়ে মুখে মোহর এঁটে দেয়া হত।

কওম সকল পরীক্ষায়ই সাফল্যের সাথে উতরে যেতে লাগল। যখন তাদের কাছে আবেদন জানানো হল যে, ক্যাম্পে মুসলিম শরণার্থী ভাইবোনদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য কাপড় প্রয়োজন তখন তারা সর্বাত্মক কুরবানী পেশ করল।

পূর্ব পাঞ্জাবের হুকুমত নহরের পানি বন্ধ করে দিল। আর আমাদের হুকুমত জনগণের কাছে নদী খননের আবেদন রাখলে তারা বেলচা-কোদাল নিয়ে ময়দানে

www.amarboi.org

নামল। ওদিকে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হালত ছিল এ রকম যে, ক্যাম্পে যখন শরণার্থীরা জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাচ্ছিল তখন তারা মালে গনীমত হাসিল করায় লেগেছিল। বাসস্থান ভাগাভাগির পর তারা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ক্ষেত খামারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, মুহাজির নেতাদের হুঁশ ছিল না; কিন্তু এলাটমেন্টের ধাক্কার খবর জানতে পেরে কওমের দরদে তাদের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে।

পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক এম, এল, আই চিন্তা করলেন, আসন্ন নির্বাচনে মুহাজিরদের ভোটার লিস্টে নাম লেখালে তাদের বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য তারা নিজস্ব এলাকায় নিকটাত্মীয়দের আবাদ গড়ে তোলার কোশেশ করেন। এসব মেদবহুল নেতাদের মনে পূর্ব পাঞ্জাবের রক্ত নদীর জন্য কোন সহমর্মিতা না থাকলেও যে সব নেতারা রক্তসাগর পেরিয়ে পাকিস্তানে এসেছিলেন তাদের সহমর্মিতায় কোন পরিবর্তন আসেনি। তবে এদের মধ্যে যারা নিছক প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালিয়েছিল তারা পরবর্তীতে এতটুকু পস্তায়নি। তারা শীর্ষনেতাদের মনে অগ্নিশিখা জ্বালানোর আশাবাদী ছিলেন। কওমের ওই লোকদের জন্য ওরা ঘোড়াস্বরূপ যার ওপর চড়ে লিডারগণ মনযিলে মাকসুদে পৌঁছান। এক্ষণে তাঁদের অভিযোগ, কি উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তাকারে পুনর্বাসন করা হল? তাঁরা বলছিলেন, শরণার্থীদের সারাদেশে ছড়িয়ে দিলে আরেক কিয়ামত সৃষ্টি হবে। এ স্বার্থান্ধ নেতাদের নিজেদের অস্তিত্ব চিন্তা কওম অপেক্ষা ছিল অধিক।

মুহাজির ও আনসারদের সমস্যা ছিল জাতীয় সমস্যা। জাতীয় অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখে তারা যে সবর, আত্মদান ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, আমাদের সফলতা ও স্বার্থোদ্ধারের পথে তা মাইল ফলক হিসাবে কাজ করবে। মুহাজিরে মক্কার সাথে মদীনার আনসারগণ যে ব্যবহার করেছিলেন সে ব্যবহারেরই পুনঃ ইতিহাস কায়েম করলেন পাকিস্তানী আনসারগণ। পূর্ব পাঞ্জাবে আমাদের মুসলিম ভাইদের লাশগুলো এজন্যে পড়েনি যে, এর ফলাফল বিলাসবহুল ইন্দ্রিয় পূজারী নেতারা ভোগ করবে।

আমাদের শহীদী কাফেলার সহযাত্রীদের খুনের দাবী হচ্ছে, এর দ্বারা কোন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, তারেক বিন যিয়াদ কিংবা কোন মাহমুদ গযনবীর ইতিহাস লেখা হবে। আমাদের পাক-প্রশাসন কিংবা পাক-আওয়াম এ ধরনের ভোজনলিপ্সু, ল্যাংড়া-লুলা নেতাদেরকে আনসার-মুহাজির গোষ্ঠীগত মতানৈক্যের মাঝে নেতাগিরির সুযোগ দেয় আর তারা যাবতীয় দায়ভার আনসার-মুহাজিরদের ওপর চাপায় তাহলে পাকিস্তান আজীবন দু'টো সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ভারতে মুসলিম নিধনে যাদের হুঁশ আসে না, তাদের দ্বারা কি আশা করা যায়?

পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রাদেশিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হলেন ওই নেতারা যাদের দৌড়ঝাপ কেবল গদী পর্যন্তই সীমিত। মন্ত্রীদের একজন বিশ ঘন্টার মধ্যে একদলকে গদীচ্যুত করলে আরেক গ্রুপ এদের বিরুদ্ধে লেগে যেত।

পশ্চিম পাকিস্তান পাকিস্তানের জন্য মেরুদণ্ডস্বরূপ। কিন্তু এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতই ঘোলাটে ছিল যে, প্রতি এম, আই, এল মন্ত্রী হবার চিন্তায় ছিলেন আর

www.amarboi.org

প্রতিজন মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন। মুসলিম লীগের অবস্থাও এর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। সকলেই কেবল গদীর চিন্তায় বিভোর। কওমের অর্ধেকের মনোনিবেশ ডান্ডাগুলি খেলার দিকে আর মুসলিম লীগের মনোনিবেশ কাবাডি খেলার যুবকদের পানে।

পশ্চিম পাঞ্জাবে শরণার্থীদের আবাসন সমস্যা নিরসন নয়, এক্ষণে সমস্যা নয় তাদের ক্ষুধার অন্ন ও লজ্জা নিবারণের কাপড়ের ব্যবস্থা। দুশমনের আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাবের এন্তেজাম ও কোন নয়; বরং সমস্যা— মন্ত্রী কে হবেন, অমুকের লোক মন্ত্রী হলে অমুক গ্রুপের কি হবে ? লিডারের অমুক অমুক উপদলের মধ্যে যে কাবাডি ম্যাচ হচ্ছে এরই বা কি হবে ?

বিগত ঘটনার আলোকে পাকিস্তান প্রশাসন জনগণকে দোষারোপ করতে পারে না যে, তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধক চেতনার অভাব। পরিস্থিতি জনগণকে সজাগ করে দিয়েছিল অনেকটাই। পূর্ব পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের রক্তারক্তি বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশংকার প্রতি তাদের গভীর নযর রাখতে শিখিয়েছিল। এক্ষণে তাদের একথা বলার জরুরত নেই যে, কাশ্মীরে ভারতের উপস্থিতি আক্রমণাত্মক, সুতরাং এর প্রতিরোধে প্রস্তুত হতে হবে এবং সংঘবদ্ধ ও সশস্ত্র হতে হবে।

নেহেরু ও প্যাটেলের চ্যালেঞ্জ কেবল পাক প্রশাসনের জন্য নয়, চ্যালেঞ্জ গোটা কওমের জন্য। কওমই পারে একমাত্র এর জবাব দিতে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত যে যুদ্ধে নামতে যাচ্ছে, উপমহাদেশে কুফর ও ইসলামের চূড়ান্ত লড়াই হবে তা। আসন্ন লড়াইয়ে পাকিস্তানের বিজয় তৌহিদমনা ইসলামী সন্তানদের আযাদী ও অস্তিত্বের ধারক হবে। খোদা না করুক উপমহাদেশে ইসলামের এ শেষ ঘাঁটিকে রক্ষা করতে না পারলে ভারত মহাসাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকবে না।

পাকিস্তান রক্ষা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার শামিল। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা অন্যান্য সমস্যাদির প্রতি অনীহ। কিন্তু যে ঘর বন্যা কবলিত সে ঘরের মালিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ না দিয়ে যদি ঘরদোর পরিষ্কার করতে যায় এবং আরাম-আয়েশের খেয়াল করে, তাকে কি বলা যায় ? আমাদের অবস্থাও কতকটা এমন। পাহাড় সমান দুর্যোগ পেরিয়ে আমরা এক ভূখণ্ডে আশ্রয় পেয়েছি। কিন্তু এখানে আসতে না আসতেই ঘরের ভিটে তৈরী করতে কোদাল মারছি। ঘরের চার দেয়াল খাড়া করিনি এখনও; এখনও আমাদের দুশমন তুফান বইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এমনও অদূরদর্শী-অর্বাচীন আমাদের মাঝে বিদ্যমান, যারা নক্‌শা নিয়ে, দরোজা-জানালার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে বাদানুবাদ শুরু করে দিয়েছে। বলছে, নক্‌শা এটা ঠিক নয়, ঠিক ওটা।

✪ ✪ ✪

জাতি হে! জনগণের যে দলটা ভেড়ার জীবন অবলম্বন করে, বাঘই তাদের ঘাড় মটকে দেয়। নেতাদের একদল আমাদেরকে ভেড়া হবার সবক দিচ্ছেন। তারা মনে করছেন, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে জনগণ ময়দানে নামলে তাদের ইতিবাচক-নেতিবাচক রাজনীতির কারিশমা ধরা খেয়ে যাবে। এজন্য যে কোন মূল্যে জনতার ঐকমত্যে ফাটল ধরাতে তারা এক পায়ে খাড়া।

www.amarboi.org

এরাই শতাব্দীকাল ধরে বিশ্বাসঘাতকতা করে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। ইসলাম এক ছিল, কিন্তু ওরাই একে গোত্রে গোত্রে ও গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছে। পাহাড়সম মুসীবতের কালে মানুষ যখন সংঘবদ্ধ ও ঐকমত্য ছিল তখনও এরা ময়দানে নেমেছে। গ্রানাডাবাসী যখন বিষম-মুসীবতের সম্মুখীন তখন তাদেরকে আরবী, আন্দালুসী ও বার্বার সাব্যস্ত করেছে এরাই। তাতারীরা বাগদাদে হামলা করলে গোষ্ঠীগত মতানৈক্যের বিষবাষ্প ছড়িয়েছে এ শ্রেণীই।

পাকিস্তানের প্রদেশগুলোয় আজো ওই শ্রেণীর গোষ্ঠিভিত্তিক মতানৈক্য ও আঞ্চলিকতার বিষবৃক্ষ রোপণের প্রয়াস চলছে। আমরা এক, আমাদের সমস্যা এক, ইসলাম যদি আরব দেশে আরবী, অনারবী, হাবশী ও কোরাইশী মতানৈক্যের এজাযত না দেয় তাহলে কি আমরা পাকিস্তানে পাঞ্জাবী, সরহদী, বেলুচী ও বাঙ্গালীর অনৈক্য চূড়ান্ত অবসান ঘটাতে পারি না? পাকিস্তানের নেয়ামত ও পাকিস্তানের মুসীবতকে আমরা এক মনে করতে পারছি না কেন? এক্ষণে প্রাদেশিকতা ছেড়ে একজাতিতত্ত্বে আমরা পাকিস্তানকে রাখি। নয়া নয়া প্রদেশ পাঞ্জাবীকে বেলুচী আর বেলুচীকে পাঞ্জাবী বানিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের ভিত্তি এ কিসিমের প্রাদেশিক মানসিকতা নড়বড়ে করে দিতে পারে। কওমের এ ধরনের স্বার্থান্ধদের পরোয়া করা উচিত নয় যারা মনে করে, তামাম মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলে আমাদের হয়ে নারা লাগাবে কারা।

একটা কচ্ছপ একটি পোলো দিয়ে ঝিলে মৎস্য শিকার করত। বর্ষার দিনে ওই ঝিলের আশেপাশে ছোটখাটো ঝিল দেখা যেত। কচ্ছপ ভয় পেয়ে যেত যে, না জানি বৃষ্টির পানিতে তৈরী হওয়া নতুন ওই ঝিলগুলো আবার বড় ঝিলের সাথে মিলে যায়। তাহলে প্রশস্ত ও গভীর ঝিলে মাছ শিকার রীতিমত মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং সে মাছদের বলল, ঝিলের কিনারায় তোমরা বাঁধ দিয়ে দাও। নয়তো তোমাদের মুক্ত-স্বাধীন জীবন হুমকির সম্মুখীন হবে, তোমরা ছোট ছোট স্রোতধারায় সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত। ঝিলের প্রচণ্ড স্রোতধারা তোমাদের পেরেশান করবে।

পাকিস্তানের প্রাদেশিক লোকদের অবস্থাও এরকম। যখন এরা প্রদেশগুলোর স্বাধীনতা চায় তখন তাদের মতলব হচ্ছে, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব যাতে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে না পারে। ওদের হৃদয়ে প্রদেশের দরদ নেই, দরদ হালুয়া-রুটির। কিন্তু ক'জন স্বার্থান্ধ লোকের জন্য জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না, যে জাতি হিন্দুস্তানী অজগর ও গরিলাদের আক্রমণ করতে সাহস রাখে, কচ্ছপের পরোয়া নেই তাদের।

আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলামের নামেই পাকিস্তান অস্তিত্বে এসেছে, কওমের কুরবানী যার উসীলা। আল্লাহ ও রাসূলের নামই এ আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করতে নিয়ামক শক্তির ভূমিকায় ছিল। এছাড়া আমাদের সম্মিলিত জাতিসত্তাগত চেতনারও মূলভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। ইতিহাস কালের সাক্ষী, আল্লাহর দীনকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারলেই প্রকাণ্ড পাহাড়সম দুর্যোগ মোকাবেলা করে আমরা সাফল্যভরে উতরে যেতে পারব। যখনই টইটম্বুর বিশ্বাসী মন নিয়ে আমরা

www.amarboi.org

ইসলামের রাজপথে নেমেছি— গগনচুম্বী পাহাড় মাথা নুইয়েছে সে পথে। মন-মিনারে যখনই ইশ্‌কে নববীর দীপশিখা রৌশন করেছি, দুর্যোগ-মুসীবতের সুবিশাল অমানিশা তখন নড়বড়ে করতে পারেনি আমাদের পা।

ইসলাম হচ্ছে সে ঢাল যা কুফরের তামাম তীর রুখে দিতে সক্ষম। ইসলাম আমাদের হাতে সে তলোয়ার তুলে দেয়, যা তার তলোয়ারের ধার করতে পারে ভোঁতা। তিমির তমসাচ্ছন্নতার বুকে ইসলামী বাতিঘরে ওই বাতি জ্বলে, আমাদের ভাগ্যতরীকে যা মানযিলে মাকসুদে পৌঁছাতে সক্ষম।

মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে আমরা নবজীবনের দিক হস্ত প্রসারিত করেছি। ইসলাম এমন এক স্রোতধারা, জীবন পাথারের উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গরাশি যেখানে ভাটার মুখ দেখে না এতটুকু। কুফরের তমসার মুখে আমাদের অনৈক্যকে কেবল ইসলামী রশ্মির দুশ্ছেদ্য বাঁধনে চিৎপটাং করাতে পারি। ইসলামই আমাদের ছাইভস্মের মাঝে বিজলী চমক দিতে সক্ষম।

একনিষ্ঠভরে আমরা পাকিস্তানের তলোয়ারকে ইসলামী ছাঁচে ঢাললে কুফর যে দানবীয় টর্নেডো গতিতে বর্বরতার তুফান নিয়ে এগুচ্ছে, সে গতিতেই তার উড়ন্ত পাখা ক্লান্তি নাশিতে ঝিমিয়ে পড়তে বাধ্য। যে যমীন আমাদের শহীদী খুনে চাপ চাপ, জাতির সিপাইদের পদচুম্বন করতে তা মুখ হা করে তাকিয়ে। যে আসমান আমাদের বধূ-মাতা, নারী-কন্যা ও শিশু-বাচ্চাদের কলিজা বিদীর্ণকারী আওয়াজ শুনেছে, জাতির গাযীদের নারা শুনতে সে উদগ্রীব। যে মাসজিদগুলো ভেঙ্গে পরিণত করা হয়েছে মন্দির ও গুরুদুয়ারায়, আবার ওখানে একবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারিত হবেই।

✪ ✪ ✪

জাতি হে! আমি তোমায় ও তথাকথিত শান্তিমনা ও আপোষকামী আঁতেলদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করছি, যারা মনে করে সন্ধি প্রস্তাব ও মত বিনিময় হিন্দুস্তানের আক্রমণাত্মক মানসিকতার পরিবর্তন আনতে পারে। বিগত ঘটনাপ্রবাহ বারংবার একথার প্রমাণ রেখেছে, হিন্দু ফ্যাসিজমের বোধগম্য কেবল তলোয়ারের যবান।

ভারতে আজ ওই তাহযীব-তমুদ্দুন পুনুর্জীবিত হচ্ছে, ঘৃণা ও বর্ণ ধিক্কার যার ভিত্তি। হিন্দুজাত শক্তিশালীকে শ্রদ্ধা করে— না, তা নয় বরং পূজা করে, আর কমযোরকে অচ্ছুত-অস্পৃশ্য জ্ঞানে কচুকাটা করে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনে হিন্দুদের অচ্ছুত-বৈরিতা ইসলাম বৈরিতায় পর্যবসিত হয়। যে পরিমাণ হিন্দুধর্ম ইসলাম ধর্মের বিপরীত ঠিক ততোটা মুসলিম অস্তিত্ব হিন্দুদের সহ্যাতীত। আমাদের আভিজাত্য, সততা ও আপোষকামিতা ততক্ষণ নিরর্থক হবে যতক্ষণ আমরা বাযুর জোরে তাকে পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টা না করছি।

হিন্দু মন্দিরগুলো থেকে যে অগ্নিশিখা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, ১০ কোটি তৌহিদী সন্তানকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে তা। আগুন হামেশাই মোহাম্মদ বিন কাসিম ও সুলতান মাহমুদ গযনবীর অপেক্ষা করবে।

www.amarboi.org

বিগত ঘটনাপ্রবাহ আমাদেরকে এ ভুল ধারণায় উপনীত হতে অনুমতি দেয় না যে, আমাদের হাতে পুষ্পস্তবক দেখে এ আগুন এমনিতেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, হিন্দুস্তানে মুসলিম নিধনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে কুফর ও ইসলামের চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে গেছে। একমাত্র সুদৃঢ় প্রতিরোধ শক্তিবলে আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদী তুফানকে রুখতে পারব।

পাকিস্তান কেবল ৮ কোটি মুসলমানের প্রতিরোধ দুর্গ নয়; বরং এর অস্তিত্ব ও স্থিতিশীলতা আমাদের তিন কোটি ভাইয়ের জীবন-মৃত্যুর সমস্যা, যারা ইংরেজদের পরে হিন্দু ফ্যাসিস্টদের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। আজ তাদের ফটকে মৃত্যু প্রহরা। তাদের অসহায়ত্ব ও নারীদের অবস্থা অত্যন্ত সকরুণ— যাদের আর্তনাদ মোহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধুতে ডেকে এনেছিল। আজ এতদ্দেশের মানুষ ওই তলোয়ারকে তাদের শাহ্‌রগে দেখছে, যার ধার পরীক্ষা করা হয়েছে পূর্ব পাঞ্জাবের লাখো মানুষের গলে। আজ আমাদের ভাবতে হবে, পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী নীল ভ্রমরদের কুরসি বুভুক্ষু মানবতার টার্গেটে পরিণত হলে ফল কি দাঁড়াবে!

পাকিস্তান ভারতের তিন কোটি মানুষের জান-মাল ও ইয্যত-আবরু হেফাযতের কার্যকর দায়িত্ব না নিলে তারা মৃত্যু, দেশান্তর কিংবা ধর্মান্তরকরণের তীরে উপনীত হবে। হিন্দুস্তানী প্রশাসন যে পরিমাণ ইসলাম বৈরিতা প্রদর্শন করবে হিন্দু জনতার মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা সে পরিমাণ বাড়বে। শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে প্যাটেল নিজেকে মুসলিম বিদ্বেষীরূপে প্রমাণ করায় নেহরু ও গান্ধীজী অপেক্ষা আম জনতার মাঝে তার আস্থা বেড়েছে। ওদিকে হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ প্যাটেলের চেয়েও কট্টর। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, আগামী দিনে হিন্দুস্তানে এমন প্রশাসক আসবে, হিন্দু জনগণের প্রবল চাপের মুখে যারা নেহেরু-প্যাটেলের চেয়ে উগ্রতা প্রদর্শনে বাধ্য হবে। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন নেহেরু-প্যাটেলের চেয়ারে সেবাসংঘী ও মহাসভার হিন্দুরা অধিষ্ঠিত হবে। হিন্দুস্তানের পরতে পরতে 'পূর্ব পাঞ্জাব' নাটকের পুনঃপ্রচার ঘটবে। পাকিস্তান যদি তার এ তিন কোটি ভায়ের জীবনাবসান নিরব দর্শকের ভূমিকায় দেখে তাহলে কুদরত বোধ হয় তাদের এ অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন না।

হিংস্রতা ও বর্বরতার যন্ত্রণামুক্ত মানুষের আখেরী ক্যাম্প হচ্ছে পাকিস্তান। অবশ্য এদের পুনর্বাসন, খাদ্য-বাসস্থানের জোগান চাট্টিখানি কথা নয়।

অচিরেই হয়ত শুনতে পাব, আজ হিন্দুস্তানের শাসন ক্ষমতায় মহাসভার হিন্দু বা সেবাসংঘীর অধিষ্ঠান হয়েছে, যারা নিজ হাত লাল করেছে পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলিম খুনে, এর চেয়ে মারাত্মক আকারে বাকী প্রদেশগুলোয় প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় মুসলিম হত্যা শুরু হয়েছে। বিশ্ব বিবেক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে পাকিস্তানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের কাছে এ প্রশ্নের জবাব চাইছে— এ পরিপ্রেক্ষিত মোকাবেলায় তোমরা প্রস্তুত কি ?

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, হিন্দুস্তানে সোশ্যালিজম কিংবা কমিউনিজম আন্দোলন হিন্দু জনতার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের যবনিকাপাত ঘটাতে পারবে না কিছুতেই,

www.amarboi.org

যতক্ষণ ব্রাহ্মণ্যবাদের ধ্বজাধারীদের সামনে মুসলিম টার্গেট উপস্থিত থাকছে। ওরা কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তূনিরের তীরের অপব্যবহার করবেই করবে। হিন্দুস্তানে যখনই কোন গণঅভ্যুত্থান হবে, তো সেটার টার্গেট হবে শুধু মুসলমান এবং মুসলমান।

✪ ✪ ✪

কওমের সিপাহী হে!

তোমার জন্য কৃতজ্ঞতার আঁসু ছাড়া আর কিছু দেয়ার নেই আমার কাছে। কওমের তরী যখন ডুবতে বসেছিল, তখন তুমিই তাকে দেখিয়েছ আলোর মিনার। যখন কওমের দিশারীদের পা নড়বড়ে হয়েছিল, নিজ বলয়ে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের মত সকল বাধা তোমরাই মোকাবেলা করেছ। যখন কওমের শিরার খুন বরফ হয়েছিল তখন তোমাদের সীনায় নবজীবনের বুলবুল কূজন করছিল।

ভারতীয় কুফরী শক্তি ধ্বংসাত্মক যাবতীয় ব্যবস্থাপনা গুছিয়ে ফেলেছে। তোমরা ইসলামী তূনিরের শেষ তীর। কুফর আজো তার জনবল, ধনবল ও অস্ত্রবলে বলীয়ান। এ নিয়ে তারা গর্ব করে, কিন্তু তোমরা তোমাদের জেহাদী হৃদয়ে ঈমানের প্রদীপ্ত দীপশিখা যদি জ্বালাতে পারো তাহলে উপমহাদেশে আবারো বদর-হুনাইনের উপাখ্যান পুনঃস্থাপন হতে পারে।

যদি তোমরা জীবন যুদ্ধে ইসলামের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হতে পার, তাহলে পাকিস্তান তোমাদের—কাশ্মীর তোমাদের। আল্লাহর যমীন তোমাদের। ইয্যত-আযাদী, বিজয় ও সফলতার সবটাই তোমাদের। হিন্দুস্তানের তিন কোটি অসহায় ও নিরীহ মুসলমানকে ওই পয়গাম দিতে পার, যা দিয়েছিল ১৭ বছরের এক তরুণ রাজা দাহিরের কয়েদীদেরকে। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ আমাদের জীবনতন্ত্রীতে এক অবাঞ্ছিত দিয়েছে, কিন্তু অতীত ইতিহাস এই বাস্তব সত্যটির সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পৃথিবীর মানচিত্রের বক্ররেখা কেবল তলোয়ারের ডগা দিয়েই সোজা করা যায়।

কওমের যুবরাজ হে! হে পাকিস্তানের মিস্ত্রীবৃন্দ!

ভুলে যেও না, পাকিস্তান তোমাদের অগণিত কোরবানীর ফসল। পাকিস্তানকে মানযিলে-মাকসুদে পৌঁছাতে কদমে কদমে লাশের পাহাড় উতরে এসেছ তুমি এবং একে স্থিতিশীল ও স্থিতিস্থাপকতায় আরো অসংখ্য কুরবানী করতে হবে তোমায়।

যতক্ষণ নেহেরুর ফৌজ কাশ্মীরে আছে, যতক্ষণ হাজার বধূ-কন্যা লোমশ কালো থাবায় আটকা আছে, যতক্ষণ তোমার ৩ কোটি ভাই ইনসানিয়াতের নিকৃষ্ট দুশমনের রহম ও করমের ওপর থাকছে: তখন তুমি এদের হয়ে কোন কার্যকর আওয়াজ বুলন্দ করতে না পারলে জেনে রেখ— যে মহান উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখনও তা সাফল্যের সোনার হরিণের নাগাল পায়নি।

দুনিয়ায় সন্ধি ও আপোষকামিতা বিরাট এক নেয়ামত বটে, কিন্তু তা তাদেরই মানায় যারা বহুবিধ অসৎ ও ষড়যন্ত্রের মোকাবেলার শক্তি রাখে।

www.amarboi.org

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ -এ কওম ওই মহান ও বিশাল ব্যক্তিত্বের দিশা থেকে বঞ্চিত হল, তিমির কুয়াশা ও নিবিড় অমানিশার মধ্যেও যিনি পাকিস্তানকে মানযিলে-মাকসুদ দেখিয়েছিলেন। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কওমের ভাগ্যতরীর সেই শক্ত কাণ্ডারী ছিলেন যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের ব্যবধানে সীমাহীন তুফান মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকাল গোটা জাতির মনে বজ্র আঘাত হানল।

জাতি এ শোক কাটিয়ে ওঠার পূর্বেই খবর এল, ভারতীয় বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা হায়দ্রাবাদ সীমান্তে উপচে পড়েছে। নেহেরুর ফৌজ হাজারো লাশের ওপর দিয়ে ট্যাংক চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময় জাতির যে মুখপাত্রের হুংকার মারার কথা, সে ব্যাঘ্রকণ্ঠ খামোশ হয়ে গেছে চিরতরে।

ভারতীয় প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে চড়াও হবার পরিকল্পনা এঁটেছিল, কিন্তু এর পূর্বে তাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার জরুরত ছিল যে, হায়দ্রাবাদ আরেক কাশ্মীর হয়ে না বসে। আর তাদেরকে এ গ্যারান্টি হায়দ্রাবাদের নিযাম ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।

স্বেচ্ছাসেবীরা কাফনের কাপড় বুকে জড়িয়ে ময়দানে এল। এদের নেতা সাইয়্যেদ কাসেম রেজভী আরেকবার টিপু সুলতানের সে সর্বজনবিদিত বাণী উচ্চারণ করলেন, শিয়ালের মত এক হাজার বছর বাঁচার চেয়ে বাঘের মত একদিন জীবন যাপন অনেক ভাল'। কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্নরা স্রেফ দেশী রাইফেল ও বর্শাসজ্জিত হয়ে হিন্দুস্তানী ট্যাংক, জঙ্গী বিমান ও গোলাবারুদের মোকাবেলায় যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিল, নিযামের গাদ্দারী বুযদিলির সামনে তা টিকতে পারল না। দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ যুদ্ধ লাখো মুসলমানের জীবন-মরণ যুদ্ধ। তারা ভালো করেই জানত, হিন্দু ফ্যাসিস্টদের সামনে অস্ত্র সমর্পণের পরিণাম কি হতে পারে!

এ আশায় নিরস্ত্র-নিরীহ স্বেচ্ছাসেবীরা হিন্দুস্তানী ট্যাংক ও গোলা বারুদের সামনে দাঁড়াল যে, অস্তিত্বের লড়াইয়ে নিযাম তাদের পক্ষে থাকবে। কিন্তু নিযাম প্রমাণ করল, তাদের পূর্বসূরি আর উত্তরসূরিদের রক্তের রং ভিন্ন। যখন স্বেচ্ছাসেবীরা ট্যাংকের সামনে শুয়ে পড়ে তখন গাদ্দার নিযাম সেকেন্দারাবাদে হামলাবাজদের রিসিপশনের প্রস্তুতি নেয়।

হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ ভারতীয় মুসলিমদের সর্বশেষ ঘাঁটি। ভারতে মুসলিম নিধন শুরু হলে বোম্বাই, মাদ্রাজ ইউ,পি, থেকে লাখো মুসলমান এখানে আশ্রয় নেয়। হায়দ্রাবাদ ট্র্যাজেডি গ্রানাডা ট্র্যাজেডির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যে যমীন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম জাতির জালালী দাপট দেখেছিল, সে যমীন এখন অসহায় জাতির খুন ও আঁসু-বন্যায় ভাসছে। মুসলমানদের শতাব্দীকালের আযাদী ও শাসন ইতিহাস কেবল একটি উপসংহারে শেষ করা যায় যে, নেহেরু-প্যাটেলের চেয়েও ঘরের গাদ্দাররা অতি মাত্রায় খতরনাক প্রমাণিত হয়েছে। যে ঘরের লোক চোর-ডাকাতের সাথে হাত মেলায়, ধ্বংসই সে ঘরের পরিণতি।

www.amarboi.org

হায়দ্রাবাদে মুসলিম খুনে হোলিখেলার পর বেনিয়াদের হিংস্রতা পূর্ণতায় পর্যবসিত হল। ইউ, এন, ইউ-এর নির্লিপ্ত ভাব একথার প্রমাণ করল যে, আন্তর্জাতিক মজলিস তলোয়ারের ফয়সালাকে রদ করে না। হায়দ্রাবাদ পতনের পর ভারতীয় প্রশাসন এক চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল কাশ্মীরে। একদিকে ঈমানী আলোতে উদ্দীপ্ত নিরস্ত্র-নিরীহ মুসলিম স্বেচ্ছাসেবী অপরদিকে হিংস্র বন্য সর্বোপরি আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত নেহেরু-প্যাটেলের পেটোয়া বাহিনী। ভারতীয় প্রশাসনের ট্যাংক অগ্নিগোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে অগ্রসর হল। অগ্নিগোলার দু'এক খণ্ড পাকিস্তান সীমান্তে এসেও আছড়ে পড়ল।

পাকিস্তান কি দক্ষিণ হিন্দুস্তানের মত কাশ্মীরের তলোয়ারী ফয়সালাকে মেনে নেবে? ৩৫ লাখ মুসলিমকে পশ্চিম পাঞ্জাবে পরবাসী হতে দেবে কি পাক প্রশাসন? পাকিস্তানের বীর সন্তানরা এ প্রশ্নের জবাবে হিন্দুস্তানী আগ্রাসনের সামনে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত বাধা হয়ে দাঁড়াল।

✪ ✪ ✪

তিন সপ্তাহ ধরে মীরপুর হাসপাতালে সলীম চিকিৎসাধীন। কাশ্মীর প্রান্তরে ও দ্বিতীয়বারের মত আহত হয়েছিল। পয়লাবারের যখম ছিল মামুলি। কিন্তু পরের বার গুরুত্বপূর্ণ এক ঘাঁটিতে আক্রমণ করতে গিয়ে মারাত্মক যখম হয় ও। চিকিৎসার জন্য ওকে মীরপুর হাসপাতালে নেয়া হয়।

অপারেশন শেষে ওর হুঁশ এলে দেখল এক বৃদ্ধ ডাক্তার ওর নিকটে দাঁড়ান। মুহাব্বতের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাচ্ছিলেন। এই-ই ডাক্তার শওকত।

সলীমের প্রথম প্রশ্ন— আমি আবার কবে অভিযানে যেতে পারব?

ডাক্তার চিন্তাক্লিষ্ট মনে ওর দিকে তাকালেন। বললেন— বেটা! তুমি জলদি সুস্থ হয়ে যাবে। বাযুর যখম না হয় জলদি চাঙ্গা হল, কিন্তু তোমার পা......?

সলীম চকিতে প্রশ্ন করে- হ্যাঁ! আমার পা সম্পর্কে বলুন.......!

ডাক্তার শওকত সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— ভয়ের কোন কারণ নেই বেটা! তোমার পা সেরে উঠতে সময় নেবে। দীর্ঘ আরামের দরকার।

ঃ আরাম! সলীমের চেহারায় অবজ্ঞার হাসি নিয়ে বলল— আরাম আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক। এই খামোশি আমার কাছে অসহ্য!'

ডাক্তার শওকত স্টিলের বাটি হাতে নিয়ে বললেন— বেটা ঘাবড়ে যেও না। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই তুমি চাঙ্গা হতে যাচ্ছ!'

সলীম বলল— আমার অপারেশনের পূর্বে আপনি ভয় পাচ্ছিলেন। আমি জানতে চাচ্ছি, আগামীতে অভিযানে যেতে পারব কি-না। গোড়ালীর নীচ থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত আমার পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!'

ডাক্তার শওকত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে জঙ্গী বিমানের ঘড়ঘড় আওয়াজ এল। আওয়াজ ক্রমাগত কাছে আসছে। বেডে শায়িত রোগীরা একে অপরের

www.amarboi.org

দিকে তাকাতে লাগল। বাইরে থেকে বুলন্দ আওয়াজে কেউ বলে উঠল— শুয়ে যাও। বিমান এদিকেই আসছে। মুহূর্তেই হাসপাতালের অদূরে বোমা ও মেশিনগানের টর টর আওয়াজ শোনা গেল। একটা বোমা হাসপাতালের কোণে বিস্ফোরিত হয়ে তার কিছু অংশ জানালার কাঁচে আঘাত করল। কাঁচ উড়ে গেল। সলীমের কক্ষেরই এক রোগী আচমকা উঠে বসে বুলন্দ আওয়াজে বলে উঠল— তোমরা কি দেখছ? তোমাদের মেশিনগান ও তোপগুলো চালাচ্ছ না কেন? বিমান উড়িয়ে দাও। কসম খোদার, এগুলো বাচ্চাদের খেলনা বিমান মাত্র। পাকিস্তান এয়ার ফোর্সকে জানিয়ে দাও, এরা যে পরিমাণ যালেম সে পরিমাণ বুযদিলও।

ডাক্তার দ্রুত লোকটার কাছে গিয়ে জবরদস্তিমূলক শুইয়ে দিতে গিয়ে বললেন— আরামে শুয়ে থাক। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। রোগি ডাক্তারের সাথেও জবরদস্তি করে বলেছিল— আমাকে রাইফেল দাও। সব বিমান ফেলে দেব। খোদার কসম, ওগুলোকে ভয় পাই না। হাসপাতালের কর্মচারীরা জমায়েত হল। জঙ্গী বিমান হাসপাতালের আশে পাশে আরো কিছু বোমা ও গুলিবর্ষণ শেষে চলে গেল। রোগীর জোশও কমে এল। সে এবার বলতে লাগল— আমাকে ছুটি দিন ডাক্তার সাহেব! আমি সুস্থ।

ডাক্তার শওকত ফের সলীমের কাছে এসে বললেন— গতকাল ময়দান থেকে তাকে এখানে আনা হয়েছে। বিগত দিনে ও মুজাফফরাবাদ ছিল। সেখান থেকেও একবার যখমী হয়ে এসেছিল। ওর সঙ্গীরা বেচারার বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে।

ঃ ডাঃ সাহেব! ওর অবস্থা কেমন ?

ঃ ওর যখম মামুলি। কিন্তু নিউমোনিয়াটা মারাত্মক। এ প্রচণ্ড নিউমোনিয়া নিয়েই সে চিৎকার করছিল। অবশ্য হালত আগের তুলনায় ভালো এখন। ইনশাআল্লাহ জলদি ভালো হয়ে যাবে।

ঃ ডাক্তার সাহেব! তকলীফ না নিলে ওর বেডের পাশে আমাকে নিলে ভালো হত। তবে এখনই না। এখন আমাকে দেখলে ওর পেরেশানি বাড়বে।

ঃ তুমি ওকে চেনো?

ঃ ও আমার কলেজের সাথী। আমরা ওই সময় তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতাম। ধারণাও করিনি একই অভিযানে আমরা একত্রিত হতে পারব....!

এ নওজোয়ান আলতাফ। ন্যাশনালিস্ট ও দেশপ্রেমিক। এ সেই আলতাফ ছাত্রজীবনে যে পাকিস্তানের নাম শুনতে পারত না। আর কর্মজীবনে সে অপরিচিত এক স্বেচ্ছাসেবী হয়ে কাশ্মীর যুদ্ধে লড়ছে।

এর তিনদিন পর।

আলতাফদের জ্বর ছাড়ল। সলীমের পাশের সিটে শুয়ে নিজের কাহিনী শোনাচ্ছিল। আলতাফের কাহিনী সলীমের কাছে নতুন নয়। এমন হাজারো উপাখ্যান ওর জানা। আলতাফ সেই লোকদের একজন, যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হিন্দু ও শিখদের প্রতি সুধারণা

www.amarboi.org

পোষণ করে আসছিল। ওর এলাকার ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস সভাপতি ওর দোস্ত। ডেপুটি কমিশনার ও ফৌজি অফিসাররা ওর বাবাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আপনার খান্দানের নিরাপত্তার জন্য দিল্লীস্থ নেহেরু প্রশাসন আমাদেরকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং দাঙ্গা শুরু হলে মহল্লার মুসলিম মা-বোনেরা ওদের বাড়ী আশ্রয় নিয়েছিল। এরপরও ওদের বাড়ী হামলার শিকার হল। কংগ্রেসের নেতা ও পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বেই হামলা হয়েছিল। হামলার মুহূর্তে আলতাফের বাবা ফটক খুলে চিৎকার করে বললেন— যালিমের দল! আমরা আগাগোড়া কংগ্রেসের পক্ষে ছিলাম। সর্বদাই পাকিস্তান বিরোধিতা করে আসছি। নেহেরু ও প্যাটেল আমাকে চেনেন। আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর পত্র আছে।' ওরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। জনৈক শিখ তার দাড়ি ধরে টেনে হিঁচড়ে গলিতে নিয়ে গেল। কুকুরের মত হামলাবাজরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলতাফ অন্য গলিপথে ডেপুটি কমিশনারের বাংলো অভিমুখে ছুটল। কিন্তু পুলিশ ওকে বাংলোর বাইরে রুখে দিল। আলতাফ চিৎকার দিয়ে বলেছিল— আমি ডেপুটি কমিশনারের বন্ধু। তাঁর কাছে যেতে দাও আমায়। আমাদের বাড়ীতে হামলা হয়েছে। নেহেরু ও প্যাটেল আমাকে চেনেন। পুলিশরা এর জবাবে বলল— বেটাকে দড়িতে লটকাও!

ডেপুটি কমিশনার ওর চিৎকার শুনে বাইরে বেরোলেন। সেপাইরা ছেড়ে দাঁড়ায় রাস্তা। ডেপুটি কমিশনার গাড়ী থেকে ঝুঁকে আলতাফকে দেখে ড্রাইভারকে বলল— ব্রেক করো না, চলো!

আলতাফ এক ঝটকায় সেপাইদের থেকে মুক্ত হয়ে গাড়ীর পাদানিতে পা রেখে বলল— ডেপুটি সাহেব! কার থামান। আমি আলতাফ। আমার বাড়ীতে হামলা হয়েছে। আপনি ওদের ফেরান।' সেপাইরা ওকে পাদানি থেকে নামানোর চেষ্টা করল। ডেপুটি কমিশনার প্রথমে ওকে ধাক্কা দিয়ে নীচে নামাতে চেষ্টা করলেন। ও নাছোড়বান্দা। তিনি পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়লেন। গুলি ওর কাঁধের গোশতে লাগল। সেই সাথে ডেপুটির ধাক্কা ওকে রাস্তার পাষাণ মেঝেতে ফেলে দিল। ড্রাইভার আবারো ব্রেক কষতে চেষ্টা করলে ডেপুটি কমিশনার বলল— পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে। দ্রুত চালাও গাড়ী।

কার-এর নিকট থেকে ফৌজি ট্রাক অতিবাহিত হচ্ছিল। আলতাফ ট্রাকের তলায় পড়ছে দেখে ড্রাইভার হার্ডব্রেক কষল। বেলুচ রেজিমেন্ট-এর জনৈক অফিসার ও ৫ জন সেপাই নেমে এলেন। পুলিশের যে সেপাই ওর পেছনে আসছিল তারা থমকে দাঁড়াল। ওই সেনাযানের পেছনে আর দশটা যান আসছিল। অফিসারের ইশারায় সবগুলো গাড়ী ব্রেক কষল। পুলিশরা এ দৃশ্য দেখে পালাল। অফিসারের হুকুমে বেহুঁশ আলতাফকে ট্রাকের ওপর শুইয়ে দেয়া হল। এরপর হুঁশ এলে ও দেখল, লাহোর হাসপাতালের বেডে শোয়া।

সুস্থ হবার পর আলতাফ জানে না ওর খান্দানের কি পরিণতি হয়েছে, একদিন লাহোরের পল্টন ক্যাম্পে বাড়ীর পাশের ক'জন লোকের সাথে ওর দেখা। তারা বলল—

www.amarboi.org

হামলার মুহূর্তে তার বিবি তিনতলা থেকে লাফ দিয়েছিল। আর তাদের বাড়ীতে জমায়েত নারীদের উলঙ্গ করে রাস্তায় মৌন মিছিল করানো হয়েছে। এরপর ফৌজি অফিসারদের সাথে তিনবার ও পূর্ব পাঞ্জাবে গেছে। কিন্তু খান্দানের কোন মহিলার সন্ধান পায়নি সে। ওর এক ভগ্নিপতি লাহোর থাকতেন। একদিন খবর আসে, জলন্ধর থেকে একদল মহিলা আসছে। সন্ধ্যার ট্রেনে তারা লাহোর স্টেশনে নামবে। ভগ্নিপতির সাথে স্টেশনে এল আলতাফ। ট্রেনে ওদের খান্দানের একমাত্র নারীকে দেখা গেল। সম্পর্কে সে ওর বোন। আলতাফ যখন এ কাহিনী সলীমের কাছে বর্ণনা করছে তখন সলীমের অনুমান— কে যেন ওর গলা চিপে ধরছে।

থামল আলতাফ। খানিক তাকালো ছাদের প্রতি। শেষ পর্যন্ত অনুচ্চস্বরে বলতে লাগল— ওই দৃশ্য বড় হৃদয় বিদারক সলীম! বোনের সামনে খাড়া আমি। আমায় দেখে দু'হাতে চেহারা ঢেকে নেয় সে। আচানক চেহারা থেকে হাত সরিয়ে বলতে থাকে সে— কে তুমি? আমার পিছু নিয়েছ কেন? আমি আগ বাড়িয়ে বললাম— ফাহমিদা! আমার দিকে দেখো। আমি তোমার ভাই। আর দেখো এই যে হামেদ। নিতে এসেছেন তোমায়'। সে কখনও আমার দিকে, আবার স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিল। আচানক সবাইকে হতবাক করে দিয়ে ভয়ঙ্কর অট্টহাসি দিয়ে উঠল। পালাতে লাগল প্লাটফর্মের দিকে। দৌড়ে তাকে ধরে ফেললাম আমি। নিয়ে এলাম বাড়ী। ওর অবস্থা খারাপ। ক'দিন ভগ্নিপতির বাড়ীতে থাকলাম। ফাহমিদা কখনও হাসত, আবার কখনও কাঁদত। কিন্তু তার জীবনের তেতো অনুভূতি তা-ই, যা তার সুস্থাবস্থায় ঘটেছিল। শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামী ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, কিন্তু ওর দৃষ্টি উপরে উঠতই না। বাস্তব জগতে এটা ও সহ্য করতে পারত না যে, ও কারো স্ত্রী, কারো বোন আর কারো মা। ওর স্বামী কসম খেতেন— ফাহমিদা! তুমি আমার দৃষ্টিতে সতী।' খামোশ হয়ে সে কখনও স্বামীর দিকে তাকাত। কখনও বা দিত চিৎকার। না! না! মিথ্যা এ সান্ত্বনা! আপনি আমাকে ঘৃণা করেন। ধিক্কার দেন। বেঁচে থাকতে দিলেন কেন আমায়? দেখামাত্র স্টেশনেই আমার গলা টিপে দিলেন না কেন ? অতঃপর পাগলিনীর মত চুল ছিঁড়ত। চেহারা খামচাতো। একদিন ও একটু শান্ত। আমি বললাম— ফাহমিদা! আমি তোমার প্রতিশোধ নেব।' হুংকার মেরে ওঠে ও— জানি, কিভাবে তুমি আমার প্রতিশোধ নেবে, তুমি নেহেরু, প্যাটেল ও তারা সিং-এর কাছে এ মর্মে ফরিয়াদ নিয়ে যাবে যে, তোমাদের পেটোয়া বাহিনী আমার পুত্রকে কতল করেছে। আমার খান্দানের নারীদের দিগম্বর মৌন মিছিল বের করেছে। এছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু আমি একা নই। খান্দানের হাজারো নারী শিখদের কব্জায় এখনও। কওমের আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন কোন না কোন বীরের কানে এদের আর্তনাদ পৌঁছবেই। ওরা তোমার মত এখানে বসে গলাবাজি করবে না; বরং পূর্ব পাঞ্জাবে গিয়ে হুংকার মারবে, এ যমীনে যে শহীদানের খুন ঝরেছে তারা আমার ভাই। এ মাটিতে যাদের ইয্যত গেছে, তারা আমার বোন। ওরা অশরীরী আত্মার ফরিয়াদ শুনবে। পূর্ব পাঞ্জাবে তারা ভূমিকম্পের কাঁপন তুলবে। হায়! পূর্ব পাঞ্জাবেই যদি আমার মওত হত! আহা! আমার অশরীরী আত্মা যদি ভাইকে আমার সংবর্ধনা জানাত!

www.amarboi.org

এ প্রথম অনুমান করলাম, ফাহমিদার ঘৃণা সর্বাধিক আমার প্রতিই। ওর ভুল ধারণা জন্মেছিল হামলার সময় আমি পালিয়ে বাঁচি। দেশ বিভাগের পূর্বে কলেজ হোস্টেলে ছাত্রীদের সামনে ও পাকিস্তানের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখত। আব্বাজানের মানসিকতার সাথে ওর মানসিকতা ছিল আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ও বলত— হিন্দুদের আক্রমণাত্মক দৃঢ়তার সামনে পাকিস্তানই হচ্ছে একমাত্র প্রতিরোধ মোর্চা। খান্দানের অনেক ছাত্রীকে ও সমমনা বানিয়েছিল। জানি, এ কাহিনী তোমার জন্য তেমন কোন আকর্ষণীয় নয়। পরিস্থিতি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। জীবনের প্রোগ্রামের সাথে কোথায় যেন একটা গরমিল আছে। জীবনের বন্ধনগুলো ছিঁড়ে গেল কেমন যেন এক এক করে।— আমরা শত চেষ্টা করেও ওর মুখে সে আগের হাসি আনতে পারলাম না। ওর স্বাস্থ্য ক্রমাগত অবনতির দিকে যেতে লাগল।

কাশ্মীর যুদ্ধ শুরু হলে স্বেচ্ছাসেবীদের দলে ভিড়ে আমি এখানে আসি। মাস দুয়েকের পর উড়ি অভিযানে হামেদের সাথে আমার সাক্ষাত। আযাদ ফৌজে শামিল ছিল ও। আমাকে জানাল, আমার চলে আসার ২০ দিন পর ফাহমিদা এ জগতের সফর শেষ করেছে।

মৃত্যুকালে ও হামেদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছে, হামেদ যেন আমৃত্যু কাশ্মীর যুদ্ধে শরীক থাকে। আমি সে ওয়াদা পূরণ করতে এসেছি। হামেদ শাহাদত বরণ করেছে। উড়ির-ই এক বৃক্ষের নীচে জান্নাতী কাননে ঘুমাচ্ছে। মৃত্যুর সময় হামেদও আমাকে বলেছিল, আলতাফ! আগামী বসন্তে জংলী ফুল ফুটবে আমার কবরে। তুমি তখন এলে এখান থেকে এক গুচ্ছ ফুল তুলে আমার ফাহমিদার কবরে ছিটিয়ে দিও।'

আলতাফ ও সলীম খানিক খামোশ থাকল। আচানক আলতাফ বলে উঠল! সলীম! আখতারের সম্পর্কে তেমন কোন খবর আছে তোমার কাছে?

'আখতার' নামটি শুনে সলীম চমকে উঠল। না ১৫ আগস্টের পর ওর কোন খবর পাইনি।

আলতাফ বলল— ও শহীদ হয়ে গেছে। আমি সর্বপ্রথম খান্দানের মা-বোনদের তালাশ করতে গেলে জলন্ধর ক্যাম্পে আখতারের এক দোস্তের সঙ্গে সাক্ষাত। সে আমাকে জানাল, আখতার কসম খেয়ে বলেছিল, যতক্ষণ শহরের সব মুসলমান পাকিস্তান না পৌঁছবে ততক্ষণ সে শহর ত্যাগ করবে না। ওর এক চাচা মেজর! তিনি খান্দানের সকলকে নিয়ে এলেন। কিন্তু আখতার সেখানেই রইল। একদিন জলন্ধরের একটি জনপদের শরণার্থীদের উদ্ধার করে রেল স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে এল। পথিমধ্যে শিখরা হামলা করল। স্রেফ অল্প কিছু লোক ট্রেনে উঠতে পারল। তারা জানাল, আখতার শহীদ হয়েছে।

✪ ✪ ✪

এক সপ্তাহ পর সুস্থ হয়ে আলতাফ আবারো ময়দানে চলে গেল। সলীম নিঃসঙ্গ বেডে তড়পাতে লাগল। তিন সপ্তাহ পরে ওর ব্যাণ্ডিজ খোলা হল। কিন্তু এরপর ও এক

www.amarboi.org

ভয়ানক খবর পেল। অনির্দিষ্টকাল লাঠিভর দেয়া ছাড়া ও হাঁটতে পারবে না। গোড়ালীর হাড় ভেঙ্গে গেছে। ডাঃ শওকত ওকে বারবার সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন— বেটা! তোমার আঘাত সাময়িক, কিছুদিন পরে তোমার আর লাঠি লাগবে না; কিন্তু হাসপাতালের আরেক ডাক্তার ওকে নিরুৎসাহিত করেছেন। বলেছেন— তোমার পা ভালো হবে কি-না তাতে সন্দেহ। লাঠিভর দিয়ে ক'মাস চলে স্বাভাবিক হাঁটতে পারলেও হয়ত রণাঙ্গনে যাবার মত শক্তি তোমার পা-হাত পাবে না।

একদা ডাক্তার শওকত সলীমকে বললেন, আরশাদের চিঠি এসেছে, পরশু এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। আমিও এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। কাজের চাপ না থাকলে হয়ত তোমার সাথে যেতে পারি আমিও। ও হ্যাঁ! ও আরো লিখেছে, মজীদ বদলী হয়ে রাওয়ালপিন্ডি পোস্টিং নিয়েছে। ওর ছুটি হলে আরশাদের সাথে আসতে পারে। সলীম মুখ গোমড়া করে বলল— ডাক্তার সাহেব! আমার রাওয়ালপিন্ডি যাওয়া কি জরুরী?

ঃ আমার মন বলছিল, হাসপাতালের বেডে তুমি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছ! পেরেশান হয়ে বললেন ডাক্তার সাহেব।

ঃ একথা সত্যি, হাসপাতালের জীবন আমাকে সংকুচিত করেছে। জানি, সেপাহী জীবন হারিয়েছি আমি। এ চার দেয়ালে আমার দম আটকে আসছে, কিন্তু রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়ে কি করব ?

ঃ ওখানে তুমি বেকার থাকবে না। কাজে লাগতে পার ওখানে। আর কে বলল তুমি সেপাহী জীবন হারিয়েছ। বেটা! জানি তোমাদের হৃদয়ে যতক্ষণ স্পন্দন আছে, ততক্ষণ তুমি সেপাহী জীবন হারাতে পার না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার পা কিছুদিনের মধ্যেই ভালো হবে। করাচী-লাহোরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে তোমার পা নিয়ে আলোচনা করব। যতক্ষণ তুমি কাঁধে বন্দুক তুলে ময়দানে যাওয়ার যোগ্য না হচ্ছ, ময়দান থেকে দূরে থেকেও কওমের খেদমত করতে পার!'

বিকেল চারটায় আরশাদের বাড়ীর সামনে একটি জীপ থামল। রাহাত কামরা থেকে ঝুঁকে বলল— আপাজান! আপাজান!! ওরা এসে গেছে!' এক মুহূর্তের জন্য ইসমতের ইন্দ্রীয় পুরীতে কেমন একটা শূন্যতার দোল খেয়ে গেল। শূন্যতার সেই জগতে খুশী ও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। ভেসে আসে সেখানে সুখ নৃত্য ও মধু সংগীতের দোলা। সেই সুখানুভূতি বোঝার— বলার নয়।

বই টেবিলে রেখে নিথর-নিস্তব্ধ উঠে দাঁড়ায় ইসমত। ব্যালকনি থেকে রাহাত বলে ওঠে— আপাজান! ভাই সলীম এসে গেছেন!' ইসমত যেন খাব থেকে জাগ্রত হচ্ছিল। দেহ ও মনের মাঝে একটা শূন্যতা সংকুচিত হয়ে সংক্ষিপ্ত একটি শব্দ স্ফুরণ করল— সলীম! সলীম! সলীম! ইসমতের স্পন্দন বাড়ছে। কম্পিত হাতে দোপাট্টা সিধা করে ও ব্যালকনির খোলা বাতায়নের দিকে এগিয়ে যায়। ডাঃ শওকত, মজীদ, আরশাদ ও সলীম ততক্ষণে উঠানে প্রবেশ করেছে। মজীদের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে সলীম।

www.amarboi.org

ঃ ভাইজান!' বলে রাহাত অগ্রসর হয়ে সলীমের হাত ধরল। সলীমের ঠোঁটে খেলে গেল এক চিলতে করুণ হাসি। সিঁড়িঘরে পা রাখতে গিয়ে চোখাচোখি হল ইসমতের সঙ্গে। ইসমতের চোখে অশ্রুর প্লাবন। প্রেমের চোখে বিগলিত বরফতুল্য অশ্রু এত স্বচ্ছ, নির্মল, পূত-পবিত্র, চিত্তাকর্ষক ও পুষ্পকলির সৌরভমাখা যা ইতোপূর্বে কখনও দেখেনি সলীম।

খানিক পর ওরা কামরায় বসে চা পান করছিল। ইসমতও পাশের কামরায় বসে কথা শুনছিল। আচানক উঠে কামরার কার্টুন থেকে কাগজে মোড়ানো আংটি বের করে আঙ্গুলে পরে নেয় ও। তারপর আবার কি খেয়াল এলে আংটি খুলে যেখানেরটা সেখানেই রেখে দেয়।

রাহাত কামরায় প্রবেশ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলল— আপাজান!

ইসমত ওর দিকে বড় চোখ করে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল— কি রাহাত ?

রাহাত খোঁড়া মানুষকে বহনযোগ্য লাঠিটা নিয়ে ছিল। ওর চোখ থেকে পানি ঝরছে। ফোঁপানো কাঁদার সুরে ও বলল— আপাজান! এটা ভাই সলীমের।

ঃ পাগলী কোথাকার। তুমি কাঁদছ কেন!' লাঠি দেয়ালে লটকে রেখে বলল৷ ইসমত।

ঃ আপাজান! রাহাত নিজকে সামলে বলল— 'আমার ধারণা ছিল আপনি এটা দেখে তকলীফ পাবেন।'

ইসমত ওকে গলে জড়িয়ে বলল— দুষ্টু কোথাকার। এটা এক সেপাহীর অলংকার।

রাহাত বলল— তিনি বড় পেরেশান আপা! আমার শংকা ছিল, আপনার আঁসুতে তিনি ভুল বুঝবেন। এজন্যে পেরেশান ছিলাম আমিও। আপনি তার সাথে কোন কথা বলেননি তো।

ঃ কি বলব তার সাথে !'

ঃ আচ্ছা! আমিই না হয় বলব।

ঃ কি বলবে ?

রাহাত চোখে দুষ্টুমির হাসি এনে বলল— যা মনে আসে তাই।

আগামীদিন আসার কথা বলে মজীদ ওদের থেকে রুখসত নিল। সলীম ও আরশাদের সাথে মোসাফাহা করে ডাক্তার শওকতকে বলল— ডাক্তার সাহেব! আমি নিরিবিলিতে আপনার সাথে কথা বলতে চাই।

ডাক্তার সাহেব ওর সাথে বাইরে এলেন। উঠানে এসে কাচুমাচু হয়ে বলল মজীদ— ডাক্তার সাহেব! আপনার কোন আপত্তি না থাকলে সলীমের বিবাহটা হয়ে যাওয়া দরকার। আমি ওর মনের কথা জানি। বড্ড লাজুক ও। আপনার এখানেও বেশীদিন অতিথি হিসাবে থাকতে পছন্দ করবে না। বিয়ের পর ওর জন্য এমন কোন কাজ জুটিয়ে দেবেন যাতে নিজকে বেকার মনে না করে। কাশ্মীরের যে পরিস্থিতি তাতে সলীম সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

www.amarboi.org

ডাক্তার শওকত স্নেহভরে মজীদের কাঁধে হাত রেখে বললেন— বেটা! বিষয়টার অবতারণা তোমার থেকে না হলে কাল নাগাদ হয়ত আমিই এ প্রস্তাবনা তুলতাম। একমাত্র এ আশায়ই আমি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। কাল এসো না একবার, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখব।

ঃ বেশ তাই হবে। কাল দুপুর একটায় আসব।

ঠিক এর চারদিন পর। সলীম— ইসমতের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হল।

✪ ✪ ✪

দু'সপ্তাহ পর।

সলীম টেবিলে লিখছিল। ইসমত কামরায় প্রবেশ করে বলল— নাশ্তা তৈরী। ভাইজান আপনার অপেক্ষায়।

ঃ বহুত আচ্ছা! চলো! বলে সলীম কলম রেখে দিল এবং খাড়া হয়ে এদিক সেদিক তাকাল।

ঃ চলুন!' ইসমত মুচকি হেসে বলল।

ঃ 'আমার যষ্ঠি সকাল থেকে গায়েব।' পেরেশান হয়ে বলল সলীম।

ইসমত অগ্রসর হয়ে সলীমের বাযু ধরে বলল— সেটা আমিই গায়েব করেছি। আমার উপস্থিতিতে এখানে আপনার কিছুর ওপর ভর করে চলতে হবে না। বাইরে গেলে ওটার ওপর ভর করার অনুমতি রইল।

ঃ তোমার ওপর ভর করে চলতে গিয়ে আমি যদি পড়ে যাই তাহলে?

ঃ দু'জনেই একসাথে পড়ব। আবার হাত ধরাধরি করে উঠব।

ঃ না, ইসমত! আমার সাথে তোমাকে পতিত হতে দেব না। ও হ্যাঁ! আমার খাটের নীচে ঘড়িটা আছে— নিয়ে এসো।

ঃ 'এই আনছি।' বলে ইসমত ওপাশের কামরায় চলে গেল।

সলীম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরোজার কাছে এল। ওর অনুমান হল, গোড়ালির হাড়টায় প্রচণ্ড খিঁচুনি, যদ্দরুন যমীনে গোড়ালি রাখা মুশকিল। এতদসত্ত্বেও ওর ধারণা, কোন প্রকার কষ্ট ছাড়া ও চলতে পারবে। ইসমত ঘড়ি নিয়ে এসে দেখল, সলীম দু'টো দরোজা অতিক্রম করে গেছে।

ইসমত দৌড়ে এসে ওর বাযু ধরল। বলল— এখনই নয়। আমার যা বিশ্বাস, খুব শীঘ্রই আপনি লাঠি ছাড়াই হাটাচলা করতে পারবেন। কিন্তু তড়িঘড়ি করবেন না।

ঃ আমি হাঁটতে সক্ষম ইসমত। এখন আমি অল্প-স্বল্প বোঝাও বহন করতে পারি।

ঃ আমি জানতাম। আজ খাব দেখেছি, আপনি একদল ফৌজকে প্যারেড করাচ্ছেন।

ঃ সত্যিই বলছ ইসমত?

ঃ রাহাতকে জিজ্ঞেস করুন! ঘুম থেকে উঠে ওকে আগে বলেছি।

ঃ আচ্ছা আমাকে ছাড়ো না, আরশাদের সাথে একটু তামাশা করি, ওকে পেরেশান করি।

www.amarboi.org

ইসমত মৃদু হেসে বলল— আরশাদ পেরেশান হবেন না। আপনার লাঠি গায়েব করতে তিনিই বলেছিলেন।

শেষ কোণের কামরা থেকে আরশাদ আওয়াজ দিল— এসো সলীম।

সলীম ও ইসমত খানার টেবিলে বসে গেল। রাহাত চা-নাশতা নিয়ে এল। চা-পান করতে করতে আরশাদ বলল—

'সলীম! রাতে তোমাকে একটা খোশ খবর শোনাতে চেয়েছিলাম।

অবশ্য তখন তুমি লেখায় লিপ্ত। আমাদের কিছু ফৌজ কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে এবং বেশ কয়েকটা অভিযানে দুশমনকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে।

সলীমের চোখে আনন্দের তুফান। সে বলল— গত পরশু মজীদ আমায় বলেছিল, কাশ্মীর সম্পর্কে খুব শীঘ্রই তুমি আশাব্যঞ্জক খবর পাবে।

আরশাদ বলল— হিন্দুস্তান বেশ ক'মাস ধরে এ বলে শোরগোল করছে যে, পাকিস্তানী সৈন্য লড়ছে। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত তাদের খায়েশ মিটিয়েছে। তোমার কি খেয়াল সলীম! হিন্দুস্তান আমাদের এ অগ্রযাত্রার পর পাকিস্তানের ওপর চড়াও হবে ?

ঃ হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আপোষমনা লোকদের ওপর হামলা করা এবং ওদের ধারণামতে বিপক্ষ শক্তি হার না মানলে নিজেরাই হাত বেঁধে দাঁড়ায়। আমাদের পক্ষ থেকে আপোষকামিতা ও সন্ধি-প্রস্তাবের বিপক্ষে এজন্যেই হামেশা আক্রমণাত্মক দৃঢ়তা দেখিয়েছে ওরা। এজন্যেই কাশ্মীরের জঙ্গী বিমান ওখানে বোমা না ফেলে খোদ্ আমাদের সীমান্তেই বোমা ফেলছে। কাশ্মীরে আমাদের ফৌজ প্রবেশ করলে দেখবে হিন্দুস্তান যুদ্ধে না জড়িয়ে সন্ধি-প্রস্তাব আনবে, কিন্তু এটাও একটা ওদের প্রবঞ্চনা। তাদের রাজনীতিজ্ঞগণ কথার ফুলঝড়ি ছড়াবে এবং তাদের বাহিনী গোপনে গোপনে ঠিকই মোর্চা বানাতে থাকবে। কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে তলোয়ার ছাড়া গতি নেই। কাশ্মীরে যুদ্ধ শুরু হলে দেখবে, অচিরেই পাকিস্তানী জনগণ এক কণ্ঠে একটা কথাই বলবে— তা হচ্ছে, তলোয়ারের ভাষা।'

বাইরের সড়কে জনগণ শ্লোগান দিচ্ছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

শ্লোগানের পাশাপাশি ট্রাক ও জীপের ঘড় ঘড় আওয়াজও শোনা গেল।

রাহাত বাইরে গিয়ে দেখে এসে বলল— ভাইজান! ফৌজ যাচ্ছে।

সলীম কুরসী থেকে উঠতে গিয়ে বলল— ইসমত! আমার লাঠিটা দাও তো। বাইরে বেরিয়ে আমি দেখতে চাই।

ইসমত ওদের কামরা থেকে লাঠি নিয়ে এল। ও বাইরে বেরোলে আরশাদ ওর সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল— সলীম! আমরা ভেবেছিলাম, ওই লাঠিটা গায়েব করলে তুমি বেরোবে না।

ঃ ইসমত, আমার লাঠি হলে আমি কবেই ওটা গায়েব করে ফেলতাম! আজ ওটা ছাড়াই ক'কদম হেঁটেছি।

ঃ তুমি খুব শীঘ্রই দেখবে, সাধারণ বোঝা বহন করতে পারছ।'

www.amarboi.org

আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে ওরা ফৌজি ট্রাক, লরি ও জীপ গাড়ী বহর দেখছিল।

ঃ ভাইজান! আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। চেয়ার এনে দিচ্ছি।

বলে রাহাত বেতের চেয়ার নিয়ে এল। ফটক থেকে ক'কদম দূরে সলীম চেয়ারে বসল। আরশাদ ওর নিকটে দাঁড়াল। ইসমত ও রাহাত আঙ্গিনাস্থ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য উপভোগ করছিল।

সড়কের দু'ধারে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল জনতা নারা লাগাচ্ছিল। ট্রাক ও লরি বহর চলে গেল। আরশাদ হাসপাতালে যাবার প্রস্তুতিকল্পে ভেতরে গেল। সলীমও উঠতে যাচ্ছিল। হঠাৎ পদব্রজী ফৌজ দেখা দেয়। আনমনে সলীমের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়— লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট।'

সেপাইরা নিকটে এল, ইসমত ও রাহাত দ্রুত ফুল বাগান থেকে ফুল ছিঁড়ে সেপাইদের রাস্তায় ছিটাতে লাগল।

সেনাদের একদল বাড়ীর সামনের পথ অতিক্রম করল। শেষ দলটা ওদের বাসার সামনে এসে গর্জে ওঠল— হল্ট্! সেনারা থেমে গেল।

ঃ রাইট টার্ন— সেপাইরা ডান দিকে তাকাল— স্ট্যান্ড এট ইজ'

কমান্ডার এসেই বলল— সলীম! এ সেই বিজলী যার অপেক্ষায় ছিলে তুমি। ওরা সেখান থেকেই এসেছে, যার অগ্রাধিনায়ক ছিলে তুমি। কাশ্মীরে তোমরা যে কাজ শুরু করেছিলে, ওদের দ্বারাই তা পূর্ণ হবে।

ঃ তুমি এখনই যাবে ?

ঃ হ্যাঁ, একঘন্টা পরেই আমাদের ব্যাটেলিয়ন রওয়ানা হয়ে যাবে। ভাইজান কোথায়?

সলীম উঠানের দিকে ইশারা করে বলল— ওদিকে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখছে।

মজীদ আগে বেড়ে বলল— ভাইজান! গতকাল আমেনার খত্ এসেছে। খুব সম্ভব আগামী সপ্তায় আপনাদের এখানে আসবে।

ইসমত বলল— আমাকেও পত্র লিখেছে সে।

ঃ আমি ওর চিঠির উত্তর লেখার ফুরসত পাইনি। এখন তো সময় হবেই না। ওকে লিখে দেবেন, আমি এখান থেকেই চলে যাচ্ছি। আপনার কাছ থেকে সেদিন যে বইটা নিয়েছিলাম— হারিয়ে ফেলেছি তা। না বলে কে যেন নিয়ে গেছে। এর বদলে আপনাকে কাশ্মীরের মহারাজার বাগানের আপেল পাঠাব।'

ঃ সাথে সাথে কাশ্মীর বিজয়ের সংবাদও।

ঃ জ্বি হ্যাঁ। তাও।

ঃ ভাইজান! এর বদলে আপনি আমার সব বইগুলো নিয়ে যান।

রাহাত যে এতক্ষণ খামোশ ছিল বলল— আমার জন্য কাশ্মীর থেকে কি আনবেন?

ঃ তোমার জন্য? মজীদ খানিক ভেবে বলল, তোমার জন্য জাফরান ফুল আনব।'

www.amarboi.org

ইসমত ও রাহাতকে খোদা হাফেয বলে মজীদ সলীমের কাছে এসে বলল—

সলীম! আমার কোম্পানী তোমাকে সেলামী দিতে চাচ্ছে।

ঃ না! না!!' চকিতে বাধা দিয়ে বলে ওঠে সলীম।

মজীদ বলল— এটা এজন্য নয় যে, তুমি আমার ভাই। নিছক এজন্য যে, তুমি সেই সেপাইদের একজন, যারা হাজারো মানুষের জীবন বাঁচিয়েছ। আমার কোম্পানী সেই মহান পুরুষকে সামান্য অর্থ যোগান দিতে চায়—

পূর্ব পাঞ্জাবে প্রচণ্ড জ্বরাক্রান্ত ও যখমী হওয়া সত্ত্বেও যে লড়েছে। এ সেলামী ওই যখমের জন্য, কাশ্মীর প্রান্তরে যাতে আক্রান্ত হয়েছিলে তুমি। সলীম! সকলেই তোমার পরিচিত। আমি সকলকে তোমার পয়গাম শুনিয়েছি। তোমার বই থেকেও পড়ে শুনিয়েছি।

সলীম যখন দাঁড়িয়ে ওই যখমীদের সেলামী গ্রহণ করছিল যাদের গুলিবিদ্ধ সীনার মধ্যে এক কওমের ভাগ্য লিপিবদ্ধ ছিল তখন ওর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হয়।

মজীদ মার্চ করার হুকুম দেয়— সড়কে সেপাইদের বুটের আওয়াজ শোনা যায়। সেনাদল চলে যায়। ক্রমান্বয়ে এই আওয়াজ বিলীন হয়ে যায়। সলীমের হৃদয়ের স্পন্দন বলছিল—

আগে বাড়ো— আগে বাড়ো— সামনে চলো—

ওর চোখে জমায়েত আঁসু— কৃতজ্ঞতার আঁসু–এ এক কবি, সাহিত্যিক, এক সেপাই ও এক ইনসানের আখেরী পুঁজি; যা ও আপনার কওমের জোয়ানদের জন্য নযরানা দিচ্ছিল

সমাপ্ত

www.amarboi.org

রক্তাক্ত ভারত

নসীম হিজাযী

অনুবাদ ঃ ফজলুদ্দীন শিবলী

সম্ভ্রমহারা এক মায়ের আর্তনাদ। এক বোনের ফরিয়াদ। বোবাকান্না এক মায়ের। নেহরুর অখণ্ড ভারতের শিকার এমন হাজারো মা, বোন ও মেয়ে।

- আমি তোমাদের গর্ব, তোমরা আমার সতীত্বের কসম খেতে পার।
- আমি সেই বোন যার উদাত্ত আহ্বানে কাঁপন ধরেছিল কাইসার ও কিসরার গগণচুমো প্রাসাদে।
- মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের তলোয়ার কোষমুক্ত করেছিলাম আমিই।
- সিন্ধু বিজয় হয়েছিল কেবল আমাকে কেন্দ্র করেই।
- সুলতান মাহমুদ গজনবী তৃপ্ত হয়েছে আমার দুধপান করে।
- সোমনাথ মন্দির দখল করতে আমিই মদদ যুগিয়েছিলাম।
- আমি সেই অগ্নিকন্যা যার শিরা-উপশিরায় তৈমুর লংয়ের রক্ত প্রবাহিত।
- দিল্লীর লাল কেল্লা নির্মিত হয়েছিল কেবল আমাকে উপলক্ষ করে।
- ভারতবর্ষের জমীনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজয় কেতন উড্ডীন করেছি আমি।

–জাতি হে! জানো! আমি কে?

আল-এছহাক প্রকাশনী

আল-এছহাক প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা